দর্শনের রূপরেখা

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

দর্শনের রূপরেখা

অনুবাদ ঃ
ডঃ আবদুল মতীন
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জুন, ১৯৬১

পাণ্ডুলিপি
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বা/এ : ১১০৬
মুদ্রণ-সংখ্যা : ২২৫০

প্রকাশক
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে
আবু আহম্মদ ভূইয়া
প্যারাডাইস প্রিন্টিং প্রেস
৪৪, বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার

DARSHANER RUPAREKHA (Bertrand Russell's *An Outline of Philosophy*) translated by Dr. Abdul Matin. Published by Bangla Academy, Dacca.

অনুবাদকের কথা

চিন্তাবিদ ও লেখক হিসাবে অনূদিত গ্রন্থের রচয়িতা বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের নাম, কেবল বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের সুধীমহলে সুপরিচিত। ছোট-বড়ো মিলিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি, এবং এগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ উনিশটিকে বিশুদ্ধ দর্শনের গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। অনূদিত গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯২৭। এর পরে তাঁর অন্ততঃ সাতখানা দর্শনের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে আলোচ্য গ্রন্থটির বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে, তাঁর মূল দার্শনিক মতামতের প্রায় সবগুলোরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ হিসাবে গ্রন্থটির নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে বলা যায়—অর্থাৎ, গ্রন্থটি কেবল দর্শনের outline বা 'রূপরেখা' নয়, তাঁর নিজস্ব দর্শনেরও রূপরেখা।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রাসেল তাঁর সুদীর্ঘ দার্শনিক-জীবনে একাধিক বার একাধিক ভাবে তাঁর নিজ মতামত পাল্‌টিয়েছেন। তবে জগৎ ও মানব-জ্ঞানের স্বরূপ, দর্শনের লক্ষ্য ও শক্তি-সীমা, নৈতিকতা ও মানব-জীবনের চরম কাম্য, ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে ভাব-বিবর্তনেব মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার পর আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যেসব মতামত রেখেছেন, পরবর্তী কালে সেগুলো থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। সুতরাং দার্শনিক রাসেলকে জানা ও বোঝার দিক থেকে এ গ্রন্থটির একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিংশ শতাব্দীর ভাষা-কেন্দ্রিক ও বিশ্লেষণাত্মক মূল দার্শনিক ধারার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও রাসেল দর্শনকে কেবল ভাষা-বিশ্লেষণ বলে মনে করেন নি; জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির ঐতিহ্যগত উদ্দেশ্যটাকে তিনি তত্ত্বগতভাবে ও কার্যতঃ দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। বিজ্ঞান তাঁর দর্শনের যাত্রাবিন্দু, এবং দর্শনকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিশীলন বলে স্বীকার করলেও তিনি মনে করেছেন যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নেই। জ্ঞান-বিদ্যায় তিনি মূলতঃ অভিজ্ঞতাবাদী ও বাস্তববাদী; জগতের স্বরূপ কল্পনায় তিনি জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মাঝামাঝি 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ'-এর প্রচারক;

জীবন-দর্শনে তিনি সুখকে মূল লক্ষ্য এবং প্রেমকে মৌল নৈতিক প্রেরণা হিসাবে মেনে নিয়ে, ধর্ম জাতি ও বর্ণগত সমুদয় বাহ্য পার্থক্যকে অস্বীকার করে, এক কল্যাণমুখী বিশ্বমানবতাবাদের বাণী-বাহক।

অনূদিত গ্রন্থটিতে তাঁর এসব মতামতের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। একটা বিশেষ সুবিধার কথা এই যে, বইটির সর্বশেষ অধ্যায়ের প্রথম দিকে তিনি পূর্ববর্তী আলোচনার একটা সারসংক্ষেপ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, স্বভাবতঃই পাঠক শুরুতে প্রথম অধ্যায়টি পড়বেন, যেখানে লেখক দর্শনের স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও সমস্যাবলীর চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে অন্যান্য অধ্যায়ে প্রবেশ করার আগে সুধী পাঠক সর্বশেষ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

প্রথম অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে রাসেল আশা প্রকাশ করেন: "সম্ভবতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা দার্শনিক সমস্যাগুলোকে এক নতুন আলোকে দেখার শক্তি পাব।" কাজেই, স্বাভাবিক ভাবেই, রাসেলের রচনায় আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এমন অনেক কথা এসে পড়েছে যেগুলোর সম্যক উপলব্ধির জন্য এসব বিদ্যার সঙ্গে একটু পরিচয় থাকা সুবিধাজনক। তবে রাসেল বিজ্ঞান নিয়ে যাত্রারম্ভ করলেও বিজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি। তাই দেখা যায়, আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও শেষ পর্যন্ত মানব-জ্ঞানের সম্যক ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি তাকে অংশতঃ প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং পদার্থবিদ্যার উপর আন্তরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও জগৎ-স্বরূপের জ্ঞানের দিক থেকে পদার্থবিদ্যার চেয়ে বরং মনোবিজ্ঞানের উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী।

রাসেলের জন্ম হয়েছিল ১৮৭২ সালের ১৮ই মে, ইংল্যাণ্ডের মনমাউথ-শায়ারে, এবং মৃত্যুও হয়েছে ইংল্যাণ্ডে, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০। এক সুবিখ্যাত ডিউক-পরিবারে তাঁর জন্ম। রাণী ভিক্টোরিয়ার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী লর্ড জন রাসেল তাঁর পিতামহ। রাসেল তাঁর সুদীর্ঘ আয়ুকাল পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। যুক্তিবিদ ও দার্শনিকের অধিগম্য বোধ হয় এমন কোন তাত্ত্বিক সমস্যা নেই যার উপর তিনি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেননি। শেষ বয়সে তিনি দু'খানা গল্পগ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর রচনার

সাহিত্যগুণের জন্যে ১৯৫০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। এ ছাড়া, তাঁর যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্বের এমন কোন জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যার উপর তাঁর জোরালো, দরদী, মানবতাবাদী ও শান্তিকামী কণ্ঠ শোনা যায়নি।

রাসেলের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও রচনাকর্মের বহুমুখিতা প্রসঙ্গে তাঁর এক ভক্ত মন্তব্য করেছেন: 'এত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাসেল লিখেছেন যে, সম্ভবতঃ জীবিত লোকদের মধ্যে এসব বিষয়ের সবগুলোর উপর সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন এমন কেউ নেই—স্বয়ং রাসেলকে অবশ্য বাদ দিয়ে—যিনি তাঁর লেখার উপর একটা পূর্ণাঙ্গ ও অনবদ্য ভাষ্য লিখতে পারেন।' এ হেন লেখকের গ্রন্থ অনুবাদে পারিভাষিক সমস্যা একটু অসাধারণ হওয়ারই কথা। এ ছাড়া, রাসেল-রচনার সর্বজন-বিদিত প্রসাদগুণ সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য কতক জায়গায় অস্পষ্ট থেকে গেছে। এসব কারণে যথেষ্ট আয়াস সত্ত্বেও অনুবাদে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে অনুবাদ আমি যথাসম্ভব মূলানুগ করার চেষ্টা করেছি—অংশত ভাষার দাবী অগ্রাহ্য না করে। কারণ আমি মনে করি, বিশেষতঃ তত্ত্বমূলক রচনার ক্ষেত্রে অনুবাদকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত লেখকের বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে বোধগম্য করে তোলা। আমি আরও মনে করি যে, অনুবাদকের উচিত মূল লেখক যা বলেছেন কেবল তা বলা নয়, তিনি 'যে ভাবে' বলেছেন যথাসম্ভব (অর্থাৎ, ভাষাগত সৌষ্ঠব বাদ না দিয়ে) সেই ভাবে বলা। সেজন্য—উদাহরণস্বরূপ—নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমি লেখকের জটিল বাক্যকে ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত সরল বাক্য অথবা দুই বা ততোধিক সরল বাক্যকে যোগ করে জটিল বাক্য গঠনের প্রয়াস পাইনি, এবং লেখক যেখানে যে বাচ্য ব্যবহার করেছেন, যথাসম্ভব সে বাচ্যই রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এমন কি, বিনা প্রয়োজনে লেখকের বিরামচিহ্ন প্রয়োগের বিশেষ রীতিও আমি লঙ্ঘন করতে চাইনি।

তবে দু'একটা বিষয়ে সজ্ঞানেই লেখকের রীতি অনুসরণ করিনি বা করা যায়নি। লেখক বইটির সর্বত্র যুগ্ম উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। মুদ্রিত পৃষ্ঠাকে পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে আমি প্রায় সব ক্ষেত্রে সরল উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করেছি। এছাড়া লেখক জোর দিতে গিয়ে যে-সব কথা বাঁকা হরফে দিয়েছেন, বাংলা মুদ্রণে বাঁকা হরফের অপ্রতুলতার দরুন অনুবাদে

সেগুলোকে উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে দিতে হয়েছে। এ বিষয়ে মুদ্রণকার্যে একটা হাস্যকর বিচ্যুতিও ঘটে গেছে (অনুবাদের ৩১তম পৃঃ দ্রঃ)। মূল পাণ্ডুলিপিতে বাঁকা হরফে ছাপার সংকেত হিসাবে কয়েকটা পঙক্তির নীচে যে রেখা টেনে দিয়েছিলাম ভুলক্রমে সে রেখাগুলোই থেকে গেছে, অথচ পাশেই লেখা আছে যে, এ পঙক্তিগুলো বাঁকা হরফে।

অনুবাদে মূল গ্রন্থের বেশ-কিছু ইংরেজী শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ রেখে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য দুটো: পাঠককে মূল শব্দটার সঙ্গে পরিচিত করানো এবং ভুলবুঝাবুঝি এড়ানো। ইংরেজী শব্দ বাহুল্যে যাতে অনুবাদ আচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে কেবল সে জন্যেই কিছু ইংরেজী শব্দ মূল পৃষ্ঠার নীচে পাদটীকার আকারে দেওয়া হয়েছে—এর মধ্যে আর কোন নীতি নেই।

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলা একাডেমী দর্শনের উপর কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, এ অনুবাদ সে পরিকল্পনারই অংশ-বিশেষ। অনুবাদ সমাপ্ত হয় ১৯৭৭ সালে একটু বিলম্বে হলেও অনুবাদটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে দেখে আমি আনন্দিত ও একাডেমী কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

অনুবাদের পাণ্ডুলিপি, পরিভাষা ও নির্ঘণ্ট তৈরীর ব্যাপারে আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন জগন্নাথ সরকারী মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক (ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক) জনাব আবদুল বারী, আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক জনাব আলী আহম্মদ মল্লিক, এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী জনাব আনিসুজ্জামান। অনেক পরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপির প্রেস-কপি তৈরী করার জন্যে আমার প্রাক্তন ছাত্র শাহাদৎ হোসেনের কথাও এ প্রসংগে বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি। দীর্ঘ-কালীন অনুবাদ কার্যে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্যে আমার স্ত্রী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা, হাসিনা বেগমের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করতে হয়।

আমার ব্যক্তিগত প্রয়াস ও সহযোগিতা সত্ত্বেও অনুবাদে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকে গেছে। সেজন্য অনুবাদের সঙ্গে একটি শুদ্ধিপত্রও সংযোজিত হলো— যদিও এ শুদ্ধিপত্র অসম্পূর্ণ। তবে নানাভাবে এ অনুবাদের মুদ্রণকার্যের দায়িত্ব গ্রহণকারী প্যারাডাইস প্রেসের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দের কাছ থেকে যে সৌজন্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তা প্রশংসার যোগ্য।

আ. ম.

এপ্রিল, ১৯৮১

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় :	দার্শনিক সংশয়		১

প্রথম খণ্ড
(বাইরের দিক থেকে মানুষ)

দ্বিতীয় অধ্যায়	মানুষ ও তার পরিবেশ	...	২৩
তৃতীয় অধ্যায়	প্রাণী ও শিশুদের শিক্ষণ প্রক্রিয়া	...	৩৯
চতুর্থ অধ্যায়	ভাষা	...	৫৬
পঞ্চম অধ্যায়	বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষণ	...	৭৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে স্মৃতি	...	৮৯
সপ্তম অধ্যায়	অভ্যাস হিসাবে অনুমান	...	১০০
অষ্টম অধ্যায়	আচরণবাদী দৃষ্টিতে জ্ঞান	...	১১০

দ্বিতীয় খণ্ড
(পদার্থিক জগৎ)

নবম অধ্যায়	পরমাণুর গঠন	...	১২৩
দশম অধ্যায়	আপেক্ষিকতা	...	১৩৬
একাদশ অধ্যায়	পদার্থবিদ্যার কারণিক নিয়মাবলী	...	১৪৪
দ্বাদশ অধ্যায়	পদার্থবিদ্যা ও প্রত্যক্ষণ	...	১৫৫
ত্রয়োদশ অধ্যায় :	পদার্থিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশ	...	১৭২
চতুর্দশ অধ্যায়	প্রত্যক্ষণ ও পদার্থবিদ্যার (Physical) কার্যকারণ নিয়ম	...	১৮১
পঞ্চদশ অধ্যায় :	পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের প্রকৃতি	...	১৯০

তৃতীয় খণ্ড

(ভেতরের দিক থেকে মানুষ)

ষোড়শ অধ্যায়	: আত্ম নিরীক্ষণ	...	২০৫
সপ্তদশ অধ্যায়	: মানস-চিত্র	...	২২৪
অষ্টাদশ অধ্যায়	: কল্পনা ও স্মৃতি	...	২৩৮
ঊনবিংশতিতম অধ্যায়	: প্রত্যক্ষণের অন্তর্দার্শনিক বিশ্লেষণ	...	২৫৬
বিংশতিতম অধ্যায়	: চৈতন্য ?	...	২৬৮
একবিংশতিতম অধ্যায়	: আবেগ, বাসনা ও ইচ্ছা	...	২৭৮
দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়	: নীতিবিদ্যা	...	২৮৭

চতুর্থ খণ্ড

(বিশ্ব)

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়	: অতীতের কিছু বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদ		৩০৩
চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়	: সত্য ও মিথ্যা	..	৩২৭
পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়	: অনুমানের বৈধতা	...	৩৪৩
ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়	: ঘটনা, জড় ও মন	...	৩৫৬
সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়	: বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান	...	৩৭৮
নির্ঘণ্ট		...	৩৯১
পরিভাষা		...	৪০৬

প্রথম অধ্যায়

দার্শনিক সংশয়

অনেকেই হয়তো আশা করবেন যে, শুরুতেই আমি 'দর্শন'-এর একটা সংজ্ঞা দেব, কিন্তু, ঠিক হোক বা বেঠিক হোক, আমি তা করতে চাইনে। আমরা যে দর্শন গ্রহণ করবো তার সঙ্গে মিলিয়ে 'দর্শন'-এর সংজ্ঞারও প্রকারভেদ হবে; শুরুতে আমরা কেবল এটুকু বলতে পারি যে, কতকগুলো সমস্যা আছে যেগুলো নিয়ে ভাবতে কিছু লোকের ভালো লাগে এবং যেগুলো, বর্তমানে অন্ততঃ, বিশেষ বিজ্ঞানগুলোর (special sciences) কোনটারই আওতাভুক্ত নয়। এ সমস্যাগুলো এ রকম যে, সাধারণ চোখে যাকে জ্ঞান বলে মনে হয় তার সম্বন্ধে এগুলো থেকে আমাদের মনে সংশয় জাগে এবং এ সংশয়ের উত্তর পাওয়া যেতে পারে কেবল এক বিশেষ ধরনের অনুসন্ধানের (study) মাধ্যমেই। এ অনুসন্ধানেরই আমরা নাম দিই 'দর্শন'। সুতরাং 'দর্শন'-এর সংজ্ঞা দিতে হলে তার প্রথম ধাপ হচ্ছে এসব সমস্যা ও সংশয়গুলোকে তুলে ধরা; প্রকৃত (actual) দর্শন চর্চারও সেটাই হচ্ছে প্রথম ধাপ। দর্শনের গতানুগতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে কতক-গুলোর সমাধান বুদ্ধির সাহায্যে দেওয়া সম্ভবপর বলে আমার মনে হয় না, কারণ তারা আমাদের ধীশক্তির সীমারেখার মধ্যে ধরা পড়ে না; এ ধরনের সমস্যা নিয়ে আমি আলোচনা করবো না। তবে সেটা যাই হোক, অন্য সমস্যাগুলোর কোন চূড়ান্ত সমাধান ঠিক এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব না হলেও, কোন্ দিক থেকে সে সমাধান আসতে পারে এবং কালক্রমে কোন্ রকমের সমাধান পাওয়া সম্ভবপর হবে সে সম্বন্ধে বিস্তর আলোকপাত করা যেতে পারে।

সত্যিকার জ্ঞান অর্জনের এক অসাধারণ একগুঁয়ে প্রচেষ্টা থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। সাধারণ জীবনে যাকে জ্ঞান বলে মনে করা হয় তার মধ্যে তিনটে ত্রুটি আছে: এ জ্ঞান অতিনিশ্চিত (cocksure), অস্পষ্ট এবং আত্ম-বিরোধী। দর্শন চর্চার পথে প্রথম ধাপ হচ্ছে এ ত্রুটিগুলোর সম্বন্ধে অবহিত হওয়া—অলস সংশয়বাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার জন্যে নয়, বরং তার [ওই অস্পষ্ট

জ্ঞানের] জায়গায় এমন এক পরিশোধিত জ্ঞান পাবার জন্যে, যে জ্ঞান পরীক্ষামূলক, সুনির্দিষ্ট এবং আত্মসমন্বিত। আরেকটা বৈশিষ্ট্য অবশ্য আছে যা আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আমরা দেখতে চাই—তার নাম ব্যাপকতা: আমরা চাই আমাদের জ্ঞানের পরিধি যতদূর সম্ভব বিস্তৃত হোক। কিন্তু সেটা দর্শনের চেয়ে বরং বিজ্ঞানেরই দেখবার বিষয়। অধিক বৈজ্ঞানিক সত্য জানলেই দার্শনিক হিসাবে একজনের মর্যাদা বেড়ে যাবে এমন কোন কথা নেই; তিনি যদি দর্শনানুরাগী হন তাহলে তিনি বিজ্ঞানের কাছ থেকে শিখবেন মূলনীতি, পদ্ধতি এবং সাধারণ ধারণা (conceptions)। বলতে গেলে, দার্শনিকের কাজ স্থূল সত্যের পরবর্তী ধাপে।[১] বৈজ্ঞানিক নিয়মের সাহায্যে বিজ্ঞান চেষ্টা করে সত্যগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পুলিন্দায় (bundles) জড়ো করতে; এ নিয়মগুলোই দর্শনের কাঁচামাল, মৌলিক সত্যগুলো (original facts) নয়। দর্শনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমালোচনা করা হয়; কিন্তু দর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে যত না চায় তার চেয়ে বেশী চায় বিশেষ বিজ্ঞানগুলোর সকলের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করতে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ আর দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোন চূড়ান্ত পার্থক্য নেই।

সাধারণ জ্ঞানের কাছ থেকে বস্তু (things) ও তার গুণ, দেশ, কাল এবং কার্যকারণ সম্বন্ধ, ইত্যাদি ধারণা নিয়ে তারই ভিত্তিতে বিশেষ বিজ্ঞান-গুলো গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান নিজেই দেখিয়েছে যে, সাধারণ জ্ঞান-লব্ধ এসব ধারণার কোনটাই জগতের ব্যাখ্যার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়; তবে মূলনীতিগুলোর প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন বিজ্ঞানের কোন শাখার কাজ নয়। এটা অবশ্যই দর্শনের কাজ। শুরুতেই আমি বলতে চাই যে, এ কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার ধারণা এই যে, কাণ্ডজ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস-গুলো কেবল যে বিজ্ঞানের মধ্যে বিশৃঙ্খলার (confusion) সৃষ্টি করে তাই নয়, তারা নীতিবিদ্যা, রাজনীতি, সামাজিক বিধি এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও ক্ষতি সাধন করে। বর্তমান গ্রন্থে মন্দ দর্শনের এই সব ব্যবহারিক ফলাফল তুলে ধরা আমার উদ্দেশ্য নয়. আমার কাজ হবে সম্পূর্ণরূপে তাত্ত্বিক (intellectual)। তবে আমার কথা যদি সত্যি হয়

১, "at the second remove from crude fact."

তো বলবো, আমরা যে-সব তাত্ত্বিক অভিযান চালাতে যাচ্ছি নানা ক্ষেত্রে তাদের নানা প্রভাব রয়েছে, প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে যার বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাসের উপর ভাবাবেগের প্রভাব অধুনিক মনোবিজ্ঞানের এক প্রিয় আলোচ্য বিষয়; কিন্তু তার বিপরীত প্রভাব—অর্থাৎ, আমাদের ভাবাবেগের উপর বিশ্বাসের প্রভাব—সে-ও আছে, যদিও কোন প্রাচীনপন্থী বুদ্ধিবাদী মনোবিজ্ঞান তাকে যেরকম মনে করবে সেটা সেরকম নয়। যদিও এ নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছিনে, তবু কথাটা মনে রাখা দরকার, যেন আমরা বুঝতে পারি যে, নিছক বুদ্ধির আওতা-বহির্ভূত বিষয়ের সঙ্গেও আমাদের আলোচনার সংশ্রব থাকতে পারে।

একটু আগে বলেছি যে, সাধারণ (common) বিশ্বাসগুলোতে তিনটে ত্রুটি আছে—তারা অতিনিশ্চিত, অস্পষ্ট ও আত্মবিরোধী। দর্শনের কাজ হচ্ছে জ্ঞানকে একেবারে বিসর্জন না দিয়ে এ ত্রুটিগুলো সংশোধন করা। কেউ যদি ভালো দার্শনিক হতে চান তো তাঁর মধ্যে জানার জন্যে প্রবল ইচ্ছা থাকতে হবে এবং তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে তিনি যে জানেন সে কথা বিশ্বাস করার ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ সতর্কতা; যৌক্তিক সূক্ষ্মদর্শিতা এবং সঠিকভাবে চিন্তা করার অভ্যাসও তাঁর থাকতে হবে। এগুলো অবশ্য একটা মাত্রাগত ব্যাপার। বিশেষতঃ অস্পষ্টতা মানুষের সকল চিন্তার মধ্যেই অল্পবিস্তর আছে; এর পরিমাণ আমরা অনির্দিষ্টভাবে কমিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একে নির্মূল করতে পারিনে। সুতরাং, দর্শন একটা নিত্যচলমান কাজ, যার মধ্যে কোন কালেই চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নয়। এদিক থেকে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্রব রাখার ফলে দর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মতত্ত্বের সূত্রগুলো (theological dogmas) সুনির্দিষ্ট এবং গোঁড়া ধর্মাবলম্বীরা তাদের কোনরূপ উন্নতি করা সম্ভবপর বলে মনে করে না। অনুরূপভাবে দার্শনিকেরাও অনেকবারই চেষ্টা করেছেন চূড়ান্ত মতবাদ খাড়া করতে; যে ক্রমাগ্রসরতায় বৈজ্ঞানিকেরা সন্তোষ লাভ করেছেন, তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট হন নি। এ বিষয়ে, আমার মতে, তাঁরা বিভ্রান্তঃ বিজ্ঞানের মতোই দর্শনেরও হওয়া উচিত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও অস্থায়ী (provisional); চূড়ান্ত সত্য এ জগতে নেই, আছে স্বর্গে।

যে তিনটে ত্রুটির কথা উল্লেখ করলাম তারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং তাদের একটাকে জানতে পারলে বাকী দুটোকেও আমরা চিনতে পারি। আমি এ তিনটেরই গোটা কয়েক দৃষ্টান্ত দেবো।

প্রথমেই টেবিল, চেয়ার, গাছ, ইত্যাদি সাধারণ জিনিসে আমাদের যে বিশ্বাস তার কথা ধরা যাক। দৈনন্দিন জীবনে এদের সম্পর্কে আমরা একেবারে সুনিশ্চিত, অথচ এ নিশ্চয়তার সপক্ষে উপযুক্ত কারণ আমাদের প্রায় নেই বললেই চলে। সরল কাণ্ডজ্ঞান (naive common sense) মনে করে যে, তাদেরকে যে রকম মনে হয় আসলেও তারা ঠিক তাই, কিন্তু সেটা অসম্ভব এই কারণে যে একই সময়ে দু'জন পর্যবেক্ষকের কাছে তারা ঠিক এক রকম মনে হয় না; অন্ততঃ এটা অসম্ভব হবে যদি পর্যবেক্ষণের বিষয়টা (object) একটিমাত্র বস্তু হয় এবং সকল পর্যবেক্ষকের জন্যে অভিন্ন হয়। যদি আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকি যে, বস্তুকে [জ্ঞানের বিষয়কে] আমরা যে-রকম দেখি সেরকম সে নয়, তাহলে বস্তু যে আছে সে বিষয়ে আমরা আর আগের মত নিশ্চয়তা অনুভব করতে পারিনে; সন্দেহের প্রথম অনুপ্রবেশ এখানেই। তবে আমরা অবশ্য তাড়াতাড়ি এ বাধা কাটিয়ে উঠবো এবং বলবো যে, পদার্থবিদ্যা বস্তু সম্পর্কে যা বলে[1] বস্তু 'আসলে' (really) ঠিক তাই। এখন, পদার্থবিদ্যার মতে, একটা টেবিল বা চেয়ার 'আসলে' ইলেকট্রন ও প্রোটনের এক অবিশ্বাস্য রকমের বড় পরিমণ্ডল (system) মাত্র, যার মধ্যে নিজেদের মাঝখানে শূন্য স্থান রেখে ইলেকট্রন আর প্রোটনগুলো দ্রুত ঘুরছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু সাধারণ লোকের মতোই পদার্থবিদও বস্তুজগতের অস্তিত্বের জন্য তাঁর ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। ভক্তি সহকারে আপনি যদি তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, "আপনি কি একজন পদার্থবিদ হিসেবে অনুগ্রহ করে আমাকে বলবেন একটা চেয়ার আসলে ঠিক কি?" তাহলে আপনি একটি জ্ঞানগর্ভ উত্তর পাবেন। তবে যদি কোন রকম ভনিতা না করেই আপনি বলেন, "ওখানে কি কোন চেয়ার আছে?" তাহলে তিনি বলবেন,

১. স্কুলের কোন পাঠ্য-পুস্তকে যে প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা পাওয়া যেতে পারে, এখানে আমি তার কথা ভাবছিনে; আমি ভাবছি আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা, তার চেয়েও বিশেষভাবে পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যার কথা, যে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমার আরও কিছু বলার থাকবে।

'অবশ্যই আছে ; দেখতে পাচ্ছেন না ?" আপনার দিক থেকে এর জবাব হওয়া উচিত না-বোধক—আপনার বলা উচিত, "না, আমি কতকগুলো রঙের ছাপ দেখছি বটে, কিন্তু আমি কোন ইলেক্ট্রন বা প্রোটন তো দেখছিনে, অথচ আপনি বলছেন যে, তাদের দিয়েই চেয়ার তৈরী।" উত্তরে তিনি বলতে পারেন : "সে ঠিক, কিন্তু অনেকগুলো ইলেক্ট্রন আর প্রোটন একসঙ্গে কাছাকাছি দাঁড়ালে একটা রঙের ছাপের (patch of colour) মত দেখায়।" "'মত দেখায়' বলতে আপনি কি বুঝাতে চান ?"—তখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন। জবাব নিয়ে তিনি তৈরী। তিনি বুঝাতে চান যে, ইলেক্ট্রন ও প্রোটন থেকে আলোক-তরঙ্গ যাত্রা শুরু করে (অথবা আরও সম্ভবতঃ আলোর কোন উৎস থেকে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন কর্তৃক তারা প্রতিফলিত হয়), চোখে এসে পৌঁছে দণ্ড ও শঙ্কু (rods and cones), অক্ষিস্নায়ু ও মস্তিষ্কের উপর একের পর এক কার্য সম্পাদন করে এবং শেষ পর্যন্ত একটি সংবেদন সৃষ্টি করে। তবে তিনি কখনও চোখ, অক্ষিস্নায়ু বা মস্তিষ্ক দেখেননি, ঠিক যেমন তিনি চেয়ার দেখেননি। তিনি কেবল কতকগুলো রঙের ছাপ দেখেছেন, চোখকে যাদের "মত দেখায়" বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ, তিনি মনে করেন যে, আপনি (আপনি যেমন মনে করেন) চেয়ার দেখার কালে যে সংবেদন পান, তার কতকগুলো পরম্পরাবদ্ধ কারণ (series of causes) আছে ; সে কারণগুলো ভৌতিক (physical) ও মানসিক, কিন্তু তিনি নিজেই দেখাচ্ছেন যে, তারা স্বধর্মানুসারেই চিরকাল অভিজ্ঞতার আওতার বাইরে থেকে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণের উপর দাঁড় করাবার ভান করেন।[১] স্পষ্টতঃই নৈয়ায়িকের জন্যে একটা সমস্যা আছে এখানে—যে সমস্যা পদার্থবিদ্যার নয় বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অন্য কোন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। সঠিকতার সন্ধান করতে গেলে যে নিশ্চয়তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এ তারই প্রথম দৃষ্টান্ত।

পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন যে, তিনি যা প্রত্যক্ষ করেন (perceives), তার থেকেই তিনি তাঁর ইলেক্ট্রন ও প্রোটন অনুমান করেন। কিন্তু কখনও কোন সুস্পষ্ট যুক্তি-পরম্পরার উপর এ অনুমানটাকে দাঁড় করানো হয় না এবং যদি

১. দাবী তোলেন (pretends)।

কখনও হতো তাহলেও খুব বেশী বিশ্বাস স্থাপন করার মত যৌক্তিকতা তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতো না। বস্তুতঃ, কাণ্ডজ্ঞান-স্বীকৃত সাধারণ বস্তু সমুদয় থেকে ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনে যে অগ্রগতি, কতকগুলো বিশ্বাস দ্বারা সে অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত। কদাচিৎ আমরা সে-সব বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেই তারা আছে। এ বিশ্বাসগুলো অপরিবর্তনীয় নয়, কিন্তু তাদের বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি গাছের মত। আমরা এই ভেবে শুরু করি যে, কোন একটা চেয়ারকে দেখতে যে-রকম আসলেও সে তাই এবং আমরা যখন তাকাচ্ছি না তখনও সেটা আছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে এ বিশ্বাস দুটো সামঞ্জস্যহীন। আমাদের দেখার উপর নির্ভর না করে যদি চেয়ারটাকে টিকে থাকতে হয় তাহলে আমরা যে রঙের ছাপ দেখি তার থেকে তাকে ভিন্ন হতে হবে, কারণ এ ছাপটা দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারের বাইরে অবস্থিত কতকগুলো শর্তের উপর। সে শর্তগুলো হচ্ছে: আলো কিভাবে পড়ছে, আমরা নীল চশমা পরে আছি কিনা, ইত্যাদি। এর ফলেই, চেয়ার দেখার সময় আমাদের মনে যে-সব সংবেদন জন্মে, বাধ্য হয়ে বৈজ্ঞানিক 'আসল' চেয়ারকে তার কারণ (অথবা কারণের এক অপরিহার্য অংশ) বলে মনে করেন। এইভাবে আমরা কার্যকারণ সম্বন্ধকে একটি অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori) বিশ্বাস বলে স্বীকার করতে বাধ্য হই—যে বিশ্বাস ছাড়া 'আসল' চেয়ারের অস্তিত্ব কল্পনা করার কোন যুক্তিই আমাদের হাতে থাকতো না। এ ছাড়া, স্থায়িত্বের খাতিরে অধিবস্তুর (substance) ধারণাও আমরা নিয়ে আসি। 'আসল' চেয়ার একটা অধিবস্তু, অথবা অধিবস্তুর সমষ্টি, যার মধ্যে একটা স্থায়িত্ব এবং সংবেদন সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। সংবেদন থেকে ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন অনুমান করার ব্যাপারে কম-বেশী অবচেতনভাবে এ পরাতাত্ত্বিক বিশ্বাস কাজ করেছে। দার্শনিকের কাজ হবে এ ধরনের বিশ্বাসগুলোকে খুঁড়ে বের করে দিনের আলোয় মেলে ধরা এবং তখনও তারা টিকে থাকে কিনা সেটা লক্ষ্য করা। প্রায়ই দেখা যাবে যে, আলোতে মেলে ধরলেই তারা অক্কা পায়।

এখন অন্য কথায় আসা যাক। যে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বা বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রমাণের মধ্যে স্মৃতি ও সাক্ষ্য (testimony) উভয়ই আছে। অতীতে আমরা যা পর্যবেক্ষণ করেছি বলে মনে পড়ে এবং অন্যে যা পর্যবেক্ষণ

করেছে বলে দাবী করে, উভয়ের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। বিজ্ঞানের একেবারে প্রারম্ভকালে কখনও কখনও সাক্ষ্য বাদ দেওয়া হয়তো সম্ভব হয়েছে; কিন্তু অতি শীঘ্রই, অতীতে নিশ্চিতভাবে যে ফলাফল পাওয়া গেল, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে লাগলো এবং এই ভাবেই সেটা অন্যের সংরক্ষিত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করতে লাগলো। বস্তুতঃ অন্যের সাক্ষ্যপ্রমাণ বাদ দিলে জড়বস্তুর (physical objects) অস্তিত্বে আমরা খুব বেশী বিশ্বাস করতে পারতাম না। কখনও কখনও লোকে মতিভ্রমে (hallucination) ভোগে, অর্থাৎ তারা মনে করে যে তারা কিছু প্রত্যক্ষ করছে, কিন্তু অন্যে তাদের সে বিশ্বাসের সমর্থনে প্রমাণ দিচ্ছে না। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, তারা বিভ্রান্ত। একই রকম ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের প্রত্যক্ষণের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে তার ফলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমাদের প্রত্যক্ষণের পেছনে বাহ্য কারণ রয়েছে; এ না হলে জড়বস্তুতে আমাদের সরল বিশ্বাস যাই থাকতো না কেন, সে বিশ্বাস অনেক আগেই হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। সে জন্যই স্মৃতি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিজ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও অবশ্য এদের প্রত্যেকটিই সংশয়বাদীর দ্বারা সমালোচিত হওয়ার যোগ্য। তাঁর সমালোচনার মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা কম-বেশী সাফল্য লাভ করতে পারি; কিন্তু তথাপি, আমরা যদি যুক্তিবাদী হই, তাহলে আমাদের মূল বিশ্বাসগুলোর আগের শক্তি আর থাকবে না। আর একবার, বেশী সঠিক হতে গিয়ে অতিবিশ্বাসের মাত্রা আমাদের কমে আসবে।

স্মৃতি আর সাক্ষ্যের প্রসঙ্গ ধরে আমরা মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে এসে পৌঁছি। এ পর্যায়ে এ দুটো নিয়ে আমি আলোচনা করবো কেবল সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কিছু সত্যিকার দার্শনিক সমস্যা আছে যেগুলো সমাধান করা দরকার। স্মৃতি নিয়েই আমি আরম্ভ করবো।

স্মৃতি কথাটার নানা রকমের অর্থ আছে। এই মুহূর্তে যে রকমটি নিয়ে আমি আলোচনা করবো, তা হচ্ছে অতীত ঘটনাবলী মনে করা (recollection)। ভ্রমশীলতার দিক থেকে এর এমনি বদনাম আছে যে, প্রত্যেক পরীক্ষকই (experimenter) যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর পরীক্ষার ফল লিখে রাখেন; যে-সব প্রতক্ষ (direct) বিশ্বাস দিয়ে স্মৃতি তৈরী তাদের চেয়ে, লিখিত

শব্দ থেকে অতীত ঘটনাবলীর অনুমানকেই তিনি অপেক্ষাকৃত কম ভ্রমশীল বলে মনে করেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড লিখনের মাঝখানে সামান্য কয়েক মুহূর্ত হলেও কিছু সময় পার হয়ে যাবেই, যদি-না রেকর্ড এমন খণ্ড খণ্ড হয় যে, তার ব্যাখ্যার জন্যে স্মৃতির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কাজেই স্মৃতিকে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাস না করে আমরা পারি না। অধিকন্তু, স্মৃতি না হলে কোন দলিল (record)-কেই আমরা অতীতের প্রতি প্রযোজ্য বলে ব্যাখ্যা করতে করতে পারি না, কারণ তখন আমরা অতীত বলে কিছু ছিল বলে জানতে পারবো না। এখন, স্মৃতির প্রমাণিত ভ্রমশীলতা ছাড়াও সংশয়বাদী আরেকটা কথা বিবেচনা করার জন্যে চাপ দিতে পারেন, যাতে আমরা অপ্রস্তুত হয়ে যেতে পারি। তিনি বলতে পারেন যে, যে স্মৃতি এখন ঘটছে তার থেকে এটা প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয় যে, যা স্মৃত তা অন্য কোন সময়ে ঘটেছিল; কারণ এটা সম্ভব যে, হঠাৎ করে পাঁচ মিনিট আগে জগৎটা আবির্ভূত হয়েছে—তখন সে যে অবস্থায় ছিল ঠিক সে অবস্থায়ই[১]—এবং তখন তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর স্মরণ-ক্রিয়াগুলোও ছিল।[২] বিবর্তনের বিরুদ্ধে এডমাণ্ড গসের (Edmund Gosse) পিতার মত ডারউইন-বিরোধীরা অনেকটা এ রকম যুক্তিই প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, খ্রীস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে জীবাশ্ম-সুদ্ধ পরিপূর্ণ অবয়বে জগৎ সৃষ্ট হয়েছিল। জীবাশ্মগুলো সংযোজিত হয়েছিল আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য। হঠাৎ করেই সৃষ্ট হয়েছিল জগৎ, কিন্তু বিবর্তিত হলে তার যা চেহারা হতো তেমন করেই সে সৃষ্ট হয়েছিল। এ মতের ভেতর কোন যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা নেই। সেইরূপ, সমস্ত স্মৃতি ও দলিল-পত্রসহ পাঁচ মিনিট আগে জগৎ সৃষ্ট হয়েছিল—এ মতের মধ্যেও কোন যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। একে একটা অসম্ভাব্য (improbable) প্রকল্প বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যুক্তির সাহায্যে একে খণ্ডন করা যাবে না।

১. অর্থাৎ, পাঁচ মিনিট আগে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে জগতের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেনি, কারণ তার পূর্বে সে ছিল না। (অনুবাদক)

২. অর্থাৎ পাঁচ মিনিট আগে জগতের আবির্ভাব ঘটামাত্র লোকে ভুল করে মনে করতে লাগলো যে, বহু আগে থেকেই সে আছে, ইত্যাদি। (অনুবাদক)

এটাকে একটা আজগবী যুক্তি মনে হতে পারে, কিন্তু এ ছাড়াও খুঁটিনাটি বিষয় (details) সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কারণ আছে যে জন্যে স্মৃতির উপর কম-বেশী অবিশ্বাস জন্মাতে পারে। এটা সুস্পষ্ট যে, অতীতের কোন ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসকে সরাসরি প্রমাণ (direct confirmation) করা সম্ভব নয়, কারণ অতীতকে পুনরায় ঘটানো যাবে না। অন্যে যা প্রকাশ করছে তার মধ্যে এবং সমসাময়িক দলিলপত্রের মধ্যে আমরা পরোক্ষ ধরনের প্রমাণ খুঁজে পেতে পারি। দ্বিতীয়টার[১] মধ্যে, আমরা দেখেছি, কিয়ৎ পরিমাণে স্মৃতির একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু তার পরিমাণ খুবই কম হতে পারে—যেমন, কোন আলাপ-আলোচনা সংঘটিত হওয়ার সময়ই যদি তার একটা শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট তৈরী করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এর চেয়ে বেশী সময়ের কোন ব্যাপার হলে আমরা স্মৃতির প্রয়োজন সম্পূর্ণ এড়াতে পারি না। ধরা যাক, সম্পূর্ণ অসাধু উদ্দেশ্যে কোন একটা কাল্পনিক কথোপকথন তৈরী করা হলো। আইনের আদালতে তার কাল্পনিক চরিত্র প্রমাণ করার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হবে সাক্ষী-সাবুদের স্মৃতির উপর। আর দীর্ঘ সময়ের উপর বিস্তৃত সকল স্মৃতিই ভ্রান্তিপ্রবণ; সকল আত্মজীবনীতেই যে কিছু-না-কিছু ভুল থেকে যায়, তার মধ্যেই এটা ধরা পড়ে। বহু বছর আগে লিখিত চিঠিপত্র পড়লে যে কোন লোক ধরতে পারে, কি ভাবে তার স্মৃতি অতীত ঘটনাবলীকে বিকৃত করেছে। এইসব কারণে, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমরা যে স্মৃতির উপর নির্ভর না করে পারি না, এ সত্যটাই, আপাতদৃষ্টিতে, জ্ঞান বলে বিবেচিত কোন কিছুকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলে মনে না করার অন্যতম কারণ। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরও যত্ন-সহকারে স্মৃতির সমস্যা নিয়ে বিবেচনা করা হবে।

সাক্ষ্য (testimony) সম্বন্ধে এমন-কি এর চেয়েও বেশী বিদঘুটে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্নগুলো এত বিদঘুটে হওয়ার কারণ এই যে, পদার্থবিদ্যার জ্ঞান গড়ে তোলার সাক্ষ্যের ভূমিকা আছে; আবার, বিপরীতক্রমে, সাক্ষ্যের বিশ্বাস-যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন। অধিকন্তু, সাক্ষ্যের সূত্র ধরে মন ও জড়ের সম্বন্ধ বিষয়ক সমস্ত সমস্যাবলী মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

---

১. অর্থাৎ, সমসাময়িক দলিলপত্রের মধ্যে। (অনুবাদক)

লাইবনিজ প্রমুখ কতিপয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক এমন সব মতবাদ খাড়া করেছেন যেগুলো অনুসারে সাক্ষ্য বলে কিছু নেই; কিন্তু তাঁরাই আবার এমন অনেক কিছু সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, সাক্ষ্য ছাড়া যাদের জানা সম্ভব নয়। এ সমস্যাটার প্রতি দার্শনিকেরা যে ঠিক ন্যায়বিচার করতে পেরেছেন তা আমার মনে হয় না, তবে আশা করি, কয়েকটা কথা থেকে এর গুরুত্ব বোঝা যাবে।

আমাদের উদ্দেশ্যের দিক থেকে, সাক্ষ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে, কোন উক্তি (assertion) পেশ করতে গিয়ে আমরা যে ধরনের আওয়াজ বা আকার উৎপন্ন করি, সাক্ষ্য হচ্ছে সে ধরনের কোন শ্রুত আওয়াজ বা দৃষ্ট আকার। শ্রোতা বা দ্রষ্টার বিশ্বাস মতে, অন্যে কোন উক্তি পেশ করার জন্য এদের উৎপন্ন করেছে। একটা মূর্ত উদাহরণ লওয়া যাক: কোন পুলিসের লোককে আমি রাস্তা জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনি বললেন, "ডান দিকে চতুর্থ, বাম দিকে তৃতীয়।"[১] অর্থাৎ, এ শব্দগুলো আমি শুনছি এবং যে জিনিস দুটোকে আমি তাঁর সঞ্চলনশীল ওষ্ঠাধর বলে ব্যাখ্যা করছি, সম্ভবতঃ তাদেরকে আমি দেখছিও। আমি ধরে নিই যে, কম-বেশী আমার মনের মতই তাঁরও একটা মন আছে এবং আমি নিজে এ শব্দগুলো উচ্চারণ করলে যে উদ্দেশ্যে তা করতাম তিনিও সে উদ্দেশ্যে শব্দগুলো উচ্চারণ করেছেন, অর্থাৎ, তথ্য (information) পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। সাধারণ জীবনে, কোন সঙ্গত অর্থে, এটা কোন অনুমান (inference) নয়; এ হচ্ছে একটা বিশ্বাস, উপযুক্ত ঘটনাসূত্রে যা আমাদের মনে জাগে। কিন্তু কেউ আপত্তি উত্থাপন করলে স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসের জায়গায় আমাদেরকে অনুমান এনে বসাতে হবে, এবং পরীক্ষার মাত্রা যত বাড়বে সে অনুমানও তত নড়বড়ে হয়ে পড়বে।

যে অনুমানটা অবশ্যই করতে হবে তার মধ্যে দুটো ধাপ—একটা পদার্থ বৈজ্ঞানিক এবং অপরটা মনোবৈজ্ঞানিক। মুহূর্ত পূর্বে যে ধরনের অনুমান নিয়ে আলোচনা করলাম, পদার্থবৈজ্ঞানিক অনুমানটা সেই ধরনের; এর মধ্যে আমরা একটা সংবেদন (sensation) থেকে একটা ভৌত (physical)

১. "Fourth to the right,, third to the left."

ঘটনায় পৌঁছাই। আমরা আওয়াজ শুনি এবং মনে করি যে, সেগুলো আসছে পুলিসের লোকটির দেহ থেকে। আমরা সঞ্চলনশীল আকার দেখি এবং সেগুলোকে তাঁর ওষ্ঠাধরের ভৌত সঞ্চলন বলে ব্যাখ্যা করি। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, এ অনুমানের যৌক্তিকতা আসে অংশতঃ সাক্ষ্য থেকে; তথাপি এখন আমরা দেখছি যে সাক্ষ্য বলে কোন কিছুতে বিশ্বাস করার কারণ খুঁজে পাওয়ার আগেই এ অনুমানটা আবশ্যক হয়ে পড়ে, এবং এটা সুনিশ্চিত যে, কখনও কখনও এ অনুমান ভ্রান্ত হয়। অন্যেরা যে সব শব্দ শোনে না, পাগলেরা সে সব শুনতে পায়; অসাধারণ তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির অধিকারী বলার বদলে তাদেরকে আমরা বরং তালাবদ্ধ করে রাখি। কিন্তু আমরা যদি কখনও কখনও এমন বাক্য শুনতে পাই যেগুলো কোন দেহ থেকে বেরিয়ে আসেনি, তাহলে সকল সময় এটা ঘটে না কেন? যে সব কথা অন্যে আমাদেরকে বলেছে বলে আমরা মনে করি, সম্ভবতঃ সেগুলো আমাদের কল্পনা যাদুবলে তৈরী করেছে। কিন্তু সংবেদন থেকে জড়বস্তু (physical objects) অনুমান করার যে সাধারণ সমস্যা রয়েছে, এ তারই অংশবিশেষ। সমস্যাটা জটিল হলেও, সাক্ষ্য সম্পর্কিত যৌক্তিক ধাঁধাসমূহের সবচেয়ে জটিল অংশ এ নয়। সবচেয়ে জটিল অংশটা হচ্ছে পুলিসের লোকটির দেহ থেকে তাঁর মন অনুমান করা। পুলিসের লোকটিকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়; রাজনীতিক বা এমন-কি দার্শনিকদের বেলায়ও আমি একই কথা বলবো।

পুলিসের লোকের মন অনুমান করা নিশ্চয়ই ভ্রান্তিপূর্ণ হতে পারে।[১] এটা পরিষ্কার যে, কোন মোমের কারিগর একটি জীবন্ত-সদৃশ পুলিস তৈরী করে তার ভেতরে একটা গ্রামোফোন বসিয়ে দিতে পারতো; এবং পুলিসটি যে প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতো তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটার পথ, সে গ্রামোফোনটা ক্ষণে ক্ষণে দর্শকদের কাছে পুলিসকে দিয়ে বলাতো। তখন অন্যান্য পুলিসের লোকের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রমাণ থাকলে পরিপূর্ণ বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, এই পুলিসটির জীবন্ততার সপক্ষে ঠিক সেই ধরনের প্রমাণ থাকতো। ডেকার্ট (Descartes) মনে করতেন যে, প্রাণীদের কোন

১. May be wrong.

মন নেই, তারা কেবল জটিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (automata) মাত্র। অষ্টাদশ শতকের জড়বাদীরা মানুষ পর্যন্ত এ মতবাদ বিস্তৃত করে দিলেন। কিন্তু এখন আমি জড়বাদ নিয়ে আলোচনা করছি না; আমার সমস্যাটা ভিন্ন। এমন কি, জড়বাদীকেও স্বীকার করতে হবে যে, তিনি যখন কথা বলেন তখন তিনি কিছু জানাতে চান, অর্থাৎ তিনি শব্দ (words) ব্যবহার করছেন চিহ্ন (signs) হিসাবে, নিছক ধ্বনি (noises) হিসাবে নয়। এই কথাটায় ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন হতে পারে; তবে এটা পরিষ্কার যে এতে কিছু একটা বোঝানো হচ্ছে এবং যে কোন ব্যক্তির নিজস্ব উক্তি সম্বন্ধে এটা[১] সত্য। প্রশ্নটা হচ্ছেঃ যেসব মন্তব্য (re marks) আমরা করি, তাদের ক্ষেত্রে যেমন, যে সব মন্তব্য আমরা শুনি, তাদের ক্ষেত্রেও কি এ কথাটা তেমনি সত্য? কিংবা আমরা যে সব মন্তব্য শুনি সেগুলো কি ঠিক অন্যান্য গোলমেলে আওয়াজের মত নিছক অর্থহীন বায়ু-কম্পন মাত্র? এর বিপক্ষে প্রধান যুক্তিটা সাদৃশ্যমূলক (analogy)। আমাদের স্ব-কৃত মন্তব্যগুলোর সঙ্গে শ্রুত মন্তব্যগুলোর এত বেশী সাদৃশ্য যে, আমরা মনে করি তাদের কারণগুলোর মধ্যেও অবশ্যই তেমনি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আমরা যদিও সাদৃশ্যানুমানকে এক ধরনের অনুমান হিসাবে বাদ দিতে পারি না, তথাপি এ মোটেই প্রতিপাদনমূলক (demonstrative) নয় এবং প্রায়শঃই এর দ্বারা আমরা বিপথগামী হই। সুতরাং, আর একবার অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের একটা আপাতদৃষ্ট কারণ আমাদের সামনে থেকে যায়।

কথা বলার সময় আমরা নিজেরা কি বুঝাই, সে প্রশ্ন থেকে আমি অন্য একটা সমস্যায় এসে পড়ছি। অন্তর্দর্শনের সমস্যা। অনেক দার্শনিকই মনে করেছেন যে সবচেয়ে অসংশয়যোগ্য জ্ঞান পাওয়া যায় অন্তর্দর্শন (introspection) থেকে; অন্যেরা মনে করেছেন যে, অন্তর্দর্শন বলে কিছু নেই। সবকিছুর উপর সংশয়পাতের চেষ্টা করে ডেকার্ট এসে পৌঁছেছিলেন, "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি",[২] এই সিদ্ধান্তে, এবং একে তিনি গণ্য করেছিলেন অবশিষ্ট

[১] অর্থাৎ, শব্দগুলোকে যে নিছক ধ্বনি হিসাবে নয়, চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে একথা। (অনুবাদক)।

[২] 'I think, therefore I am.'

সমুদয় জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে। পক্ষান্তরে, আচরণবাদী ডঃ জন বি. ওয়াটসনের মতে আমরা চিন্তা করি না, কথা বলি মাত্র। অন্য যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে চিন্তার যে পরিমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়, ওয়াটসনের বাস্তব জীবনেও সে প্রমাণ তার চেয়ে কম নয় ; সুতরাং চিন্তা করেন বলে তিনি যদি নিঃসন্দেহ না হতে পারেন তাহলে আমাদের সকলের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ। সে যাই হোক, কোন সুযোগ্য দার্শনিক যদি তাঁর মতে বিশ্বাসী হন তাহলে সেটাই এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ যে, কিছু লোক অন্তর্দর্শনকে যে রকম সন্দেহমুক্ত মনে করেছেন, সে রকম সে নয়। তবে আরেকটু সূক্ষ্মভাবে এ প্রশ্নটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

আমার মনে হয়, অন্তর্দর্শন এবং আমরা যাকে বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষণ (perception) বলি, তাদের মধ্যকার পার্থক্যটা জ্ঞানের মধ্যে যা প্রাথমিক তার সঙ্গে জড়িত নয়, বরং অনুমানের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে জড়িত। এক সময় আমরা ভাবি যে, আমরা একটা চেয়ার দেখছি ; অন্য সময়ে ভাবি যে, আমরা দর্শন নিয়ে চিন্তা করছি। প্রথমটার আমরা নাম দিই বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষণ ; দ্বিতীয়টাকে আমরা বলি অন্তর্দর্শন। এখন, ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে কাণ্ডজ্ঞান (common sense) প্রত্যক্ষণকে যে পরিপূর্ণ অর্থে নেয়, সে অর্থে প্রত্যক্ষণের উপর সন্দেহ পোষণ করার কারণ রয়েছে। পরে আমি ভেবে দেখবো, প্রত্যক্ষণে অসংশয়যোগ্য ও প্রাথমিক কি আছে ; এখনকার মতো এটুকু অগ্রিম বলে রাখছি যে, "একটা চেয়ার দেখা"র মধ্যে যেটুকু সংশয়াতীত সেটুকু হচ্ছে এই যে, কতকগুলো রঙ মিলে একটা প্যাটার্ন সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা পরে দেখবো যে, এ ঘটনাটা চেয়ারের সঙ্গে যতটুকু আমার সঙ্গেও ঠিক ততটুকু জড়িত ; আমি যে প্যাটার্ন দেখছি, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ ঠিক সে প্যাটার্ন দেখতে পায় না। কাজেই বাহ্য প্রত্যক্ষণ বলে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে একটা আত্মগত ও ব্যক্তিগত (subjective and private) ভাব আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষণকে বিপজ্জনক ভাবে বস্তুজগৎ পর্যন্ত টেনে আনার ফলে সে ভাবটা ঢাকা পড়ে যায়। আমার মতে, বিপরীতক্রমে, অন্তর্দর্শনের মধ্যেও বিপজ্জনকভাবে মানসিক জগতে ঢুকে পড়ার একটা ঝুঁকি আছে : এটুকু বাদ দিলে এবং বাহ্য প্রত্যক্ষণ থেকেও তার নিজস্ব সম্প্রসারণটুকু বাদ দিলে, এ দুটোর মধ্যে আর তেমন

কোন পার্থক্য থাকে না। এই কথাটা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে, আমি দেখাতে চেষ্টা করবো আমরা তখন কি ঘটছে বলে জানি, যখন, আমরা যেমন বলি যে, আমরা দর্শন নিয়ে ভাবছি।

ধরা যাক, অন্তর্দর্শনের ফলস্বরূপ আপনি একটা বিশ্বাসে এসে পৌঁছলেন, যাকে আপনি প্রকাশ করলেন এই বলে : "আমি এখন বিশ্বাস করছি যে, জড় থেকে মন ভিন্ন।" অনুমান বাদ দিলে, এ রকম ক্ষেত্রে আপনি কি জানেন? সর্বপ্রথম 'আমি' শব্দটাকে আপনার কেটে বাদ দিতে হবে : যে ব্যক্তি বিশ্বাস করছেন তিনি একটি অনুমান, সরাসরি আপনি যা জানেন তার অংশ তিনি নন। দ্বিতীয়তঃ, "বিশ্বাস করছি" (believing) শব্দটার বিষয়েও আপনাকে সতর্ক হতে হবে। যুক্তিবিদ্যা বা জ্ঞানতত্ত্বে এর অর্থ কি হবে সেটা আমার বিবেচ্য নয় ; কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গেলে এর অর্থ কি হতে পারে, আমি সেটা নিয়েই ভাবছি। মনে হয় যে, এ রকম ক্ষেত্রে এ কোন এক ধরনের অনুভূতিই কেবল বর্ণনা করতে পারে। আর যে যুক্তিবাক্যটা আপনি বিশ্বাস করছেন বলে ভাবছেন, অর্থাৎ, "জড় থেকে মন ভিন্ন," তার কথায় আসতে গেলে—আপনি এতে বিশ্বাস করেন বলে যখন ভাবছেন তখন বাস্তবে কি ঘটছে তা বলা খুবই কঠিন। এটা [অর্থাৎ, যা ঘটছে] কেবল কতকগুলো শব্দমাত্র (words) হতে পারে—উচ্চারিত, মনশ্চক্ষুতে দেখা, অথবা শ্রুতিগত মানসচিত্র কিংবা সঞ্চলন-প্রতিরূপের মধ্যে প্রকাশিত শব্দ।[১] শব্দগুলোতে যা 'বোঝায়' তার প্রতিরূপও (images) এ হতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্যটার যৌক্তিক আধেয়ের আদৌ কোন নির্ভুল প্রকাশ (representation) এ হতে পারবে না। "অজ্ঞাত চিন্তা-সমুদ্রে পাড়ি জমানো" নিউটনের মূর্তির একটা প্রতিরূপ আপনার মনে জাগতে পারে ; এবং 'কত ভিন্ন !'—এ শব্দগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎরাই ধরে গড়িয়ে-পড়া কোন পাথরের অন্য একটা প্রতিরূপও জাগতে পারে আপনার মনে। অথবা একটা বক্তৃতা লেখা ও ডিনার খাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য তার কথাও আপনি ভাবতে পারেন। শব্দের (words) মাধ্যমে আপনি যখন আপনার চিন্তাটাকে প্রকাশ করতে চান, কেবল তখনই আপনি যৌক্তিক সঠিকতার (precision) দিকে অগ্রসর হন।

---

১. **Pronounced, visualised, or in auditory or motor images.**

অন্তর্দর্শন ও বাহ্য প্রত্যক্ষণ, উভয়ের মধ্যেই আমরা যা জানি তাকে প্রকাশ করতে চাই শব্দের মাধ্যমে।

সাক্ষ্যের প্রসংগে যে রকম, এখানেও তেমনি আমরা জ্ঞানের সামাজিক দিকটাতে এসে পড়ি। জড়বস্তুকে যে রকম প্রকাশ্য বলে দাবী করা হয়, চিন্তাকে সে রকম প্রকাশ্যতা দেওয়াই শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য। একাধিক লোকে কোন কথিত শব্দ শুনতে পায় বা লিখিত শব্দ দেখতে পায়, কারণ এদের প্রত্যেকটাই একটা জড় ঘটনা। আপনাকে আমি যদি বলি, "মন জড় থেকে ভিন্ন", তাহলে আমি যে চিন্তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করছি এবং যে চিন্তা আপনার মনে উদ্রিক্ত হচ্ছে, তাদের মধ্যে খুবই সামান্য সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু এই দুটি চিন্তার মধ্যে ঠিক এই জিনিসটা সাধারণ থেকে যাচ্ছে যে, একই শব্দাবলীর মাধ্যমে তাদের ব্যক্ত করা যায়। সেইরূপ, যখন আমরা, প্রচলিত ভাষায় বলতে গেলে, একই চেয়ারের দিকে তাকাই, তখন আপনি এবং আমি যা দেখি তার মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমরা উভয়েই একই শব্দাবলী ব্যবহার করে আমাদের প্রত্যক্ষণগুলো প্রকাশ করতে পারি।

তাহলে, নিজ নিজ প্রকৃতির দিক থেকে, চিন্তা ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে তেমন গুরুতর কোন পার্থক্য নেই। পদার্থবিদ্যা যদি সত্য হয় তাহলে অনুবন্ধের (correlations) দিক থেকে তারা ভিন্ন: যখন আমি একটা চেয়ার দেখি তখন অন্যের মধ্যেও কম-বেশী একই রকম প্রত্যক্ষণ ঘটতে পারে, এবং মনে করা হয় যে, সকল প্রত্যক্ষণগুলোই চেয়ার থেকে আগত আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত; পক্ষান্তরে, আমি যখন কোন একটা চিন্তাকে চিন্তা করি (think a thought), তখন অন্যেরা তার অনুরূপ কিছু না-ও চিন্তা করতে পারে। কিন্তু দাঁতের ব্যথার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য, যে দাঁতের ব্যথাকে সাধারণতঃ অন্তর্দর্শনের দৃষ্টান্ত বলে কেউ মনে করবে না। কাজেই, মোটের উপর অন্তর্দর্শনকে বাহ্য প্রত্যক্ষণ থেকে ভিন্ন রকমের জ্ঞান বলে মনে করার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই গোটা প্রশ্নটা নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আবার আমরা আলোচনায় নামবো।

অন্তর্দর্শনের 'বিশ্বস্ততার' কথা বলতে গেলে, এখানেও আবার বাহ্য প্রত্যক্ষণের সঙ্গে তার একটা পূর্ণ সাদৃশ্য (parallelism) আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই,

প্রকৃত উপাত্তটুকু (datum) অনিন্দনীয়, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি-বশে আমরা যে সম্প্রসারণ ঘটাই[১] তা সন্দেহজনক। "আমি বিশ্বাস করছি যে, মন জড় থেকে ভিন্ন," এই কথা না বলে আপনার বলা উচিত, "একটা অনুভূতি সমভিব্যাহারে, পরস্পরের সঙ্গে কোন একভাবে সম্পর্কিত হয়ে কতকগুলো মানসচিত্র (images) ঘটছে।" সমুদয় বিশেষত্ব উল্লেখ করে প্রকৃত ঘটনাটা বর্ণনা করার মত কোন শব্দ নেই ; সকল শব্দই সাধারণ ; এমন কি, বিশেষ নামগুলোও, কেবল 'ইহা' (this)—এই সম্ভাব্য ব্যতিক্রমটি ছাড়া ; কিন্তু এটাও আবার দ্ব্যর্থক। "এই একটা চেয়ার"[২] বলার সময় যেমন, ঠিক তেমনি, ঘটনাটাকে শব্দে অনুবাদ করার সময়ও আপনি সাধারণীকরণ (generalisation) ও অনুমান করছেন। এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। প্রতি ক্ষেত্রেই, প্রকৃত উপাত্তটা অনুচ্চারণীয়, এবং যা শব্দযোগে প্রকাশযোগ্য তার মধ্যে অনুমান আছে, যে অনুমান ভ্রান্ত হতে পারে।

যখন বলি যে, এর মধ্যে 'অনুমান' আছে, তখন আমার কথা ঠিক অভ্রান্ত হবে না, যদি-না সাবধানে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, "একটা চেয়ার দেখা"র মধ্যে আমরা প্রথমে একটা রঙীন প্যাটার্ন হৃদয়ঙ্গম ক'রে তারপর একটা চেয়ার অনুমান করতে যাই না : যখন আমরা রঙীন প্যাটার্ন দেখি তখনই স্বতস্ফূর্তভাবে চেয়ারের বিশ্বাসটা জেগে ওঠে। কিন্তু এ বিশ্বাসের কারণ কেবল বর্তমান জড় উদ্দীপকের মধ্যে নেই, সেটা অংশতঃ আছে অতীত অভিজ্ঞতায়, এবং অংশতঃ প্রতিবর্তের (reflex) মধ্যে। প্রাণীকুলের মধ্যে প্রতিবর্তের এক অত্যন্ত বড় ভূমিকা আছে ; মানবজাতির মধ্যে অভিজ্ঞতাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে শিশু স্পর্শ ও দৃষ্টির মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন (correlate) করতে এবং সে যা দেখছে অন্যেরাও তাই দেখছে বলে আশা করতে শেখে। এইভাবে যেসব অভ্যাস গড়ে ওঠে, আমাদের মত বয়স্কদের মধ্যে চেয়ারের মত কোন বস্তুর যে ধারণা, সে ধারণার পক্ষে সেগুলো অপরিহার্য। দৃষ্টির সাহায্যে

১. অর্থাৎ, উপাত্তের ভিত্তিতে অনুমানের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের যে বিস্তৃতি ঘটাই। (অনুবাদক)।

২. "there is a chair."

চেয়ারের প্রত্যক্ষণের পেছনে একটা জড় উদ্দীপক আছে, যা সরাসরিভাবে কেবল দৃষ্টির উপর ক্রিয়া করে, কিন্তু কঠিনতা ও অন্যান্য ধারণার উদ্রেক করে শিশুকালীন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এ অনুমানটাকে শারীরবৃত্তিক (physiological) বলা যেতে পারে। এই ধরনের অনুমানে অতীত অনুবন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন স্পর্শ ও দৃষ্টির মধ্যেকার অনুবন্ধ; কিন্তু এ অনুমান ভ্রান্ত হতে পারে; যেমন, বিরাট আয়নার ভেতরকার একটা প্রতিচ্ছবিকে আপনি অন্য কামরা বলে ভুল করতে পারেন। তদ্রূপ, স্বপ্নের মধ্যে আমরা ভ্রান্ত শারীরবৃত্তিক অনুমান করতে পারি। সুতরাং যে সব বিষয় এই অর্থে অনুমিত সেগুলোর ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত বোধ করতে পারি না, কারণ, যখন আমরা তাদের যতগুলো সম্ভব ততগুলো গ্রহণ করতে চাই, তখনই আবার আত্মসামঞ্জস্যের খাতিরে তাদের কতকগুলোকে আমরা বর্জন করতে বাধ্য হই।

জড়বস্তু সম্পর্কে কাণ্ডজ্ঞানের ধারণার অপরিহার্য যে উপাদানের আমরা নাম দিয়েছিলাম "শারীরবৃত্তিক অনুমান", একটু আগেই আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। সবচেয়ে সরল আকারে শারীরবৃত্তিক অনুমানটা হচ্ছে এই: ধরা যাক, 'ক' একটা উদ্দীপক, যার উপর প্রতিবর্তের মাধ্যমে আমরা প্রতিক্রিয়া করি 'খ' নামক দৈহিক সঞ্চালনের সাহায্যে, এবং ধরা যাক 'ক́' নামক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে 'খ́'; যদি একই সঙ্গে ঘন ঘন দুটি উদ্দীপকের অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তাহলে কালক্রমে 'ক' থেকে 'খ́' উৎপন্ন হবে।[১] অর্থাৎ, শরীর এমনভাবে কাজ করবে যেন 'ক́' উপস্থিত ছিল। জ্ঞানতত্ত্বে শারীরবৃত্তিক অনুমান গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্পর্কে আমি অনেক কথা বলবো। এখনকার মত, আমি এর উল্লেখ করেছি অংশতঃ যৌক্তিক অনুমানের সঙ্গে এ যাতে গুলিয়ে না যায় তার জন্য এবং অংশতঃ 'আরোহে'র সমস্যার অবতারণা করার জন্য, যে সম্পর্কে এ পর্যায়ে প্রাথমিক ধরনের দু-চারটা কথা আমাদের বলা অবশ্যক।

সমগ্র জ্ঞানতত্ত্বে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাটা সম্ভবতঃ আরোহের সমস্যা। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক নিয়ম (scientific law) প্রতিষ্ঠিত হয় এর সাহায্যে,

[১] দৃষ্টান্তস্বরূপ: আপনি যদি একই সঙ্গে পুনঃ পুনঃ একটা তীব্র আওয়াজ শুনেন এবং একটা উজ্জ্বল আলো দেখেন, তাহলে কালক্রমে আলোটা ছাড়াই আওয়াজ থেকে আপনার চোখের মণি সংকুচিত হবে।

অথচ একে যে কেন আমরা একটা বৈধ যৌক্তিক পদ্ধতি বলে বিশ্বাস করবো তা বোঝা কঠিন। আরোহী যুক্তির নিছক সার কথাটা এই যে, যেহেতু 'ক' ও 'খ'-কে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা গেছে এবং কখনও আলাদা দেখা যায় নি, সুতরাং 'ক'-কে আবার দেখা গেলে সম্ভবতঃ (probably) 'খ'-কেও দেখা যাবে। এটা প্রথমে থাকে একটা "শারীরবৃত্তিক অনুমান" হিসেবে এবং সেজন্য প্রাণীরাও এর ইস্তেমাল করে। আমরা যখন প্রথম চিন্তা করতে আরম্ভ করি তখন শারীরবৃত্তিক অর্থে আমরা নিজেরাও আরোহানুমান করি—যেমন খাবার দেখে আমরা কোন এক ধরনের স্বাদ আশা করি। প্রায়ই আমরা এই প্রত্যাশা সম্পর্কে সচেতন হই নিরাশ হওয়ার মাধ্যমে—যেমন, আমরা লবণকে চিনি ভেবে মুখে দিই। মানবসমাজ যখন বিজ্ঞানের পথ ধরলো, তখন তারা এ জাতীয় অনুমানের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যৌক্তিক সূত্রাবলী প্রণয়ন করতে চেষ্টা করলো। এ সব প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করবো পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ; এখনকার মত আমি কেবল বলবো যে, আমার চোখে সে প্রচেষ্টাগুলো নিতান্ত ব্যর্থ মনে হয়। কোন এক রকমের এবং কোন এক মাত্রায় আরোহের যুক্তিসিদ্ধতা যে থাকতেই হবে সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত, কিন্তু কিভাবে অথবা কেন যে আরোহ যুক্তিসিদ্ধ হবে সেটা দেখানোর সমস্যা এখনও তার সমাধান খুঁজে পায়নি। এর সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত যুক্তিবাদী (rational) মানুষ সন্দেহ করবে তার খাদ্য তাকে পুষ্টি যোগাবে কিনা এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে কিনা। এ অর্থে আমি যুক্তিবাদী মানুষ নই, তবে কিছুক্ষণের জন্য আমি হওয়ার ভান করবো। এবং যদিও আমরা সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী হতে পারি না, তথাপি বর্তমানের চেয়ে আরেকটু বেশী যুক্তিবাদী হতে পারলে সম্ভবতঃ আমাদের অবস্থা আরও ভাল হতো। নেহাত কম করে ধরলেও বলা যায়, যুক্তি (reason) আমাদের কোথায় নিয়ে যায় সেটা দেখা এক কৌতুকাবহ অভিযান হবে।

যে সব সমস্যা আমরা উত্থাপন করছি তাদের কোনটাই নতুন নয়, কিন্তু তাদের থেকে এ জিনিসটা যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জগৎ এবং তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাদের নিত্যকার (everyday) ধারণাগুলো সন্তোষজনক নয়। আমরা জিজ্ঞেস করে আসছি আমরা এটা জানি বা ওটা জানি কি-না, কিন্তু 'জানা' (knowing) জিনিসটা কি তা এ পর্যন্ত জিজ্ঞে

করিনি। সম্ভবতঃ আমরা দেখবো যে, জ্ঞান সম্পর্কে আমরা এতকাল কেবল ভুল ধারণা পোষণ করে এসেছি এবং এ বিষয়ে আমাদের ধারণা আরও নির্ভুল হলে আমাদের সমস্যার পরিমাণ কমে যাবে। আমার মনে হয়, যে সব মৌলিক সন্দেহ নিয়ে আলোচনা করলাম, কিছুক্ষণের মত সেগুলোর কথা ভুলে গিয়ে, জ্ঞানাকে মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যবর্তী সম্বন্ধের অংশ হিসাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে আমাদের দার্শনিক অভিযাত্রা শুরু করলেই আমরা ভাল করবো। সম্ভবতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা দার্শনিক সমস্যাগুলোকে এক নতুন আলোকে দেখার শক্তি পাব। সেই প্রত্যাশায় জ্ঞান কি দিয়ে তৈরী সে সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণায় পৌঁছার উদ্দেশ্যে মানুষ ও তার পরিবেশের সম্পর্কটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

প্রথম খণ্ড

বাহিরের দিক থেকে মানুষ

MAN FROM WITHOUT

man from without

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ ও তার পরিবেশ

আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যদি পূর্ণ ও অখণ্ড হতো, তাহলে আমরা নিজেদেরকে, জগৎকে এবং জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাকে বুঝতে পারতাম। প্রকৃতপক্ষে, এ তিনটির সম্পর্কেই আমাদের উপলব্ধি খণ্ডাকার। এখনকার মতো, তৃতীয় প্রশ্নটা—জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের প্রশ্নটা নিয়েই আমি আলোচনা করতে চাই, কারণ এটাই আমাদেরকে দর্শনের সমস্যাবলীর সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে যায়। আমরা দেখবো যে, এ প্রশ্নটা আমাদেরকে জগৎ ও আমাদের নিজেদের সম্পর্কিত অন্য প্রশ্ন দুটোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে; কিন্তু এটাও আমরা দেখবো যে, এ দুটোকে আমরা আরও ভালোভাবে বুঝবো যদি প্রথমে ভেবে দেখি জগৎ কিভাবে আমাদের উপর ক্রিয়া করে এবং আমরা কিভাবে জগতের উপর ক্রিয়া করি।

কয়েকটা বিজ্ঞান আছে, যেগুলোতে মানুষ (Man) নিয়ে আলোচনা হয়। প্রাকৃত ইতিহাসে (natural history) আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারি প্রাণীকুলের একটি হিসাবে, বিবর্তনে যার একটা স্থান আছে এবং অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে যার নির্ণয়যোগ্য সম্পর্ক আছে। শারীরবৃত্তে আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারি একটা কাঠামো (structure) হিসাবে, যা কতকগুলো ক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম এবং এমন কতকগুলো উপায়ে পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম যাদের কয়েকটাকে অন্ততঃ রসায়নবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সমাজবিজ্ঞানে আমরা তাকে নিয়ে গবেষণা করতে পারি, পরিবার ও রাষ্ট্র-জাতীয় বিভিন্ন সংগঠনের অন্যতম একক (unit) হিসাবে। এবং মনোবিজ্ঞানে আমরা তাকে নিয়ে গবেষণা করতে পারি, সে নিজের কাছে কিভাবে প্রতিভাত হয় সে পরিপ্রেক্ষিত থেকে। এই শেষেরটা থেকে আমরা পাই যাকে বলা যায় মানুষের একটা আভ্যন্তরীণ চিত্র (view); যার বিপরীত দিকে আছে তার বাহ্য চিত্র, অন্য তিনটা থেকে যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে-ক্ষেত্রে মানুষকে জানার অন্যান্য পদ্ধতিগুলোতে

আমাদের সকল উপাত্ত অন্য লোক নিরীক্ষণ করে পাওয়া যায়, সে-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানে আমরা যেসব উপাত্ত ব্যবহার করি সেগুলো পেতে পারি কেবল যদি নিরীক্ষক ও নিরীক্ষিত[১] একই ব্যক্তি হয়। বিভিন্নভাবে এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কেও বিভিন্ন মত আছে, কিন্তু এ পার্থক্য যে আছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। নিজেদের স্বপ্ন আমরা স্মরণ করতে পারি, যদিও অন্য লোকেরা বলে না দিলে তাদের স্বপ্নের কথা আমরা জানতে পারি না। কখন আমাদের দাঁত ব্যথা হচ্ছে, কখন আমাদের খাবার অতিরিক্ত লোণা লাগছে, কখন আমরা অতীতের কোন ঘটনা স্মরণ করছি, এসব কথা আমরা জানি। আমাদের জীবনের এইসব ঘটনা একই রকম প্রত্যক্ষভাবে অন্য লোকে জানতে পারে না। এ অর্থে, আমাদের সকলের একটা আভ্যন্তরীণ জীবন আছে, যার দ্বার কেবল আমাদের নিজস্ব অবেক্ষণের (inspection) কাছে উন্মুক্ত, অন্য কারুর নয়। সন্দেহ নেই যে, দেহ-মনের পরম্পরাগত পার্থক্যের উৎসটা এ-ই: দেহকে আমাদের সেই অংশ বলে মনে করা হতো যা অন্যে নিরীক্ষণ করতে পারতো এবং মনকে মনে করা হতো সেই অংশ বলে যা ছিল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত (private)। সাম্প্রতিক কালে এ পার্থক্য-করণের গুরুত্বের উপর সংশয়পাত করা হয়েছে এবং আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে, এর কোন মৌলিক দার্শনিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু, ঐতিহাসিকভাবে, দর্শন-চর্চার প্রারম্ভকালে মানুষ যে সব ধারণা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেগুলোকে নির্দিষ্ট করার[২] ক্ষেত্রে এর একটা প্রভাবশালী ভূমিকা ছিল এবং অন্য কোন কারণে না হলেও, এই কারণে এর কথা মনে রাখা উচিত।

পরম্পরাগতভাবে, জ্ঞানকে দেখা হয়েছে ভিতর থেকে, আমাদের নিজেদের ভেতরে পর্যবেক্ষণ করা যায় এমন কিছু-একটা হিসাবে—অন্য কাউকে আমরা প্রদর্শন করতে দেখবো, এমন কিছু হিসাবে নয়। আমি যখন বলি যে জ্ঞানকে এভাবে দেখা হয়েছে, তখন আমি বলতে চাই যে, এটা ছিল

১. The observer and the observed.

২. অর্থাৎ, সে ধারণাগুলো কি কি হবে, সেটা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে। (অনুবাদক)

দার্শনিকদের অভ্যাস ; সাধারণ জীবনে, মানুষ আরও বিষয়গত (objective) হয়েছে। সাধারণ জীবনে, জ্ঞান এমন একটা-কিছু যাকে পরীক্ষার মাধ্যমে পরখ করা যায় ; অর্থাৎ, এর অবস্থান কোন এক ধরনের উদ্দীপকের উত্তরে কোন এক ধরনের প্রতিবেদনের (response) মধ্যে। দর্শনে যেভাবে জ্ঞানকে দেখা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তার চেয়ে বিষয়গতভাবে দেখা, আমার মতে, অনেক বেশী ফলপ্রসূ। আমি বলতে চাই যে, 'জানা'র কোন সংজ্ঞা যদি আমরা দিতে চাই, তাহলে পরিবেশের উপর কোন এক রকমের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই একে সংজ্ঞায়িত করা উচিৎ ; এমনভাবে নয়, যাতে তার মধ্যে এমন কিছু-একটা (এক প্রকার "মনের অবস্থা")[১] এসে পড়ে যা কেবল জ্ঞাতা একা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এই মত পোষণ করি বলেই আমি মনে করি যে, যে সব বিষয়ে নিরীক্ষক ও নিরীক্ষিতকে একই ব্যক্তি হতে হয় সেই সব বিষয় নিয়ে আরম্ভ করার চেয়ে বরং মানুষ ও তার পরিবেশ নিয়ে আরম্ভ করাই সর্বোত্তম। আমি জানাকে যে ভাবে দেখি তাতে জানা হচ্ছে এমন একটা বৈশিষ্ট্য, আমাদের পরিবেশের উপর আমাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যাকে দেখা যেতে পারে ; কাজেই সবার আগে প্রয়োজন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ প্রতিক্রিয়াগুলো যে ভাবে ধরা পড়ে তাদের সেই প্রকৃতি বিবেচনা করে দেখা।

প্রাত্যহিক একটা অবস্থার কথা ভাবা যাক। ধরা যাক, আপনি একটা দৌড়বাজি দেখছেন এবং সঠিক মুহূর্তটিতে আপনি বললেন, "ঐ চল্‌লো" ("they're off")। এই চীৎকারটা পরিবেশের উপর একটা প্রতিক্রিয়া এবং অন্যের সঙ্গে সময়ের মিল রেখে এ চীৎকার দিলে এর মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করা হয়। এখন, বিজ্ঞানের মতে বাস্তবিক পক্ষে কি ঘটছে তা ভেবে দেখা যাক। যা ঘটেছে তার ভেতরে প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের জটিলতা। একে চার পর্যায়ে ভাগ করলে সুবিধা হতে পারে: প্রথমে, আপনার চক্ষু এবং যারা দৌড়াচ্ছে তাদের মধ্যে বাইরের জগতে যা ঘটেছিল ; দ্বিতীয়তঃ, আপনার দেহে আপনার চক্ষু থেকে আপনার মস্তিষ্ক পর্যন্ত যা ঘটেছিল ; তৃতীয়তঃ, আপনার মস্তিষ্কে যা ঘটেছিল ; চতুর্থতঃ, আপনার দেহে আপনার মস্তিষ্ক থেকে আপনার গলা ও জিহ্বা পর্যন্ত যা ঘটেছিল,

১. "State of mind."

যে ঘটনাটাই হলো আপনার চীৎকার। এ চারটা পর্যায়ের মধ্যে প্রথমটা পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত এবং এর আলোচনা হয় প্রধানতঃ আলোক-তত্ত্বে (theory of light); দ্বিতীয় এবং চতুর্থটা শারীরযন্ত্রের (physiology) এলাকায় পড়ে; তৃতীয়টারও তত্ত্বগতভাবে শারীরযন্ত্রের আওতায় পড়া উচিত, কিন্তু মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব-হেতু এটা বস্তুতঃ পড়েছে মনোবিজ্ঞানের এলাকায়। তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের ফল। প্রাণী কথা বলতে পারে না, অথচ আপনি পারেন এবং একজন ফরাসী লোক ইংরেজী বলতে পারে না, অথচ আপনি পারেন—এর জন্য দায়ী ওটাই। তথাপি জ্ঞানের সবচেয়ে সরল দৃষ্টান্ত যদি আমরা দিতে চাই তাহলে এই অতি-জটিল ঘটনা ছাড়া আর কিছু উল্লেখ করা প্রায় অসম্ভব।

এ মুহূর্তে, এ প্রক্রিয়ার যে অংশটুকু বাইরের জগতে ঘটে এবং যা পদার্থবিদ্যার আওতাভুক্ত, তার কথা বাদ দেওয়া যাক। এ সম্পর্কে পরে আমি অনেক কথা বলবো; কিন্তু যা বলবার তা মোটেই সহজ নয় এবং আমি বরং প্রথমে তার চেয়ে কম দুরূহ বিষয়গুলো হাতে নেব। আমরা যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি বলে মনে করা হয়—অর্থাৎ, দৌড় প্রতিযোগীরা যাত্রা করছে—আমি কেবল বলবো যে, সে ঘটনা, আমাদের চোখের উপরিভাগে যা ঘটছে তার থেকে একটা দীর্ঘ বা হ্রস্ব ঘটনা-শৃঙ্খল দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এই শেষেরটাকেই[১] বলা হয় 'উদ্দীপক'। অতএব, যখন আমরা দেখি তখন যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি বলে মনে করা হয় সেটা উদ্দীপক নয়; সেটা এক পূর্ববর্তী (anterior) ঘটনা, উদ্দীপকের সঙ্গে যার এমন এক সম্বন্ধ যাকে নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। শ্রবণ ও ঘ্রাণ সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়, কিন্তু স্পর্শ অথবা আমাদের নিজ দেহের অবস্থার প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে তা বলা যাবে না। এসব ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত চার পর্যায়ের প্রথমটা অনুপস্থিত। এটা পরিষ্কার যে, দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণের ক্ষেত্রে উদ্দীপক এবং যে ঘটনা প্রত্যক্ষণ করা হলো বলে মনে করা হয় তার মধ্যে অবশ্যই একটা সম্বন্ধ থাকবে, কিন্তু এ সম্বন্ধটাকে কি রকম হতে হবে সেটা আমরা বিচার

১. অর্থাৎ, চোখের উপরিভাগের ঘটনাকেই। (অনুবাদক)

রো না। আমরা বরং আলোচনা করবো, প্রত্যক্ষগত (perceptive) জ্ঞান-
ার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় নিয়ে। এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত,
া, যেখানে প্রথম পর্যায়টা মাত্র কতকগুলো ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ
াখানে এই পর্যায়টা সব সময়ই উপস্থিত।

দ্বিতীয় পর্যায়টা ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পরিভ্রমণে ক কি ঘটে সেটা বিবেচনা করা আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে আবশ্যক নয়। েহের সীমানায় একটা বিশুদ্ধ জড় ঘটনা—অর্থাৎ উদ্দীপক—ঘটে এবং একটার র একটা করে তার কতকগুলো কার্য (effects) অন্তর্বাহী স্নায়ুর পথ ধরে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। উদ্দীপকটা যদি আলোক হয় তাহলে বিশেষ কার্যগুলো উৎপন্ন রার জন্য তাকে চোখের উপর পড়তে হবে; দেহের অন্যান্য অংশের উপর ড়লেও আলোক থেকে কার্য উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাদের দ্বারা দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য র্ধারিত হয় না। সেইরূপ, উদ্দীপকটা যদি শব্দ হয় তাহলে তাকে কানের পর পড়তে হবে। আলোকচিত্রের পাতের মত বিশেষ রকম উদ্দীপকের লে কোন ইন্দ্রিয়ে বিশেষ রকমের অনুভূতি জন্মে: আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, ীব্রতা এবং দিকের ভিন্নতা অনুসারে তার কার্যেরও তারতম্য হয়। আলোক সে পড়ার ফলে চোখের ভেতরে ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ার পর অক্ষিস্নায়ুতে ারও কতকগুলো ঘটনা ঘটে এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের ভেতরে কটা ঘটনা ঘটে—উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারে যে ঘটনারও তারতম্য হয়। মামাদের 'প্রত্যক্ষণে' যে সব ক্ষেত্রের ভিন্নতা ধরা পড়ে, তাদের সবগুলোতে উদ্দীপকের ভিন্নতা অনুযায়ী মস্তিষ্কের ভেতরকার ঘটনাও অবশ্যই ভিন্ন হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রত্যক্ষণে আমরা লাল আর হলুদে পার্থক্য করতে পারি; অত-এব লাল আলো পড়ার ফলে অক্ষিস্নায়ু জুড়ে এবং মস্তিষ্কে যে সব ঘটনা ঘটে, হলদে আলো থেকে উৎপন্ন ঘটনাবলী থেকে তাদের প্রকৃতি অবশ্যই ভিন্ন হবে। কিন্তু দুটো রঙের মাত্রায় যখন এমন সাদৃশ্য থাকে যে, তাদেরকে কেবল সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পৃথক করা যায়, প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে করা যায় না, তখন অক্ষিস্নায়ু এবং মস্তিষ্কে তারা যে ভিন্ন রকমের ঘটনা উৎপন্ন করছে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না।

আলোড়নটা (disturbance) মস্তিষ্কে পৌঁছার পর সেখানে সে এক বিশেষ ধরনের ঘটনা-সমষ্টি উৎপন্ন করতে পারে কিংবা না-ও করতে পারে।

যদি না করে তাহলে আমরা তার সম্বন্ধে, যাকে বলে 'সচেতন' (conscious), তা হবো না। কারণ হলুদ দেখা সম্পর্কে 'সচেতন' হওয়াটা। আর যাই হোক, তার মধ্যে অবশ্যই অক্ষিস্নায়ু-বাহিত বার্তার (messages) উপর মস্তিষ্কের কোন এক রকমের প্রতিক্রিয়া থাকবে। এটা মনে করা যেতে পারে যে, অন্তর্বাহী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে যে সব বার্তা এসে পৌঁছে তাদের অধিকাংশ আদৌ আমাদের কোন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না—তারা হচ্ছে সরকারী অফিসে লেখা সেইসব চিঠির মত যেগুলোর কোন উত্তর কখনও দেওয়া হয় না। দৃষ্টি-ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে যে-সব জিনিস আছে, কোনভাবে চিত্তাকর্ষক না হলে তারা সাধারণতঃ নজরে পড়ে না; নজরে পড়লে তারা দৃষ্টি-ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে চলে আসে, যদি-না আমরা স্বেচ্ছায় এতে বাধার সৃষ্টি করি। এ জিনিসগুলো এই অর্থে দৃশ্য যে, আমাদের জড় পরিবেশ বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই আমরা তাদের প্রত্যক্ষ করতে পারতাম, যদি সে রকম ইচ্ছা করতাম; অর্থাৎ, কোন প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য তাদের প্রয়োজন কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে একটা পরিবর্তন। কিন্তু সচরাচর তারা কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না; দৃষ্টি-ক্ষেত্রের সব কিছুর উত্তরেই আমাদের যদি সর্বক্ষণ প্রতিক্রিয়া করতে হতো তাহলে জীবনটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর বোধ হতো। প্রতিক্রিয়া যেখানে নেই, সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়েই প্রক্রিয়াটার সমাপ্তি ঘটে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের উদ্ভব ঘটে না। সে ক্ষেত্রে এমন কিছুই ঘটেনি যাকে আলোচ্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'প্রত্যক্ষণ' বলা যেত।

যাই হোক, যে ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে, আমাদের কৌতূহল তার সম্পর্কেই। এক্ষেত্রে, প্রথমে আছে মস্তিষ্কের ভেতরকার একটা প্রক্রিয়া যার স্বরূপ এখনও কেবল একটা অনুমানের ব্যাপার; আলোচ্য ইন্দ্রিয়ের উপযোগী কেন্দ্র থেকে এ প্রক্রিয়াটা একটা মোটর-কেন্দ্রে চলে যায়। সেখান থেকে একটা প্রক্রিয়া কোন বহির্গামী স্নায়ু ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত একটা পৈশিক (muscular) ঘটনা উৎপন্ন করে, যার থেকে কেবল একটা দৈহিক সঞ্চলনের সৃষ্টি হয়। দৌড়-প্রতিযোগিতার আরম্ভ মনোযোগ সহকারে দেখছে এমন লোকের যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, সে দৃষ্টান্তে একটা প্রক্রিয়া দৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত মস্তিষ্কের অংশ থেকে বচনের সঙ্গে সম্পর্কিত অংশে পরিভ্রমণ করে; একেই আমরা বলেছিলাম তৃতীয় পর্যায় (stage)।

রপর বহির্মুখী স্নায়ুর পথ ধরে একটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং সেই ব সঞ্চলন উৎপন্ন করে যেগুলোতে 'ঐ চলো' উক্তিটা তৈরী; একেই রা বলেছিলাম চতুর্থ পর্যায়।

চারটা পর্যায়ই যদি না থাকে তাহলে 'জ্ঞান' নামে অভিহিত করার কিছুই থাকে না। এমন-কি তাদের সব কটিই যখন আছে তখনও 'জ্ঞান' লে কিছু থাকতে হলে অন্যান্য আরও কিছু শর্ত পালিত হওয়া আবশ্যক। বে এ সব মন্তব্য প্রদানের সময় এখনও আসেনি; আমারা বরং তৃতীয় চতুর্থ পর্যায়ের বিশ্লেষণ দেওয়ার কাজে ফিরে যাবো।

তৃতীয় পর্যায়টা দু'রকমের। অনুবর্তের (reflex) ক্ষেত্রে সেটা এক মের; ডঃ ওয়াটসন যাকে 'শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া' (learned reaction) লেছেন তার ক্ষেত্রে সেটা আরেক রকমের। অনুবর্তের ক্ষেত্রে জন্মলগ্নেই পর্যায়টা পূর্ণাবয়ব; নবজাত শিশু অথবা জন্তুর মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরী য, কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই অন্তর্মুখী স্নায়ুস্থিত কোন প্রক্রিয়ার সঙ্গে হির্মুখী স্নায়ুস্থিত অন্য কোন প্রক্রিয়ার একটা সম্বন্ধ থাকবে। হাঁচি দেওয়ার ধ্যে অনুবর্তের একটা সুন্দর (good) দৃষ্টান্ত পাই। নাকের ভেতরে কোন ক রকমের সুড়সুড়ি লাগার ফলে বেশ তীব্র একটা দেহ-কম্পনের সৃষ্টি হয়; কম্পনের প্রকৃতি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং সুড়সুড়ি ও কম্পনের এই সম্বন্ধ নতম বয়সের শিশুর মধ্যেও রয়েছে। পক্ষান্তরে, শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া-লো ঘটে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের ভেতরকার পূর্ববর্তী ঘটনার ফল হিসাবে। টা উপমার সাহায্যে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে; তবে উপমাটার র অতিরিক্ত চাপ দিলে তাতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। এমন একটা ভূমির কল্পনা করুন যেখানে কখনও বৃষ্টিপাত হয়নি এবং মনে করুন য, শেষ পর্যন্ত তার মাঝে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল; তখন সে নি যে ধারায় প্রবাহিত হবে, অনুবর্তের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকবে। তবে ঘন যদি বৃষ্টিপাত হতে থাকে তাহলে পানির খাত ও নদী-উপত্যকার vater courses and river valleys) সৃষ্টি হবে; এটা হয়ে যাবার পর নি অতীতে তৈরী খাতের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে যাবে। এই এলাকাটার অভিজ্ঞতা'কে এই খাতগুলোর কারণ বলে ধরা যেতে পারে। 'শিক্ষালব্ধ তিক্রিয়া'র সঙ্গে এর মিল রয়েছে। 'শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার' সবচেয়ে

স্মরণীয় দৃষ্টান্তগুলোর অন্যতম হচ্ছে বচন (speech) : আমরা কথা বলি এজন্য নয় যে, কোন একটা ভাষা আমরা শিখেছি, এজন্য নয় যে, আদিতেই ঠিক ওই ভাবে প্রতিক্রিয়া করার কোন প্রবণতা আমাদের মস্তিষ্কের ছিল। সম্ভবতঃ সকল জ্ঞান—প্রায় সমস্ত জ্ঞান অবশ্যই—শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ, মস্তিষ্কের ভেতরকার সেই সব সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল যেগুলো মানুষের সহজাত সাজ-সরঞ্জামের (congenital equipment) অঙ্গীভূত নয়, যেগুলো বরং তার প্রত্যক্ষগত ঘটনাবলীর ফল।

শিক্ষালব্ধ ও সহজাত প্রতিবেদনের (unlearned) মধ্যে পার্থক্য দেখানো সকল ক্ষেত্রে সহজ নয়। এটা মনে করা যাবে না যে, জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহে যেসব প্রতিবেদন অনুপস্থিত তাদের সব কটিই শিক্ষালব্ধ। এর স্পষ্টতম দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বলা যায় : বয়ঃসন্ধিক্ষণে যৌন প্রতিবেদনের স্বরূপ অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়; সেটা ঘটে অভিজ্ঞতার ফল হিসাবে নয়, নালী বিহীন গ্রন্থিতে (ductless glands) পরিবর্তন ঘটার ফল হিসাবে। কিন্তু এ-ই কেবল একমাত্র দৃষ্টান্ত নয় : দেহের বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন প্রতিবেদনের উদ্ভব ঘটে—অভিজ্ঞতার ফলে তারা পরিবর্তিত হয় সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের উদ্ভব সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতা থেকে ঘটে না। যেমন : নবজাত শিশু দৌড়াতে পারে না; সুতরাং তার চেয়ে বয়স্ক কোন শিশুর মত ভীতিজনক কোন কিছুর কাছ থেকে সে দৌড়িয়ে পালাতে পারে না। আরেকটু বয়স্ক শিশু দৌড়াতে শিখেছে, কিন্তু সে যে নেহাৎ দৌড়িয়ে পালাতে (run away) শিখেছে, তেমন কোন কথা নেই; যে উদ্দীপক উপস্থিত থাকার ফলে সে দৌড়িয়েছে সেটা হয়তো কখনও কোন ভয়ংকর বস্তু ছিল না। সুতরাং নবজাত শিশু কি করে, সেটা দেখে আমরা শিক্ষালব্ধ ও সহজাত প্রতিবেদনে মধ্যে পার্থক্য করতে পারি, এরূপ মনে করা ভুল হবে, যেহেতু আরও পরবর্তী পর্যায়ে [অর্থাৎ, আরও বয়স হলে] কোন অনুবর্ত সক্রিয়ভাবে দেখা দিতে পারে। বিপরীতক্রমে, জন্মলগ্নে শিশু যেসব কাজ করে তাদের কতকগুলো শিক্ষালব্ধ হতে পারে, অর্থাৎ, যেগুলো সে মাতৃগর্ভে করতে পেরেছে—যেমন, কিয়ৎ পরিমাণে লাথি মারা ও শরীরটাকে লম্বা করা। সুতরাং শিক্ষালব্ধ ও সহজাত প্রতিবেদনের গোটা পার্থক্যটা যতটুকু সুনির্দিষ্ট বলে আমরা আশা করতে পারতাম ততটুকু সুনির্দিষ্ট তা নয়। দুই বি

প্রান্তদেশে আমরা তাদের স্পষ্ট দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাই—যেমন, একদিকে হাঁচি দেওয়া ও অন্য দিকে কথা বলা, কিন্তু মাঝামাঝি পর্যায়ের আচরণও আছে, যেগুলোকে কোন শ্রেণীতে ফেলা আরও কঠিন।

শিক্ষালব্ধ ও সহজাত প্রতিবেদনের প্রতি যাঁরা অধিকতম গুরুত্ব আরোপ করেন, এমন-কি তারাও একথা অস্বীকার করেন না। ডঃ ওয়াটসনের *Behaviorism*-এ (পৃঃ ১০৩) একটা "সহজাত উপকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" আছে, নীচের অনুচ্ছেদটি দিয়ে যার সমাপ্ত ঘটেছে:

"অন্যান্য ক্রিয়াগুলো আরও পরবর্তী পর্যায়ে দেখা দেয়—যেমন, চক্ষু পিটপিট করা, হাত বাড়িয়ে কিছু ধরা, হাতানো, কোন এক হাতের বিশেষ ব্যবহার (handedness), হামাগুড়ি দেওয়া, দাঁড়ানো, বসা, হাঁটা, দৌড়ানো, লাফ দেওয়া। এই পরবর্তী ক্রিয়াগুলোর বেশীর ভাগের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ক্রিয়াকে অখণ্ডভাবে নিয়ে বলা যায় যে, তার কতখানি যে প্রশিক্ষণ বা সাপেক্ষীকরণের ফল তা বলা দুষ্কর। একটা লক্ষণীয় অংশ নিঃসন্দেহে কাঠামোর বৃদ্ধিগত পরিবর্তনের ফল এবং অবশিষ্টাংশের জন্যে দায়ী প্রশিক্ষণ ও সাপেক্ষীকরণ।" (বাঁকা হরফ ওয়াটসনের।)

এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক পার্থক্য (logically sharp distinction) টানা সম্ভব নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও কম সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিছক স্বাভাবিক (normal) বৃদ্ধি থেকে যে সব উন্নতি দেখা দেয় সেগুলোকে সহজাত বলে গণ্য করতে হবে, আর ব্যক্তির জীবনেতিহাসে বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর যেগুলো নির্ভরশীল সেগুলোকে শিক্ষালব্ধ বলে গণ্য করতে হবে। কিন্তু পৈশিক উন্নতির কথা ধরা যাক: স্বাভাবিক অবস্থায় পেশীগুলো ব্যবহার না করলে এ ঘটবে না এবং তাদেরকে ব্যবহার করলে যে কুশলতা তাদের আয়ত্তগম্য, সেটা না শিখে তারা পারবে না। এবং নানা জায়গায় চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার মত যেসব বিষয়কে অবশ্যই শিক্ষালব্ধ বলে গণ্য করতে হবে, সেগুলো নির্ভর করে এমন অবস্থার উপর যা স্বাভাবিক এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রে যা উপস্থিত। অতএব, সম্পূর্ণ পার্থক্যটাই বরং মাত্রাগত, প্রকারগত নয় তথাপি তা মূল্যবান।

শিক্ষালব্ধ ও সহজাত প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যের মূল্য শিক্ষণের নিয়মাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত, পরবর্তী অধ্যায়ে যা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। কতকগুলো নিয়মানুসারে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের আচরণ রূপান্তরিত হয় এবং আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেই প্রতিক্রিয়া যার রূপায়ণে এ নিয়মগুলো একটা ভূমিকা পালন করেছে। যেমন: জন্ম থেকেই শিশুরা উচ্চ শব্দে ভয় পায়, কিন্তু প্রথমে কুকুর থেকে ভয় পায় না; কোন কুকুরকে উচ্চ শব্দে ঘেউ-ঘেউ করতে শোনার পর তারা কুকুর থেকে ভয় পেতে পারে এবং এটা একটা শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া। মস্তিষ্ক সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকলে, শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়াগুলো মস্তিষ্কের নিছক বৃদ্ধি ছাড়া অন্য পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল, এই কথা বলে পার্থক্যটাকে আমরা আরও সুনির্দিষ্ট করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় (as it is) দৈহিক আচরণ নিরীক্ষণ করে আমাদের বিচার করতে হয়, প্রতিক্রিয়ার সহগামী হিসাবে মস্তিষ্কের যে সব রূপান্তর কল্পনা করি, সেগুলোকে আমরা বরং তত্ত্বের ভিত্তিতে ধরে নিই, বাস্তবে কখনও নিরীক্ষণ করিনে।

আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে সরল। জন্মলগ্নে মানুষ বা অন্য যে কোন প্রাণী কতকগুলো নির্দিষ্ট ভাবে, অর্থাৎ, কতক প্রকারের দৈহিক সঞ্চালনের মাধ্যমে, কতকগুলো উদ্দীপকের উত্তরে প্রতিক্রিয়া করে; বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অংশতঃ উন্নতিশীল দেহ-কাঠামো এবং অংশতঃ তার জীবনের ঘটনাবলীর ফলস্বরূপ প্রতিবেদনের এই প্রকারগুলো পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী প্রভাবটা পড়ে কতকগুলো নিয়মানুসারে, এবং এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, কারণ 'জ্ঞান'-এর উৎপত্তির ক্ষেত্রে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কিন্তু রুষ্ট পাঠক চীৎকার দিয়ে বলতে পারেন—কোনকিছু জানা দৈহিক সঞ্চলন নয়, সেটা মনের একটা অবস্থা, অথচ তা সত্ত্বেও আপনি হাঁচি দেওয়া ইত্যাদি জাতীয় বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। রুষ্ট পাঠককে আমি ধৈর্য ধরতে বলবো। তিনি 'জানেন' যে, মানসিক অবস্থা তাঁর আছে এবং তাঁর জানাটাও একটা মানসিক অবস্থা। আমি অস্বীকার করছি না যে তাঁর কতকগুলো মানসিক অবস্থা আছে, তবে দুটো প্রশ্ন করছি: প্রথমে, সেগুলো কি রকমের জিনিস? দ্বিতীয়তঃ, তাদের সম্বন্ধে তাঁর যে

আছে সে বিষয়ে তিনি কি প্রমাণ আমাকে দিতে পারেন? তাঁর [ক]াছে প্রথম প্রশ্নটা খুবই কঠিন মনে হতে পারে; এবং তাঁর উত্তরে তিনি [য]দি দেখাতে চান যে, দৈহিক সঞ্চলন থেকে মানসিক অবস্থাগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন [ধ]রনের জিনিস তাহলে তাঁকে, দৈহিক সঞ্চলন কি জিনিস, সেটাও আমাকে [ব]লতে হবে। এর জন্য পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে দুর্বোধ্য অংশগুলোর মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে হবে। এসব বিষয় আমি পরে আলোচনা করতে চাই, এবং তখন [আ]শা করি রুষ্ট পাঠক পরিতুষ্ট হবেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটা, অর্থাৎ, তাঁর নিজের [জ্ঞ]ানের সপক্ষে অন্য লোকে আমার কাছে কি সাক্ষ্য উপস্থিত করতে [প]ারেন—সে সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা পরিষ্কার যে, তাঁকে নির্ভর করতে [হ]বে বলা বা লেখার উপর, অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রেই দৈহিক সঞ্চলনের উপর। [সু]তরাং জ্ঞাতার কাছে জ্ঞান যাই হোক না কেন, একটা সামাজিক ব্যাপার [হি]সাবে তা এমন কিছু যার প্রকাশ দৈহিক সঞ্চলনের মধ্যে। এখনকার [ম]ত, জ্ঞাতার কাছে জ্ঞান কি, ইচ্ছে করেই এ প্রশ্নটা মুলতবী রাখছি এবং [জ্ঞ]ান বহিঃস্থ নিরীক্ষকের কাছে কি, সে বিষয়ের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ [র]াখছি। এবং তার পক্ষে এটা অবশ্যই (necessarily) উদ্দীপকের—আরও [বি]শেষভাবে, পরীক্ষার প্রশ্নাবলীর—উত্তরে যে দেহ-সঞ্চালন করা হয় তার [ম]ধ্যেই প্রদর্শিত একটা কিছু। এটা আর কি হতে পারে, আরও পরবর্তী [প]র্যায়ে আমি তা বিবেচনা করবো।

জ্ঞাতার কাছে জ্ঞান কিভাবে ধরা দেয় এ প্রশ্ন বিবেচনা করে আমাদের [জ্ঞ]ান ব্যাখ্যার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে আমরা যা-কিছুই যুক্ত করিনা কেন তাতে—[ব]হিঃস্থ নিরীক্ষকের কাছে জ্ঞান কিরূপে ধরা পড়ে, এ প্রশ্ন আলোচনা করে [আ]মরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো, সে সিদ্ধান্তের অশুদ্ধতা প্রমাণিত হবে না। [এ]কটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করা আবশ্যক, অর্থাৎ, আমাদের আলোচ্য [বি]ষয় এমন একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে প্রথমে পরিবেশ (environment) মানুষের [উ]পর ক্রিয়া করে এবং তারপর মানুষ ক্রিয়া করে পরিবেশের উপর। জ্ঞান [কি] তা যদি আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে এ প্রক্রিয়াটাকে আগা-[গো]ড়া বিবেচনা করতে হবে। পুরাতন মতটা এই হতে পারতো যে, [আ]মাদের উপর পরিবেশের ক্রিয়া দ্বারা এক প্রকার জ্ঞান (প্রত্যক্ষণ) উৎপন্ন [হ]তে পারে এবং অন্যদিকে পরিবেশের উপর আমাদের প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে

ইচ্ছা। এদের প্রত্যেকটাই ছিল 'মানসিক' ঘটনা এবং স্নায়ু ও মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। আমার মনে হয় যে, উদ্দীপক থেকে দৈহিক সঞ্চালন পর্যন্ত গোটা চক্রটাকে (cycle) নিয়ে যাত্রারম্ভ করলে রহস্যটাকে দূর করা এবং আলোচ্য বিষয়টাকে আন্দাজের জগৎ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হবে। এই ভাবে, জানা ধ্যানের বিষয় (something contemplative) না হয়ে একটা সক্রিয় ব্যাপার হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ, জানা ও ইচ্ছা করা একই চক্রের দুই দিক মাত্র, এবং এ চক্রটাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে একে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

যন্ত্র (mechanism) হিসাবে মানব-দেহ সম্পর্কে অবশ্যই গুটিকয়েক কথা বলা দরকার। অচিন্তনীয় জটিলতা-বিশিষ্ট এই মানব দেহ, এবং বিজ্ঞানের কিছু লোক মনে করেন যে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মাবলী দিয়ে এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—বরং একটা "জৈবিক সত্তা" (vital principle) দিয়ে এ যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত, যার ফলে এর নিয়মগুলো নিষ্প্রাণ জড়ের নিয়মাবলী থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। এ সব লোককে বলা হয় 'প্রাণবাদী' (vitalists)। এঁদের মত গ্রহণ করার কোন কারণই আমার চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু একই সঙ্গে একে নিশ্চিতভাবে বর্জন করার মত যথেষ্ট জ্ঞানও আমাদের হাতে নেই। আমরা যা বলতে পারি সেটা এই যে, এঁদের মত প্রমাণিত হয়নি, বরং এর বিপরীত মতটাই, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, একটা অধিকতর ফলপ্রসূ প্রকল্প। যেখানেই সম্ভব সেখানেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রগত ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা শ্রেয়তর, কেননা মানবদেহের অনেক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানি, এ পদ্ধতিতে যাদের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব এবং এমন কোন প্রক্রিয়ার কথাই আমরা জানি না, নিশ্চিতভাবেই এ পদ্ধতিতে যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কোন 'জৈবিক সত্তা'-কে ডেকে আনার অর্থ আলস্যের সপক্ষে একটা ওজর দাঁড় করানো, যখন আরেকটু পরিশ্রম সহকারে অন্বেষণ চালালে সেটাকে বাদ দেওয়া সম্ভব হতো। অতএব, সাময়িক প্রকল্প হিসাবে আমি ধরে নেব যে, নিষ্প্রাণ জড় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের যে সব নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, মানবদেহও সেইসব নিয়মানুসারে কাজ করে, এবং নিষ্প্রাণ জড় থেকে এর পার্থক্য এর গঠন-প্রণালীর অসাধারণ জটিলতার মধ্যে, এর নিয়মাবলীর মধ্যে নয়।

তা সত্ত্বেও মানবদেহের সঞ্চালনসমূহকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যাদেরকে আমরা যথাক্রমে 'যান্ত্রিক' ও 'জৈবিক' (mechanical ও vital) বলতে পারি। পূর্ববর্তী শ্রেণীটার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি উল্লেখ করতে পারি খাড়া উঁচু পাহাড় থেকে কোন লোকের সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার কথা। এর স্থূল দিকগুলোর প্রেক্ষিত থেকে এর ব্যাখ্যা দিতে হলে, লোকটা যে জীবিত, সে সত্যের প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজন নেই; একটা প্রস্তরখণ্ডের ভরকেন্দ্র যেভাবে নড়তো তার ভরকেন্দ্রও ঠিক সেইভাবে নড়ে। কিন্তু যখন সে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে তখন সে এমন কিছু করছে যা সম-আকার ও সম-ওজন বিশিষ্ট নিষ্প্রাণ জড় কখনও করতো না; এটা একটা 'জৈবিক' সঞ্চলন। মানব দেহের মধ্যে অল্পবিস্তর অস্থায়ী সাম্যতায় (equilibrium) অনেক রাসায়নিক শক্তি জমা আছে; অতি সামান্য উদ্দীপকও এ শক্তিকে অর্গলমুক্ত করে দিয়ে যথেষ্ট দৈহিক সঞ্চলনের জন্ম দিতে পারে। কোন গোচাকৃতি পর্বত-চূড়ার উপর সাবধানে ভারসাম্য বজায় রেখে কোন বৃহত প্রস্তরখণ্ডকে বসিয়ে দিলে যা হয়, অবস্থাটা সেই রকম: সামান্য জোরে ধাক্কা লাগলেই সেটা প্রচণ্ড শব্দে, ধাক্কার দিক অনুসারে কোন এক দিকে, নিম্নবর্তী উপত্যকায় গড়িয়ে পড়তে পারে। তেমনি ভাবে, আপনি যদি কাউকে বলেন "আপনার বাড়ীতে আগুন লেগেছে," তাহলে সে দৌড়াতে আরম্ভ করে; উদ্দীপকের ভেতর অতি সামান্য শক্তি নিহিত থাকা সত্ত্বেও সে যে শক্তি খরচ করবে তার পরিমাণ হতে পারে বিপুল। হাঁপানি দ্বারা সে তার শক্তি বাড়িয়ে নেয়—হাঁপানির ফলে তার দেহে দহন-ক্রিয়া বেড়ে যায় এবং তার ফলে দহনক্রিয়াজাত শক্তির পরিমাণ বেড়ে যায়; এটা ঠিক কোন চুল্লীর ড্রাফ্‌ট্ (draught) খুলে দেওয়ার মত। এ শক্তি থাকে এক অস্থায়ী ভারসাম্যের মধ্যে, এবং 'জৈবিক' সঞ্চলন হচ্ছে সেই-সব সঞ্চলন যেগুলোতে এ শক্তি ব্যবহৃত হয়। জৈব-রসায়নবিদ, শরীরতত্ত্ববিদ এবং মনোবিজ্ঞানীর আলোচ্য বিষয় কেবল এগুলোই (সঞ্চলনগুলোই)। অন্য সঞ্চলনগুলো ঠিক নিষ্প্রাণ জড়ের নড়াচড়ার মতোই, এবং আমরা যখন বিশেষভাবে মানুষ সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছি তখন তাদের কথা ভুলে থাকতে পারি।

জৈবিক সঞ্চলনের একটা উদ্দীপক থাকে, এবং সেটা দেহের ভেতরে বা বাইরে, কিংবা একই সঙ্গে উভয় স্থলেই থাকতে পারে। ক্ষুধা দেহের

ভেতরকার একটা উদ্দীপক, কিন্তু খাদ্য-দর্শনের সঙ্গে মিলিত হলে ক্ষুধা হয়ে ওঠে এক দ্বিমুখী উদ্দীপক, আভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ। তত্ত্বে, কোন উদ্দীপকের ক্রিয়া পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কিন্তু বর্তমানে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, এটা একটা সাধু অভিমত (pious opinion) ছাড়া আর কিছু নয়। পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা যা জানি তা এই যে অভিজ্ঞতা দ্বারা আচরণ পরিবর্তিত হয়—অর্থাৎ বিরতি দিয়ে একই রকম উদ্দীপক যদি বারংবার উপস্থাপিত হয় তা হলে তার ফলে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কোন বাসকণ্ডাক্‌টর যখন "দয়া করে ভাড়া দিন" বলেন তখন খুব ছোট শিশুর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, আরেকটু বয়স্ক শিশু ধীরে ধীরে পেনি খুঁজতে শেখে, এবং পুরুষজাতীয় হলে শেষ পর্যন্ত সে চাইবামাত্র সজ্ঞান প্রচেষ্টা ছাড়াই আবশ্যক মত টাকাটা বের করে দেওয়ার শক্তি অর্জন করে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে প্রকারে আমাদের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হয়, সেটা প্রাণীকুলের এক পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য; অধিকন্তু নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীর চেয়ে বরং উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এটা বেশী লক্ষণীয় এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয়। 'বুদ্ধি'র সঙ্গে এ বিষয়টা অন্তরঙ্গভাবে জড়িত, এবং বহিস্থ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান কি দিয়ে তৈরী সেটা উপলব্ধি করার আগে এর পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক। পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

স্থূলভাবে বলতে গেলে, প্রাণবিশিষ্ট্য সকল সত্তার ক্রিয়াকলাপেই জৈবিক উদ্‌বর্তনের (biolagical survival) প্রতি, অর্থাৎ, অসংখ্য বংশধর রেখে যাওয়ার প্রতি একটা ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণী—যাদের ব্যক্তিসত্তা (individuality) বলতে কিছু আছে বলা কঠিন, এবং যারা বিভাজন-পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে—তাদের কাছে নেমে এলে এর চেয়ে সরলভাবে বিষয়টাকে দেখা যেতে পারে। একটা সীমার মধ্যে, নিজেকে চিরস্থায়ী করার এবং সঠিক উপাদানে তৈরী জড়ের উপর নিজের রাসায়নিক গঠন-প্রকৃতির ছাপ ফেলার একটা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সপ্রাণ জড়ের ভেতরে রয়েছে। বদ্ধ জলাশয়ে একটি অনুবীজ (spore) পড়লে তা থেকে লক্ষ লক্ষ অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ (vegetable organism)-এর জন্ম হতে পারে; আবার, এর ফলে একটি ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে এমন অসংখ্য বংশধর জন্মাতে পারে, সেই ক্ষুদ্রউদ্ভিদ খেয়ে

দ্বারা বেঁচে থাকবে ; আবার, এগুলোর উপর নির্ভর করে জলগোধিকা, বেঙাচি, মাছ ইত্যাদি বৃহত্তর প্রাণীকুল বেঁচে থাকে। শেষ পর্যন্ত, শুরুতে সে জায়গায় যত প্রটোপ্লাজম ছিল তার বহুগুণ বেশী প্রটোপ্লাজম সেখানে দেখা দেয়। সপ্রাণ জড়ের রাসায়নিক সংগঠনের ফল হিসাবে নিঃসন্দেহে এর ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। কিন্তু জীবের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের গোড়ায় রয়েছে এই নিছক রাসায়নিক আত্মসংরক্ষণ ও সামষ্টিক বৃদ্ধি। প্রতিটি জীব যেন এক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী ; তার পরিবেশের যতটুকু সম্ভব ততটুকু সে চায় তার নিজের ও তার বীজের সত্তায় পরিবর্তিত করতে। নিজ এবং ভাবী বংশধরের মধ্যে যে পার্থক্য, এককোষী অযৌন জীবের মধ্যে উন্নত আকারে সে পার্থক্য বিরাজমান নয় ; এমন-কি মানব-জীবনেও, কেবল ভুলে গিয়েই অনেক জিনিস সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সমগ্র বিবর্তনকে সপ্রাণ জড়ের এই "রাসায়নিক সাম্রাজ্যবাদ" থেকে নিঃসৃত বলে গণ্য করা যায়। মানুষ (এ পর্যন্ত) কেবল এর শেষ দৃষ্টান্তমাত্র। ভূমণ্ডলের উপরিভাগকে সে রূপান্তরিত করে পূর্তকার্য, কৃষিকাজ, খনি-খনন খাদ-খনন (quarrying), খাল ও রেলপথ তৈরী, কতিপয় প্রাণীর প্রজনন এবং অন্যগুলোর ধ্বংস-সাধনের মাধ্যমে ; এবং একজন বহিস্থ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যখন নিজেদের জিজ্ঞেস করি, এ সমস্ত ক্রিয়া-কসরতের দ্বারা শেষ পর্যন্ত আমরা কি পাই, তখন আমরা দেখি যে, একটা অতি সরল ফরমূলার মধ্যে তার উত্তরটাকে সংক্ষেপ করে ফেলা যায়ঃ ভূপৃষ্ঠস্থ জড়ের যতখানি সম্ভব ততখানিকে মানব-দেহে রূপান্তরিত করা। পশু-পালন, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পায়ন এ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর হিসাবে দেখা দিয়েছে। ভূমণ্ডলের মানুষের সংখ্যার সঙ্গে আমরা যখন অন্য বৃহৎ প্রাণীকুলের সংখ্যা বা পূর্ববর্তী কালের লোকসংখ্যার তুলনা করি তখন দেখি যে, বস্তুতঃ, 'রাসায়নিক সাম্রাজ্যবাদ'ই সেই মূল লক্ষ্য যার জন্য মানব-বুদ্ধি নিয়োজিত হয়েছে। সম্ভবতঃ বুদ্ধি সেই স্তরে পৌঁছাচ্ছে যেখান থেকে সে এর চেয়েও উন্নততর (worthier) লক্ষ্যের ধারণা করতে পারবে, যে লক্ষ্যের সম্বন্ধ মানব জীবনের পরিমাণের চেয়ে বরং তার গুণের সঙ্গে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যেই এ ধরনের বুদ্ধি সীমিত ; মানব-জীবনের বড় বড় ঘটনাবলী এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। এ অবস্থার আদৌ কখনও পরিবর্তন হবে কি না, সে

সম্পর্কে কোনরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করার দুঃসাহস আমি দেখাচ্ছি না। এবং, আর যাই হোক, মানব জীবনকে তার সর্বোচ্চ পরিমাণে নিয়ে যাওয়ার সাদামাটা লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হওয়ার মধ্যে সেই সান্ত্বনাটুকু অন্ততঃ আছে, এই গ্রহের উপরে প্রাণীকুলের আদিতম উৎপত্তিকাল থেকে তাদের সমগ্র অগ্রগতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতি থেকে যে সান্ত্বনাটুকু পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণী ও শিশুদের শিক্ষণ-প্রক্রিয়া

কোন প্রাণীর জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলীর ফল স্বরূপ তার আদি প্রতিবেদন-সমষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন কতকগুলো অভ্যাসে পরিবর্তিত হয়। যে সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও যেসব নিয়ম অনুসারে এ পরিবর্তন ঘটে, বর্তমান অধ্যায়ে আমি তাদের নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আর সবাইকে বাদ দিয়ে কুকুর তার প্রভুর অনুসরণ করতে শেখে; আস্তাবলে ঘোড়া তার নিজের খোঁয়াড়টিকে চিনে নিতে শেখে; দুগ্ধ দোহনের সময় মতো গোশালায় ফিরে আসতে শেখে গরু। এর সবগুলোই অর্জিত অভ্যাস, প্রতিবেদন (reflex) নয়; তারা সংশ্লিষ্ট প্রাণীর অবস্থার (circumstances) উপর নির্ভরশীল, কেবল তার বিশেষ শ্রেণীর সহজাত বৈশিষ্টাবলীর উপর নয়। কোন প্রাণীর কিছু 'শেখা'র কথা যখন আমি বলবো, তখন আমি সমুদয় অর্জিত অভ্যাসকে তার অন্তর্ভুক্ত করবো, সেগুলো প্রাণীর কোন উপকারে আসুক বা না আসুক। ইটালীতে ঘোড়ার মদ্য পান করতে 'শেখা'র কথা শুনেছি, যাকে আমি অবশ্য একটা বাঞ্ছনীয় অভ্যাস বলে বিশ্বাস করি না। কোন কুকুর উৎপীড়নকারী লোকের প্রতি তেড়ে ওঠা 'শিখতে' পারে, এবং এত নিয়মানুবর্তিতা ও হিংস্রতার সাথে তা করতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হয়। প্রশংসাসূচক কোন অর্থে শিক্ষণ কথাটাকে আমি ব্যবহার করছি না; শিক্ষণ বলতে আমি কেবল অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ আচরণের পরিবর্তনকে বোঝাচ্ছি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাণীর শিক্ষণ-প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, ধৈর্য সহকারে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ হয়েছে প্রচুর। যে ধরনের সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, সে ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে কিছু ফললাভও হয়েছে, কিন্তু সাধারণ সূত্রাবলীর (general principles) বিষয়ে এখনও অনেক বিতর্ক রয়ে গেছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে প্রাণী-গুলোকে সাবধানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তাদের সকলের আচরণ থেকেই, পর্যবেক্ষণ শুরু করার আগে পর্যবেক্ষক যে দর্শনে বিশ্বাস করতেন, সে দর্শনই

প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পর্যবেক্ষকের জাতীয় চরিত্রও তাদের সকলের আচরণে পরিস্ফুট হয়েছে। আমেরিকাবাসীরা যেসব প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে তারা উন্মত্তভাবে চতুর্দিকে ছুটাছুটি করে, অবিশ্বাস্য রকমে সতেজে ধাক্কাধাক্কি করে, এবং শেষ পর্যন্ত দৈবক্রমে বাঞ্ছিত ফললাভ করে। জার্মানেরা যেসব প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে তারা স্থির হয়ে বসে চিন্তা করে, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ভিতরের চৈতন্য থেকে সমস্যার সমাধান উদ্ধার করে। বর্তমান লেখকের মত সাদামাটা লোকের কাছে এ অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। যাই হোক, আমি বরং বলবো যে, কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃ কোন প্রাণীকে যে ধরনের সমস্যা সমাধান করতে দেন সে ধরনটা নির্ভর করে তাঁর নিজস্ব দর্শনের উপর, এবং সম্ভবতঃ ফলাফলের ভিন্নতার জন্য সেটাই দায়ী। এক ধরনের সমস্যায় প্রাণীর প্রতিক্রিয়া এক রকমের, এবং অন্য ধরনের সমস্যায় অন্য রকমের; কাজেই বিভিন্ন পর্যবেক্ষক যেসব ফলাফল পান সেগুলো ভিন্ন হলেও সামঞ্জস্যহীন নয়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, কোন একজনমাত্র গবেষক সমুদয় গবেষণাক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করবেন, এমন ভরসা করা যায় না।

এ অধ্যায়ে আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেগুলো আচরণবাদী মনোবিদ্যার আওতাভুক্ত, এবং অংশতঃ বিশুদ্ধ শরীরবিদ্যার অন্তর্গত। তথাপি আমার মনে হয় যে, যথার্থ দার্শনিক উপলব্ধির জন্যে এগুলো অপরিহার্য, যেহেতু জ্ঞান ও অনুমানের বিষয়নিষ্ঠ পর্যালোচনার (objective study) জন্যে এদের প্রয়োজন রয়েছে। 'বিষয়নিষ্ঠ' পর্যালোচনা বলতে আমি তাকেই বোঝাই যেখানে পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিতের অভিন্ন ব্যক্তি হওয়ার প্রয়োজন নেই; যে পর্যালোচনায় তাদেরকে অবশ্যই অভিন্ন হতে হবে তাকে আমি 'বিষয়ীগত, (subjective) বলবো। এখনকার মত, 'জ্ঞান'কে একটা বিষয়গত ব্যাপার বলে বুঝতে হলে যা আবশ্যক, তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। জ্ঞানের বিষয়ীগত পর্যালোচনার সমস্যায় আমরা আসছি আরও পরে।

প্রাণীর শিক্ষণ-প্রণালী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ম অতি সাম্প্রতিক; ১৯১১ সালে থর্ণডাইকের 'Animal Intelligence' প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই এর আরম্ভ বলে মনে করলে খুব ভুল হবে না। পরবর্তীকালে বস্তুতঃ সকল আমেরিকান গবেষকেরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা আবিষ্কার

করেছিলেন থর্ণডাইক। এ পদ্ধতিতে কোন প্রতিবন্ধকের সাহায্যে একটা প্রাণীকে তার খাবার থেকে আলাদা করা হয়; সে খাবার সে দেখতে পায় বা তার ঘ্রাণ সে নিতে পারে, এবং সে প্রতিবন্ধক সে জয় করতে পারে দৈবক্রমে (chance)। যেমন হাতল-বিশিষ্ট দরজা-ওয়ালা কোন খাঁচার ভেতরে একটা বিড়াল রাখা হলো, যে তার নাক দিয়ে ঠেলা মেরে সে দরজা খুলতে পারে। প্রথমে বিড়ালটা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে নড়াচড়া করতে থাকে, যে পর্যন্ত-না নিছক ভাগ্যক্রমে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় বারেও, সেই একই খাঁচার ভেতরে কিছুক্ষণ সে বিশৃঙ্খলভাবে নড়াচড়া করে, কিন্তু প্রথমবারের মত নয়। তৃতীয় বারে সে আরও ভাল করে, এবং অনতি-বিলম্বেই সে আর কোন অনাবশ্যক নড়াচড়া করে না। আজকাল বিড়ালের বদলে ইঁদুর ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং খাঁচার বদলে হ্যাম্পটন কোর্ট (Hampton Court) গোলকধাঁধার একটা মডেলের ভেতর তাকে ঢোকানো হয়। প্রথমে ইঁদুরগুলো সব রকমের ভুল ছোটাছুটি করে, কিন্তু কিছুকাল পর কোন রকম ভুল না করে সোজা দৌড় মেরে বাইরে আসতে শেখে। ডঃ ওয়াটসন উনিশটা ইঁদুরের গড়-পরতা হিসাব দিয়েছেন, যাদের প্রত্যেকটাকে বারবার গোলকধাঁধার ভেতরে ঢোকানো হয়েছিল, এবং খাদ্য ছিল বাইরে যেখান থেকে তার ঘ্রাণ সে নিতে পারতো। সকল পরীক্ষণেই, প্রাণীটা যাতে ক্ষুধার্ত থাকে, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। ডঃ ওয়াটসন বলেন: "প্রথম পরীক্ষায় গড়ে সতেরো মিনিটের বেশী লেগেছিল। এ সময়ে ইঁদুরটা গোলকধাঁধার ভেতরে চতুর্দিকে দৌড়া-দৌড়ি করছিল, ঢুকে পড়ছিল কানাগলিতে, ফিরে আসছিল যাত্রাস্থলে, আবার খাবারের জন্য যাত্রা করছিল. তার চারিদিককার তারগুলোতে কামড় দিচ্ছিল, নিজেকে আঁচড়াচ্ছিল, মেঝের উপরে নানা স্থানের গন্ধ শুঁকছিল। শেষ পর্যন্ত সে খাবারের কাছে পৌঁছলো। তাকে একবার মাত্র কামড় দিতে দেওয়া হয়েছিল। আবার তাকে ঢোকানো হলো গোলক-ধাঁধার ভেতরে। খাবারের স্বাদ তাকে প্রায় উন্মত্ত করে তুলেছিল। আরও দ্রুত সে চারদিকে ধাক্কা মারতে লাগলো। দ্বিতীয় পরীক্ষায় সমগ্র দলটির গড়-পড়তা সময় দাঁড়ালো সাত মিনিটের কিছু বেশী। চতুর্থ পরীক্ষায় ঠিক তিন মিনিটও নয়; এ সময় থেকে তেইশতম পরীক্ষা পর্যন্ত উন্নতি

হয়েছিল খুব ধীর গতিতে।" তিরিশতম পরীক্ষায় গড়-পড়তা যে সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল তা তিরিশ সেকেণ্ডের কাছাকাছি।[১] এ পরীক্ষাগুলো যে শ্রেণীর পরীক্ষা-সমূহের অন্তর্গত, এদেরকে তার আদর্শ-স্বরূপ মনে করা যেতে পারে।

খাঁচা ও গোলকধাঁধা নিয়ে পরীক্ষা চালানোর ফল হিসাবে থর্ণডাইক নিম্নোল্লেখিত দুটো "বিবেচনা-সাপেক্ষ নিয়ম" (provisional laws) সূত্রায়িত করেছেন :

"কার্যফল নিয়মটা[২] এই যে : একই অবস্থার (situation) উত্তরে যে কতিপয় প্রতিবেদন ঘটে, তাদের মধ্যে যেগুলোতে সেই মুহূর্তে বা তার কিছু পরে প্রাণীর পরিতোষ লাভ হয়, সেগুলো, অন্য সবকিছু একরূপ থেকে গেলে, ওই অবস্থার সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হবে, যার ফলে, ওই অবস্থার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সেই প্রতিবেদনগুলোরও পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে ; যেগুলোতে সেই মুহূর্তে বা তার কিছু পরে প্রাণীর অসন্তোষ লাভ হয়, অন্য সবকিছু একরূপ থেকে গেলে, সেই অবস্থার সঙ্গে সেগুলোর সংযোগ দুর্বল হয়ে পড়বে, যার ফলে, সে অবস্থার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সেই প্রতিবেদনগুলোরও পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা কমে যাবে। সন্তুষ্টি বা যন্ত্রনা যত বেশী হবে, সংযোগ ততই সবল বা দুর্বল হবে।

"অনুশীলন নিয়মটা[৩] এই যে : অন্য সবকিছু যদি একরূপ থাকে তাহলে, কোন অবস্থার সঙ্গে কোন প্রতিবেদনের সংযুক্ত হওয়ার সংখ্যা এবং সে সংযোগের গড়-পড়তা শক্তি ও স্থায়িত্বকাল যত বেশী, সে অনুপাতে সে অবস্থার সঙ্গে সে প্রতিবেদনের সংযোগও তত দৃঢ় হবে।"

এ নিয়ম দুটোকে আমরা মোটামুটিভাবে এই দুই উক্তির মাধ্যমে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি : প্রথমতঃ, যা থেকে সুখ এসেছে, প্রাণী তার পুনরাবৃত্তি করতে চায় ; দ্বিতীয়তঃ, যা কোন প্রাণী পূর্বে বারংবার করেছে, তার সে পুনরাবৃত্তি করতে চায়। এ নিয়মগুলোর কোনটাই আশ্চর্যজনক নয়, কিন্তু

১. ওয়াটসন, Behaviorism, পৃ: ১৬৯-৭০।

২. The Law of Effect.

৩. The Law of Exercise.

আমরা পরে দেখবো যে, প্রাণীর শিক্ষণ-প্রণালীর ব্যাখ্যার জন্য এগুলোই যথেষ্ট—এ মতবাদে অসুবিধা আছে।

আরও সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে একটা তাত্ত্বিক ব্যাপার মিটিয়ে ফেলতে হয়। তাঁর প্রথম নিয়মে থর্ণডাইক সন্তুষ্টি ও যন্ত্রনার কথা বলেন, এবং এসব শব্দ বিষয়ীগত (subjective) মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত। কোন প্রাণী সন্তোষ 'অনুভব' করে কিনা অথবা যন্ত্রণা 'অনুভব' করে কিনা, আমরা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না; আমরা কেবল দেখতে পারি যে, যে ধরনের আচরণকে আমরা এ-সব অনুভূতির চিহ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সে ধরনের আচরণ সে করছে। থর্ণডাইকের নিয়ম এখন যে রকম আছে, সে অবস্থায় তা বিষয়গত মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত হতে পারে না এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে তাকে বিচার করাও যায় না। যাই হোক, এ আপত্তিটা যত গুরুতর মনে হয়, আসলে তত গুরুতর সে নয়। কার্যফল (result) থেকে যে সন্তুষ্টি আসে সে কথা না বলে আমরা কেবল কার্যফল-গুলোকে ধরতে পারি, যাদের, থর্ণডাইক যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন, বাস্তবিকই সে বৈশিষ্ট্য রয়েছে—অর্থাৎ, প্রাণী এমনভাবে কাজ করে যাতে তাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে। গোলকধাঁধার ভেতরে ইঁদুর এমন আচরণ করে যাতে সে পনিরের নাগাল পায়, এবং যখন একবার কোন কাজ করে সে পনিরের নাগাল পায়, তখন ওই কাজটার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর একটা প্রবণতা তার জাগে। আমরা বলতে পারি যে, যখন আমরা বলি যে, পনির তাকে 'সন্তুষ্টি দেয়' অথবা ইঁদুর পনির পেতে 'ইচ্ছা করে' তখন আমরা এ-ই বোঝাই। অর্থাৎ, থর্ণডাইকের 'কার্যফল নিয়ম'-কে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করতে পারি যার ফলে আমরা তার থেকে ইচ্ছা (desire), সন্তোষ, এবং যন্ত্রণার একটা সংজ্ঞা পাই। তখন এ নিয়মের অর্থ হবে: এমন কতকগুলো অবস্থা আছে, প্রাণীর যে সব কাজ থেকে তাদের উদ্ভব ঘটে, সেসব কাজের তারা পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চায়; এ-সব অবস্থা সম্পর্কেই আমরা বলি যে, প্রাণী তাদেরকে 'ইচ্ছা করে' এবং তাদের মধ্যে সে 'সন্তোষ' খুঁজে পায়। সুতরাং, থর্ণডাইকের প্রথম নিয়মের বিরুদ্ধে এ আপত্তি খুব গুরুতর কিছু নয়, এবং অতঃপর এর থেকে আমাদের আর কোনরূপ অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই।

ডঃ ওয়াটসন কেবল একটিমাত্র নিয়মকে প্রাণী ও মানুষের সকল শিক্ষণ-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট মনে করেন, যার নাম "শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া"র নিয়ম। নিম্নলিখিতভাবে এ নিয়মটাকে উল্লেখ করা চলে :

কোন প্রাণী বা মানুষের দেহের উপর যখন মোটামুটিভাবে সমসাময়িক দুটো উদ্দীপক যথেষ্ট পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কেবল পূর্বগামী উদ্দীপক সেই প্রতিবেদন জাগিয়ে তোলে, অন্য উদ্দীপক থেকে তার আগে যে প্রতিবেদনের সৃষ্টি হতো।

যদিও আমি ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে একমত নই যে, এ নিয়মটা (principle) একাই যথেষ্ট, তথাপি আমি স্বীকার করি যে, এ একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। এটা হচ্ছে 'অনুষঙ্গ' নিয়মের আধুনিক রূপ। দর্শনে, বিশেষতঃ বৃটিশ দর্শনে 'ধারণার অনুষঙ্গ' এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এখন মনে হয় যে, এটা তার চেয়েও ব্যাপক ও মৌলিক অন্য এক নিয়মের ফল, অর্থাৎ, দৈহিক প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ। এই ব্যাপকতর নিয়মটাই উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সপক্ষে কি ধরণের প্রমাণ (evidence) রয়েছে, তাই দেখা যাক।

'ধারণা'র নয় বরং সঞ্চলনের (movements) পক্ষেই অনুষঙ্গ-ভুক্তি প্রয়োজন বলে, পূর্বতন নিয়মের চেয়ে আমাদের এই নিয়মের প্রমাণসাধ্যতার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃততর হয়ে পড়ে। যে সব ক্ষেত্রে প্রাণী নিয়ে কারবার সেগুলোতে ধারণা একটা প্রাকল্পিক ব্যাপার, কিন্তু সঞ্চলন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব; এমন-কি, মানুষের বেলায়ও অনেক নড়াচড়া অনৈচ্ছিক ও অবচেতন। তথাপি সবচেয়ে সচেতন ধারণাগুলো যে-রকম অনুষঙ্গ নিয়মের অধিকারভুক্ত, প্রাণীর সঞ্চলন এবং মানুষের অবচেতন অনৈচ্ছিক সঞ্চলনও ঠিক সে-রকম। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নের দৃষ্টান্তটা (ওয়াটসন, পৃঃ ৩৩) লওয়া যাক। চোখের মণি অন্ধকারে বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল আলোতে সংকুচিত হয়; এটা একটা অনৈচ্ছিক ও অবচেতন ক্রিয়া, কেবল অন্যকে পর্যবেক্ষণ করে যে সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। এখন, একজন লোক নিয়ে তাকে পুনঃপুনঃ উজ্জ্বল আলোতে আনা হোক এবং সেই মুহূর্তে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজানো হোক। কিছুক্ষণ পর বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজার ফলেই তার চোখের মণি সংকুচিত হবে। যতদূর দেখা যায়, সকল মাংসপেশীরই আচরণ এরকম

যে সব ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে গ্রন্থির আচরণও তাই। বলা হয় যে, কোন ব্রাস ব্যাণ্ডের [পিতল-নির্মিত যন্ত্রের বাদক-দলের] সামনে লেবু চুষলে ব্যাণ্ডের সদস্যদের লালাগ্রন্থির উপর তার যে ক্রিয়া হয়, তার ফলে ব্যাণ্ড নিঃশব্দ হয়ে যায় ; স্বীকার করছি যে, এ উক্তির সত্যাসত্য আমি কখনও পরীক্ষা করে দেখিনি। কিন্তু ওয়াটসনের ২৬তম পৃষ্ঠায় আপনি দেখতে পাবেন কুকুরকে নিয়ে এর সম্পূর্ণ সমতুল্য এক বৈজ্ঞানিক নজীর। কুকুরের মুখের ভেতরে একটা নল এমনভাবে ঢোকান, যেন একটা পরিমাপ-যোগ্য হারে বিন্দু বিন্দু করে লালা বেরিয়ে আসে। আপনি কুকুরকে খাবার দিলে তার ফলে লালা বেরিয়ে আসার হার বেড়ে যায়। একই সময় আপনি তার বাম উরু স্পর্শ করুন। কিছু সময় পার হওয়ার পর খাদ্য সহযোগে বাম উরু স্পর্শ করলে যে পরিমাণ লালা নিঃসৃত হতো, খাদ্য ছাড়াই কেবল স্পর্শের ফলে সেই পরিমাণ লালা নিঃসৃত হবে। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে আবেগের বেলায়, যা নির্ভর করে নালীবিহীন গ্রন্থিগুলোর উপর। জন্মলগ্নে শিশুরা উচ্চ শব্দে ভয় পায়, কিন্তু প্রাণীতে নয়। ওয়াটসন এগারো মাস বয়সের এক শিশুকে নিয়েছিলেন, একটা সাদা ইঁদুরকে যে পছন্দ করতো ; দু'বার সে ইঁদুরটাকে স্পর্শ করামাত্র ঠিক তার মাথার পেছনে আকস্মিকভাবে শব্দ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ইঁদুর-ভীতি জন্মাবার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট হলো, এবং সন্দেহ নেই যে, এর কারণটা এই ছিল যে, কুকুর বা তুরী বাদকের লালাগ্রন্থির বেলায় যে রকম এ-ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকমভাবে অ্যাড্রিন্যালগ্রন্থি উদ্রিক্ত হয়েছিল। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে দেখা যায় যে, ধারণা অনুষঙ্গের অপরিহার্য একক (units) নয়। মনে হয়, কেবল যে 'মন' অপ্রাসঙ্গিক তা নয়, এমন-কি মস্তিষ্ককেও আগে যে রকম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো তত গুরুত্বপূর্ণ সে নয়। সে যাই হোক, পরীক্ষামূলকভাবে যা জানা গেছে তা এই যে, উচ্চতর প্রাণীকুলের গ্রন্থি ও পেশী (ডোরাকাটা ও ডোরাবিহীন উভয়ই) কাজ করে প্রতিবেদনের স্থানান্তর নিয়মানুসারে[১] ; অর্থাৎ, দুটো উদ্দীপক যখন বারংবার একসঙ্গে প্রযুক্ত হয় তখন শেষ পর্যন্ত তাদের একটা থেকে সেই প্রতিবেদন উৎপন্ন হবে, যা আগে অন্যটা থেকে উৎপন্ন হতো। এ

১. The law of transfer of response.

নিয়ম অভ্যাসের প্রধান ভিত্তিগুলোর একটি। অতি পরিষ্কার যে, ভাষা বোঝার জন্যে এটা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক : কুকুর দেখতে পেলে 'কুকুর' শব্দটা উচ্চারিত হয়, এবং 'কুকুর' শব্দ উচ্চারিত হওয়ার ফলে বাস্তব কুকুরের প্রতি উপযুক্ত প্রতিবেদনসমূহের কতকগুলো উদ্রিক্ত হয়।

তবে, অভ্যাস ছাড়াও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার আরেকটা উপাদান আছে। থর্ণডাইকের 'কার্যফল নিয়ম'-এর কাজ এ উপাদান নিয়েই। যে সব ক্রিয়ার ফল সুখদায়ক সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করার এবং যেগুলোর ফল অসুখদায়ক সেগুলোকে এড়িয়ে চলার একটা প্রবণতা আছে প্রাণীদের মধ্যে। কিন্তু, একটু আগে যেমন বলেছি, 'সুখদায়ক' ও 'অসুখদায়ক' এমন দুটো শব্দ, বিষয়গত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাদের সত্যাসত্য আমরা পরীক্ষা করতে পারি না। যা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তা এই যে, যে সব অবস্থা থেকে এক ধরনের কিছু ফলাফল উৎপন্ন হয়েছে, প্রাণী তাদের অন্বেষণ করে, এবং যেসব অবস্থা থেকে অন্যধরনের কিছু ফলাফল উৎপন্ন হয়েছে তাদেরকে সে এড়িয়ে চলে। অধিকন্তু স্থূলভাবে বলতে গেলে, যে সব ফলাফলের মধ্যে তার নিজের অথবা তার সন্তানের জীবন রক্ষার প্রবণতা আছে সেসব ফলাফল সে অন্বেষণ করে এবং যে সব ফলাফলের মধ্যে তার বিপরীত প্রবণতা রয়েছে সেগুলোকে সে এড়িয়ে চলে। তবে এটা অপরিবর্তনীয় নয়। পতঙ্গ আগুন খোঁজে, মানুষ খোঁজে পানীয় (drink), যদিও এর কোনটাই জৈবিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় নয়। বহুকাল ধরে কোন অবস্থায় বাস করে প্রাণীরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে দেয় যেন তাদের ক্রিয়াকর্ম জৈবিক দিক থেকে তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়—কিন্তু এ খাপ খাওয়ানো ঘটে কেবল মোটামুটিভাবে। বস্তুতঃ জৈবিক উপযোগিতাকে লক্ষ্য করতে হবে কেবল প্রাণীর আচরণ-বিধির এমন একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে যা প্রায়ই নজরে পড়ে; তাদের আচরণ-বিধির ব্যাখ্যা হিসাবে কখনও একে ব্যবহার করা চলবে না।

ডঃ ওয়াটসনের মতে থর্ণডাইকের 'কার্যফল নিয়ম' নিষ্প্রয়োজন। তিনি প্রথমে ইংগিত দেন যে, অভ্যাসের ব্যাখ্যার জন্য কেবল দুটো উপাদান দরকার, অর্থাৎ, পৌনঃপুনিকতা ও সাম্প্রতিকতা (frequency and recency)। থর্ণডাইকের 'অনুশীলন নিয়ম'-এর মধ্যে পৌনঃপুনিকতাকে পাওয়া যায়, কিন্তু

যে সাম্প্রতিকতা প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই একটা সত্যিকার উপাদান, থর্ণডাইকের দুই নিয়মের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, যখন কিছু বিশৃংখল ছুটা-ছুটি থেকে শেষ পর্যন্ত সাফল্য এসে গেছে তখন দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় এই ছুটাছুটির মধ্যে যেগুলো অধিকতর সাম্প্রতিক, পূর্ববর্তীগুলোর চেয়ে সেগুলোরই অপেক্ষাকৃত আগে পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা। কিন্তু ওয়াটসন শেষ পর্যন্ত "সাপেক্ষ অনুবর্ত" বা "শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া"র একমাত্র নিয়মের অনুকূলে অভ্যাস-গঠন ব্যাখ্যা করার এ পদ্ধতি বর্জন করেন। তিনি বলেন (Behaviorism, পৃঃ ১৬৬):

'কয়েকজনমাত্র মনোবিজ্ঞানী সমস্যাটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। পরিতাপের বিষয় যে, অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী এমন-কি সমস্যাটা দেখতে পর্যন্ত পাননি। তাঁদের বিশ্বাস, পরীরা এসে অভ্যাসগুলো পুঁতে রেখে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, থর্ণডাইক বলেন যে, সুখ (pleasure) সফল নড়াচড়াগুলোর উপর মোহর মেরে দেয়, আর অসুখ (displeasure) নিষ্ফল নড়াচড়াগুলোকে মুছে ফেলে দেয়। আবার, অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী মস্তিষ্কের ভেতরে নতুন নতুন পথ রচনার কথা অনর্গল বলে যান, যেন সেখানে ভালকান (Vulcan)-এর একদল ক্ষুদ্রকায় চাকর আছে যারা হাতুড়ি আর বাটালি নিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের ভেতর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে নতুন নতুন নর্দমা তৈরী করছে আর পুরাতন-গুলোকে আরও গভীর করছে। এ ভাষায় সমস্যাটাকে সূত্রায়িত করলে তার সমাধান করা সম্ভব বলে আমি নিশ্চিত নই। আমি মনে করি যে, অভ্যাস-গঠনের সমগ্র প্রক্রিয়াটাকে এর চেয়ে সরল উপায়ে বিবেচনা করা সম্ভব হতে হবে, নতুবা এর সমাধান হয়তো কখনও সম্ভব হবে না। মনো-বিজ্ঞানে সমুদয় সরলীকরণ নিয়ে সাপেক্ষ অনুবর্ত প্রকল্পের আবির্ভাবের পর থেকে (এবং আমার প্রায়ই ভয় হয় যে, প্রকল্পটা সম্ভবতঃ অতি-সরল) আমি অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বাগযন্ত্রের প্রক্রিয়াগুলোকে [অর্থাৎ, অন্যেরা যাকে 'চিন্তা' বলে] এ সমস্যার উপর খাটিয়েছি।'

ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত যে, অভ্যাস-গঠনের যেসব ব্যাখ্যা সচরাচর দেওয়া হয় সেগুলো পর্যাপ্ত নয়, এবং অতি অল্প সংখ্যক মনোবিজ্ঞানীই সমস্যাটার গুরুত্ব অথবা জটিলতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এটাও আমি স্বীকার করি যে, বহু দৃষ্টান্তকেই তাঁর সাপেক্ষ অনুবর্তের সূত্রের

আওতায় ফেলা যায়। এক দৃষ্টান্তে তিনি এক শিশুর বিবরণ দিয়েছেন, যে একবার এক গরম রেডিয়েটর ধরেছিল এবং পরে দু'বছর সেটাকে এড়িয়ে চলেছিল। তিনি আরও বলেন: অভ্যাস সম্পর্কিত আমাদের পুরাতন পরিভাষা[1] যদি রাখি তাহলে [বলা যায় যে] এ দৃষ্টান্তে আমরা একটা অভ্যাস পাই যা একটিমাত্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন 'সাফল্যজনক সঞ্চলনের দৃঢ়মূল হওয়া' এবং 'নিষ্ফল সঞ্চলনের ছিন্নমূল হওয়া' নেই।" এ ধরনের দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন যে, অভ্যাস-গঠনের সমগ্র ব্যাপারটাই সাপেক্ষ অনুবর্ত নিয়ম থেকে আহরণ করা যায়। নিম্নলিখিতভাবে সে নিয়মটাকে তিনি সূত্রায়িত করেছেন (পৃঃ ১৬৮):

X-উদ্দীপক এখন R-প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করবে না; Y-উদ্দীপক R-প্রতিক্রিয়া (অসাপেক্ষ অনুবর্ত) উৎপন্ন করবে; কিন্তু যখন X-উদ্দীপক প্রথমে এবং তার একটু পরই Y (যা R উৎপন্ন করে) উপস্থিত করা হয়, তখন তার পর থেকে X, R উৎপন্ন করবে। অন্য কথায়, তার পর সর্বক্ষণের জন্য X, Y-এর স্থান দখল করে বসে।

এ নিয়মটা এত সরল, এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এত ব্যাপকভাবে সত্য যে, অষ্টাদশ শতকে পদার্থবিদেরা যেমন সবকিছুকেই মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক তেমনি এর কার্যকারিতার পরিধিকে অতিরঞ্জিত করার একটা ভয় আছে। কিন্তু যখন একে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয় তখন আমার মনে হয় যে, এর মধ্যে দুটো বিপরীতধর্মী ত্রুটি রয়েছে। প্রথমতঃ, এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে কোন অভ্যাসই গড়ে ওঠে না, যদিও এ নিয়মানুসারে গড়ে ওঠা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, এমন সব অভ্যাস আছে যেগুলো, বর্তমানে আমরা যতদূর জানতে পারি, অন্য উৎপত্তিস্থল থেকে জন্মেছে।

আগের কথাটা আগে নেওয়া যাক: 'লঙ্কা' (pepper) শব্দটা শুনলেই লোকের হাঁচি আসে না, যদিও এ নিয়মানুসারে তাই হওয়া উচিত।[2] যে

১. Habit terminology.

২. মনে হয়, ডঃ ওয়াটসনের আশা আছে যে, তিনি শিশুদেরকে লঙ্কার কৌটা (pepper boz) দেখে হাঁচি দিতে শেখাবেন, তবে সেটা তিনি এখনও করেননি। Behaviorism, পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য।

সব শব্দে সুস্বাদু খাবারের বর্ণনা থাকে সেগুলোতে মুখে পানি আসবে; ইন্দ্রিয় সুখ-ব্যঞ্জক শব্দগুলোতে সেইসব অবস্থায় (situations) কিছু কার্যফল জন্মাবে, যেসব অবস্থার ইঙ্গিত থাকে তাদের মধ্যে; কিন্তু কোন শব্দেই হাঁচি অথবা কাতুকুতুর উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া জন্মায় না। ডঃ ওয়াটসন যে ডায়্যাগ্রাম দিয়েছেন (পৃঃ ১০৬) তাতে চারটা অনুবর্ত রয়েছে—অর্থাৎ, হাঁচি, হিক্কা, চক্ষু পিটপিট করা, আর ব্যাবিনস্কি অনুবর্ত—যাদেরকে সাপেক্ষ অনুবর্তের উৎস বলে প্রতীয়মান হয় না; তবে তাতে ইঙ্গিত রয়েছে (পৃঃ ৯৯) যে, আসলে চক্ষু পিটপিট করা নিজে একটা সাপেক্ষ অনুবর্ত হতে পারে। কতকগুলো প্রতিক্রিয়া প্রতিকল্পী উদ্দীপকের সাহায্যে উৎপন্ন করা যেতে পারে, অন্যগুলো নয়—এ সত্যটার একটা সম্পূর্ণ সরল (straight-forward) ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু তেমন কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। সুতরাং সাপেক্ষ অনুবর্ত নিয়ম যেভাবে সূত্রায়িত হয়েছে তাতে এ নিয়ম অতি-ব্যাপক এবং যে সূত্র অনুসারে এর প্রয়োগক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করা যাবে সে সূত্রটা যে কি তাও পরিষ্কার নয়।

ডঃ ওয়াটসনের অভ্যাস-নিয়মের (law of habit) বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটা যদি অভ্রান্ত হয়, তাহলে সেটা হবে প্রথমটার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ; এর অভ্রান্ততা আরও অধিক সন্দেহের ব্যাপার। দাবী করা হয় যে, কোন এক শ্রেণীর ক্ষেত্রগুলোতে, যেসব ক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা যায় সেগুলো এমন এলোমেলো ক্রিয়া নয় যেগুলো থেকে সাফল্য আসে কেবল দৈবক্রমে; বরং সেগুলো এমন ক্রিয়া, 'অন্তর্দৃষ্টি' থেকে যাদের উৎপত্তি এবং এ অন্তর্দৃষ্টিতে সমস্যার দৈহিক (physical) সমাধানের সূচনা হিসাবে একটা 'মানসিক' সমাধান পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে বিশেষভাবে তাঁদের মত যাঁরা গেস্তাল-মনোবিজ্ঞান (Gestalt-psychologie) অথবা বহিরাকৃতি মনোবিজ্ঞানের প্রবক্তা। শিক্ষণ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবের আদর্শ নমুনা হিসাবে কোহ্লার-এর 'Mentality of Apes'-কে নিতে পারি। কতিপয় বানরজাতীয় প্রাণী নিয়ে কোহ্লার ১৯১৩ সালে টেনারিফে (Tenerife) গিয়েছিলেন; যুদ্ধ বাধার দরুন তাদের নিয়ে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, যার ফলে গবেষণার বিস্তর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। আমেরিকার গোলকধাঁধা ও খাঁচা সহযোগে যেসব সমস্যা উপস্থিত করেন

সেগুলো সম্পর্কে তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে, সেগুলো এরকম যে, বুদ্ধির সাহায্যে তাদের সমাধান করা 'যায় না'। হ্যাম্পটন কোর্ট গোলকধাঁধা থেকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে স্যার আইজাক নিউটনও বেরিয়ে আসতে পারতেন না। অপর দিকে, কোহ্লার তাঁর বানরদের (Apes) সামনে এমন সমস্যা উপস্থিত করেছিলেন, যেগুলোকে, তিনি যাকে 'অন্তর্দৃষ্টি' (insight) বলেন, তার দ্বারা সমাধান করা যেত। নাগালের বাইরে তিনি একটা কলা[১] ঝুলিয়ে রাখতেন এবং তার কাছাকাছি ফেলে রাখতেন কয়েকটা বাক্স—যেন শিম্পাঞ্জীগুলো বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে ফলটার নাগাল পেতে পারে। কখনও কখনও তাদেরকে কৃতকার্য হওয়ার আগে তিনটা, অথবা এমন-কি চারটা বাক্সের একটাকে আরেকটার উপর রাখতে হতো। তারপর তিনি খাঁচার ভিতরে একটা লাঠি রেখে কলাটাকে খাঁচার শিকগুলোর বাইরে রেখে দিতেন এবং বানরটা লাঠির সাহায্যে কলার নাগাল পেত। একবার সুলতান নামে তাদের (শিম্পাঞ্জীগুলোর) একটার কাছে ছিল দুটো বাঁশের লাঠি, যার প্রত্যেকটাই এত খাটো ছিল যে, তার সাহায্যে কলার নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না; কয়েকবার নিষ্ফল চেষ্টার পর একটুক্ষণ সে নীরবে চিন্তা করলো এবং তারপর সে ছোট লাঠিটাকে অন্যটার ফাঁপার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এমন একটা লাঠি তৈরী করলো যা যথেষ্ট লম্বা হলো। এর বিবরণ থেকে মনে হয় যে, প্রথমে সে কম-বেশী দৈবক্রমে দুটোকে জোড়া লাগিয়ে ফেলেছিল এবং কেবল তারপর সে বুঝতে পেরেছিল যে, সে একটা সমাধান পেয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও, দুটো লাঠিকে যে জোড়া দিয়ে একটা করা যায়, এটা বোঝার পর তার আচরণকে ওয়াটসনপন্থী বলা কঠিন: তখন আর পরীক্ষামূলক (tentative) কিছুই রইল না—বরং রইল একটা সুনিশ্চিত সাফল্য, প্রথমে প্রাকচিন্তনে এবং পরে কাজে। তার নতুন কৌশলে সে এতই আনন্দিত হলো যে, কোন কলা খাওয়ার আগে সে কয়েকটা কলা খাঁচার ভেতরে টেনে নিয়ে এল। বস্তুতঃ,

১. যাকে কোহ্লার বলেন 'লক্ষ্যবস্তু' (objective), যেহেতু পণ্ডিতসুলভ কাজের পক্ষে 'কলা' (banana) শব্দটা নিতান্ত সাধারণ। ছবিগুলো থেকে ধরা পড়ে যে, 'লক্ষ্যবস্তু'টা ছিল নিছক একটা কলা।

পুঁজিপতিরা যন্ত্রপাতি নিয়ে যে রকম আচরণ করেছে, তার আচরণও সে রকম হলো।

কোহ্লার বলেন: "প্রথম থেকেই কোন অবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করার ফলে যে রকম আচরণের উদ্ভব ঘটে এবং যে রকম আচরণের উদ্ভব এভাবে ঘটে না, আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা এ দুটোর মধ্যে কড়াকড়িভাবে একটা ভেদরেখা টানতে পারি। কেবল প্রথমটার ক্ষেত্রেই আমরা অন্তর্দৃষ্টির কথা বলি এবং প্রাণীদের কেবল সেই ব্যবহার আমাদের কাছে বুদ্ধিসঞ্জাত বলে মনে হয়, যার মধ্যে প্রথম থেকেই অবস্থার স্বরূপ (the lie of the land) লক্ষ্য করা হয় এবং সহজ ও ধারাবাহিকভাবে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর থেকেই এ বৈশিষ্ট্যটা আসে: "কার্য-ক্ষেত্রের গোটা নকশাটার আলোকে একটা পূর্ণ সমাধানের আবির্ভাব-কেই অন্তর্দৃষ্টির মানদণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।"

কোহ্লার বলেন যে, সমস্যার সত্যিকার সমাধান পৌনঃপুনিকতার ফলে উন্নত হয় না; প্রথমবারেই সমাধান ত্রুটিমুক্ত (perfect) এবং পৌনঃপুনি-কতার ফলে যদি কিছু হয় তাহলে সেটা কেবল এই যে, তাতে করে আবি-ষ্কারের উত্তেজনা ক্ষীণ হয়ে আসার ফলে সে সমাধানের বরং ক্ষতি হয়। কোহ্লার তাঁর শিম্পাঞ্জীগুলোর প্রচেষ্টার যে বিবরণ দেন তাতে গোলক-ধাঁধার ভেতরে ঢোকানো ইঁদুরগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধারণা জন্মে; এবং তার ফলে এ সিদ্ধান্ত না করে উপায় নেই যে, আমেরিকায় যে গবেষণা হয়েছে সে গবেষণা এ জন্যে কতকটা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে যে সেখানে কেবল এক ধরনের সমস্যা থেকে এক ধরনের সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে এবং সে সিদ্ধান্ত-গুলোকে প্রাণীর শিক্ষণ-সংক্রান্ত সমুদয় সমস্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়েছে। মনে হয় যে, শিক্ষণের দুই উপায় আছে— তার একটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা, আরেকটা হচ্ছে কোহ্লার যাকে 'অন্তর্দৃষ্টি' বলেন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষণ অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্ভব; যদিও, যতদূর জানা যায়, অমেরুদণ্ডীর ক্ষেত্রে তা কদাচিৎ সম্ভব। পক্ষান্তরে, বনমানুষের (anthropoid apes) চেয়ে নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে 'অন্তর্দৃষ্টির' মাধ্যমে শিক্ষণ আছে বলে জানা নেই, যদিও কুকুর ও ইঁদুরের উপর আরও গবেষণা চালালে এ জাতীয় শিক্ষণ তাদের মধ্যে আছে বলে ধরা পড়বেনা বলাটা গুরুতর

হঠকারিতা হবে। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে কিছু প্রাণী—যেমন, হাতী—সম্ভবতঃ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু তাদের নিয়ে গবেষণা করার মধ্যে প্রায়োগিক অসুবিধা ও ব্যয় এত বেশী যে আগামী কিছুকাল পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই জানার সম্ভাবনা নেই। সে যাই হোক, কোহ্‌লারের গ্রন্থে আসল সমস্যাটা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনির্দিষ্টভাবে ধরা পড়েছে: সেটা হচ্ছে সাপেক্ষ অনুবর্তের বিরুদ্ধ হিসাবে অন্তর্দৃষ্টির ব্যাখ্যা।

প্রথমে নিছক আচরণের ভাষায় সমস্যাটা বর্ণনা করলে তার স্বরূপ যা দাঁড়ায় সে বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণায় আসা যাক। একটা কলার যথেষ্ট কাছাকাছি থাকলে ক্ষুধার্ত বানর সেইসব ক্রিয়া করবে, অভ্যস্ত পরিবেশে যে-সব ক্রিয়া সম্পাদনের ফলে সে পূর্বে কলা পেতে সক্ষম হয়েছে। এটুকু পর্যন্ত, একথা ওয়াটসনের সঙ্গে যেমন তেমনি থর্নডাইকের সঙ্গেও বেশ খাপ খায়। কিন্তু এই পরিচিত ক্রিয়াগুলো নিষ্ফল হলে—যদি প্রাণীটা অনেক দিন খাদ্যহীন থেকে থাকে, স্বাস্থ্য যদি তার ভাল হয় এবং যদি সে নিতান্ত শ্রান্ত না হয়, তাহলে সে এমন সব ক্রিয়া করতে অগ্রসর হবে যেগুলো ইতিপূর্বে কখনও কলা এনে উপস্থিত করেনি। ওয়াটসনকে অনুসরণ করতে চাইলে কেউ মনে করতে পারেন যে, এই নতুন ক্রিয়াগুলোর কতকগুলো অংশ রয়েছে, যাদের প্রতিটি ইতিপূর্বে কখনও এমন একটা কার্যধারার (series) অঙ্গ হিসাবে ঘটেছে যার সমাপ্তি ঘটেছে কলা-প্রাপ্তির মধ্যে। অথবা কেউ মনে করতে পারেন—যেমন থর্নডাইক মনে করেন বলে আমার বিশ্বাস—যে, এই হতবুদ্ধিকর দশাপ্রাপ্ত প্রাণীর ক্রিয়াগুলো উদ্দেশ্যহীন (random) ক্রিয়া, যার ফলে সমাধান আসে নিছক দৈবক্রমে। কিন্তু এমনকি প্রথম প্রকল্পেও দৈবের উপাদান বিবেচনাযোগ্য। ধরা যাক, পূর্বে কোন এক সময় ক, খ, গ, ঘ, এই ক্রিয়াগুলোর প্রত্যেকটাই এমন একটা অনুক্রমের (series) অংশ হিসাবে সম্পন্ন হয়েছে, যার সমাপ্তি ঘটেছে সার্থকতার মধ্যে, কিন্তু এখন প্রথমবারের মত তাদের সবকটাকেই এক সঙ্গে এবং সঠিক ক্রমানুসারে সম্পন্ন করতে হচ্ছে। একথা অতি স্পষ্ট যে, এ ক্রিয়াগুলো কেবল যদি দৈবক্রমে সংযুক্ত হয়, তাহলে প্রাণীটা নেহাত ভাগ্যবান না হলে ক্ষুধাজনিত কারণে মরে যাওয়ার আগে তাদের সবগুলোকে সে সঠিক ক্রমানুসারে সম্পাদন করতে পারবে না।

কিন্তু কোহ্‌লারের মতে, তাঁর শিম্পাঞ্জীগুলোকে যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, তারা 'দৈবলব্ধ অংশ দিয়ে তৈরী কোন সমাধান-সমষ্টি'[১] খুঁজে পায় নি। তিনি বলেন (পৃঃ ১৯৯-২০০) :

"এটা নিশ্চয়ই শিম্পাঞ্জীর কোন বৈশিষ্ট্য নয় যে, তাকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে শুরু করলে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে নড়াচড়া শুরু করবে, যার সঙ্গে আরও অন্যান্য জিনিস মিলে একটা অপ্রকৃত (non-genuine) সমাধানের উৎপত্তি ঘটবে। খুব কদাচিৎ তাকে এমন কোন প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়, যাকে পরিবেশের তুলনায় দৈবিক (accidental) বলে মনে না করে উপায় নেই (তার আগ্রহকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে অন্য কোন দিকে সরিয়ে নিলে অবশ্য অন্য কথা)। যতক্ষণ তার প্রচেষ্টা লক্ষ্যবস্তুর উপর নিবদ্ধ ততক্ষণ (অনুরূপ পরিবেশে মানুষের মত) তার আচরণের প্রভেদযোগ্য সমুদয় পর্যায়গুলোই সমাধানের পূর্ণ প্রচেষ্টা বলে মনে হতে চায়, 'কোনটাই' আকস্মিকভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ-করা অংশ থেকে উৎপন্ন বলে প্রতীয়মান হয় না। যে সমাধানটা শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার ক্ষেত্রে একথা সবচেয়ে বেশী সত্য। সত্য বটে যে, হতবুদ্ধিতা বা সুস্থিরতার মধ্যে (প্রায় ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করে) কিছু সময় কাটাবার পর সে সমাধান উৎপন্ন হয়, কিন্তু আসল বিশ্বাসজনক ক্ষেত্রগুলোতে সমাধানটা কখনও অন্ধ তাড়নার বিশৃঙ্খলার মধ্যে উৎপন্ন হয় না। সেটা এক অবিচ্ছিন্ন অপ্রতিহত ক্রিয়া। 'কেবল' দর্শকের 'কল্পনাই' যার অংশ-গুলোকে পৃথক করতে পারে ; বাস্তবে সেগুলো আলাদাভাবে দেখা দেয় 'না'। কিন্তু এতগুলো 'প্রকৃত' ক্ষেত্র, যাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে—সেগুলোতে কেবল যে দৈবক্রমে সমাধানগুলো অখণ্ডভাবে দেখা দেবে, এরূপ কল্পনা গ্রহণযোগ্য নয়।"

সুতরাং একে আমরা একটা নিরীক্ষিত সত্য বলে মনে করতে পারি যে, যে ধরনের মতবাদ নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম তাকে সমগ্র আলোচ্য-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরলে তার বিরুদ্ধে, বাহ্য (overt) আচরণের বেলায়, দুটো আপত্তি আছে। প্রথম আপত্তিটা এই যে, কোন এক শ্রেণীর ক্ষেত্র-গুলোতে দৈব-সংক্রান্ত মতবাদ (doctrine of chances) অনুসারে সমাধানটা

১. "a composition of the solutions out of chance parts."

যত শীঘ্র দেখা দেওয়া উচিত তার চেয়ে আগে দেখা দেয়; দ্বিতীয়টা এই যে, সমাধানটা দেখা দেয় অখণ্ডরূপে, অর্থাৎ, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে কাটাবার পর প্রাণীটা সহজ ও দ্বিধাহীনভাবে সঠিক (অর্থাৎ সমাধান পাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত) কার্যক্রম সম্পাদন করে।

প্রাণীর ক্ষেত্রে যে রকম উপযুক্ত উপাত্ত পাওয়া যায়, মানুষের ক্ষেত্রে সে রকম পাওয়া যায় না। মানুষ-মায়েরা চাইবেন না যে তাঁদের ছেলে-মেয়ের প্রথমে উপবাস করুক এবং তারপর কোন কক্ষে আবদ্ধ থাকুক, যেখানে একটা কলা থাকবে, যাকে পেতে হলে টেবিলের উপর চেয়ার এবং চেয়ারের উপর একটা পাদানি রাখতে হবে এবং কোন হাড় না ভেঙ্গে তার উপর উঠতে হবে এটাও তাঁরা পছন্দ করবেন না যে, তাদেরকে (ছেলেমেয়েদেরকে) কোন হ্যাম্পটন কোর্ট গোলকধাঁধাঁর মাঝখানে ফেলা হবে এবং তার বাইরে তাদের খাবার ঠাণ্ডা হতে থাকবে। হয়তো কালক্রমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজবন্দীদের ছেলেমেয়ের উপর এসব পরীক্ষা চালানো হবে, কিন্তু এটা সৌভাগ্যের কথা যে, এ পর্যন্ত কর্মকর্তারা (authorities) বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে যথেষ্ট কৌতুহল দেখাচ্ছেন না। সে যাই হোক, এটা বলা যায় যে, ওয়াটসন ও কোহ্‌লার মানুষের শিক্ষণরীতির যে দু'রকম বর্ণনা দিয়েছেন তাদের উভয়টাই সত্য। আমার মনে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, এক-একটা করে শব্দ আয়ত্ত করা পর্যন্ত কথা বলতে শেখা হয় ওয়াটসনীয় পদ্ধতিতে: পরবর্তী পর্যায়ে প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন প্রাই চলে অস্ফুট স্বরে, কিন্তু প্রথমে তা চলে প্রত্যক্ষগম্যভাবে এবং, কিছু সংখ্যক বালকবালিকার ক্ষেত্রে, তাদের বচনরীতি সম্পূর্ণ নির্ভুল না হওয়া পর্যন্ত। তবে যে অখণ্ড উপলব্ধির উপর গেস্তাল মনোবিজ্ঞান জোর দেয় তাকে বাদ দিয়ে বাক্য উচ্চারণ ব্যাখ্যা করা এমনিতেই আরও কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোহ্‌লারের শিম্পাঞ্জীগুলোর মধ্যে যে ধরনের আকস্মিক উপলব্ধির (illumination) উদয় হয়েছিল তা এমন একটা ব্যাপার যে, শিক্ষণের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে, তার সঙ্গে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। কিছু কাল হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে অন্ধকারে হাতড়াবার পর একদিন স্কুলের ছাত্র বুঝতে পারে বীজগণিত জিনিসটা কি। বই লেখার ক্ষেত্রে আমার নিজের অভিজ্ঞতা—আমি জানি সেটা বেশ সাধারণ তবে কোনক্রমেই সার্বজনীন নয়—এই যে, কিছু সময় ধরে আমি অনিশ্চিতভাবে

হাতড়ে বেড়াই এবং দ্বিধার মধ্যে থাকি এবং তারপর হঠাৎ করে আমি গোটা বইটাই দেখতে পাই এবং যেন কোন সম্পূর্ণ তৈরী পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করছি, এমনভাবে সেটাকে লিখে ফেলি।

এসব বিষয়কে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের আওতার মধ্যে আনতে হলে সেটা করতে হবে 'অপ্রত্যক্ষ' (implicit) আচরণের মাধ্যমে। আত্ম-আলাপের আকারে ওয়াটসন এর অনেক প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু বানরদের (apes) ক্ষেত্রে এ ঠিক এ আকার ধারণ করতে পারে না। এবং 'অপ্রত্যক্ষ' আচরণকে আমরা 'চিন্তা' বলি বা না বলি, এর সাফল্যের ব্যাখ্যার জন্য কোন একটা মতবাদ (theory) দরকার। সম্ভবতঃ ওয়াটসনের পথ অবলম্বন করে এ রকম একটা মতবাদ গড়ে তোলা যায়, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এ পর্যন্ত তা গড়ে তোলা হয়নি। কোহ্‌লারের পর্যবেক্ষণের ফলে যে ধরনের ব্যাপার আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত আচরণবাদীদের মতবাদ (thesis) প্রমাণিত হয়েছে বলতে পারিনে। পরবর্তী এক পর্যায়ে এ বিষয় নিয়ে আবার আমরা আলোচনা করবো; এখনকার মতো মন খোলা রাখা যাক।

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা

ভাষা সম্পর্কে গতানুগতিক দর্শনে[১] যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন-অনুশীলন হয়নি। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, 'শব্দ' আছে চিন্তা (thoughts) প্রকাশ করার জন্যে; সাধারণতঃ 'শব্দে'র আছে 'বিষয়' (objects), শব্দে যা বোঝায় (mean)। মনে করা হয়েছিল যে, শব্দে যা বোঝায়, ভাষার সাহায্যে সরাসরিভাবে তা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এবং শব্দের যে দুটো বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করা হয়—চিন্তা 'প্রকাশ' (express) করা এবং বস্তু 'বোঝানো'—এর কোনটাকেই যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। প্রায় ক্ষেত্রেই, দার্শনিকেরা যখন শব্দ দিয়ে যেসব বস্তু বোঝানো হয় সেগুলো সম্পর্কে ভাবতে চেয়েছেন তখন তাঁরা আসলে ভেবেছেন শব্দ সম্পর্কেই এবং শব্দ সম্পর্কে ভাবতে এসে তাঁরা, অল্প-বিস্তর অজ্ঞাতসারেই, ভুল করে মনে করেছেন যে, কোন শব্দ একটা একক সত্তা; আসলে এ যে অল্প-বিস্তর সদৃশ ঘটনার সমষ্টি, সেটা তাঁরা মনে করেননি। ঐতিহ্যগত দর্শনে যা মন্দ, ভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে চিন্তা না করতে পারার ব্যর্থতা তার অনেকখানির জন্য দায়ী। আমার মতে, 'অর্থ' (meaning) সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা জন্মাবে কেবল যদি আমরা মনে করি যে, ভাষা একটা দৈহিক অভ্যাস যা আমরা শিখি ফুটবল খেলা বা সাইকেল চালানো শেখার মত। আমি মনে করি যে, ডঃ ওয়াটসনের মত ভাষাকে কেবল এভাবে দেখলেই সে দেখা সন্তোষজনক হবে। বস্তুতঃ, ভাষাতত্ত্বকেই আচরণবাদের স্বপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তিগুলোর অন্যতম বলে আমি মনে করতে চাই।

জন্তুর তুলনায় মানুষের নানাবিধ বিশেষ সুবিধা আছে—যেমন আগুন, কাপড়-চোপড়, কৃষি এবং যন্ত্রপাতি—গৃহপালিত পশু নয়, কারণ সেগুলো পিঁপড়ারও আছে। কিন্তু এগুলোর যে কোনটার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে

১. Traditional philosophy.

ভাষা। কিভাবে বা কখন ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল, অথবা শিম্পাঞ্জীরা কেন কথা বলে না, সেটা জানা নেই। লেখা বা বলা ভাষার অধিকতর পুরাতন রূপ কিনা, সেটা জানা আছে বলেও আমার সন্দেহ। ক্রোম্যাগনন মানবেরা পর্বত-গুহায় যেসব চিত্র তৈরী করেছিল, হতে পারে যে, সেগুলোর সাহায্যে তারা কোন অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছিল এবং সেগুলো এক ধরনের লেখাও হতে পারে। এটা জানা আছে যে, চিত্র থেকে লেখার উৎপত্তি, কারণ সেটা ঘটেছিল ঐতিহাসিক কালে; কিন্তু বিবরণ বা আদেশ দেওয়ার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগে চিত্রের ব্যবহার কতদূর হয়েছিল, তা জানা নেই। কথিত ভাষার প্রসঙ্গে আসতে গেলে, প্রাণীর চিৎকার থেকে এর পার্থক্য এই যে, এর সাহায্যে কেবল আবেগ প্রকাশিত হয় না। ভয়, অথবা খাদ্য খুঁজে পাওয়ার আনন্দ, ইত্যাদি কারণে প্রাণীরা চীৎকার দেয় এবং এই চীৎকারের সাহায্যে তারা পরস্পরের কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু আবেগ—শুধু তাই নয়, যে আবেগ তারা সত্যিই অনুভব করছে, কেবল সেই আবেগ—ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশের কোন উপায় তাদের আছে বলে মনে হয় না। বর্ণনা দেওয়ার কাজের মত কিছু তারা করতে পারে এমন কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং, এটা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, ভাষা মানুষেরই একটা বিশেষ সুবিধা এবং যে-সব অভ্যাস থাকার দরুন আমরা 'নির্বাক' প্রাণীজগতের চেয়ে উন্নততর তাদের মধ্যে ভাষাই সম্ভবতঃ প্রধান।

ভাষা নিয়ে পর্যালোচনা আরম্ভ করার সময় তিনটা বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথমে, ভৌত (physical) ঘটনা হিসাবে শব্দ কি জিনিস; দ্বিতীয়তঃ, কি অবস্থায় পড়ে আমরা কোন একটা শব্দ ব্যবহার করি; তৃতীয়তঃ, আমরা যখন কোন শব্দ শুনি বা দেখি তখন তার কার্যফল কি কি। তবে, এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা শব্দ থেকে বাক্যের প্রসঙ্গে চলে যাব এবং এইভাবে নতুন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবো যাদের সমাধানের জন্য সম্ভবতঃ গেস্তাল-মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন হবে।

সাধারণ শব্দগুলো চার প্রকারের; কথিত, শ্রুত, লিখিত ও পঠিত। এটা অবশ্য অনেকাংশে একটা প্রচলের (convention) ব্যাপার যে, অন্য কোন প্রকারের শব্দ আমরা ব্যবহার করিনে। কালা ও বোবাদের ভাষা বলে এক জাতীয় ভাষা আছে; ফরাসী লোকের স্কন্ধ-উত্তোলন একটা শব্দ (word);

বস্তুতঃ সমাজে প্রচলিত হয়ে গেলে যেকোন প্রকার বাহ্য-প্রত্যক্ষণযোগ্য দেহ সঞ্চালনই একটা শব্দে পরিণত হতে পারে। কিন্তু যে প্রচল কথিত ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছে তার একটা উপযুক্ত ভিত্তি আছে, কারণ এত তাড়াতাড়ি বা পেশীর এত সামান্য ব্যবহারের সাহায্যে বোধগম্য পার্থক্য-বিশিষ্ট কতকগুলো শব্দ উৎপাদনের আর কোন উপায় নেই। রাজনীতিকদেরকে যদি বোবা-কালার ভাষা (deaf-and-dumb language) ব্যবহার করতে হতো তাহলে তাঁদের পক্ষে জনসভায় বক্তৃতা খুবই বিরক্তিকর হতো এবং সে কাজটা খুবই ক্লান্তিকর হতো যদি স্কন্ধ-উত্তোলনে পেশীর ব্যবহার যে পরিমাণে হয় সকল শব্দ উচ্চারণেই সে পরিমাণে পেশীর ব্যবহার আবশ্যক হতো। বলা, শোনা, লেখা এবং পড়া ছাড়া অন্য সব রকম ভাষার প্রসঙ্গ আমি এড়িয়ে যাব, কারণ অন্যগুলো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের মধ্যে কোন বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যাও নেই।

বাগযন্ত্র ও মুখের মধ্যে কতকগুলো আনুক্রমিক কম্পন যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাদের নিয়ে গঠিত হয় একটা কথিত শব্দ। এ জাতীয় কম্পনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট দুটো অনুক্রম একই শব্দের দৃষ্টান্ত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, যেহেতু ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট দুই শব্দের একই রকম উচ্চারণ হতে পারে; কিন্তু এ ধরনের দুটো অনুক্রমের মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য না থাকে তাহলে তারা একই শব্দের দৃষ্টান্ত হতে পারে না। (একটিমাত্র ভাষার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ করে রাখছি।) যেমন, একটা কথিত শব্দ—ধরা যাক সেটা 'dog'—কতকগুলো ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট কম্পনের অনুক্রমের সমষ্টি এবং শব্দটা যতবার উচ্চারিত হয় সে সমষ্টির মধ্যে ততগুলি অংশ (member) থাকে। কোন উচ্চারণকে 'dog' শব্দটার দৃষ্টান্ত হতে হলে সাদৃশ্যের মাত্রা কি হবে, তা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কতক লোকে বলে 'dawg' এবং এটাকে অবশ্যই ছাড়পত্র দিতে হবে। কোন জার্মানবাসী বলতে পারে 'tok' এবং তখন আমাদের সন্দেহ করতে শুরু করা উচিত। প্রান্তবর্তী ক্ষেত্রগুলোতে আমরা কোন শব্দ উচ্চারিত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারিনে। লম্ফ দেওয়া অথবা এক পায়ে লাফানো (hopping) অথবা দৌড়ানো ইত্যাদির মত একটা কথিত শব্দও এক রকমের দৈহিক আচরণ যার কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। একটা লোক দৌড়াচ্ছে, না

হাঁটছে ? দৌড়-প্রতিযোগিতায় সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা বিচারকের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার। তেমনি, এমন কিছু দৃষ্টান্ত থাকতে পারে যে-গুলোতে কোন ব্যক্তি 'dog' বললো না 'dock' বললো, সে সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় আসা সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায় যে, একটা কথিত শব্দ একই সঙ্গে সাধারণ এবং কতক পরিমাণে অনির্দিষ্ট (vague)।

কথিত ও শ্রুত শব্দের সম্বন্ধ আমরা সচরাচর ধরেই নেই। "আমি যা বলছি তা আপনি শুনতে পারছেন কি ?"—আমরা জিজ্ঞাসা করি এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বলেন "হ্যাঁ"। এটা অবশ্যই একটা বিভ্রান্তি মাত্র এবং চিন্তাশূন্যভাবে জগতের দিকে তাকানোর ফলে যে সরল বাস্তববাদের উদ্ভব ঘটে, এ তারই একটা অংশ। যা বলা হয় তা আমরা কখনও শুনিনে ; যা বলা হয় তার সঙ্গে জটিল কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ কিছু-একটা আমরা শুনি। প্রথমে আছে বক্তার মুখ থেকে আরম্ভ করে শ্রোতার কান পর্যন্ত প্রসারিত শব্দতরঙ্গের একটা নিছক ভৌত প্রক্রিয়া, তারপর কান ও স্নায়ুর মধ্যে একটা জটিল প্রক্রিয়া এবং তারপর মস্তিষ্কের ভেতরে একটা ঘটনা। আমাদের শব্দ শোনার সঙ্গে এ ঘটনার যোগাযোগ আছে এবং সে যোগাযোগের ধরন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হবে পরে ; তবে, আর যাই হোক না কেন, সে ঘটনাটা আমাদের শব্দ শোনার সঙ্গে যুগপৎ ঘটে। এখানে আমরা পাই কথিত ও শ্রুত শব্দের মধ্যবর্তী ভৌত কার্য-কারণ সম্বন্ধ। তবে, এর চেয়েও মনস্তাত্ত্বিক ধরনের আরেকটা সম্বন্ধ রয়েছে। কোন ব্যক্তি যখন কোন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সে তা শোনেও ; ফলতঃ, কথা বলতে জানে, এরূপ যে কোন ব্যক্তির জন্যই কথিত ও শ্রুত শব্দের মধ্যে একটা নিবিড় অনুষঙ্গ গড়ে ওঠে। কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তি তার নিজ ভাষায় যে কোন শব্দ শুনতে পেলে সেটা উচ্চারণ করতেও পারে ; কাজেই অনুষঙ্গটা উভয় দিকে একই রকম ভালভাবে কাজ করে। এই নিবিড় অনুষঙ্গ থাকার দরুনই সাধারণ মানুষ কথিত ও শ্রুত শব্দকে অভিন্ন মনে করে, যদিও দুটোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য।

ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্য যাতে সার্থক হয় তার জন্য শ্রুত ও কথিত শব্দের অভিন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, সেটা সম্ভবও নয় ; তবে এটা দরকার যে, কোন লোক যখন ভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করবে তখন শ্রুত শব্দগুলো ভিন্ন হবে এবং যখন দু'বার সে একই শব্দ উচ্চারণ করবে তখন সেই দু'বারই শ্রুত শব্দটা প্রায়

এক হবে। এর প্রথমটা নির্ভর করে কানের সংবেদনশীলতা এবং বক্তার কাছ থেকে তার দূরত্বের উপর; উচ্চারণকারী থেকে অতিরিক্ত দূরে থাকলে দুটো শব্দ যদি কিছুটা এক রকম হয় তাহলে তাদের পার্থক্য আমরা ধরতে পারি না। দ্বিতীয় শর্তটা নির্ভর করে ভৌত অবস্থাদির (physical conditions) সমরূপতার উপর এবং সকল সাধারণ অবস্থায়ই সে শর্ত পালন করা হয়। কিন্তু বক্তার চারপাশে যদি এমন ধরনের যন্ত্রপাতি থাকে যেগুলো কতকগুলো স্বরের (notes) ক্ষেত্রে অনুনাদী হয় এবং অন্য কতকগুলো স্বরের ক্ষেত্রে হয় না, তাহলে তাঁর কণ্ঠস্বরের কতকগুলো ধ্বনিবৈচিত্র্য ধরা পড়তে পারে এবং অন্যগুলো হারিয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তিনি যদি একই শব্দ দুটো ভিন্ন স্বরভঙ্গীতে উচ্চারণ করেন তাহলে শ্রোতা সে অভিন্নতা ধরতে সম্পূর্ণ অক্ষম হতে পারে। কাজেই কথা বলার কার্যকারিতা কতকগুলো ভৌত শর্তের উপর নির্ভর করে। তবে, এগুলোকে আমরা স্বীকার করে নেব, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অধিকতর মনোবৈজ্ঞানিক অংশগুলোতে এসে পৌঁছাতে পারি।

কথিত শব্দ থেকে লিখিত শব্দের পার্থক্য এই যে, লিখিত শব্দগুলো জড় সংগঠন (material structures)। একটা কথিত শব্দ ভৌত জগতের একটা প্রক্রিয়া, যার মধ্যে অপরিহার্যভাবে একটা কাল-বিন্যাস (time-order) আছে; একটা লিখিত শব্দ জড়-খণ্ডের একটা অনুক্রম, যার মধ্যে অপরিহার্যভাবে একটা দেশ-বিন্যাস আছে। 'জড়' বলতে আমরা কি বোঝাই, সে প্রশ্ন নিয়ে পরবর্তী এক পর্যায়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। এখনকার মতো এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যে সব প্রক্রিয়া থেকে কথিত শব্দ উৎপন্ন, তাদের থেকে যে সব জড় সংগঠন থেকে লিখিত শব্দ উৎপন্ন তাদের পার্থক্য এই যে, এগুলো দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে—কখনো কখনও হাজার হাজার বছর পর্যন্ত; এ ছাড়া, একই প্রতিবেশে তারা আটকে থাকে না, বরং দুনিয়া জুড়ে তাদেরকে ভ্রমণ করানো যায়। বলার তুলনায় লেখার এই হচ্ছে দুটো বড়ো সুবিধা। অন্ততঃ, সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত তাই হয়েছে। কিন্তু রেডিও আসার পর থেকে লেখা তার প্রাধান্য হারাতে শুরু করেছে: সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা জনসমষ্টির কাছে এখন এক ব্যক্তি কথা বলতে পারে। এমন কি স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও, বলা লেখার সমান হ

উঠতে পারে। সম্ভবতঃ, আইনের দলিলপত্রের স্থলে আমরা পাব গ্রামোফোন রেকর্ড, যার মধ্যে চুক্তির বিভিন্ন পক্ষ তাদের কণ্ঠ স্বাক্ষর (voice signatures) রাখবে। সম্ভবতঃ, ওয়েলস্‌-এর 'When the Speaker Awakens'-এ যেমন আছে, বই আর ছাপা হবে না, কেবল গ্রামোফোনের জন্যে গুছিয়ে রাখা হবে। সে ক্ষেত্রে লেখার প্রয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে। সে যাই হোক, এ সব ভবিষ্যৎ-চিন্তা ছেড়ে এবার আজকের জগতে ফিরে আসা যাক।

লিখিত বা মুদ্রিত শব্দের বিপরীতে, পঠিত শব্দ ঠিক কথিত বা শ্রুত শব্দের মতোই ক্ষণস্থায়ী। কোন লিখিত শব্দের উপর আলো পড়লে এবং কোন স্বাভাবিক চোখের সঙ্গে তার উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হলে, চোখের উপর তার একটা জটিল প্রতিক্রিয়া ঘটে; এ প্রক্রিয়ার যে অংশটুকু চোখের বাইরে ঘটে তা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয় আলোক-বিজ্ঞানে এবং যে অংশটুকু চোখের ভেতরে ঘটে তা শরীরবৃত্তীয় আলোকতত্ত্বের (physiological optics) অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও আরেকটা প্রক্রিয়া ঘটে, প্রথমে অক্ষিস্নায়ুতে এবং পরে মস্তিষ্কে; মস্তিষ্কের ভেতরকার প্রক্রিয়া ও দৃষ্টি যুগপৎ ঘটে। দৃষ্টির সঙ্গে এর আর কি সম্বন্ধ আছে সে প্রশ্ন নিয়ে অনেক দার্শনিক বিতর্ক হয়ে গেছে; পরবর্তী এক পর্যায়ে এ প্রসঙ্গে আমরা ফিরে আসবো। লেখার কারণিক ফলপ্রসূতার কথা বলতে গেলে, বিষয়টার সার কথা এই যে, লেখা থেকে কতকগুলো অর্ধস্থায়ী জড় সংগঠন উৎপন্ন হয় যেগুলো, তাদের গোটা আয়ুষ্কাল ধরে, উপযুক্তভাবে স্থাপিত সমস্ত স্বাভাবিক চোখের উপর এমনসব ফলাফল উৎপন্ন করে, তাদের সঙ্গে যেগুলোর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে; এবং বলার ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন লিখিত শব্দ থেকে বিভিন্ন পঠিত শব্দ পাওয়া যায় এবং একটা শব্দ দু'বার লিখিত হলে তার ফলে একই পঠিত শব্দ পাওয়া যায়—এবং এখানেও পরিষ্কার সীমাবদ্ধতার মধ্যে সমস্তটা ঘটে।

ভাষার জড় (physical) দিকটা প্রায়ই অন্যায়ভাবে অবহেলিত হয়; তবে তার সম্পর্কে এ পর্যন্তই। এখন আমি মানসিক (psychological) দিকটাতে আসছি, যে দিকটাই এ অধ্যায়ে আমাদের প্রকৃত আলোচ্য বিষয়।

শব্দের বিপরীতে বাক্য নিয়ে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তাদের বাদ দিয়ে, যে দুটো প্রশ্নের উত্তর আমাদের দেওয়া দরকার তারা হচ্ছেঃ প্রথমে,

কোন শব্দ শোনার ফলে কি ধরনের আচরণ উদ্রিক্ত হয়? এবং দ্বিতীয়তঃ, কোন শব্দ উচ্চারণ করার যে আচরণ, কোন্ ধরনের অবস্থা আমাদের মধ্যে সে আচরণের উদ্রেক করে? প্রশ্নগুলোকে আমি এভাবে ক্রমবদ্ধ করছি, কারণ ছেলেমেয়েরা নিজে শব্দ ব্যবহার করতে শেখার আগে শেখে অন্যের ব্যবহৃত শব্দের উত্তরে প্রতিক্রিয়া করতে। আপত্তি উঠতে পারে যে কোন জাতির ইতিহাসে, অন্ততঃ এক সেকেণ্ডের অংশবিশেষের ব্যবধানে, প্রথম কথিত শব্দটা অবশ্যই প্রথম শ্রুত শব্দের আগে এসেছে। কিন্তু কথাটা খুব প্রাসঙ্গিক নয়, সংশয়াতীতভাবে সত্যও নয়। শ্রোতার কাছে কোন একটা ধ্বনির (noise) একটা অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু উচ্চারণকারীর নিকট নয়; সেক্ষেত্রে এটা একটা শ্রুত শব্দ, কথিত শব্দ নয়। ('অর্থ' [meaning] দ্বারা আমি কি বুঝাই, শীঘ্রই আমি তা ব্যাখ্যা করবো।) ফ্রাইডের পায়ের ছাপের একটা 'অর্থ' ছিল রবিনসন ক্রুসোর কাছে, কিন্তু ফ্রাইডের কাছে নয়। সেটা যাই হোক, নৃতত্ত্বের যে কল্পনামূলক অংশগুলো এখানে এসে পড়তে পারে সেগুলো এড়িয়ে গেলেই এবং আজকের দিনের মানবশিশুর মধ্যে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটা যে ভাবে ধরা পড়ে সেটা নিয়ে আলোচনা করলেই আমরা বরং ভাল করবো। আর আমরা যতদূর জানি, মানবশিশুর মধ্যে নিজে শব্দ উচ্চারণ করতে পারার শক্তির অনেক আগেই আসে অন্যের উচ্চারিত শব্দের উত্তরে প্রতিক্রিয়া।

শিশু শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে, অন্য যে কোন দৈহিক অনুষঙ্গ-প্রক্রিয়া সে যেভাবে শেখে ঠিক সেইভাবে। তাকে তার বোতলটা দেওয়ার সময় প্রতিবারই যদি আপনি 'বোতল' শব্দটা উচ্চারণ করেন, তাহলে অল্প দিনের মধ্যেই, একটা সীমার মধ্যে, আগে বোতল দর্শনে সে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করতো, 'বোতল' শব্দটা শুনলে সেইভাবে সে প্রতিক্রিয়া করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে অনুষঙ্গ নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম, এ তারই একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। অনুষঙ্গটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই পিতামাতা বলেন যে, শিশু 'বোতল' শব্দটা 'বুঝতে' পারে, অথবা শব্দটাতে কি 'বোঝায়' তা সে জানে। অবশ্য, প্রকৃত বোতল যে সব কার্য (effects) উৎপাদন করে, শব্দটাতে তার 'সবগুলো' উৎপন্ন হয় না। শব্দটা মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি প্রয়োগ করে না, পুষ্টি যোগায় না, শিশুর মাথায় লেগেও লাফিয়ে উঠতে পারে না।

শব্দ ও বস্তু উভয় থেকেই যে কার্যগুলো উৎপন্ন হয় সেগুলো নির্ভর করে অনুষঙ্গ-নিয়ম, অথবা "সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া" অথবা "শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া"র উপর। এগুলোকে বলা যায় 'আনুষঙ্গিক' (associative) কার্য অথবা 'স্মৃতিগত' (Mnemic) কার্য—পরবর্তী নামটা গৃহীত হয়েছে সেমনের (Semon) বই[১] 'Mneme' থেকে, যেখানে স্মৃতির অনুরূপ সকল বিষয়কে তিনি এমন এক নিয়মের আওতায় এনেছেন, অনুষঙ্গ-নিয়ম বা "সাপেক্ষ অনুবর্ত" থেকে কার্যতঃ যা পৃথক নয়।

আলোচ্য কার্যফলগুলোর শ্রেণী সম্পর্কে আর একটু নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব। কোন জড়বস্তু এমন একটা কেন্দ্র যা থেকে নানা রকমের কার্য-পরম্পরা বেরিয়ে আসে: বস্তুটা যদি জন স্মিথের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় তাহলে যে-সব কার্যকারণ পরম্পরা এর থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের একটার মধ্যে প্রথমে থাকবে সে বস্তু থেকে জন স্মিথের চক্ষু পর্যন্ত সঞ্চারমান আলোক-তরঙ্গ (অথবা আলোক-কণা)[২], তারপর তার চোখ ও অক্ষিস্নায়ুস্থ ঘটনাবলী, তারপর তার মস্তিষ্কের ভেতরকার ঘটনাবলী এবং তারপর (সম্ভবতঃ) তার একটা প্রতিক্রিয়া। এখন, স্মৃতিগত কার্যফলগুলো থাকে কেবল জীবন্ত তন্তুর মধ্যস্থ ঘটনাবলীর মধ্যে; কাজেই কেবল সেই কার্যফলগুলো স্মিথের 'বোতল' শব্দটা শোনার সঙ্গে অনুষঙ্গ-বদ্ধ হতে পারে, যেগুলো হয় তার দেহের ভেতরে ঘটে, অথবা বোতলের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার ফল-স্বরূপ ঘটে। এবং তার পরেও কেবল কতকগুলো ঘটনা অনুষঙ্গ-বদ্ধ হতে পারে: পুষ্টি ঘটে শরীরের মধ্যে, কিন্তু 'বোতল' শব্দটাতে পুষ্টি হয় না। সাপেক্ষ অনুবর্তের মধ্যে একটা নির্ধারণযোগ্য সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু তার সীমার মধ্যে, শব্দের অর্থোপলব্ধি ব্যাখ্যার জন্য যা প্রয়োজন তা সে সরবরাহ করে। শিশু যখন বোতল দেখে তখন উত্তেজিত হয়; খাবারের আগে এ দৃশ্য ঘটে—এ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, এটা ইতিমধ্যেই একটা সাপেক্ষ অনুবর্তের রূপ নিয়েছে। সাপেক্ষণের পরবর্তী এক পর্যায়ে 'বোতল' শব্দটা শোনার ফলে শিশু উত্তেজিত হয়; তখন লোকে বলে যে, সে শব্দটা "বুঝতে" পারছে।

১. লণ্ডন: জর্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন লিঃ।

২. Light-quanta.

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, কোন ব্যক্তি যে শব্দ শুনছে তা সে বুঝতে পারছে, যদি, সাপেক্ষ অনুবর্ত নিয়মের প্রয়োগ-সীমার মধ্যে, সে শব্দের কার্যফলগুলো এবং শব্দ দ্বারা যা 'বোঝানো' হচ্ছে তার কার্যফলগুলো অভিন্ন হয়। একথা অবশ্য কেবল 'বোতল'-এর মত শব্দগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলোতে কোন মূর্ত বস্তু বা মূর্ত বস্তুর শ্রেণী বোঝায়। 'ব্যতিহার' (reciprocity) অথবা 'প্রজাতন্ত্রবাদ'-এর মত কোন শব্দ বোঝা আরও জটিল ব্যাপার এবং বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে সে বিষয় বিবেচনা করা যাবে না। কিন্তু বাক্য নিয়ে আলোচনা করার আগে, যে সব অবস্থায়, কোন ব্যবহৃত শব্দ শোনার ফলাফলের বিপরীতে, আমরা বরং শব্দ ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হই, সেগুলো আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

'ma-ma' ও 'da-da'-র মত যে কতকগুলো সরল ধ্বনি শিশুরা এগুলোকে শব্দ হিসাবে জানার আগে উচ্চারণ করে, সেগুলো ছাড়া আর কোন শব্দ ব্যবহার করার চেয়ে উচ্চারণ করাই বরং বেশী কঠিন। যে বহু-সংখ্যক ধ্বনি সব শিশুরা উদ্দেশ্যহীনভাবে উচ্চারণ করে, এ দুটো তাদের অন্তর্গত। দৈবক্রমে কোন শিশু যখন তার মায়ের উপস্থিতিতে 'ma-ma' উচ্চারণ করে তখন তিনি মনে করেন যে, ধ্বনিটার অর্থ সে জানে, এবং শিশুর কাছে পছন্দনীয় উপায়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। ধীরে ধীরে থর্নডাইকের কার্যফল নিয়ম অনুসারে তার মায়ের উপস্থিতিতে সেই ধ্বনি উচ্চারণ করার অভ্যাস সে আয়ত্ত করে, কারণ এ পরিস্থিতিতে ফলাফল সুখদায়ক। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক শব্দই সে এভাবে আয়ত্ত করে। বেশীর ভাগ শব্দই আয়ত্ত হয় অনুকরণের মাধ্যমে; তার সঙ্গে যুক্ত হয় বস্তু ও শব্দের অনুষঙ্গ, পিতামাতা স্বেচ্ছায় প্রাথমিক পর্যায়-গুলোতেই (একেবারে প্রথম পর্যায়ের পরেই) যে অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা অতি পরিষ্কার যে, কেউ নিজে যখন শব্দ ব্যবহার করে তখন তার জন্য শব্দের 'ধ্বনি' (sound) ও অর্থের অনুষঙ্গ ছাড়াও আরও কিছু-একটা দরকার। কুকুরেরা অনেক শব্দ বোঝে এবং শিশুরা যত না বলতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী পারে বুঝতে। শিশুকে আবিষ্কার করতে হয় যে, যে সব ধ্বনি (noise) সে শুনে তাদের মত ধ্বনি উচ্চারণ করা সম্ভব এবং লাভজনক। (এ উক্তিটাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ শাব্দিক অর্থে নেওয়া চলবে না, নইলে এটা অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদী [intellectualistic] হয়ে যাবে।) কথা বলার ইচ্ছা

ছাড়াই এলোমেলোভাবে ধ্বনি উৎপন্ন না করলে এটা সে কখনও আবিষ্কার করতো না। তখন সে ধীরে ধীরে দেখতে পায় যে, যেসব ধ্বনি সে শুনে তাদের মত ধ্বনি সে উৎপন্ন করতে পারে, এবং সাধারণভাবে সেটা করার ফলাফল সুখদায়ক। পিতা-মাতা সন্তুষ্ট হন, অভিষ্ট বস্তু লাভ করা যায়, এবং—সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যা—আকস্মিকভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করার বদলে ইচ্ছাকৃতভাবে করার মধ্যে একটা শক্তি-চেতনা আছে। কিন্তু এই সম্পুর্ণ প্রক্রিয়াটার মধ্যে ইঁদুরদের গোলকধাঁধাঁ শেখা থেকে মৌলিক পার্থক্য-বিশিষ্ট কিছুই নেই। কোহ্‌লারের বানরদের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার চেয়ে বরং এ ধরনের শিক্ষণের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য আছে, কারণ, বুদ্ধি যতই থাক না কেন, তার সাহায্যে বস্তুসমুদয়ের নাম খুঁজে বের করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হতো না—গোলকধাঁধাঁর মত এ ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতাই একমাত্র সম্ভাব্য পথপ্রদর্শক। অন্যের কথা বোঝার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ যে দিক ধরে চলে, কোন ব্যক্তি যখন কথা বলতে শেখে তখন সাপেক্ষীকরণ তার বিপরীত দিক ধরে চলে। কোন ড়াল দেখতে পেলে কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে 'বিড়াল' শব্দটা উচ্চারণ করা; এটা সে বাস্তবিক না করতে পারে, কিন্তু এ ক্রিয়ার প্রবণতা-সম্পন্ন একটা প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে দেখা দেবে, যদিও কোন রণে বাহ্য ক্রিয়াটা (overt act) না ঘটতে পারে। সত্য বটে যে, 'বিড়াল' ব্দটা সে উচ্চারণ করতে পারে এ জন্যে যে, সে একটা বিড়াল সম্বন্ধে 'চিন্তা' রছে, বস্তুতঃ কোন বিড়াল দেখছে না। তবে একটু পরেই আমরা দেখবো , এটা কেবল সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার আর একটা পর্যায় মাত্র। আমি তদূর দেখতে পাচ্ছি, বাক্যের বিপরীতে একক (single) শব্দের ব্যবহার গালকধাঁধার অভ্যন্তরবর্তী প্রাণীর ক্ষেত্রে যেসব সূত্র প্রযোজ্য সেগুলোর যো সম্পুর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

বিশ্লেষণের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন কতিপয় দার্শনিক মনে করেন যে, প্রথমে সে বাক্য এবং তারপর একক শব্দ। এ প্রসঙ্গে তাঁরা সব সময়ই প্যাটা-নিয়াবাসীদের (Patagonians) ভাষার কথা উল্লেখ করেন, যে ভাষা তাঁদের পক্ষ অবশ্যই জানে না। আমাদের বুঝানো হয় যে আপনি যদি বলেন 'পশ্চিম দিককার পাহাড়ের পশ্চাতের হ্রদে আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি," তাহলে কান প্যাটাগনিয়াবাসী তা বুঝতে পারে, কিন্তু আলাদাভাবে 'মাছ' কথাটাকে

সে বুঝতে পারে না। (এ দৃষ্টান্ত কাল্পনিক, কিন্তু যে ধরনের কথা বলা হ তার পরিচয় এতে আছে।) এখন হতে পারে যে, প্যাটাগনিয়াবাসীরা স্বত (peculiar)—বস্তুতঃ স্বতন্ত্র তাদের হতেই হবে; নইলে তারা প্যাটাগনিয় থাকা পছন্দ করতো না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, টমাস কার্লাইল আর ল ম্যাকলে ছাড়া সভ্য দেশের অন্য শিশুদের আচরণ এ রকম নয়। তিন বৎসর না হওয়া পর্যন্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি কখনও কথা বলেন নি; সে সময় তিনি তাঁ ছোট ভাইকে কাঁদতে দেখে বলেন, 'What ails wee Jock ?' লর্ড ম্যাকলে "গানের মাধ্যমে যা শিখিয়েছিলেন তা শিখেছিলেন যন্ত্রণার মধ্যে"; কারণ কো এক পার্টিতে এক কাপ গরম চা নিজের উপর উল্‌টে ফেলে দিয়ে একটু পর তি তাঁর অতিথিসেবিকাকে বলেছিলেন "ধন্যবাদ ম্যাডাম্, যন্ত্রণাটা কমে এসেছে," এবং এইভাবে কথা বলা আরম্ভ করেছিলেন। অবশ্য এ-সব তথ্য জীবনী লেখকদের প্রসংগে, শৈশবে কথা বলতে শুরু করার প্রসংগে নয়। যত্নসহকা যেসব ছেলেমেয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তাদের সকলের বেলায়ই স্বতন্ত্র শব্দে অনেক পরে আসে বাক্য।

প্রথম দিকে শিশুদের সীমাবদ্ধতা থাকে ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষমতার থেকে, এবং শিক্ষালব্ধ অনুষঙ্গের স্বল্পতা দ্বারাও তারা থাকে সীমাবদ্ধ। নিশ্চিত যে, 'ma-ma' ও 'da-da'-র যে অর্থ আছে সে অর্থ থাকার কারণ যে, শিশুরা অতি শৈশবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধ্বনিগুলো উৎপন্ন করে, এবং জন্যই বয়স্কদের পক্ষে এ ধ্বনিগুলোতে একটা অর্থ আরোপ করা সুবিধাজনক কথা বলার প্রারম্ভকালেই যা ঘটে, তা বয়স্কদের অনুকরণ নয়—তখন বরং আবিষ্কৃত হয় যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনি উৎপাদন করলে তা থেকে ভাল পাওয়া যায়। অনুকরণ আসে পরবর্তী সময়ে, শব্দের যে অর্থ থাকে সে সত্য শিশুর কাছে উদঘাটিত হবার পর। কোন খেলা শেখা বা সাইকে চালাতে শেখার সঙ্গে যে ধরনের দক্ষতা জড়িত, এ ক্ষেত্রেও ঠিক সে ধর দক্ষতাই জড়িত।

একটা সরল সূত্রের আকারে এ অর্থ-তত্ত্ব (theory of meaning) সংক্ষে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাপেক্ষ অনুবর্ত নিয়মের মাধ্যমে ক যখন গ

১. "Thank you, Madam, the agony is abated."

কারণ হয়, তখন ক-কে আমরা গ-এর একটা 'আনুষঙ্গিক' কারণ বলবো, এবং গ-কে বলবো ক-এর একটা 'আনুষঙ্গিক' কার্য। আমরা বলবো যে, কোন ব্যক্তি যখন ক শুনছে তখন তার কাছে ক-তে গ 'বোঝায়', যদি ক-এর আনুষঙ্গিক কার্যগুলো গ-এর আনুষঙ্গিক কার্যগুলোর নিকট-সদৃশ হয়; এবং আমরা বলবো যে, সে যখন ক-শব্দটা উচ্চারণ করে তখন তাতে গ 'বোঝায়', যদি ক-এর উচ্চারণ গ অথবা পূর্বে গ-এর সঙ্গে অনুষঙ্গ-বদ্ধ কোন কিছুর আনুষঙ্গিক কার্য হয়। আরও মূর্ত আকারে বিষয়টা উল্লেখ করতে হলে বলতে হয়, 'পিটার' শব্দটাতে কোন ব্যক্তি বোঝায়, যদি 'পিটার' শব্দটা শোনার আনুষঙ্গিক কার্যগুলো পিটারকে দেখার আনুষঙ্গিক কার্যসমূহের নিকট-সদৃশ হয় এবং 'পিটার' শব্দটা উচ্চারণ করার আনুষঙ্গিক কারণগুলো পিটারের সঙ্গে অনুষঙ্গ-বদ্ধ ঘটনাবলী হয়। অবশ্য আমাদের অভিজ্ঞতার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এই সরল পরিকল্প (schema) অস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার উপর চাপও পড়ে অতিরিক্ত, কিন্তু আমার মতে মৌলিকভাবে এ সত্য থেকে যায়।

সি. কে. অগডেন ও আই. এ. রিচার্ডস্ সাহেবের 'The Meaning of Meaning' নামে একটি চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান গ্রন্থ আছে। শব্দ-শ্রবণের কার্যফলের বদলে শব্দোচ্চারণের কারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার দরুন তার মধ্যে উপরে বর্ণিত মতবাদটার অর্ধেকটা মাত্র পাওয়া যায় এবং সেটাও কতকটা অসম্পূর্ণ আকারে। এতে বলা হয়েছে যে, একটা শব্দ ও তার অর্থের কারণগুলো অভিন্ন। সক্রিয় (active) অর্থ, যা শব্দের উচ্চারণকারীর অর্থ, এবং নিষ্ক্রিয় (passive) অর্থ, যা শব্দ শ্রবণকারীর অর্থ—এ দুটোর মধ্যে আমি পার্থক্য করতে চাই। সক্রিয় অর্থের বেলায়, শব্দের অর্থ বা তার সঙ্গে অনুষঙ্গ-বদ্ধ কিছুর দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে (associatively) শব্দটা উৎপন্ন হয়; নিষ্ক্রিয় অর্থের বেলায়, শব্দটার আনুষঙ্গিক কার্যগুলো মোটামুটিভাবে তার অর্থের আনুষঙ্গিক কার্যাবলী থেকে অভিন্ন হয়।

আচরণবাদী ধারায়, স্বকীয় নাম এবং যাদেরকে 'অমূর্ত' বা 'জাতিবাচক' শব্দ বলা হয়, এই উভয়ের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই। ''বিড়াল' শব্দটা সাধারণ (general) আর 'পিটার' শব্দটা একটা স্বকীয় নাম; কিন্তু শিশু উভয় শব্দ ব্যবহার করতে শেখে একইভাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, 'পিটার'

কতকগুলো ঘটনার সমষ্টি, এবং এক অর্থে সাধারণ। পিটার কাছে বা দূরে থাকতে পারে, হাঁটতে পারে, দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে পারে, হাসতে বা ভ্রুকুটি করতে পারে। এগুলোতে বিভিন্ন উদ্দীপকের উৎপত্তি ঘটে, কিন্তু উদ্দীপকগুলোতে যথেষ্ট সাধারণ উপাদান আছে, যার ফলে 'পিটার' শব্দে গঠিত প্রতিক্রিয়াটা উৎপন্ন হয়। সুতরাং, আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 'পিটার' ও 'মানুষ'-এর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। 'পিটার'-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্যে যে সাদৃশ্য, তার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য আছে 'মানুষ'-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্যে, কিন্তু সেটা কেবল মাত্রাগত পার্থক্য। যে সব ক্ষণস্থায়ী বিশেষ ঘটনাবলীর মধ্যে পিটারের বিভিন্ন আবির্ভাব বিধৃত, তাদের জন্য আমার কাছে কোন নাম নেই, কারণ কোন বিশেষ ব্যবহারিক গুরুত্ব তাদের নেই; বস্তুতঃ তাদের গুরুত্ব নিছক তত্ত্বগত ও দার্শনিক। কাজেই, পরবর্তী এক পর্যায়ে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলার থাকবে আমাদের। এখনকার মতো, আমরা লক্ষ্য করছি যে, পিটার অনেকবার ঘটছে এবং 'পিটার' শব্দটাও অনেকবার ঘটছে; পিটারকে যে ব্যক্তি দেখছে তার কাছে তাদের প্রত্যেকেই কতকগুলো সাদৃশ্য-বিশিষ্ট কতকগুলো ঘটনার সমষ্টি। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, পিটারের সংঘটনগুলো (occurrences of Peter) 'কার্যকারণ' সূত্রে সংযুক্ত, যে-ক্ষেত্রে 'পিটার' শব্দের সংঘটনগুলো সাদৃশ্যের মাধ্যমে সংযুক্ত। কিন্তু এটা এমন এক পার্থক্য যা নিয়ে আলোচনা করার সময় এখনও আসেনি।

বলা হয় যে, 'মানুষ' অথবা 'বিড়াল' অথবা 'ত্রিভুজ'-এর মত সাধারণ শব্দগুলো 'সার্বিক' (universals) নির্দেশ করে, যাদের সম্পর্কে প্লেটোর সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত দার্শনিকেরা বিতর্ক চালাতে কখনও নিরস্ত হননি। সার্বিক আছে কিনা, এবং থাকলে কোন্ অর্থে আছে, সেটা অধিবিদ্যার প্রশ্ন, ভাষা-প্রয়োগ প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন প্রয়োজন নেই। সার্বিক প্রসঙ্গে যে একমাত্র কথা এখানে এ পর্যায়ে উত্থাপন করার প্রয়োজন সেটা এই যে, সাধারণ শব্দের নির্ভুল প্রয়োগ থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, কোন মানুষ সার্বিক সম্বন্ধে ভাবতে পারে। প্রায়শঃ এ-কথা মনে করা হয়েছে যে, যেহেতু 'মানুষ'-এর মত কোন শব্দ আমরা নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে পারি, সুতরাং মানুষের অনুরূপ একটা "অমূর্ত ধারণা" করার শক্তি আমাদের অবশ্যই

থাকবে ; কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। এক ব্যক্তির পক্ষে কতকগুলো প্রতিক্রিয়া সঠিক, আরেক ব্যক্তির পক্ষে অন্য কতকগুলো, কিন্তু সবগুলোর মধ্যে কতকগুলো উপাদান সাধারণ। 'মানুষ' শব্দটাতে আমাদের সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলো ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া যদি উৎপন্ন না হয় তাহলে বলা যাবে যে, আমরা 'মানুষ' শব্দটা বুঝি। জ্যামিতি শেখার বেলায় লোকে 'ত্রিভুজ'-এর মত কোন শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা এড়িয়ে চলার অভ্যাস অর্জন করে। আমরা জানি যে, সাধারণভাবে ত্রিভুজ সম্পর্কে আমরা যখন কোন যুক্তিবাক্যের সাক্ষাৎ পাই, তখন বিশেষভাবে কোন সমকোণী ত্রিভুজ বা কোন এক প্রকারের ত্রিভুজ সম্পর্কে আমরা চিন্তা করবো না। সারতঃ, এ-ই হচ্ছে 'সকল' ত্রিভুজের সঙ্গে যা জড়িত, শব্দটার সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে শেখার প্রক্রিয়া ; এটা যখন আমরা শিখেছি তখন 'ত্রিভুজ' শব্দটা আমরা বুঝি। সুতরাং, যদিও আমরা নির্ভুলভাবে সাধারণ শব্দ ব্যবহার করি, তথাপি এরূপ মনে করার কোন প্রয়োজন নেই যে, আমরা কখনও সার্বিক উপলব্ধি (apprehend) করি।

এ পর্যন্ত আমরা কথা বলেছি স্বতন্ত্র শব্দ সম্পর্কে, এবং তাদের মধ্যে আমরা বিবেচনা করেছি কেবল সেগুলোকে, যেগুলোকে স্বাভাবিকভাবে স্বতন্ত্ররূপে প্রয়োগ করা যায়। শিশু বাক্য গঠনের আগে এক ধরনের স্বতন্ত্র শব্দ প্রয়োগ করে ; কিন্তু কতকগুলো শব্দের জন্য আগে বাক্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। "জন জেম্‌সের পিতা"—এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করার আগে কেউ 'পিতৃত্ব' (paternity) শব্দটা ব্যবহার করবে না। "আগুন আমাকে গরম করে"—এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করার আগে কেউ 'কার্যকারণতা' (causality) শব্দটা ব্যবহার করবে না। বাক্য নতুন বিবেচ্য বিষয়ের অবতারণা করে, এবং আচরণবাদী ধারা অনুসরণ করে ঠিক এত সহজে বাক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তবে দর্শন বাক্যের স্বরূপ উপলব্ধির জোর দাবী জানায় এবং সেজন্য তাদের নিয়ে আলোচনা আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

ইতিপূর্বে আমরা যেমন দেখেছি, প্যাটাগনিয়ার বাইরে সব শিশুই স্বতন্ত্র শব্দ নিয়ে আরম্ভ করে, এবং কেবল তার পরে বাক্য আয়ত্ত করে। কিন্তু একটা থেকে আরেকটাতে যাওয়ার দ্রুততার ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য। আমার নিজের সন্তানেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। আমার ছেলে

প্রথমে স্বতন্ত্র বর্ণ, তারপর স্বতন্ত্র শব্দ নিয়ে অভ্যাস করেছে, এবং তিন বা চারের অধিক শব্দ নিয়ে গঠিত বাক্য নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছে দু'বছর তিন মাস বয়সে। পক্ষান্তরে, আমার মেয়ে অতি তাড়াতাড়িই বাক্য পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, এবং তার প্রায় কোন বাক্যেই কখনও ভুল ছিল না। তার আঠারো মাস বয়সে আড়াল থেকে শোনা গেছে যে, যখন তার ঘুমিয়ে থাকার কথা তখন সে নিজের কাছেই বলছে : "গত বছর আমি ডাইভিং-বোর্ড থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়তাম, হাঁ পড়তাম।"[১] অবশ্য 'গত বছর' কথাটা সে বার বার উচ্চারণ করতো তার অর্থ না বুঝেই। এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শিশুরা প্রথম যে বাক্যগুলো উচ্চারণ করে সকল ক্ষেত্রেই সেগুলো, তারা অন্যদেরকে যে-সব বাক্য উচ্চারণ করতে শুনেছে তাদের পরিবর্তনহীন পুনরাবৃত্তি মাত্র। শব্দের ক্ষেত্রে জড়িত নয়, এমন কোন নিয়ম (principle) এসব ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত হয় না। নতুন নিয়মের উদ্ভব ঘটে তখন, যখন জানা শব্দ সন্নিবেশিত করে এমন বাক্য গঠন করার সামর্থ্য জন্মে, যে বাক্য আগে শোনা হয় নি, কিন্তু যে বাক্য শিশু যা বলতে চায় তা নির্ভুল-ভাবে প্রকাশ করে। এর সঙ্গে জড়িত আছে আকার ও কাঠামো (form and structure) নিয়ে কাজ করার সামর্থ্য। অবশ্য 'মানুষ' শব্দের প্রয়োগের সঙ্গে যেমন কোন সার্বিকের উপলব্ধি জড়িত নয়, তেমনি কোন অমূর্ত আকার বা অমূর্ত কাঠামোর উপলব্ধিও এর সঙ্গে জড়িত নয়। কিন্তু এটা সত্য যে উদ্দী-পকের আকার ও প্রতিক্রিয়ার আকারের মধ্যবর্তী একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ এর সঙ্গে জড়িত আছে। খুব স্বল্পকালের মধ্যেই শিশুরা "বিড়ালেরা ইঁদুর খায়" আর "ইঁদুরেরা বিড়াল খায়"—এই দুই উক্তি দ্বারা ভিন্নভাবে প্রভাবিত হতে শেখে; এবং তার অল্প দিন পরেই এদের একটাকে বাদ দিয়ে অন্য উক্তিটা করতে শেখে। এ ধরনের ক্ষেত্রে, কারণ (শোনার সঙ্গে জড়িত) অথবা কার্য (বলার সঙ্গে জড়িত) একটা পূর্ণাঙ্গ বাক্য। হতে পারে যে, কোন একটা শব্দের উৎপত্তির জন্যে পরিবেশের একটা অংশই যথেষ্ট, এবং অন্য একটার জন্যে অন্য অংশ, কিন্তু কেবল দুটো অংশ সম্বন্ধযুক্ত হলেই পূর্ণ বাক্য উৎপন্ন হতে পারে। কাজেই যখনই বাক্য এসে যাচ্ছে তখনই আমরা দুটো জটিল সত্যের (facts) মধ্যে

[১] "Last year I used to dive off the diving-board, I *did*."

টা কার্য-কারণ সম্বন্ধ পাচ্ছি, যাদের একটা উক্তিকৃত সত্য (fact asserted) বং অন্যটা উক্তিকারী বাক্য ; সত্যগুলো অখণ্ডভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধের ধ্যে প্রবেশ করে, এবং সে সম্বন্ধকে কেবল বাক্যাংশের সম্বন্ধগুলোর সমষ্টি বলে াখ্যা করা যায় না। অধিকন্তু 'খাওয়া'-র (eat) মত সম্বন্ধসূচক শব্দ যখনই ান শিশু নির্ভুলভাবে ব্যবহার করতে শিখেছে, তখনই সে পরিবেশের কোন ম্বন্ধ-বিশিষ্ট দিকের দ্বারা কারণিকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সামর্থ্য অর্জন রেছে, এবং এর মধ্যে রয়েছে এক নতুন মাত্রার জটিলতা, সাধারণ নামবাচক দ ব্যবহারের জন্য যে জটিলতা আবশ্যক নয়।

সুতরাং সম্বন্ধসূচক শব্দের, অর্থাৎ, বাক্যের সঠিক ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে াকে নির্ভুলভাবে বলা যায় "আকারের অনুভূতি" (perception of form) ; র্থাৎ, এর জন্যে প্রয়োজন আকার-বিশিষ্ট উদ্দীপকের উত্তরে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া। দাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক, কোন শিশু বলতে শিখেছে যে, একটা জিনিস অন্য কটা জিনিসের 'উপর' (above), যখন বিষয়টাও আসলে তাই। 'উপরে' ব্দটা ব্যবহারের অনুবর্তী উদ্দীপক পরিবেশের একটা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট দিক, এবং আমরা বলতে পারি যে, যেহেতু সেটা থেকে একটা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হচ্ছে, সুতরাং এ দিকটা 'প্রত্যক্ষগত' (perceived)। বলা যেতে পারে "উপরে" সম্বন্ধটা 'উপরে' শব্দটার নিতান্ত সদৃশ নয়। সেটা সত্য ; কিন্তু সাধারণ জড়বস্তু (physical objects) সম্পর্কেও একই কথা সত্য। পদার্থবিদদের মতানুসারে, কোন পাথরের দিকে তাকালে সেটাকে আমরা যেমন দেখি, পাথরটা মোটেই সে রকম নয়, কিন্তু তথাপি এটা বললে ভুল হবে না যে, আমরা তা 'প্রত্যক্ষ' (perceive) করছি। এটা বলার সময় অবশ্য এখনও আসেনি। সুনির্দিষ্ট-ভাবে যেটুকু বোঝা গেছে সেটুকু এই যে, কোন ব্যক্তি যখন নির্ভুলভাবে বাক্য ব্যবহার করতে সমর্থ হয়, তখন তার থেকে আকার বা সম্বন্ধবিশিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীলতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

"এটা ওটার উপরে", অথবা "ব্রুটাস সিজারকে হত্যা করেছিলেন"— কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট সত্যের অস্তিত্ব-সূচক এ জাতীয় কোন বাক্যের কাঠামো এবং উদ্দিষ্ট সত্যের কাঠামো, দু'য়ের মধ্যে একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। 'এটা' ও 'ওটা', এই দুই পদের মধ্যে "উপরে" একটা সম্বন্ধ ; কিন্তু 'উপরে' শব্দটা কোন সম্বন্ধ নয়। বাক্যের মধ্যে সম্বন্ধটা হচ্ছে শব্দগুলোর কালিক

বিন্যাস (order) (অথবা লিখিত শব্দ হলে, দৈশিক বিন্যাস), কিন্তু সম্বন্ধ-সূচক শব্দটা নিজে অন্য শব্দগুলোর মতই পদার্থিক (substantial)। ল্যাটিনের মত ধাতুরূপ-সম্পন্ন ভাষাগুলোতে সম্বন্ধের 'ধারা' (sense) দেখানোর জন্য শব্দ-বিন্যাস আবশ্যক নয়; কিন্তু ধাতুরূপহীন ভাষাগুলোতে "ব্রুটাস সিজারকে হত্যা করেছিলেন" এবং "সিজার ব্রুটাসকে হত্যা করেছিলেন", এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার এটাই একমাত্র উপায়। শব্দগুলো হচ্ছে দেশকালিক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভৌত ঘটনা; অন্য সম্বন্ধগুলোর শাব্দিক প্রতীগায়নে (symbolization)[১] আমরা এসব সম্বন্ধ ব্যবহার করি এবং তার প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধের 'ধারা'—অর্থাৎ, সম্বন্ধটা ক থেকে খ-য়ে, না খ থেকে ক-য়ে যাচ্ছে—সেটা দেখানো।

এই মাত্র আমরা লক্ষ্য করলাম যে, একটা সম্বন্ধকে আমরা আরেকটা সম্বন্ধের সাহায্যে প্রকাশ করি না, প্রকাশ করি শব্দের সাহায্যে, যে শব্দ ঠিক অন্য শব্দেরই মত। সম্বন্ধ সম্পর্কে কার্যতঃ সকল দর্শনেই যে গোলযোগ রয়েছে, তার অনেকখানির জন্য এ বিষয়টাই দায়ী। ফলতঃ, সম্বন্ধ সম্পর্কে চিন্তা করার সময় আমরা সর্বক্ষণ সম্বন্ধের অপদার্থিকতা (unsubstantiality) এবং শব্দের পদার্থিকতার মাঝখানে ঘোরাফেরা করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বজ্র-বিদ্যুৎ যে বজ্রধ্বনির আগে আসে সে কথাটাই ভেবে দেখা যাক। সত্য ব্যাপারটার কাঠামো নিখুঁতভাবে তুলে ধরার মত কোন ভাষার সাহায্যে আমাদেরকে যদি এ জিনিসটা প্রকাশ করতে হতো তাহলে আমাদেরকে কেবল বলতে হতো: "বজ্রবিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি", যেখানে প্রথম শব্দটা যে দ্বিতীয় শব্দটার আগে আসছে তার অর্থ হচ্ছে, প্রথম শব্দটাতে যা বোঝাচ্ছে তা, দ্বিতীয় শব্দটাতে যা বোঝাচ্ছে, তার আগে আসছে। কিন্তু কালিক বিন্যাস (temporal order) প্রকাশের জন্যে যদিও আমরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারতাম, তথাপি অন্যান্য সম্বন্ধের বেলায় শব্দের আবশ্যকতা আমাদের হতো, কারণ শব্দের ক্রমবিন্যাসের মাধমে[২] সেগুলোকেও প্রতীগায়িত করতে গেলে অনিবার্যভাবেই এক অসহনীয় ধরনের ব্যর্থকতা এসে পড়তো।

১. অর্থাৎ : শব্দের মাধ্যমে 'অন্য' সম্বন্ধ প্রকাশে। (অনুবাদক)

২. অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে শব্দের 'ক্রমবিন্যাস' (order of words) যথেষ্ট নয়—এর জন্য সম্বন্ধ-সূচক 'স্বতন্ত্র' শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি আবশ্যক। (অনুবাদক)

জগতের কাঠামো সম্পর্কে আমরা যখন চিন্তা করতে শুরু করবো তখন এসব কথা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন হবে, কারণ আমাদের পরাতাত্ত্বিক চিন্তা-ধ্যানে ভাষার দ্বারা বিপথগামী হতে না চাইলে তার আগে ভাষা সম্পর্কে একটু গবেষণা না করে উপায় নেই।

এ অধ্যায়ের কোথাও শব্দের বর্ণনামূলক ও কল্পনাত্মক প্রয়োগ সম্পর্কে আমি কিছুই বলিনি; শব্দে যা বোঝায় তার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপকের প্রসঙ্গে আমি শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছি। স্মৃতি ও কল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করার আগে পর্যন্ত শব্দের অন্যান্য প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা কঠিন কাজ। উদ্দীপক হিসাবে শ্রুত শব্দের কার্য, এবং শব্দ যখন সংবেদনের বিষয় হিসাবে উপস্থিত কোন কিছুতে প্রযুক্ত হয় তখন তার কারণ—এ বিষয় দুটোর একটা আচরণবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার মধ্যেই আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমি মনে করি যে, আমরা দেখতে পাব—শব্দের বর্ণনামূলক, কল্পনামূলক, ইত্যাদি অপরাপর ব্যবহারগুলোতে অনুষঙ্গী নিয়মেরই নতুন নতুন প্রয়োগ ঘটে থাকে। তবে আরও কতকগুলো মনো-বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন আলোচনা না করা পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে আমরা বিশদভাবে কিছু বলতে পারবো না।

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষণ

স্মরণ করা যেতে পারে যে, আমাদের এখনকার লক্ষ্য হচ্ছে, কোন বহিঃস্থ পর্যবেক্ষকের চোখে 'জ্ঞান' যেভাবে ধরা পড়ে, সে হিসাবে জ্ঞানের একটা সংজ্ঞা দেওয়া। এই বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে যা বলার আছে তা যখন বলা শেষ হবে, তখন আমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করবো, বিষয়ীগত (subjective) দৃষ্টিকোণ—যে দৃষ্টিকোণে আমরা এমন-সব তথ্য বিবেচনায় মধ্যে আনি, যেগুলো কেবল পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত একই ব্যক্তি হলেই আবিষ্কৃত হতে পারে—থেকে অন্য আরও কিছু জানা যায় কিনা, এবং জানা গেলে সেটা কি। কিন্তু বর্তমানের মত, কোন মানুষের মধ্যে অন্য কোন মানুষ যে-সব সত্য প্রত্যক্ষ করতে পারে সে সব সত্য, এবং এ সত্যগুলো থেকে যে অনুমানগুলো করা যায়, সে সব অনুমানের মধ্যে আমরা দৃঢ়ভাবে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

'জ্ঞান' (knowledge) শব্দটা অত্যন্ত দ্ব্যর্থক। আমরা বলে থাকি যে, ওয়াটসনের ইঁদুরেরা 'জানে' কি করে গোলকধাঁধার বাইরে আসা যায়, তিন বছর বয়সের শিশু 'জানে' কিভাবে কথা বলতে হয়, কোন মানুষ তার পরিচিত ব্যক্তিদেরকে 'জানে', সে 'জানে' আজ ভোরে কি দিয়ে সে প্রাতরাশ করেছিল এবং সে 'জানে' কখন কলম্বাস প্রথম মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ফরাসী ও জার্মান ভাষা কম দ্ব্যর্থক, কারণ এদের প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন রকমের 'জ্ঞানে'র জন্য দুটো শব্দ রয়েছে, যে রকম-গুলোকে আমাদের চিন্তায় আমরা গুলিয়ে ফেলতে চাই, যেহেতু আমাদের ভাষায় আমরা তাদের গুলিয়ে ফেলি। এখন পর্যন্ত আমি সাধারণ-ভাবে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো না, বরং জ্ঞানের চেয়ে কম সাধারণ কতকগুলো ধারণা নিয়ে আমি আলোচনা করবো, যেগুলোকে সচরাচর 'জ্ঞানের'র আওতায় ফেলা হবে। এবং সবার প্রথমে আমি আলোচনা করবো প্রত্যক্ষণ (perception) নিয়ে—বহিঃস্থ পর্যবেক্ষক দ্বারা

ক্ষযোগ্য একটা-কিছু হিসাবে, প্রত্যক্ষকের কাছে এ যেভাবে ধরা পড়ে, সে বে নয়।

প্রথমে, 'প্রত্যক্ষণ' দিয়ে যে ধরনের জিনিস আমরা বোঝাতে চাই, সে ম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটা প্রাথমিক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

বলতে পারেন যে, কোন লোক তার ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে যা কিছু ক্ষ্য করে তাই সে 'প্রত্যক্ষ করে'। এ কেবল ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত একটা প্রশ্ন য়, যদিও ইন্দ্রিয়গুলো [প্রত্যক্ষণের] একটা আবশ্যিক শর্ত। দৃষ্টিক্ষেত্রের মার মধ্যে নয় এরূপ কোন জিনিস কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তবে ত্যক্ষ না করেও সে কোন জিনিসের প্রতি সরাসরি তাকাতে পারে। প্রায়ই মার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে—যাকে দার্শনিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে রা হয়—যে, আমার চশমাজোড়াটা আমি সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছি, দিও খোঁজা শুরু করার সময় সেটা আমার চোখের সামনেই ছিল। তরাং কোন লোকের কেবল ইন্দ্রিয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেই আমরা বলতে ারবো না সে কি প্রত্যক্ষ করছে, যদিও সেটা থেকে আমরা এটুকু জানতে ারি যে, কোন একটা জিনিস সে প্রত্যক্ষ করছে না। পর্যবেক্ষক জানতে ারেন যে, কোন ব্যক্তি একটা কিছু প্রত্যক্ষ করছে, কেবল যদি তার মধ্যে কটা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কোন লোককে যদি আমি বলি 'অনুগ্রহ করে সর্ষেটা[1] এগিয়ে দিন" এবং তখন যদি সে তা এগিয়ে দেয়, াহলে এটা খুবই সম্ভব যে, আমি যা বলেছিলাম তা সে প্রত্যক্ষ করেছে, দিও সে মুহূর্তে তার সর্ষে এগিয়ে দেওয়ার কাজটা নিছক সমাপতনের (coin-idence) ব্যাপার হতে 'পারে'। কিন্তু আমি যদি তাকে বলি, "আপনি টেলিফোন নম্বরটা চান তা হচ্ছে ২৪৬৭" এবং তিনি যদি সে নম্বরে টেলিফোন করতে এগিয়ে যান, তাহলে 'নিছক' দৈবক্রমে তার সে কাজ রার বিপরীত সম্ভাবনা খুবই বেশী—মোটামুটিভাবে ১-এর বিপরীতে ১০০০। বং কোন লোক যদি কোন বই থেকে উচ্চস্বরে কিছু পড়েন এবং তার াড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে আমি সেই শব্দগুলোই দেখতে পাই, তাহলে এরূপ মনে করা খুবই অদ্ভুত হবে যে, সে যে শব্দগুলো উচ্চারণ করছে সেগুলো

১. খাবার টেবিলে সর্ষেবাটা। (অনুবাদক)

সে প্রত্যক্ষ করছে না। এইভাবে, অন্য লোকে যা প্রত্যক্ষ করছে তার কতকগুলো সম্পর্কে বহু ক্ষেত্রেই আমরা ব্যবহারিক নিশ্চয়তা অর্জন করতে পারি।

প্রত্যক্ষণ তার চেয়েও বড় এক জাতির (genus) প্রজাতি (species), যার নাম সংবেদনশীলতা। কেবল জীবের মধ্যে সংবেদনশীলতা সীমাবদ্ধ নয়; বস্তুতঃ এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ থেকে। কোন জড়বস্তুকে কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি "সংবেদনশীল" বলা হয় তখন, যখন সে উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে সে বস্তুর আচরণ যেমন হয়, তার উপস্থিতিতে সে বস্তুর আচরণ তার থেকে এত ভিন্ন হয় যে সেটা নজরে পড়ে। আলোর প্রতি আলোকচিত্রের পর্দা সংবেদনশীল, চাপের প্রতি ব্যারোমিটার সংবেদনশীল, তাপের প্রতি থার্মোমিটার, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রতি গ্যালভ্যানমিটার, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রের সবগুলোতেই আমরা কোন-এক রূপক অর্থে বলতে পারি যে, যে উদ্দীপকের প্রতি কোন যন্ত্র সংবেদনশীল, সে উদ্দীপক সে যন্ত্র 'প্রত্যক্ষ করে' (perceives)। আমরা অবশ্য এরকম করে বলি না; আমরা মনে করি যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে আমরা যা দেখি তার চেয়ে অধিক কিছু প্রত্যক্ষণে আছে। এই অধিক জিনিসটা কি?

এর গতানুগতিক উত্তরটা হবে: চৈতন্য (consciousness)। কিন্তু, ভ্রান্ত হোক কি অভ্রান্ত হোক, এখনকার মত এ উত্তর আমরা খুঁজছিনে, কারণ বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে প্রত্যক্ষক যেভাবে ধরা পড়ে, তাকে সে হিসাবেই আমরা বিবেচনা করছি, এবং বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে চেতনা একটা অনুমান মাত্র। বাইরের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষণ যা, তার মধ্যে এমন কিছু আছে কি, যা তাকে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সংবেদনশীলতা থেকে পৃথক করে?

এটা অবশ্য সত্য যে, মানুষ যে কোন যন্ত্রের চেয়ে অধিক রকমের উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীল। কোন জিনিসকে যখন তার বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি কৃত্রিমভাবে সংবেদনশীল করে তোলা হয়, তখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই তার কাছে হার মানে। আলোকচিত্রের পর্দায় এমন-সব তারকার ছবি ওঠে যেগুলোকে আমরা দেখতে পারি না; ডাক্তারী (clinical) থার্মোমিটারে তাপমাত্রার এমন-সব পার্থক্য ধরা পড়ে যেগুলো আমরা অনুভব করতে

পারি না ; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটা অণুবীক্ষণযন্ত্র, একটা মাইক্রোফোন, একটা থার্মোমিটার, একটা গ্যালভ্যানমিটার, ইত্যাদিকে যুক্ত করে এমন একটা-মাত্র যন্ত্র তৈরী করার কোন উপায় নেই, যে যন্ত্র তার বিভিন্ন 'ইন্দ্রিয়' গুলোর উপর যেসব বিভিন্ন উদ্দীপক ক্রিয়া করে তাদের সমষ্টির উপর অখণ্ডভাবে প্রতিক্রিয়া করবে। তবে সম্ভবতঃ এর থেকে কেবল এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের যান্ত্রিক কুশলতা কালক্রমে যত উন্নত হতে পারবে এখনও তত উন্নত হতে পারেনি। নির্জীব যন্ত্র ও সজীব দেহের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ধারণে এটুকু নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়।

প্রধানতম—সম্ভবতঃ আমাদের বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে একমাত্র—পার্থক্যটা এই যে, সজীব দেহগুলো অনুষঙ্গ নিয়ম বা "সাপেক্ষ প্রতিবর্ত" (conditioned reflex) নিয়মের অধীন। উদাহরণস্বরূপ একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথাই বিবেচনা করা যাক। এর একটা প্রতিবর্ত আছে যার দরুন এটা পেনির (pennies) প্রতি সংবেদনশীল, যে প্রতিবেদন থাকার ফলে এটা চকোলেট ছেড়ে দেয়।[১] কিন্তু কেবল পেনি দেখে, অথবা 'পেনি' শব্দটা শুনে চকোলেট ছেড়ে দিতে এ কখনোই শেখে না। আপনি যদি একে আপনার বাড়ীতে রাখতেন এবং পেনি ঢোকাবার সময় প্রতিবারই এর কাছে "Abracadabra" উচ্চারণ করতেন, তাহলেও কেবল "Abracadabra" শব্দটা শুনে সে কোন কাজ করতো না। হাঁচি দেওয়ার মত আমাদের কতকগুলো প্রতিবর্তের অনু-রূপভাবে এর প্রতিবর্তগুলোও অসাপেক্ষ থেকে যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে হাঁচি দেওয়া এদিক থেকে অনন্যসদৃশ (peculiar)—সেজন্য এটা গুরুত্বহীন। আমাদের অধিকাংশ প্রতিবর্তকেই সাপেক্ষ করা যায়, এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে আবার নতুন করে সাপেক্ষ করা যায়, এবং এ প্রক্রিয়া সীমাহীনভাবে চলতে পারে। এর ফলেই, উন্নততর প্রাণীকুলের, বিশেষতঃ মানুষের, প্রতিক্রিয়া-গুলো যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াসমূহের চেয়ে এত অধিক চিত্তাকর্ষক ও জটিল হয়ে ওঠে। দেখা যাক অন্যান্য রকমের সংবেদনশীলতা থেকে প্রত্যক্ষণকে পৃথক করার ব্যাপারে এই একমাত্র নিয়ম যথেষ্ট কিনা।

কোন বিশেষ উদ্দীপকের উত্তরে মানুষের প্রতিবেদনের মধ্যে যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তার থেকেই জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যেকার পরম্পরাগত স্বাতন্ত্র্যটা গড়ে

১. স্বয়ংক্রিয় ভেনডিং মেশিনের কথা বলা হচ্ছে। (অনুবাদক)

উঠেছে। কারুর ধনী পিতৃব্য (uncle) দেখা করতে এলে তার স্বাভাবি
প্রতিবেদন হচ্ছে প্রফুল্ল হাসি; তিনি অর্থহারা হয়ে যাবার পর এই নং
সাপেক্ষীকরণ (conditioning) থেকে তার চেয়ে শীতল আচরণের উৎপা
ঘটে। এইভাবে, উদ্দীপকের উত্তরে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাকে দুই অংশে ভা
করা হয়েছে—এক অংশ নিছক গ্রাহী (receptive) এবং ইন্দ্রিয়জ, অ
অংশ সক্রিয় এবং সঞ্চালনমূলক (motor)। পরম্পরাগতভাবে প্রত্যক্ষণ
যেভাবে ধারণা করা হয়েছে তার থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষণ
প্রতিক্রিয়ার গ্রাহী-ইন্দ্রিয়জ অংশের শেষ প্রান্ত (end term), এবং ইচ্ছা (
ব্যাপকতম অর্থে) প্রতিক্রিয়ার সক্রিয়-সঞ্চালনমূলক অংশের প্রথম প্রান্ত
এরূপ মনে করা সম্ভব হয়েছিল যে, প্রতিক্রিয়ার গ্রাহী অংশটা সব সময় এব
উদ্দীপকের বেলায় একই রকম হবে, এবং অভিজ্ঞতাজাত পার্থক্য কেব
সঞ্চালনমূলক অংশে দেখা দেবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে নিষ্ক্রিয় অংশে
শেষ প্রান্ত যে ভাবে প্রতীয়মান হয়, সে হিসাবে তাকে বলা হলো 'সংবেদন
(sensation)। কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়মের প্রভাব যত গভীরে প্রবে
করে বলে এ মতবাদে মনে করা হয়েছিল, আসলে তা তার চেয়েও গভী
প্রবেশ করে। আমরা দেখেছিলাম যে, স্বাভাবিক অবস্থায় চোখের
সংকুচিত হয় উজ্জ্বল আলোর সামনে, কিন্তু তাকে এমনভাবে সাপেক্ষ ক
যায় যে, উচ্চ শব্দের ফলেও তার সংকোচন ঘটবে। আমরা যা দেখি তা
অনেকাংশ নির্ভর করে চোখের পৈশিক অভিযোজনগুলোর উপর এবং
অভিযোজন আমরা করি সম্পূর্ণ অবচেতনভাবে। কিন্তু চোখের তারার সংকো
ছাড়া তাদের [অভিযোজনগুলোর] একটামাত্র সত্যিকার প্রতিবর্ত, এ
সেটা হচ্ছে উজ্জ্বল আলোর দিকে চোখ ফেরানো। এ সঞ্চালন শিশুরা তাদে
জন্মদিনেই করতে পারে; এটা আমি কেবল ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে
জানি না, বরং, তার চেয়েও বড় কথা, পাঠ্যবই থেকেও জানি। কি
নবজাত শিশুরা তাদের চোখ দিয়ে কোন চলনশীল আলো অনুসরণ
পারে না; দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করতে বা খাপ খাওয়াতেও তারা পারে না
ফলতঃ দৃশ্যবস্তুর প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার নিছক গ্রাহী অংশটা, প্রতিক্রিয়া
যে পরিমাণে দৃষ্টিগত সেই পরিমাণে, বয়স্কদের বা বয়সে বড় শিশুদের—যা

অক্ষিপেশীগুলো অভিযোজনক্ষম হওয়ার দরুন তারা পরিষ্কার দেখতে পারে—গ্রাহী অংশ থেকে ভিন্ন।

কিন্তু এখানেও আবার সব রকমের ব্যাপার এসে পড়ে। আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে অসংখ্য বস্তু রয়েছে, কিন্তু (বড় জোর) কেবল তাদের কতকগুলো মাত্র আমাদের কাছে কৌতূহলজনক। কেউ যদি বলে, "ওই দেখ, একটা সাপ," তাহলে আমাদের চোখ দুটোকে আমরা নতুনভাবে ঠিক করে ধরি এবং একটা নতুন 'সংবেদন' আমরা পাই। তারপর নিছক দৃষ্টিগত অংশটুকু যখন শেষ হয়ে গেল তখন অনুষঙ্গযোগে মস্তিষ্কের অন্যান্য কেন্দ্রগুলোতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কোহ্‌লারের গ্রন্থে ছবি আছে, যেগুলোতে বানরেরা বিপজ্জনক বাক্সস্তূপের উপর অন্য বানরদের লক্ষ্য করছে এবং দর্শকেরা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের হাত তুলছে। শরীরচর্চা অথবা সুনিপুণ নৃত্যকলা পরিদর্শন করছেন, এমন যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সহানুভূতিসূচক পৈশিক সংকোচন অনুভব করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা স্পর্শ করতে পারি এমন যে কোন দৃশ্যবস্তু প্রারম্ভিক স্পর্শ-প্রক্রিয়া জাগিয়ে তুলবে, কিন্তু সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারা তা করবেনা।

বিপরীতক্রমে, অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে অনুষঙ্গ থাকার ফলেও দৃষ্টিগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। মোটরগাড়ী যখন সচরাচর চোখে পড়তো না, তখন একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে আমি হাঁটছিলাম ; এমন সময় প্রচণ্ড শব্দ করে আমাদের কাছাকাছি কোথাও একটা চাকা ফেটে গেল। সে এটাকে রিভলবার মনে করলো এবং বললো যে, সে সত্যিই আগুনের শিখা দেখেছে। স্বপ্নে এ ধরনের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলে। কোন উদ্দীপক—যেমন দ্বারে আঘাতকারিণী কোন পরিচারিকার শব্দ—অনুষঙ্গ-প্রভাবে অদ্ভুত রকমে ব্যাখ্যাত হয়। মনে পড়ে যে, একবার আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে, আমি জার্মানীর কোন গ্রাম্য পান্থশালায় আছি এবং ঘরের বাইরে কোন গায়কদলের গান গাওয়ার ফলে জেগে উঠেছি। শেষ পর্যন্ত আমি সত্যিই জেগে উঠলাম এবং দেখলাম যে, একটা স্প্রিং শাওয়ার মেঝের উপর খুবই সঙ্গীতময় শব্দ করছিল। অন্ততঃ একটা সঙ্গীতময় শব্দ আমি শুনেছিলাম, এবং এখন সেটাকে মেঝের উপর শাওয়ারের পতন বলে পুনর্ব্যাখ্যা করলাম। এ প্রকল্প আমি সত্য বলে প্রমাণ করলাম জানালাপথে বাইরে তাকিয়ে। জাগ্রতাবস্থায় যে সব

ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প আমাদের মনে জাগে সেগুলোকে আমরা সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখি, এবং সেজন্য স্বপ্নাবস্থার মত লাগাম-ছাড়া ভুলগুলো করি না। কিন্তু, সমালোচনামূলক প্রক্রিয়ার বিপরীতে, সৃজনশীল প্রক্রিয়াটা (mechanism) স্বপ্নাবস্থায় যে রকম, জাগ্রতাবস্থায়ও তাই: কেবল সাংবেদনিক উদ্দীপক থেকে যেটুকু পাওয়ার কথা, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে তার চেয়ে বেশী সম্পদ থাকে। ব্যক্তির জীবনে পরিবেশের সঙ্গে যে অভিযোজন ঘটে, মনে করা যেতে পারে যে, সে অভিযোজন হচ্ছে স্বপ্ন দেখতে শেখা—যে স্বপ্ন ব্যর্থ হয় না, বরং সার্থক হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা যেসব স্বপ্ন দেখি, সচরাচর সেগুলোর সমাপ্তি ঘটে বিস্ময়ে: জাগ্রত অবস্থার স্বপ্নগুলোর মধ্যে সে প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম। কখনও কখনও তাদেরও সমাপ্তি সে রকমের হয়—যেমন, যখন অতি দর্পে হতা লঙ্কা হয়; কিন্তু সেক্ষেত্রে, ভূমিকম্পের মত কোন বড় বাহ্যিক কারণ না থাকলে, এগুলোকে অনোপযোজনের (maladjustment) পরিচায়ক বলে মনে করা হয়। বলা যেতে পারে যে, স্বীয় পরিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে খাপ-খাওয়া কোন ব্যক্তির স্বপ্ন এমন ধরনের বিস্ময়ের মধ্যে পরিসমাপ্ত হবে না, যাতে সে জেগে ওঠে। সে ক্ষেত্রে, সে মনে করবে যে, তার স্বপ্নগুলো বাস্তব সত্তা (objective reality)। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে, সে স্বপ্নগুলোকে আমরা জাগ্রতাবস্থার প্রত্যক্ষণ (waking perceptions) বলি, নিদ্রাকালীন অদ্ভুত স্বপ্নগুলো থেকে বাস্তব সত্তার সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য খুব সামান্যই বেশী। তাদের মধ্যে 'কিছু' সত্য আছে, তবে তাদেরকে কার্যোপযোগী করার জন্য যতটুকু দরকার, কেবল ততটুকুই আছে।

চিন্তা করতে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে মনে করি যে, আয়নার প্রতিবিম্বের মত কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া আমরা যা দেখি তা সত্যি-সত্যি বহির্জগতে আছে।[১] পদার্থবিদ্যা এবং প্রত্যক্ষণের ঘটন-পদ্ধতি সম্পর্কিত মতবাদ থেকে দেখা যায় যে, এই অতি-সরল বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না। প্রত্যক্ষণ আমাদেরকে বহির্জগত সম্পর্কে কিছু জানতে সক্ষম করতে পারে এবং আমি মনে করি সক্ষম করে, কিন্তু আমরা স্বভাবতঃই তাকে জগৎ-স্বরূপের প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলে মনে করলেও আসলে তা সে রকম নয়।

১. ... is really 'there' in the outside world.

পদার্থবিদ্যার কাছ থেকে দার্শনিকের কি শেখার আছে, সে কথা বিবেচনা করার আগে পর্যন্ত এ প্রশ্নের পর্যাপ্ত আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; আমি কেবল, পূর্বাভাস হিসাবে, সেই কারণগুলো উল্লেখ করছি যেগুলোর জন্যে প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানের রূপ-বিশেষ হিসাবে মনে না করে, পরিবেশের উপর দৈহিক সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশিত এক ধরনের প্রতিক্রিয়া বলে মনে করা হয়। জ্ঞান কি দিয়ে গঠিত, সে আলোচনা আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে আমরা হয়তো দেখবো যে, আর যাই হোক, প্রত্যক্ষণ এক প্রকারের জ্ঞান বটে; কিন্তু সেটা হবে কেবল এজন্যে যে, জ্ঞানকে আমরা স্বভাবতঃ যা মনে করি, জ্ঞান সম্পূর্ণ তা নয়। বহিঃস্থ নিরীক্ষকের মনে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে যে ধারণা জন্মাতে পারে সেটা এই যে, প্রত্যক্ষণ পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করার স্বরূপের মধ্যে প্রকাশিত একটা ব্যাপার। এখনকার মত, প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত এ ধারণার উপরই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখবো।

বহিঃস্থ নিরীক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রত্যক্ষণ গড়ে ওঠে ঠিক অন্য যে কোন কারণিক অনুবন্ধের মতই। আমরা লক্ষ্য করি যে, কোন মানুষের দেহের সঙ্গে কোন দৈশিক সম্বন্ধে যখনই কোন বস্তু সংযুক্ত হয়, তখনই সে মানুষের দেহ এক বা একাধিক বার নড়াচড়া করে; তখন আমরা বলবো যে, লোকটা বস্তুটাকে 'প্রত্যক্ষ করে'। এইভাবে, নবজাত শিশু দৃষ্টিক্ষেত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত নয় এমন কোন উজ্জ্বল আলোর দিকে ধীরে ধীরে চোখ ফেরায়; তার ভিত্তিতে আমরা বলি যে, শিশু আলো 'প্রত্যক্ষ করে'। সে যদি অন্ধ হয়, তাহলে তার চোখ এভাবে নড়াচড়া করে না। যে পাখী বনের ভেতর ইতস্ততঃ উড়ে বেড়ায় শাখা-প্রশাখার সঙ্গে তার ধাক্কা লাগবে না, কিন্তু ঘরের ভেতর জানালার কাচের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগবে। এর ফলে আমরা বলি যে, পাখীটা শাখা-প্রশাখা প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু কাচ প্রত্যক্ষ করে না। আমরা কি কাচ 'প্রত্যক্ষ' করি, না কেবল জানি যে, সে আছে? অনুষঙ্গ থেকে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়, এ প্রশ্ন আমাদেরকে তাদের কাছে নিয়ে যায়। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জানি যে, সচরাচর জানালার ফ্রেমে কাচ থাকে; এর ফলে জানালার ফ্রেম দেখে আমরা এমনভাবে প্রতিক্রিয়া করি, যেন আমরা কাচ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কখনও কখনও কোন কাচ থাকে না: তথাপি সম্ভবতঃ আমাদের আচরণ দেখে

মনে হবে যেন আছে। এটা যদি ঘটতে পারে তাহলে বোঝা যাবে যে, আমরা কাচ প্রত্যক্ষ করি না, যেহেতু কাচ থাকুক বা না থাকুক, আমাদের প্রতিক্রিয়া একই হয়। তবে যদি কাচ রঙীন হয়, অথবা কিছুটা বিকৃতকারী হয়, কিংবা সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হয়, তাহলে কাচে-অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি কাচ-ওয়ালা এবং কাচ-বিহীন জানালার ফ্রেমের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। সেক্ষেত্রে, সে কাচ 'প্রত্যক্ষ' করছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আরও কঠিন। এটা নিশ্চিত যে, প্রত্যক্ষণের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাব পড়ে। যে ব্যক্তি পড়তে জানে সে এমন জায়গায় মুদ্রণ (print) প্রত্যক্ষ করে যেখানে অন্য ব্যক্তি করতো না। অপ্রশিক্ষিত কানে যে সুরের পার্থক্য ধরা পড়ে না, সংগীতজ্ঞ সে পার্থক্য প্রত্যক্ষ করেন। টেলিফোনে অভ্যস্ত না হলে লোকে তার মধ্যে যা শোনে, তারা তা বুঝতে পারে না; তবে সম্ভবতঃ এটা আসলে কোন প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত নয়।

আমরা যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি তার মূলে রয়েছে এই সত্যটা যে, মানবদেহটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মত নয়ঃ অনুষঙ্গ নিয়মের প্রভাবাধীনে যে কোন নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি সে তার প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটাচ্ছে অনবরত। অধিকন্তু, মানবদেহ সর্বক্ষণই কিছু একটা করছে। তাহলে কিভাবে আমরা জানবো যে, সে যা করছে তা কোন বিশেষ উদ্দীপকের ফল কিনা? তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্যা খুব জটিল নয়, বিশেষতঃ আমরা যখন কথা বলার মত বয়স-প্রাপ্ত লোকদের উপর গবেষণা করছি। চক্ষুচিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি আপনাকে কতকগুলো বর্ণ পড়তে দেন, যেগুলো ধীরে ধীরে ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে গেছে; এক জায়গায় এসে আপনি আর পড়তে পারেন না। যে ক্ষেত্রে আপনি পেরেছেন সেক্ষেত্রে তিনি জানেন যে, বর্ণটা কি তা বোঝার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রত্যক্ষণ আপনার হয়েছে। অথবা একজোড়া কম্পাস নিয়ে তার অগ্রভাগ দুটোকে কোন লোকের পিঠের উপর চেপে ধরুন, এবং জিজ্ঞাসা করুন সে দুটো খোঁচা অনুভব করছে কিনা, কিংবা মাত্র একটা। অগ্রভাগ দুটো যখন কাছাকাছি তখন সে বলতে পারে, একটা; সে যখন এ ভুল সম্পর্কে হুঁশিয়ার তখন আসলে একটা অগ্রভাগ থাকা সত্ত্বেও সে বলতে পারে দুটো। অগ্রভাগ দুটোর মধ্যে যদি যথেষ্ট ফাঁক থাকে তাহলে সে কখনও ভুল করবে

না। অর্থাৎ, 'দুই' শব্দটা উচ্চারণ করার মধ্যে যে দেহ-সঞ্চলন ঘটে, তা অপরিবর্তনীয়ভাবে কোন একটা উদ্দীপক থেকে উৎপন্ন হবে। (অপরিবর্তনীয়-ভাবে বলতে আমি বোঝাতে চাই, কোন বিশেষ দিনে কোন বিশেষ পরীক্ষা-পাত্রের বেলায়।) এর ফলে আমরা বলতে পারি যে, লোকটি দুটো অগ্রভাগের অস্তিত্ব বুঝতে পারে যদি তারা অতিরিক্ত কাছাকাছি না হয়। অথবা আপনি বলতে পারেন, "দিগন্তরেখার উপর আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন?" এক ব্যক্তি বলেন, "আমি একটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি"। অন্য একজন বলেন, "আমি দুই চিমনি-বিশিষ্ট একটা স্টীমার দেখছি"। তৃতীয় একব্যক্তি বলেন, "আমি দেখছি একটা কিউনারডার (Cunarder) সাউথামপটন থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছে"। এই তিন ব্যক্তি যা বলেন তার কতটুকু প্রত্যক্ষণ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য? তিন জনের বক্তব্যই সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে, কিন্তু তথাপি আমরা স্বীকার করতে পারি না যে, কোন লোক 'প্রত্যক্ষ' করতে পারে যে, জাহাজটা সাউথামপটন থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছে। এটাকে আমাদের বলা উচিত অনুমান (inference)। তবে সীমারেখা টানা মোটেই সহজ নয়; গুরুতর অর্থে কতকগুলো জিনিস আনুমানিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে প্রত্যক্ষণ বলে স্বীকার করতে হয়। যে ব্যক্তি বলেন, "আমি একটা জাহাজ দেখছি" সে অনুমান প্রয়োগ করছে। অভিজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিলে, সে কেবল একটা নীল পটভূমিতে একটা অদ্ভুতাকার কালো বিন্দু দেখছে। অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে যে, ও রকমের বিন্দুতে জাহাজ 'বোঝায়'; অর্থাৎ, তার মধ্যে একটা সাপেক্ষ অনুবর্ত আছে, যার ফলে, কোন একভাবে তার চোখ উদ্দীপ্ত হলে সে উচ্চস্বরে অথবা নিজের কাছে 'জাহাজ' শব্দটা উচ্চারণ করে। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের প্রত্যক্ষণ সমূহের মধ্যে যে জিনিসটা অভিজ্ঞতালব্ধ আর যে জিনিসটা তা নয়, এ দুটোকে পৃথক করার চেষ্টা বৃথা। কার্যতঃ, কোন শব্দ যদি পূর্ববর্তী শাব্দিক মাধ্যম ছাড়া আসে তাহলে সাধারণ লোকে, শব্দে যা বোঝায়, তাকে প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করবে; তবে সে ব্যক্তি যদি কোন প্রকাশ্য বা আভ্যন্তরীন শাব্দিক পূর্বা-য়োজন (preliminaries) ছাড়া সে শব্দটা পায় তাহলে সে তা করবে না। কিন্তু এ প্রশ্নটা স্বয়ং একটা পরিচয় থাকা না থাকার ব্যাপার। কোন শিশুকে একটা পঞ্চভুজ দেখালে তাকে বাহুগুলোর সংখ্যা জানার জন্যে সেগুলোকে

শুণতে হবে, কিন্তু জ্যামিতিক ক্ষেত্রাবলী সম্পর্কে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মাবার পর কোন পূর্ববর্তী শব্দ ছাড়াই 'পঞ্চভুজ' (pentagon) শব্দটা জেগে উঠবে। এবং যে কোন অবস্থায় এ ধরনের মাপকাঠি তত্ত্বগতভাবে মূল্যহীন। সমস্ত বিষয়টাই একটা মাত্রাগত ব্যাপার, এবং প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের মধ্যে কোন সঠিক রেখা টানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি জন্মিবামাত্র আমাদের অসুবিধাগুলো নিছক শাব্দিক এবং সেহেতু গুরুত্বহীন বলে প্রতিভাত হয়।

লক্ষ্য করা দরকার যে, প্রত্যক্ষণ কি দিয়ে গঠিত, বর্তমানে আমরা সেটা বলার চেষ্টা করছি না; আমরা বরং বলতে চাচ্ছি, যে ব্যক্তিকে আমরা নিরীক্ষণ করছি, তার কি ধরনের আচরণ থেকে আমরা সঙ্গতভাবে বলতে পারবো যে, সে তার পরিবেশের এইদিক (feature) বা ওইদিক প্রত্যক্ষ করেছে। আমি প্রস্তাব করছি যে, যদি কোন ব্যক্তি, একদিন বা সেরকম কোন সময় ধরে, যখনই এমন কোন দিক উপস্থিত থাকে তখনই কোন একটা দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং অন্য সময়ে করে না, তাহলে আমাদের পক্ষে এটা বলা সঙ্গত হবে যে, সে ওইদিকটা 'প্রত্যক্ষ' করছে। এ শর্তটা স্পষ্টতঃই যথেষ্ট, কিন্তু অপরিহার্য নয়—অর্থাৎ কিনা, এ শর্ত পালিত না হলেও প্রত্যক্ষণ থাকতে পারে। সাপেক্ষায়নের মাধ্যমে, এমন-কি এক দিনের মত অল্প সময়ের মধ্যেও, কোন লোকের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হতে পারে। আবার, প্রতিক্রিয়া একটা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা এত ক্ষীণ যে, নিরীক্ষণের মধ্যে তা ধরা পড়ে না; এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের মানদণ্ড তাত্ত্বিকভাবে পালিত হচ্ছে, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে নয়, যেহেতু কেউ জানতে পারবে না যে পালিত হচ্ছে। প্রায়শঃই, প্রত্যক্ষণ ঘটার পরে আমরা প্রমাণ পাই যে, সেটা ঘটেছিল, যদিও সংঘটন-মুহূর্তে লক্ষ্যণীয় কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। প্রায়ই আমি দেখেছি যে, ছেলেমেয়েরা এমন সব মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে, যেগুলো যথাকালে তারা শুনেছিল বলে মনে হয় না। এ ধরনের দৃষ্টান্ত থেকে প্রত্যক্ষণের অন্য এক জাতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ, বিলম্বিত প্রতি-বেদন থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ। কিছু লোক একদল আলাপী লোকের সঙ্গে নিশ্চুপ ও উদাসীনভাবে বসে থাকবে, এবং তারা যে শুনছে তার কোন আভাস দেবে না; অথচ বাড়ী ফিরে গিয়ে তাদের পত্রিকায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে সে কথোপকথন প্রকাশ করবে। এরাই হচ্ছে জাত স্মৃতিকথা

লেখক। এর চেয়েও অসাধারণ ব্যাপার এই যে, আমি এক লোককে জানি—প্রতিভাবান লোক সন্দেহ নেই—যিনি অনর্গল কথা বলেন, কিন্তু তথাপি কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি জানতে পারেন তাকে সুযোগ দেওয়া হলে সে কি বলতো। কি ভাবে এটা সম্ভব হয় আমি জানি না; তবে সঙ্গত কারণেই এমন লোককে 'প্রত্যক্ষণশীল' (perceptive) বলা হয়।

স্পষ্টতঃই, কথা বলার মত বয়স হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের সর্বোত্তম প্রমাণ পাওয়া যায় শব্দ থেকে। জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর পর স্বীয় প্রাত্যক্ষণিক পরিবেশের (perceptive situation) প্রতি কোন ব্যক্তির প্রতিবেদনে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। আপনি যদি কোন মাছরাঙা দেখেন এবং একই সময়ে আপনার সঙ্গী যদি বলেন, "ওই একটা মাছরাঙা", তাহলে সে যে তা দেখেছিল তার সপক্ষে ওটুকুই বেশ চূড়ান্ত প্রমাণ। কিন্তু, এ দৃষ্টান্ত থেকে যেমন দেখা যায়, অন্যে কোন জিনিস যে প্রত্যক্ষ করেছে, তার সপক্ষে আমাদের প্রমাণ সব সময়ই আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে। এবং অন্যের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আমরা যে ভাবে জানি, আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আমরা জানি তার চেয়ে ভিন্নভাবে। বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে কোন দর্শন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এটাই হচ্ছে অন্যতম দুর্বল জায়গা। এ ধরনের দর্শন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানকে একটা চালু ব্যাপার বলে মনে করে, এবং যে জগৎকে মানুষ তার নিজের প্রত্যক্ষণাবলী থেকে আহরণ করে, তার অস্তিত্বকে ধরে নেয়। বিষয়গত পদ্ধতির সাহায্যে আমরা দর্শনের সমুদয় সমস্যা সমাধান করতে পারি না, কিন্তু এ আমাদের যতদূর নিয়ে যায় ততদূর অগ্রসর হওয়ার মূল্য আছে। প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত এই গোটা প্রশ্নটাকেই এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে পাকড়াও করতে হবে, এবং তখন আমরা দেখবো যে, এ রকম ভাবার কারণ রয়েছে যে, আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ তার নিজের আওতার মধ্যে সিদ্ধ হলেও সে দৃষ্টিকোণ পর্যাপ্ত নয়। সে যাই হোক, বিষয়ীগত দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আলোচনায় উপনীত হবার আগে আমাদের এখনও দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে; তার চেয়েও বিশেষ কথা হচ্ছে—'জ্ঞান' ও 'অনুমান'কে আমাদের আচরণবাদ অনুসারে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, এবং তারপর, নতুনভাবে যাত্রারম্ভ করে, ভেবে দেখতে হবে আধুনিক

পদার্থবিদ্যা 'জড়' দিয়ে কি করছে। তবে এ মুহূর্তে বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে এখনও কতকগুলো কথা বলার আছে।

দেখা যাবে যে, প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আমাদের মানদণ্ড অনুসারে, প্রত্যক্ষিত বস্তুর পক্ষে প্রত্যক্ষকের দেহ-সংলগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজি ওই মানদণ্ড অনুসারে প্রত্যক্ষিত। তবে দেহ-সংলগ্ন নয়, এমন বস্তু যাতে প্রত্যক্ষিত হতে পারে, তার জন্য ভৌত ও দৈহিক শর্তাবলী রয়েছে, যেগুলো পালিত হওয়া আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট বস্তুটা যখন উপযুক্তভাবে অবস্থিত তখন অবশ্যই দেহের উপরিভাগে কোন এক প্রকার ভৌত প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে, কিন্তু অন্য সময় নয়; এ জাতীয় প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মত ইন্দ্রিয় থাকতে হবে। পদার্থবিদ্যার কাছ থেকে আমরা জানি যে, এমন অনেক প্রক্রিয়া আছে যেগুলো প্রয়োজনীয় ভৌত শর্তগুলো পূরণ করে, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের ত্রুটির (inadequacies) দরুন আমাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। কোন এক ধরনের তরঙ্গ থেকে শব্দ সৃষ্টি হয়, কিন্তু ঠিক একই ধরনের তরঙ্গ অতিরিক্ত হ্রস্ব হলে তাদের আর শোনা যায় না। কোন এক ধরনের তরঙ্গে আলোক উৎপন্ন হয়, কিন্তু তারা যদি অতিরিক্ত দীর্ঘ অথবা অতিরিক্ত হ্রস্ব হয় তাহলে তাদের আর দেখা যায় না। যে তরঙ্গে আলোর সৃষ্টি হয়, বেতারে ব্যবহৃত তরঙ্গ সেই একই শ্রেণীর, তবে তারা অতিরিক্ত লম্বা। যন্ত্র ব্যতিরেকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা কেন বেতার-বার্তা শুনতে পারবো না, তার কোন অভিজ্ঞতাপূর্ব কারণ নেই। যে সব রশ্মিতে আলোক উৎপন্ন হয়, সে সব রশ্মি আর এক্স-রে এক জাতীয়, তবে এক্ষেত্রে তারা এত ছোট যে তাদের দেখা যায় না। যদি আমাদের অন্য কোন জাতের চক্ষু থাকতো তাহলে হয়তো যে সব বস্তু থেকে সেগুলো আসে তাদেরকে তারা দৃষ্টিগম্য করে তুলতে পারতো। চুম্বক খুব শক্তিশালী না হলে তার কোন সংবেদন আমরা পাই না; কিন্তু আমাদের দেহে যদি লৌহের ভাগ বেশী থাকতো, তাহলে নাবিকের কম্পাস আমাদের প্রয়োজন হতো না। জৈবিক প্রক্রিয়া যেসব ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব সম্ভব করে তোলে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তাদের মধ্য থেকে বিশৃঙ্খলভাবে নির্বাচিত; কেউ মনে করতে পারে যে, দৈবিক পরিবর্তন (chance variation) এবং জীবন-সংগ্রামের ফলে তাদের উদ্ভব ঘটেছে।

এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের প্রত্যক্ষণগুলো খুব বেশী করে আকার অথবা আকৃতি অথবা কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। যাকে গেস্তাল-মনোবিজ্ঞান (Gestalt psychologie), বা আকারের মনোবিজ্ঞান বলা হয় তাতে এ বিষয়টার উপর জোর দেওয়া হয়। এর একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে পড়া। আমরা সাদা কাগজের উপর কালো হরফ অথবা ব্ল্যাকবোর্ডের উপর সাদা হরফ পড়ছি কিনা, সেটা আমরা কদাচিৎ লক্ষ্য করি; হরফগুলোর রঙ অথবা আয়তন নয়, বরং তাদের আকারগুলোই ক্রিয়া করে আমাদের উপর (যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সহজপাঠ্য থাকে)। এ বিষয়ে, দর্শনেন্দ্রিয়ই প্রধান, যদিও অন্ধ লোকেরা (এবং অল্পতর মাত্রায় অন্য লোকেরা) স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আকার সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে।

আমাদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, একটা সীমার মধ্যে, তারা আমাদেরকে কালিক অনুক্রমের জ্ঞান দেয়। কোন লোকের কাছে আপনি যদি বলেন "ব্রুটাস সিজারকে হত্যা করেছিলেন", এবং তারপর "সিজার ব্রুটাসকে হত্যা করেছিলেন", তাহলে, সে যদি শোনে, দুটো উক্তির পার্থক্য সে তাহলে বুঝতে পারবে; এক ক্ষেত্রে সে বলবে "অবশ্যই", অন্য ক্ষেত্রে "বাজে কথা" (Nonsense), এবং এটাই প্রমাণ যে, আমাদের সংজ্ঞানুসারে, দু'ক্ষেত্রে তার দুটো ভিন্ন প্রত্যক্ষণ ঘটেছে। অধিকন্তু, আপনি যদি তাকে জিজ্ঞাসা করেন পার্থক্যটা কি, তাহলে সে আপনাকে বলতে পারবে যে, এটা হচ্ছে শব্দগুলোর বিন্যাসগত পার্থক্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যে কাল-বিন্যাস (time-order) স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রাণীদের এবং বাকশক্তি অর্জনের আগে শিশুদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্যে, আমরা এ অধ্যায়ে যে বিষয়গত পদ্ধতি প্রয়োগ করছি, সেটাই একমাত্র পদ্ধতি। বহুসংখ্যক প্রাণী বিবর্তন-গ্রামের এত নীচে যে, তাদের চোখ নেই; তথাপি এ অর্থে আলোর প্রতি তারা সংবেদনশীল যে, তারা তার দিকে এগোয় এবং তার থেকে সরে আসে। আমাদের মানদণ্ড অনুসারে, এ ধরনের প্রাণীরাও আলোক প্রত্যক্ষ করে, যদিও এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, রঙ অথবা দৃষ্টিগত আকার অথবা নিছক আলোর উপস্থিতি ছাড়া অন্য কিছু তারা প্রত্যক্ষ করে। আমাদের চোখ বন্ধ থাকলে

নিছক আলোর উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি ; কেউ সম্ভবতঃ তাদের অপর্যাপ্ত সংবেদনশীলতাকে অল্প-বিস্তর আমাদের এ জাতীয় প্রত্যক্ষণের সম-জাতীয় বলে কল্পনা করতে পারে।

যে কোন অবস্থায়ই, এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, কোন বস্তু 'প্রত্যক্ষ' করলে, বস্তুটা যে কি রকম, সে সম্পর্কেও জ্ঞান জন্মে। সেটা [অর্থাৎ, বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান] সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। পরে আমরা দেখবো যে, আমাদের প্রত্যক্ষণ থেকে প্রত্যক্ষিত বস্তুতে নিতান্ত অমূর্ত ধরনের কিছু অনুমান আমরা করতে পারি ; কিন্তু এ অনুমানগুলো একই সঙ্গে জটিল এবং ঠিক নিশ্চিত (certain) নয়। প্রত্যক্ষণের নিজের মধ্যে বস্তুর স্বরূপ প্রতিফলিত, এ ধারণা একটা প্রিয় বিভ্রান্তি ; অধিকন্তু, এটা এমন একটা বিভ্রান্তি যে, দর্শনকে যদি একটা চিত্তবিনোদক রূপকথা ছাড়া আর কিছু হতে হয় তাহলে এটাকে জয় করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে স্মৃতি

কেবল আচরণ পর্যবেক্ষণ করে অন্য লোক সম্বন্ধে আমরা কি জানতে পারি, এ অধ্যায়গুলোতে সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সাধারণ লোকের ভাষায় যাকে 'স্মৃতি' বলা যায় তার মধ্যে যা কিছু পড়ে তার সবই এ অধ্যায়ে আমি আলোচনা করতে চাই, যে পর্যন্ত সে সব বিষয়কে বাহ্য নিরীক্ষণের আওতার মধ্যে ফেলা যায়। আর সম্ভবতঃ এখানে, 'আচরণবাদ' সম্পর্কে যে প্রশ্ন আছে, সে সম্বন্ধে আমার অভিমত ব্যক্ত করাও তেমনি বাঞ্ছনীয় হতে পারে। এ দর্শনের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন ডঃ জন বি· ওয়াটসন, এবং এঁর মতে, মানুষ সম্পর্কে যা জানা যায় তার সব কিছুই বাহ্য নিরীক্ষণের, পদ্ধতির সাহায্যে আবিষ্কার করা সম্ভব,—অর্থাৎ, আমাদের কোন জ্ঞানই, মূলগতভাবে এবং অপরিহার্যরূপে, এমন উপাত্তের উপর নির্ভর করে না, যে উপাত্তে পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত একই ব্যক্তি। মূলগতভাবে এ মতবাদের সঙ্গে আমি একমত নই; তবে আমি মনে করি যে, অধিকাংশ লোকের ধারণার চেয়ে অনেক বেশী সত্য এর মধ্যে আছে, এবং আমার মতে আচরণ-বাদী পদ্ধতিকে যতটুকু উন্নত করা সম্ভব ততটুকু উন্নত করা বাঞ্ছনীয়। আমি বিশ্বাস করি যে, পদার্থবিদ্যাকে যতক্ষণ আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত এ পদ্ধতি থেকে লভ্য জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং কোন পর্যায়েই আত্মনিরীক্ষণ, অর্থাৎ, যে নিরীক্ষণ কোন ব্যক্তি কেবল তার নিজের উপর চালাতে পারে, অন্য কারও উপর নয়—সে জাতীয় নিরীক্ষণ-লব্ধ উপাত্তের কাছে সাহায্য প্রার্থনার কোন প্রয়োজনও তার নেই। তা সত্ত্বেও আমি অবশ্য মনে করি যে, এ জাতীয় নিরীক্ষণ আছে, এবং আত্মনিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল জ্ঞান আছে। এর চেয়েও বড় কথা, আমি মনে করি যে, যে পদার্থবিদ্যাকে আচরণবাদ ধরে নেয়, তার বিচারমূলক ব্যাখ্যার জন্যে এ জাতীয় উপাত্তের প্রয়োজন আছে। সে জন্যে মানুষ সম্পর্কে আচরণবাদীর অভিমত ব্যক্ত করার পর পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরীক্ষা করতে অগ্রসর হবো; সেখান

থেকে আবার মানুষের কাছে ফিরে আসবো, তবে এবার মানুষকে দেখা হবে ভেতরের দিক থেকে। তারপর, চুড়ান্ত পর্যায়ে, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সাধারণভাবে আমরা কি জানি সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করবো।

'স্মৃতি' অথবা 'স্মরণ' (memory or remembering) কথাটা সচরাচর কতিপয় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়—সেগুলোকে পৃথক করা অত্যাবশ্যক। আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে, এর একটা ব্যাপক অর্থ আছে যে অর্থে পূর্বে-শেখা যে কোন অভ্যাসগত বিষয়ের পুনরাবৃত্তির প্রতিই শব্দটা প্রযুক্ত হয়, এবং একটা সংকীর্ণ অর্থ আছে যে অর্থে কেবল অতীত ঘটনার স্মৃতির (recollection) প্রতিই একে প্রয়োগ করা হয়। ব্যাপক অর্থেই লোকে বলে যে, কুকুর তার প্রভু অথবা তার নাম মনে রাখে, এবং স্যার ফ্রান্সিস ডারউইনও উদ্ভিদের স্মৃতির কথা বলেছিলেন। সচরাচর যে ধরনের আচরণকে সহজাত বলা হতো, স্যামুয়েল বাটলার তার কারণ হিসাবে পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতার কথা বলতেন, এবং এটা সুস্পষ্ট যে, 'স্মৃতি' কথাটাকে যত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব তিনি তত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে, বার্গসঁ 'অভ্যাস-স্মৃতি'কে (habit-memory) সত্যিকার স্মৃতি বলেই স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সত্যিকার স্মৃতি অতীত ঘটনার স্মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং তিনি মনে করেন যে, এটা কোন অভ্যাস হতে পারে না, কারণ স্মৃত ঘটনাটা একবার মাত্র ঘটেছিল। আচরণবাদী মনে করেন যে, এ যুক্তি (contention) ভ্রান্ত এবং সকল স্মৃতিই কোন একটা অভ্যাস ধরে রাখার ব্যাপার। সেজন্য তাঁর পক্ষে স্মৃতি এমন কিছু নয় যার জন্য বিশেষ অনুসন্ধানের (study) প্রয়োজন আছে; অভ্যাস সম্পর্কিত অনুসন্ধানের মধ্যেই স্মৃতি এসে পড়ে। ডঃ ওয়াটসন বলেন: "আচরণবাদী কখনও 'স্মৃতি' শব্দটা ব্যবহার করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিষয়গত মনোবিজ্ঞানে এর কোন স্থান নেই।" তিনি দৃষ্টান্ত দিতে অগ্রসর হন এবং গোলকধাঁধার ভেতরে একটা সাদা ইঁদুর নিয়ে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে, প্রথমবার গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে এই ইঁদুরটার চল্লিশ মিনিট লেগেছিল, কিন্তু পঁয়ত্রিশ বার চেষ্টা করার পর সে কোন ভ্রান্ত গতি-পরিবর্তন ছাড়াই ছয় সেকেণ্ডে বেরিয়ে আসতে শিখলো। তারপর তাকে ছয় মাস অবধি গোলকধাঁধা থেকে দূরে রাখা হলো, এবং তার ভেতরে আবার তাকে

ঢোকানো হলে মাত্র ছ'টা ভুল করে দু'মিনিটে সে বেরিয়ে এল। এর আগে বিশ বারের প্রচেষ্টার সময় তার যে পরিমাণ দক্ষতা ছিল, এখন ঠিক সেই রকম ছিল। গোলকধাঁধার অভ্যাসটা যে পরিমাণে সংরক্ষিত হয়েছিল তার একটা পরিমিতি আমরা এখানে পাচ্ছি। একটা বানর নিয়ে এ জাতীয় একটা পরীক্ষণে এমনকি এর চেয়েও বেশী ধারণক্ষমতা (retentiveness) ধরা পড়েছিল। তাকে ঢোকানো হয়েছিল একটা সমস্যা-বাক্সে (problem box), যেটা খুলতে প্রথমে তার লেগেছিল বিশ মিনিট, কিন্তু বিশ বারের প্রচেষ্টাকালে সে মাত্র দুই সেকেণ্ডে সেটা খুলে ফেললো। তখন তাকে ছ'মাসের জন্য সেটা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলো, এবং আবার ঢোকানো হলে সে চার সেকেণ্ডে সেটা খুলে ফেললো।

মানুষের বেলায় আমরা জানি যে, যে সব অভ্যাস আমরা আয়ত্ত করি তাদের অনেকগুলোকেই দীর্ঘকালের অব্যবহারের মধ্যেও আমরা ধরে রাখি—স্কেটিং, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, গল্‌ফ্‌ খেলা, ইত্যাদি তার পরিচিত দৃষ্টান্ত। সম্ভবতঃ ডঃ ওয়াটসন যখন বলেন: "কোন অপটু শিকারী (poor shot) অথবা অদক্ষ গল্‌ফ্‌ খেলোয়াড় যখন আপনাকে বলেন যে, পাঁচ বছর আগে তিনি ভাল ছিলেন, কিন্তু অনভ্যাসের দরুন তিনি অপটু হয়ে গিয়েছেন, তখন তাকে বিশ্বাস করবেন না; কোন কালেই তিনি ভাল ছিলেন না!"—তখন তিনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। আর যাই হোক, বেহালা অথবা পিয়ানোবাদকের বিশ্বাস এ রকম নয়—তারা মনে করেন যে, প্রতিদিনই অভ্যাস করা দরকার। তবে এটা [ওয়াটসনের উক্তি] যদি কিয়ৎ পরিমাণে অতিরঞ্জন হয়, তা হলেও একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, দৈহিক অভ্যাসগুলো আমরা বেশ ধরে রাখি। কতকগুলো—যেমন, সাঁতার—অন্যগুলোর চেয়ে বেশী সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন বিদেশী ভাষা বলার ক্ষমতা অব্যবহারের ফলে অত্যন্ত বেশী করে নষ্ট হয়। সমস্ত ব্যাপারটা পরিমাণগত, এবং পরীক্ষণের সাহায্যে সহজেই যাচাই করা যায়।

কিন্তু অতীত ঘটনার স্মরণ অর্থে স্মৃতিকে যদি অভ্যাস হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে কেউ মনে করতে পারে যে, সেটা অবশ্যই একটা 'শাব্দিক' (verbal) অভ্যাস হবে। এ সম্পর্কে ডঃ ওয়াটসন বলেন:

"সাধারণ মানুষ সচরাচর স্মৃতির প্রকাশ বলতে যা বোঝায়, সেটা এ রকম অবস্থায় ঘটে : অনেক বছরের অনুপস্থিতির পর কোন পুরাতন বন্ধু তাকে দেখতে আসে। এ বন্ধুকে দেখামাত্র সে বলে : 'প্রাণ বাজী রেখে বলতে পারি, সিয়াট্‌লের এডিসন সিম্‌স্‌ ! শিকাগোর বিশ্ব-মেলার পর থেকে তোমাকে আর দেখিনি। ওয়াইলডারনেস হোটেলে আমরা যে সব ফুর্তির অনুষ্ঠান করতাম, সেগুলো তোমার মনে পড়ে কি ? মিডওয়ের (Midway) কথা মনে করতে পার কি ? মনে পড়ে কি···ইত্যাদি, অফুরন্ত কথা। এ প্রক্রিয়ার মনোবিজ্ঞান এত সরল যে, এর আলোচনা করতে গেলে আপনার বুদ্ধিকেই প্রায় অপমান করা হয়, কিন্তু (and) তথাপি আচরণবাদীর সহৃদয় সমালোচকদের বেশ অনেকেই বলেছেন যে, আচরণবাদ স্মৃতির কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এটা সত্য কিনা দেখা যাক।"

তিনি আরও বলেন যে, এই সময়ের মধ্যে, অনেক আগে, যখন সিম্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে এই সাধারণ লোকটির দেখা-সাক্ষাৎ চলছিল তখন তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কতকগুলো শাব্দিক ও দৈহিক অভ্যাস গড়ে ওঠে, যার ফলে "শেষ পর্যন্ত, এমনকি অনেক মাসের অসাক্ষাতের (absence) পরেও লোকটিকে দেখামাত্র কেবল যে পুরাতন শাব্দিক অভ্যাসগুলো জেগে উঠতো তা নয়, এছাড়া আরও অনেক দৈহিক ও আন্ত্রিক অভ্যাসও সজাগ হয়ে উঠতো।"

সংক্ষেপে তিনি বলেন : "তাহলে 'স্মৃতি'র সাহায্যে আমরা এছাড়া আর কিছু বোঝাইনে যে, কিছুকাল অনুপস্থিত থাকার পর আমরা যখন পুনরায় কোন উদ্দীপকের সাক্ষাৎ পাই, তখন আমরা সেই পুরাতন অভ্যাসগত কাজটা করি (পুরাতন শব্দগুলো উচ্চারণ করি এবং পুরাতন আন্ত্রিক—আবেগিক—আচরণ প্রদর্শন করি), সেই উদ্দীপকের প্রথম সাক্ষাতে যে কাজটা আমরা করতে শিখেছিলাম।"

সাধারণ (ordinary) মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলো থেকে এ মতবাদ অনেক দিক থেকেই বেশী পছন্দনীয়। প্রথমতঃ, স্মৃতিকে কোন এক ধরনের রহস্যময় 'বৃত্তি' (faculty) বলে গণ্য করার কোন প্রচেষ্টা এর মধ্যে নেই, এবং এখানে এটাও মনে করা হচ্ছে না যে, কোন উপযুক্ত উদ্দীপকের সাক্ষাৎ পেলে যে সব বিষয় মনে করতে পারতাম, তাদের সবকিছুই আমরা সর্বক্ষণ

মনে করছি। বিশেষ বিশেষ স্মরণক্রিয়া, বাইরে থেকে যাদের পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাদের উৎপত্তির সঙ্গেই এর সম্পর্ক। একে সন্দেহ করার কোন সঙ্গত (good) কারণ আছে কি? কোন উপমাহীন ঘটনার স্মরণক্রিয়া অভ্যাসের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, বার্গসঁর এ মত স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। প্রাণী ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার ফলেই কোন অভ্যাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, কোন পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে অনুষক্ত উদ্দীপক দৈহিক ঘটনার এমন একটা অনুক্রমের (series) জন্ম দেবে, যার ফলে সেই [পূর্ববর্তী] ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার মত উপযুক্ত শব্দাবলী সৃষ্ট হবে। এখানে অবশ্য একটা অসুবিধা আছে। কোন অতীত ঘটনা পুনঃপুনঃ সম্বন্ধবদ্ধ না হ'লে তার স্মৃতি কোন 'শাব্দিক' অভ্যাস হতে পারে না। ওয়াটসনের সাধারণ মানুষ যখন বলে, "মিডওয়ের কথা তোমার মনে পড়ে কি?" তখন সে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করছে না, যেগুলো অভ্যাসগত হয়ে পড়েছে; খুব সম্ভবতঃ এ শব্দগুলো সে পূর্বে কখনও ব্যবহার করেনি। সে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করছে যেগুলোকে কোন শাব্দিক অভ্যাস, তার ভেতরে এখন ঘটছে, এমন কোন ঘটনার সঙ্গে অনুষক্ত করে, এবং সে ঘটনাটা মি. সিম্‌সের সঙ্গে অনুষঙ্গ-বদ্ধ কোন অভ্যাসের মাধ্যমে জেগে ওঠে। এটা আমাদের অন্ততঃ ধরে নিতে হবে, যদি আমরা ওয়াটসনের অভিমত গ্রহণ করি। কিন্তু এতে করে তাঁর অভিমতের সম্ভাব্যতা ও প্রতিপাদ্যতা কমে যায়। আমাদের প্রকৃত (actual) ভাষা নয়, বরং আমাদের শব্দাবলীর মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়, তাকেই অভ্যাসগত বলে মনে করা যেতে পারে। মুখস্থ করা কোন কবিতার পুনরাবৃত্তিতে ভাষাটা অভ্যাসগত, কিন্তু আগে কখনও ব্যবহার করিনি এমন শব্দাবলী ব্যবহার করে আমরা যখন কোন অতীত ঘটনা স্মরণ করি তখন ব্যাপারটা তা নয়। এক্ষেত্রে আমরা পুনরাবৃত্তি করি প্রকৃত শব্দগুলোকে নয়, কেবল তাদের অর্থটাকে। সুতরাং অভ্যাসগত উপাদানটাই যদি স্মৃতির প্রকৃত ভিত্তি হয়, তাহলে সেটাকে অবশ্যই শব্দের মধ্যে খোঁজা ঠিক হবে না।

ভাষা সম্পর্কিত ওয়াটসনীয় মতবাদে এ থেকে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন ইঁদুর যখন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে চলাফেরা করতে শেখে, তখন

সে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট দেহ-সঞ্চালন আয়ত্ত করে; মুখস্থ করার বেলায় আমরাও তাই করি। কিন্তু এক ব্যক্তিকে আমি বলতে পারি, "আজ ট্রেনে মি. জোন্সের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল," এবং অন্যজনকে বলতে পারি, "জোসেফ আজ সকালে ৯'৩৫-এ[১] ছিল।" 'in the'—এই শব্দ দুটো ছাড়া এ বাক্য দুটোতে শাব্দিক দিক থেকে সাধারণ (common) আর কিছু নেই, তথাপি তারা একই সত্য ঘটনা (fact) ব্যক্ত করতে পারে, এবং ঘটনাটা মনে করার সময় বাছ-বিচার না করে আমি এদের যে কোন একটা ব্যবহার করতে পারি। কাজেই আমার স্মৃতি নিশ্চয়ই কোন সুনির্দিষ্ট শাব্দিক অভ্যাস 'নয়'। তথাপি শব্দই একমাত্র প্রকাশ্য দৈহিক সঞ্চলন যার সাহায্যে অন্যান্য লোককে আমার স্মৃতি সম্পর্কে আমি জ্ঞান দান করি। আচরণবাদী যদি বলেন যে, আমার স্মৃতি দৈহিক অভ্যাস, এবং আমাকে এই বলে শুরু করেন যে, এটা একটা 'শাব্দিক' অভ্যাস, তাহলে এ জাতীয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁকে এটা স্বীকার করতে বাধ্য করা যেতে পারে যে, একে অবশ্যই অন্য কোন জাতীয় অভ্যাস হতে হবে। তিনি যদি একথা বলেন তাহলে নিরীক্ষণযোগ্য ঘটনার এলাকা তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন, এবং একটা মতবাদকে রক্ষা করার জন্যে প্রকল্পাত্মক দৈহিক সঞ্চলনের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছেন। কিন্তু এগুলো [দৈহিক সঞ্চলনগুলো] 'চিন্তা'র চেয়ে ভাল কিছু নয়।

স্মৃতির সমস্যার চেয়ে এ প্রশ্নটা আরও বেশী সাধারণ (general)। একই 'অর্থ' প্রকাশ করার জন্যে বিভিন্ন রকমের অনেক শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হতে পারে; এবং বিভিন্ন রকমের শব্দগুচ্ছে যা প্রকাশিত হয় তা 'চিন্তা' করতে গিয়ে আমরা যে কখনও কখনও এক রকমের শব্দগুচ্ছ এবং আবার কখনও কখনও অন্য রকমের শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করি—নিছক অভ্যাসের মধ্যে এ সত্য ব্যাখ্যা করার মত কোন যুক্তি (reason) নিহিত আছে বলে মনে হয় না। অনুষঙ্গটা উদ্দীপক থেকে সরাসরি শব্দের কাছে যায় না; সে যায় উদ্দীপক থেকে 'অর্থে' এবং সেখান থেকে অর্থ-প্রকাশক শব্দে। উদাহরণ স্বরূপ, আপনাকে "জ্যাকব জোসেফের চেয়ে বয়সে বড়" অথবা "জোসেফ

১. অর্থাৎ, ৯'৩৫ মিনিটের ট্রেনে। মূল ইংরেজী বাক্য দুটো :
"I met Mr. Jones in the train to-day."
"Joseph was in the 9·35 this morning." (অনুবাদক)

জ্যাকবের চেয়ে বয়সে ছোট" বলেছিলাম কি-না, সেটা মনে করতে আপনি সম্পূর্ণ অপারগ হতে পারেন, যদিও এই উভয় শব্দগুচ্ছে যে সত্য প্রকাশ করে তা সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্টভাবে আপনি স্মরণ করতে পারেন। আবার, ধরা যাক, আপনি যদি কোন গাণিতিক উপপাদ্যের প্রমাণ শেখেন তাহলে, আপনি খুব নিম্নশ্রেণীর গাণিতিক না হলে, বইয়ে যা বলে তা আপনি মুখস্থ করেন না; আপনি, লোকে যেমন বলে, প্রমাণটা 'বুঝতে' শেখেন, এবং তখন বইয়ের প্রতীকগুলো (symbols) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে আপনি তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সক্ষম হন। আমরা যদি ধরে নিই যে, অনুষঙ্গের পদগুলো শব্দ, অথবা পদগুলোকে এমনকি বাক্য বলেও যদি ধরে নিই, তাহলে অন্যান্য আরও বিষয়ের সঙ্গে এ জাতীয় বিষয়ই, স্মৃতির ক্ষেত্রে অথবা সাধারণভাবে 'চিন্তা'র ক্ষেত্রে, অনুষঙ্গের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করাকে কঠিন ব্যাপার করে তোলে।

যাই হোক, পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে শব্দের 'অর্থ' সম্পর্কে আমরা যে মতবাদ গড়ে তুলেছিলাম, সম্ভবতঃ তার সাহায্যে আমরা এ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি। শব্দের অর্থকে আমরা সংজ্ঞায়িত করেছিলাম তার অনুষঙ্গের (associations) সাহায্যে; সুতরাং, যদি কোন দুটি শব্দ সমার্থক হয় তাহলে তাদের অনুষঙ্গ হবে ভিন্ন; এবং যে কোন উদ্দীপক তাদের একটিকে জাগিয়ে তুললে সেটাতে অন্যটাকেও জাগিয়ে তুলবে। তখন দুই সমার্থক পদের কোন্‌টাকে আমরা ব্যবহার করবো, সেটা নির্ভর করবে কোন বহিঃস্থ অবস্থার উপর।

আলাদা আলাদা শব্দের বেলায় কথাটা বেশ ঠিকই খাটে; যেমন, আমি যে কোন লোককে কখনও কখনও তার গোত্রনামের সাহায্যে এবং কখনও কখনও তার খ্রীস্টীয় নামের সাহায্যে ডাকি, এ জিনিসটা এর সাহায্যে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু বাক্যের সম্পর্কে যখন প্রশ্ন তুলি, তখন কথাটা যে তত সন্তোষজনক তা বলা কঠিন। মুহূর্ত খানেক আগের দৃষ্টান্তে ফিরে গেলে, "আপনার যাত্রাপথে কিছু ঘটেছিল কি?"—এ উদ্দীপকের উত্তরে আপনি হয় বলতে পারেন "আজ ট্রেনে মি. জোন্‌সের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল," নয়তো "জোসেফ আজ সকালে ৯'৩৫-এ ছিল", অথবা সেই একই ঘটনা-প্রকাশক অনির্দিষ্ট-সংখ্যক অন্য

অনেক বাক্যের যে কোন একটা আপনি উচ্চারণ করতে পারেন। আমরা কি ধরে নেব যে, আপনি যখন ট্রেনে ছিলেন তখন আপনি এ বাক্যগুলো নিয়ে একাকী মহড়া দিচ্ছিলেন, যার ফলে এদের প্রত্যেকটি, "আজকের ভ্রমণ", এ শব্দগুলোর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অনুষক্ত হয়ে পড়েছিল? এমন কিছু একটা ধরে নিলে, সেটা স্পষ্টতঃই উদ্ভট হতো। তথাপি আপনার বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোর সব কটিরই আলাদাভাবে অন্যান্য আরও অনেক অনুষঙ্গ রয়েছে; কেবল সামগ্রিকভাবেই বাক্যটা আপনার ভ্রমণের সঙ্গে অনুষক্ত। মি. জোন্স্ ছাড়াও অন্যান্য লোকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছে; আজ সকালের সাক্ষাৎ ছাড়াও মি. জোন্সের সঙ্গে আরও যোগাযোগ আপনার হয়েছে; অন্যান্য যে সব ঘটনার বিবরণ আপনি দিতে পারতেন তাদের বেলায়ও 'ট্রেন' ও 'আজ' সমভাবে উপযোগী। কাজেই আনুষঙ্গিক একক (associative unit) হতে হবে পুরো বাক্যটাকেই, এবং তা সত্ত্বেও হতে পারে যে, বাক্যটা এর আগে কখনও আপনার মাথায় আসেনি। এটা পরিষ্কার মনে হয় যে, আপনার স্মরণাগত কোন কিছুকে শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা সম্ভব, যদিও আপনি পূর্বে কখনও তাকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি। ধরা যাক আমি বললাম, "আজ প্রাতরাশে আপনি কি খেয়েছিলেন?" সম্ভবতঃ আপনি তা বলতে সক্ষম হবেন, যদিও এটা খুবই সম্ভব যে, এ মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত যে সব জিনিস আপনি খেয়েছেন সেগুলোর কোন নাম আপনি দেননি।

ভাষা আলোচনার সময় আমরা বাক্য ও স্বতন্ত্র শব্দের যে পার্থক্যটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে লক্ষ্য করেছিলাম, এই সমস্ত ব্যাপারটাই তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু আমরা যখন স্বতন্ত্র (single) শব্দের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি, এমনকি তখনও ডঃ ওয়াটসনের মতের মধ্যে সমস্যা আছে। এমন দৃষ্টান্ত আছে বলে দাবী করা হয়েছে, যেখানে শিশুরা কথা বলতে শেখার পর এমন সব ঘটনাবলী স্মরণ করেছে এবং নির্ভুল শব্দের মাধ্যমে তাদের বর্ণনা করেছে, যেগুলো ঘটেছে তাদের কথা বলতে শেখার আগে। এর ফলে দেখা যায় যে, তাদের কথা বলতে শেখার পূর্বে গোটা সময়টা ধরে সে স্মৃতি অশাব্দিক আকারে অবস্থান করেছে, এবং কেবলমাত্র তার পরে শাব্দিক প্রকাশ লাভ করেছে। এ-জাতীয় চরম ঘটনা দুর্লভ এবং তাদের

সম্পর্কে সন্দেহ উত্থাপন করাও অযৌক্তিক নয়, কিন্তু এর চেয়ে কম চরম আকারে সে-জাতীয় ব্যাপারের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন হওয়ার কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোন অল্পবয়স্ক শিশু 'কব্জি' (wrist) শব্দটা শেখার আগে সাংঘাতিকভাবে তার কব্জিতে আঘাত পেল, এবং তার কিছুকাল পর সে শব্দটা শিখল ; সে তার কব্জিতে আঘাত পেয়েছিল, এ বিবরণ দিতে পারলে আমি আশ্চর্যান্বিত হবো না। অবশ্য, এ-জাতীর দৃষ্টান্তে ওয়াটসনের মতবাদের সার কথা খণ্ডিত হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি 'আন্ত্রিক' (visceral) স্মৃতি স্বীকার করে নিতে পারেন, এবং তার সঙ্গে 'কব্জি' শব্দটার অনুষঙ্গ জুড়ে দিতে পারেন। আমার মতে, ওয়াটসনের অভিমতের মধ্যে আসল সমস্যাটা এই যে, আমাদের বাক্যটার অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত অভিন্ন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত শব্দের দিক থেকে তা যত খুশী পরিবর্তিত হতে পারে, এবং স্পষ্টতঃই সেই 'অর্থ'-সম্পন্ন সকল সম্ভাব্য বাক্য নিয়ে আমরা আগে থেকেই নিজেদের কাছে মহড়া দিতে থাকি না।

এটা বোঝা উচিৎ যে, কেউ নিরীক্ষণ করতে পারে না এবং ধরে নেওয়ারও অন্য কোন কারণ নেই, আচরণবাদ যদি এ-রকম কোন সঞ্চলনকে পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তাহলে সে তার আকর্ষণীয়তার অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। ডঃ ব্রড তাঁর **The Mind and its Place in Nature** নামক গ্রন্থে 'পিণ্ডগত' ও 'আণবিক'[১] আচরণবাদের মধ্যে পার্থক্য করেনঃ প্রথমটা কেবল এমন-সব দৈহিক সঞ্চলন ধরে নেয় যেগুলোকে নিরীক্ষণ করা যায়, আর দ্বিতীয়টা, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের ভেতরে, অতি ক্ষুদ্র সঞ্চলনকে প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করে এবং সেগুলোকে কাজে লাগায়। এখন, এ জায়গায় আমাদেরকে একটা পার্থক্য করতে হবে। পদার্থবিদ্যা এমন বহুসংখ্যক ঘটনায় (phenomena) বিশ্বাস করে যেগুলো এত ক্ষুদ্র যে, এমন-কি সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়েও তাদের নিরীক্ষণ করা যায় না ; এবং পদার্থবিদ্যা যদি নির্ভুল হয় তাহলে অবশ্যই মানবদেহের সকল অংশে এমন অতিক্ষুদ্র সঞ্চলন রয়েছে যেগুলোকে কখনও আমরা দেখার আশা করতে পারিনে। আচরণবাদীর কাছে এটা দাবী করা উচিত হবে না যে, পদার্থবিদ্যা নিতান্ত সঙ্গত

১. Molar and molecular.

কারণে যে প্রকল্প গ্রহণ করছে, তিনি নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। এবং উদ্দীপক-জনিত প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এমন ঘটনা না ঘটে পারে না, যেগুলো, নিরীক্ষণযোগ্য না হলেও, যা ঘটে তার শরীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আচরণবাদী যখন এমন-সব ঘটনার প্রকল্প গ্রহণ করেন যাদের কোন ভিত্তি পদার্থবিদ্যায় নেই, এবং কেবল তাঁর মতবাদটাকে বাঁচাবার জন্যই যেগুলো প্রয়োজন তখন তাঁর ভিত্তিভূমি আর তত সবল নয়। যেমন, ডঃ ওয়াটসন বলেন যে যখনই আমরা 'চিন্তা করি' তখনই বাকযন্ত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চলনের সৃষ্টি হয়, যেগুলো উচ্চস্বরে শব্দ উচ্চারণ করলে আমরা যে ধরনের সঞ্চলন উৎপন্ন করতাম তাদের প্রারম্ভিক অবস্থা। হতে পারে যে একথা সত্য; আমি অবশ্যই কথাটা অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু এটা আমি বলতে প্রস্তুত নই যে, কথাটাকে কেবল এ কারণেই সত্য 'হতে হবে' যে, এটা সত্য না হলে আচরণবাদ মিথ্যা হবে। আগে থেকেই এটা আমরা জানি না যে আচরণবাদ সত্য; আমাদের দেখতে হবে, এর সাহায্যে নিরীক্ষিত ঘটনাবলী (facts) ব্যাখ্যা করা যাবে কিনা। যখনই এ কেবল খণ্ডন এড়াবার জন্য অনিরীক্ষিত কোন কিছু পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে ধরে নিতে বাধ্য, তখনই এ দাবী দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং এ যদি মনে করে—ডঃ ওয়াটসনের ভাষা থেকে এই মনে হয়—যে, আমরা কোন ঘটনাকে স্মরণ রাখি কেবল সে সম্পর্কে একটা শাব্দিক অভ্যাস গড়ে তুলে, তাহলে একে শব্দের এমন অনেক অপ্রকাশ্য ব্যবহারকে ধরে নিতে হয় যার সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই।

সংক্ষেপে আলোচনাটা এই দাঁড়ায়। যদিও আচরণবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিরীক্ষককে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি কোন অতীত ঘটনা স্মরণ করছে কিনা তা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ সম্ভব, এবং যদিও অভ্যাস হিসাবে সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে অনেক স্মৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, তথাপি, অন্ততঃ ঘটনা স্মরণ করার বেলায়, স্মৃতি 'নিছক' অভ্যাস দিয়ে গড়া, এ মতবাদের মধ্যে বিস্তর অসুবিধা রয়েছে। স্মৃতিকে যদি আমরা 'মূলতঃ' একটা শাব্দিক অভ্যাস বলে ধরে নিই তাহলে এসব অসুবিধা দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়। তারা দুর্লঙ্ঘ্য নয় যদি যথেষ্ট পরিমাণ

তক্ষুদ্র অনিরীক্ষেয় দৈহিক সঞ্চলনকে পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে গ্রহণ করি। ন্তর্দর্শন-লব্ধ উপাত্তের অবতারণা করে তাদের জয় করা যায় কিনা সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখিনি, যেহেতু এখনকার মত আমরা মানুষের আচরণের প্রতি একটা সম্পূর্ণ বিষয়গত (objective) মনোভাব পোষণ করতে চাই। স্মৃতি সম্পর্কে অন্তর্দর্শনভিত্তিক আলোচনার অবতারণা পরবর্তী স্থান এক পর্যায়ে করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

অভ্যাস হিসাবে অনুমান

অন্যে যখন অনুমান করে তখন বাইরে থেকে সেটা কেমন দেখায়, এ অধ্যায়ে আমরা তাই নিয়ে আলোচনা করবো। মনে করা হয় যে, অনুমান বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যন্ত্র থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এর মাঝে ধরা পড়ে। তবে এটাও সত্য যে, পরম্পরাগত যুক্তিবিদ্যায় অনুমানের যে চিত্র ধরা পড়ে তা এত আহম্মকিপূর্ণ যে, এ দাবীর উপর সন্দেহ জাগে, এবং অ্যারিস্টটল থেকে বেকন (বাদ দিয়ে) পর্যন্ত যে সহানুমানকে (syllogistic inference) আদর্শ বলে ধরা হয়েছিল তা এমন একটা ব্যাপার যে, কোন অধ্যাপকের চেয়ে গণনা যন্ত্রই সেটা আরও ভালভাবে করতে পারতো। সহানুমানে আপনাকে আগে থেকেই জানতে হবে যে, সকল মানুষ মরণশীল এবং সক্রেটিস একজন মানুষ; এর থেকে আপনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, সক্রেটিস মরণশীল, যাতে আপনি আগে কখনও সন্দেহ করেননি। এ ধরনের অনুমান বস্তুতঃ ঘটে, যদিও নিতান্ত কালেভদ্রে। একমাত্র যে দৃষ্টান্তটার কথা আমি শুনেছি তা পরিবেশন করেছিলেন ডঃ এফ. সি. এস. শিলার। তিনি একবার দার্শনিক পত্র Mind-এর একটা হাসির সংখ্যা বের করেছিলেন, এবং বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে তার কপি পাঠিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে একজন জার্মানও ছিলেন, যিনি বিজ্ঞপ্তিগুলো দেখে খুব ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যুক্তি দিলেন: "এই পুস্তকের সবকিছুই তামাশা, সুতরাং বিজ্ঞপ্তিগুলোও তামাশা।" সহানুমানের সাহায্যে নতুন জ্ঞান লাভের আর কোন দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েনি। স্বীকার করতে হবে যে, যে পদ্ধতি দুই সহস্র বছর ধরে যুক্তিবিদ্যার রাজ্যে আধিপত্য করছে, জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে তার এটুকু অবদানকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায় না।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রকৃতপক্ষে যে সব অনুমান করি, সহানুমানিক যুক্তিবিদ্যা থেকে দু'বিষয়ে তাদের পার্থক্য: অর্থাৎ, তুচ্ছ ও নিরাপদ না হয়ে তারা বরং গুরুত্বপূর্ণ ও অনিশ্চিত। সহানুমানকে কেতাবী ভীরুতার

ıdemic timidity) এক কীর্তিস্তম্ভ বলে গণ্য করা যেতে পারে: কোন নের যদি ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে-রকম অনুমান করা জনক। সুতরাং মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীরা, তাঁদের জীবনে যেমন তেমনি দের চিন্তায়ও, উর্বরতাকে বাদ দিয়ে নিরাপত্তার সন্ধান করেছেন।

নবজাগরণের (Renaissance) পথ ধরে জগতে এর চেয়ে বেশী দুঃসাহসি-পূর্ণ এক মনোভঙ্গির আবির্ভাব ঘটে; কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে প্রথমে যে রূপ দেখা দেয় সেটা হচ্ছে, অ্যারিস্টটলকে বাদ দিয়ে গ্রীকদেরকে, শেষতঃ প্লেটোকে অনুসরণ করা। কেবল বেকন ও গ্যালিলিওর কাছে পদ্ধতি তার উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়: বেকনের ক্ষেত্রে এক পরি-না হিসাবে, যার বেশীর ভাগ ভ্রান্ত; কিন্তু গ্যালিলিওর ক্ষেত্রে সেটা থেকে ংকার সুফল পাওয়া গিয়েছিল—যেমন, আধুনিক গাণিতিক পদার্থবিস্তার ও প্রতিষ্ঠা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আরোহ যখন পণ্ডিতস্মন্যদের হাতে গিয়ে লো, তখন, অবরোহ যেমন পোষমানা এবং পণ্ডিতসুলভ হয়ে পড়েছিল, রা সেটাকে সে-রকম করে তোলার জন্য কাজে লেগে পড়লো। এর কে যাতে 'সব সময়' সত্য ফলাফল পাওয়া যায়, তার পথ তারা ান করতে লাগলো এবং সেটা করতে গিয়ে এর সাহসিকতা হরণ করে লা। হিউম সংশয়বাদী যুক্তি নিয়ে তাদের মোকাবিলা করলেন এবং র্ণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে, কোন আরোহানুমান যদি করার গ্য হয় তাহলে তার ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই। এর উত্তরে ট জগাখিচুড়ি ও রহস্য এনে দার্শনিক জগতকে প্রতারণা করলেন, যার ত থেকে সে জগৎ এখন-মাত্র নিষ্কৃতি পেতে শুরু করছে। আধুনিক কালের নিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে কান্টের প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু আমার চোখে নি নিছক একটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু ছিলেন না।

পাঠ্যপুস্তকে আরোহের যে চেহারা ধরা পড়ে তার থেকে মোটামুটিভাবে না যায়, আরোহানুমান হচ্ছে: যেহেতু ক ও খ-কে এক সঙ্গে দেখা ছে এবং কখনও আলাদা দেখা যায়নি, সুতরাং তারা সম্ভবতঃ (probably) ব সময়ই এক সঙ্গে আছে, এবং তাদের একটাকে অপরটার চিহ্ন বলে মনে রা যেতে পারে। এ পর্যায়ে এ ধরনের যুক্তিক্রিয়ার যৌক্তিক ন্যায্যতা র্কে পরীক্ষা চালাতে চাইনে; এখনকার মত, আমি একে এমন একটা

ক্রিয়া (practice) বলে বিবেচনা করছি, মানুষ ও প্রাণীর অভ্যাসের মধ্যে যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

ক্রিয়া হিসাবে আরোহ আমাদের পুরাতন বন্ধু, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বা অনুষঙ্গ নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়। একটি শিশু একটা নবে (knob) হাত দেয় এবং সেটা থেকে সে বিদ্যুতের ধাক্কা খায়; এরপর সে নবে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কথা বলার মত যথেষ্ট বয়স হলে সে বলতে পারে যে, স্পর্শ করলে নব আঘাত করে; একটিমাত্র দৃষ্টান্ত থেকে সে একটা আরোহের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সে যদি কথা বলতে না পারার মত অল্পবয়স্ক হয়, তাহলেও এ আরোহটা একটা দৈহিক অভ্যাস হিসাবে বেঁচে থাকবে এবং প্রাণী যদি নিতান্ত নিম্নমানের না হয় তাহলে তাদের মধ্যেও সমভাবেই এর আবির্ভাব ঘটে। যুক্তিবিস্তার আরোহ সংক্রান্ত মতবাদগুলোকে ফ্রয়েডীয়রা 'যুক্ত্যাভ্যাস' (rationalisation) বলে; অর্থাৎ কিনা, আমরা যা করছি তা যে অর্থপূর্ণ (sensible), সেটা প্রমাণ করার জন্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত যুক্তিই হচ্ছে সেগুলো। এর থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সেগুলো মন্দ যুক্তি: জীবনের উন্মেষকাল থেকে আমরা এবং পূর্বপুরুষেরা যে বেঁচে থাকতে পেরেছেন, এ সত্যের আলোকে স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের ও তাদের আচরণ নিশ্চয় যথেষ্ট অর্থপূর্ণ ছিল, যদিও আমরা ও তারা প্রমাণ করতে পারিনি যে, সেটা তাই ছিল। অবশ্য, এ মুহূর্তে এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এ মুহূর্তে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে-- শাব্দিক আরোহ আচরণগত আরোহেরই একটা পরবর্তী উন্নত পর্যায়, এবং আচরণ-গত আরোহ "শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া" নিয়মের চেয়ে কম-বেশী কিছু নয়।

পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, এ নিয়মটার বক্তব্য এই যে, যদি কোন ঘটনা কোন বিশেষ প্রতিবেদনের উদ্রেক করে এবং যদি অন্য কোন ঘটনা এর ঠিক আগে কিংবা একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহলে কালক্রমে, যে প্রতিবেদন আদিতে কেবল প্রথম ঘটনার ফলে সৃষ্ট হতো, অন্য ঘটনার মধ্যে সেই প্রতিবেদন জাগাবার একটা প্রবণতা দেখা দেবে। পেশী ও মাংসগ্রন্থি, উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য; এবং যেহেতু মাংসগ্রন্থির বেলায় এটা প্রযোজ্য, সেজন্যই শব্দ আবেগের জন্ম দিতে সক্ষম। অধিকন্তু, যে অনুষঙ্গ-শৃঙ্খল গড়ে উঠতে পারে তার দৈর্ঘ্যের উপরও আমরা কোন

সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দিতে পারি না। কোন শিশুর হাত ধরলে আপনি একটা ক্রোধাত্মক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলেন; একে একটা "শিক্ষানিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া" বলে মনে হয়। যদি আপনি, আর কেউ নয়, বার বার কোন শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধরেন, তাহলে কিছুকাল পর কেবল আপনাকে দেখা-মাত্র তার মধ্যে একটা ক্রোধাত্মক প্রতিক্রিয়া জেগে উঠবে। শিশু যখন কথা বলতে শিখবে তখন আপনার নাম থেকে একই ফলোদয় হতে পারে। পরে সে যদি জানতে পারে যে, আপনি একজন চশমা প্রস্তুতকারক তাহলে সে সকল চশমা প্রস্তুতকারককেই ঘৃণা করতে আরম্ভ করতে পারে; এর ফলে সে স্পিনোজাকে ঘৃণা করতে পারে, যেহেতু তিনি চশমা প্রস্তুত করতেন, এবং তার পর সে দার্শনিক ও ইহুদীদেরকেও ঘৃণা করা আরম্ভ করতে পারে। সন্দেহ নেই যে, এটা করার পক্ষে সে সবচেয়ে প্রশংসনীয় যুক্তি খোঁজে, যেগুলো তার কাছে তার আসল যুক্তি বলে মনে হবে; যে সাপেক্ষীকরণ (conditioning) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে আসলে কু ক্লাক্স ক্ল্যান-এর[১] জন্য তার উৎসাহে এসে পৌঁছেছে তাকে সে কখনও সন্দেহ করবে না। আবেগের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণের এটা একটা দৃষ্টান্ত; কিন্তু আমাদেরকে বরং পেশার এলাকায় আরোহানুমানের অভ্যাসের উৎস সন্ধান করতে হবে।

যেসব গৃহপালিত প্রাণীকে কোন ব্যক্তি নিয়মিতভাবে (habitually) খাওয়ায়, তাকে দেখামাত্র তারা সেই ব্যক্তির দিকে ছুটবে। আমরা বলি যে তারা খাদ্য আশা করে, এবং বস্তুতই তারা খাদ্য দেখলে তাদের আচরণ যে-রকম হতো, তাদের আচরণ অনেকটা সে-রকম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কেবল 'সাপেক্ষীকরণে'র একটা দৃষ্টান্ত পাচ্ছি: তারা প্রায়শঃ প্রথমে কৃষক (farmer) এবং তারপর খাদ্য দেখেছে, যার ফলে তারা আদিতে খাদ্য দর্শনে যে-রকম প্রতিক্রিয়া করতো, কালক্রমে কৃষককে দেখেও সে-রকম প্রতিক্রিয়া করে। শিশুরা যদিও প্রথমে কেবল বোতলের স্পর্শলাভে প্রতিক্রিয়া করে, অনতিবিলম্বে তারা তাকে দেখতে পেলেই প্রতিক্রিয়া করে। তারা যখন কথা বলতে পারে, তখন সেই একই নিয়মের বলে তারা ডিনারের ঘণ্টা

১. Ku Klux Klan : যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের পর তার দক্ষিণাংশে সংগঠিত গুপ্তদল। (অনুবাদক)

শুনে 'ডিনার' (dinner) শব্দটা উচ্চারণ করে। এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন যে, তারা প্রথমে চিন্তা করে "ওই ঘণ্টার অর্থ ডিনার," এবং তারপর 'ডিনার' বলে। ডিনারের দৃশ্য (পূর্ববর্তী কোন "শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া"র মাধ্যমে) 'ডিনার' শব্দের জন্ম দেয়ঃ ঘণ্টাধ্বনি পুনঃ পুনঃ ডিনারের দৃশ্যের আগে শোনা যায়; সেজন্য কালক্রমে ঘণ্টাধ্বনি 'ডিনার' শব্দটা উৎপন্ন করে। কেবল তার পরবর্তীকালে চিন্তা করার ফলে—এবং সেটাও ঘটে সম্ভবতঃ আরও অনেক বয়স হবার পর—সে বলে "আমি জানতাম যে ডিনার তৈরী ছিল কারণ আমি ঘণ্টাধ্বনি শুনেছিলাম।" একথা বলতে সক্ষম হওয়ার বহু পূর্বেই সে এমন হাবভাব করছে, যেন মনে হয় সে তা জানতো। এবং জানলে যে-রকম করার কথা, যখন সে সে-রকম করে তখন অস্বীকার করার কোন উপযুক্ত কারণ নেই যে, সে তা জানে। জ্ঞানকে যদি আচরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তাহলে তার প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে আমাদের নিজেদেরকে কেবল 'শাব্দিক' আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার কোন যথার্থ কারণ নেই।

বিমূর্তভাবে বলতে গেলে, অবস্থাটা নিম্নরূপ। গোড়ায় উদ্দীপক ক প্রতিক্রিয়া গ উৎপন্ন করেছিল; এখন উদ্দীপক খ অনুষঙ্গের ফলে তা উৎপন্ন করছে। এইভাবে খ ক-এর একটা 'চিহ্ন' (sign) পরিণত হয়েছে, এই অর্থে যে, ক-এর জন্য যে আচরণ উপযুক্ত সে তা উৎপন্ন করছে। সব রকমের জিনিসই অন্য জিনিসের চিহ্ন হতে পারে, কিন্তু মানুষের বেলায় শব্দই হচ্ছে চিহ্নের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সব চিহ্নই কোন-একটা ব্যবহারিক আরোহের (practical induction) উপর নির্ভর করে। যখনই আমরা কোন উক্তি পড়ি বা শুনি, তার কার্য এ অর্থেই আরোহের উপর নির্ভর করে; যেহেতু শব্দে যা বোঝায় শব্দ এ অর্থে তাদের চিহ্ন যে, কোন কোন বিষয়ে (respects) আমরা তাদের উপর সেই রকম প্রতিক্রিয়া করি, তারা যে জিনিসের চিহ্ন সে জিনিসের উপর আমরা যে-রকম প্রতিক্রিয়া করতাম। কেউ যদি আপনাকে বলে "আপনার ঘরে আগুন লেগেছে," আপনার উপর তার ফল কার্যতঃ এমন হবে যেন আপনি প্রজ্জ্বলনটা দেখছেন। আপনি অবশ্য প্রতারণার শিকার হতে পারেন, এবং সেক্ষেত্রে আপনার মনে যে উদ্দেশ্য আছে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ভুল করার এ ভয় সবসময়ই আছে; যেহেতু দুটো জিনিস

যে অতীতে এক সঙ্গে ঘটেছে, এ সত্য থেকে এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না যে, ভবিষ্যতে তারা এক সঙ্গে ঘটবে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার আমরা নাম দিতে পারি "শরীরবৃত্তীয় আরোহ" (physiological induction), এবং বৈজ্ঞানিক আরোহ হচ্ছে একে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা। এটা অতি স্পষ্ট যে, প্রাণী, শিশু, এবং অসভ্য লোকেরা যে ভাবে শরীরবৃত্তীয় আরোহ সম্পাদন করে তাতে প্রায়শঃ এর থেকে ভুল সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। আছে ডঃ ওয়াটসনের শিশু, যে দুটো দৃষ্টান্ত থেকে আরোহানুমান করেছিল যে, যখনই সে একটা ইঁদুর দেখবে তখনই একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে। আছেন এডমাণ্ড বার্ক, যিনি একটি দৃষ্টান্ত (ক্রমওয়েল) থেকে আরোহানুমান করেছিলেন যে, বিপ্লবের ফলে জঙ্গী স্বেচ্ছাচারতন্ত্র দেখা দেয়। অসভ্য মানুষেরা আছে, যারা একটা খারাপ মৌসুম থেকে অনুমান করে যে, কোন সাদা লোকের আবির্ভাব ঘটলে ফসল খারাপ হয়। ১৩৪৮-এ সিয়েনার (Siena) অধিবাসীরা মনে করেছিল যে, কালো মড়ক হচ্ছে অতিবড় একটা ক্যাথিড্রাল তৈরী আরম্ভ করার গর্বের জন্য শাস্তি। এ জাতীয় দৃষ্টান্তের কোন সীমা-সংখ্যা নেই। সুতরাং যদি সম্ভব হয় তাহলে যে পদ্ধতিতে আরোহ সম্পাদন করলে তার থেকে সচরাচর নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যাবে, সে-রকম একটা পদ্ধতি খুঁজে বের করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমস্যা, যাকে আমরা এখন পর্যন্ত আলোচনার মধ্যে আনবো না।

এখনকার মত আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, বাস্তবক্ষেত্রে যে ধরনের অনুমান ঘটে তাদের সবগুলোই এই সাপেক্ষীকরণ নিয়মের (principle of conditioning) উন্নত সংস্করণ। কার্যতঃ, অনুমান দুই শ্রেণীর—তার একটার আদর্শ রূপ আরোহ এবং অপরটার গাণিতিক যুক্তি। আগেরটা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু আমরা দেখেছি যে, চিহ্নের সকল ব্যবহার, সকল অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক সাধারণীকরণ এবং তারা যে সব অভ্যাসের শাব্দিক প্রকাশ সেইসব অভ্যাস এর আওতাভুক্ত। আমি জানি যে, ঐতিহ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এ ধরনের দৃষ্টান্তগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমানের কথা বলা উদ্ভট ঠেকে। যেমন, আপনি খবরের কাগজে দেখতে পান যে, এই-এই রকমের একটা ঘোড়া ডার্বি জিতেছে। আমার নিজের শব্দ-প্রয়োগ অনুসারে,

আপনি যখন সেটা থেকে এ বিশ্বাসে পৌঁছেন যে, সেই ঘোড়াটা জিতেছে তখন আপনি আরোহানুমান করছেন। উদ্দীপকটা তৈরী সাদা কাগজের উপর—অথবা সম্ভবতঃ পাটলবর্ণ কাগজের উপর—কতকগুলো কালো চিহ্ন দিয়ে। ঘোড়া ও ডার্বির সঙ্গে এ উদ্দীপকের সম্বন্ধ কেবল অনুষঙ্গের মাধ্যমে ; তথাপি ডার্বির ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া উপযুক্ত আপনার প্রতিক্রিয়া তাই। ঐতিহ্যগতভাবে, যেখানে একটা 'মানসিক প্রক্রিয়া' আছে, যে প্রক্রিয়া 'হেতুবাক্যগুলো'র উপর বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তাদের যোগাযোগ সম্পর্কে একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে 'সিদ্ধান্তে' এসে পৌঁছে—অনুমান কেবল সেখানেই আছে। উপরের শব্দগুলোর অনুরূপ শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়, সে প্রক্রিয়া কখনও ঘটে না, এমন কথা আমি বলছি না ; সেটা নিশ্চয়ই ঘটে। আমি যা বলছি সেটা এই যে, সবচেয়ে বিস্তারিত আরোহ এবং সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের "শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া"র মধ্যে উৎপত্তিগত ও কারণগতভাবে কোন গুরুতর পার্থক্য নেই। একটা কেবল অপরটার উন্নত রূপ, মৌলিক অর্থে ভিন্ন কিছু নয়। এবং যদিও আরোহের ফলাফলে যুক্তিবিদ হিসাবে বিশ্বাস স্থাপনের কোন কারণ আমাদের নেই, তথাপি আমরা যে বিশ্বাস করতে স্থির-সংকল্প তার আসল কারণ অনুষঙ্গ নিয়মের শক্তি ; ডঃ স্যান্টায়ানা যাকে "জৈবিক বিশ্বাস" (animal faith) বলেন, এ তারই একটা দৃষ্টান্ত—সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

গাণিতিক যুক্তির সমস্যাটা এর চেয়ে জটিল। আমি মনে করি যে, আমরা এটা বলতে পারি যে, গণিতে সব ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তটা কেবল হেতুবাক্যের সম্পূর্ণটা অথবা তার একটা অংশ-বিশেষ প্রকাশ করে, যদিও সচরাচর সেটা করা হয় নতুন ভাষায়। গণিতের সমস্যাটা হচ্ছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ সত্যটা উপলব্ধি করা। কার্যতঃ, গাণিতিকের কাছে কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকে যেগুলোর সাহায্যে তার প্রতীকগুলো ব্যবহার করা যায়, এবং বিলিয়ার্ড-খেলোয়াড় যেমন করেন ঠিক সেইভাবে ওই নিয়মগুলোর সাহায্যে কাজ করে তিনি তাঁর বিশেষ প্রকৌশল আয়ত্ত করেন। কিন্তু গণিত আর বিলিয়ার্ডের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে : বিলিয়ার্ডের নিয়মগুলো স্বেচ্ছাকৃত, যেক্ষেত্রে গণিতে অন্ততঃ কিছু নিয়ম কোন এক অর্থে 'সত্য'। এ নিয়মগুলো যে সঠিক সেটা না 'দেখা' পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সম্পর্কে

বলা যাবে না যে, তিনি গণিত বুঝেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারটা কি? আমি মনে করি যে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বুঝি যে, 'নেপোলিয়ন' ও 'বোনাপার্ট' একই ব্যক্তি নির্দেশ করে, এটা তারই একটা অধিকতর জটিল দৃষ্টান্ত-মাত্র। তবে এটা ব্যাখ্যা করতে হলে, 'ভাষা'র উপর লিখিত অধ্যায়ে আকারের (form) উপলব্ধি সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল, সেটাতে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

আকার দেখে প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা মানুষের আছে। সন্দেহ নেই যে, উন্নততর প্রাণীকুলের কতকগুলোর মধ্যেও সে ক্ষমতা আছে, যদিও পরিমাণে সেটা মানুষের মত মোটেই নয়; এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রজাতি-সমূহের সামান্য কয়েকটি ছাড়া অন্য প্রাণীদের মধ্যে সেটা প্রায় নেই বললেই চলে। মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর তারতম্য ঘটে, এবং সচরাচর কৈশোর পর্যন্ত এ শক্তি বেড়ে যেতে থাকে। আমার মতে 'বুদ্ধি'র (intellect) মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই [শক্তিটাই]। কিন্তু প্রথমে দেখা যাক এ শক্তিটা কিসের মধ্যে থাকে।

কোন শিশুকে যখন পড়তে শেখানো হচ্ছে তখন সে কোন একটা বর্ণ, ধরা যাক সেটা H, চিনতে শেখে—সেটা বড় হোক বা ছোট হোক, কালো হোক অথবা সাদা বা লাল। এসব বিষয়ে সেটার তারতম্য যাই হোক না কেন, তার প্রতিক্রিয়া একই থাকে: সে বলে 'H'। অর্থাৎ, উদ্দীপকের মধ্যে মূল বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে তার 'আকার'। আমার তিন বছরের সামান্য কম বয়সের ছেলে যখন রুটি-মাখনের ত্রিকোণাকার একটা টুকরা খেতে যাচ্ছে তখন তাকে বললাম যে, এটা একটা ত্রিভুজ। (তার টুকরো-গুলো সাধারণতঃ চতুষ্কোণ হতো।) পরদিন সে কোন রকম প্রযোজনা ছাড়াই অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল-এর পাকা মেঝের ত্রিকোণাকার খণ্ডগুলোর দিকে সংকেত করলো, এবং তাদেরকে বললো 'ত্রিভুজ'। কাজেই যে জিনিসটা তার মনে দাগ কেটেছিল সেটা রুটি-মাখনের আকার—তার ভোজ্যতা, তার নরমত্ব, তার স্বাদ, ইত্যাদি কিছু নয়। এ জাতীয় জিনিসই আকারের উত্তরে সবচেয়ে প্রাথমিক ধরনের প্রতিক্রিয়া।

এখন, অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের অনুরূপভাবে 'জড়' ও 'আকার'-কে মানের ক্রমানুসারে সাজানো যায়। ত্রিভুজ থেকে আমরা বহুভুজের (polygon)

দিকে এগোতে পারি, তা থেকে ক্ষেত্রে (figure), এবং সেখান থেকে বহু বিন্দুর সমাহারের (manifold of points) দিকে। তারপরও আমরা এগোতে পারি এবং 'বিন্দু'-কে একটা আকারিক ধারণায় পরিণত করতে পারি, যার অর্থ হবে "এমন একটা-কিছু যার মধ্যে, কতিপয় আকারিক দিক থেকে, দৈশিক সম্বন্ধের অনুরূপ সম্বন্ধ আছে।" এদের প্রত্যেকটাই 'জড়' থেকে দূরের দিকে এবং ক্রমশঃ 'আকারে'র রাজ্যের ভেতরের দিকে একটা পদক্ষেপ-বিশেষ। প্রতি পর্যায়েই সমস্যা বাড়ে। সমস্যাটা হচ্ছে এ জাতীয় কোন উদ্দীপকের জবাবে একটা সমরূপ প্রতিক্রিয়া (অবসাদ ছাড়া) পাওয়ার সমস্যা। কোন গাণিতিক উক্তি যখন আমরা 'বুঝি' তখন তার অর্থ হচ্ছে, উপযুক্ত ভাবে এর উত্তরে আমরা প্রতিক্রিয়া করতে পারি—বস্তুতঃ, তার একটা 'অর্থ' আছে আমাদের জন্য। 'বিড়াল' শব্দটা 'বোঝা'র দ্বারাও আমরা এ-ই বোঝাই। কিন্তু 'বিড়াল' শব্দটা বোঝা সহজতর, কারণ বিভিন্ন বিড়ালের মধ্যে এ-রকম সাদৃশ্য আছে যে, তার ফলে এমন-কি প্রাণীদের মধ্যেও সকল বিড়ালের ক্ষেত্রে সমরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যখন আমরা বীজগণিতে আসি এবং x ও y নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, তখন স্বভাবতঃই জানতে ইচ্ছা করে x ও y বস্তুতঃ কি? অন্ততঃ আমার মনোভাব ছিল তাই ঃ আমি সর্বদাই ভাবতাম যে, শিক্ষক জানেন আসলে তারা কি, কিন্তু আমাকে বলবেন না। বীজগণিতের সরলতম সূত্রটি—যেমন, $(x+y)^2 = x^2+2xy+y^2$—বোঝায় অর্থও হচ্ছে, দুই প্রস্থ প্রতীক যে আকার প্রকাশ করে তার সাহায্যে তাদের দেখে প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হওয়া, এবং অনুভব করা যে উভয় ক্ষেত্রে আকারটা এক। এটা খুবই বিস্তৃত ব্যাপার, এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, বালক-বালিকারা বীজগণিতকে জুজুর মত ভয় করে। কিন্তু আকারের প্রারম্ভকালীন প্রাথমিক উপলব্ধির পর নীতিগতভাবে আর কোন নতুনত্ব নেই। এবং আকারের উপলব্ধি এছাড়া আর কিছু নয় যে, দুটো উদ্দীপক অন্যান্য বিষয়ে অনেক ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রতিক্রিয়া করা। কারণ সেটা যখন আমরা করতে পারি তখন, উপযুক্ত উপলক্ষ দেখা দিলে, আমরা বলতে পারি, "ওটা একটা ত্রিভুজ"; এবং আমরা যে জানি ত্রিভুজ কি, সে সম্পর্কে পরীক্ষককে সন্তুষ্ট করার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট, যদি-না তিনি এত সেকেলে

হন যে, তিনি আশা করেন আমরা শাব্দিক সংজ্ঞাটার পুনরাবৃত্তি করি। এ কাজটা অবশ্য আরও সহজ ব্যাপার, যাতে ধৈর্য থাকলে আমরা একটা তোতা পাখীকেও সফলকাম হতে শিক্ষা দিতে পারি।

জটিল গাণিতিক প্রতীকের অর্থ সব সময়ই নির্ধারিত হয় সরলতর প্রতীক-সমূহের অর্থ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর সাহায্যে; কাজেই তাদের অর্থ পৃথক শব্দের নয়, বাক্যের অর্থের অনুরূপ। সুতরাং, বাক্যের অর্থ বোঝা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছিল, তা গণিতের যেকোন প্রতীকগুচ্ছ সম্পর্কে সত্য—যে প্রতীকগুচ্ছের অর্থ অন্য কোন গুচ্ছের অর্থ বা তার অর্থের অংশ-বিশেষের সঙ্গে অভিন্ন হবে।

এ আলোচনা আমরা সংক্ষেপ করে ফেলতে পারি এই বলে যে, যে দুই প্রতীকগুচ্ছের[১] অর্থ তাদের সংগঠক অংশাবলী সম্পর্কিত প্রচল-কর্তৃক[২] নির্ধারিত হয়, সেই প্রতীকগুচ্ছের সঙ্গে একই প্রতিক্রিয়া যুক্ত করার মধ্যেই গাণিতিক অনুমান নিহিত; এবং অপর দিকে, আরোহ হচ্ছে প্রথমে কোন কিছুকে অন্য কোন কিছুর চিহ্ন বলে মনে করা, এবং পরে, আমরা যখন ক-কে খ-এর চিহ্ন বলে ধরতে শিখেছি তখন ক-কে গ-এর চিহ্ন বলেও ধরে নেওয়া। এইভাবে আরোহ ও অবরোহের সাধারণ দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা এই যে, আগেরগুলোতে অনুমানটা হচ্ছে একই চিহ্নকে দুটো ভিন্ন জিনিসের চিহ্ন বলে ধরে নেওয়া, এবং পরেরগুলোতে অনুমানটা হচ্ছে দুটো ভিন্ন চিহ্নকে একই জিনিসের চিহ্ন বলে ধরে নেওয়া। এ কথাটা কতক পরিমাণে এত বিরোধাত্মক যে, এর মধ্যে বিষয়টার পূর্ণ সত্যের প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করা যায় না। তবে যে কথাটা সত্য সেটা এই যে, উভয় প্রকারের অনুমানই চিহ্ন ও চিহ্নিতের সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং সেজন্য তারা অনুষঙ্গ নিয়মের আওতার মধ্যে পড়ে।

১. প্রতীক—Sign; ২. প্রচল—Convention.

অষ্টম অধ্যায়

আচরণবাদী দৃষ্টিতে জ্ঞান

'স্মৃতি' শব্দের মত 'জ্ঞান' (knowledge) শব্দটাও আচরণবাদী এড়িয়ে চলেন। তথাপি একটা ব্যাপার আছে যাকে সাধারণতঃ 'জ্ঞান' বলা হয়, এবং আচরণবাদী প্রণালীতে পরীক্ষার মধ্যে যাকে পরখ করা হয়। এ ব্যাপারটা নিয়েই এ অধ্যায়ে আমি আলোচনা করতে চাই, এবং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আচরণবাদী দিতে পারেন না—সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসা।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যে অভিমতে পৌঁছে-ছিলাম সেটা এই: জ্ঞান হচ্ছে উদ্দীপক থেকে প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটার একটা বৈশিষ্ট্য; দৃষ্টি ও শ্রবণের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা এমন-কি কোন বাহ্য বস্তু থেকে প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, এবং বাহ্য বস্তুটা উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হবে বাহ্য জগতে অবস্থিত কোন ভৌত (physical) কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা। এখনকার মতো, দৃষ্টি ও শ্রবণের শ্রেণীভুক্ত বিষয়গুলোকে ছেড়ে দিয়ে, সঠিকতার খাতিরে, স্পর্শ-লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখা যাক।

আমরা দেখতে পাই যে, কীট ও সামুদ্রিক অ্যানেমনির (anemone) মত খুব সাধারণ প্রাণীর মধ্যে স্পর্শ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। আমরা কি বলবো যে, তারা যা স্পর্শ করে তার সম্পর্কে তারা 'জ্ঞান' লাভ করে? এক অর্থে, হাঁ। জ্ঞান একটা মাত্রাগত ব্যাপার। একে যখন বিশুদ্ধ আচরণ বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তখন আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, যেখানেই কোন বিশেষ রকমের উদ্দীপকের জবাবে একটা বৈশিষ্ট্যসূচক (characteristic) প্রতিক্রিয়া আছে, এবং সঠিক প্রকারের উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে সে প্রতিক্রিয়া না ঘটে, সেখানেই কোন এক মাত্রায় জ্ঞান আছে। এ অর্থে, যে "সংবেদনশীলতা"র কথা প্রত্যক্ষণের প্রসঙ্গে আমরা

াালোচনা করেছিলাম, 'জ্ঞান'কে সেটা থেকে পৃথক করা যায় না। আমরা লতে পারি যে, থার্মোমিটার তাপকে 'জানে' এবং কম্পাস 'জানে' ম্বকধর্মী উত্তর দিকটা কোন্ দিকে। কেবল এ অর্থেই, পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিম্নমানের প্রাণীকুলে আমরা জ্ঞান আরোপ করতে পারি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আলোর সামনে পড়লে অনেক প্রাণী নিজেদের লুকিয়ে ফেলে, কিন্তু াচরাচর অন্য অবস্থায় তা করে না। এ বিষয়ে রেডিয়মিটার থেকে তাদের কোন পার্থক্য নেই। সন্দেহ নেই যে, পদ্ধতিটা ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যক্ষিত দেহ-সঞ্চালনের (molar motions) বৈশিষ্ট্যগুলো একরূপ। যেখানেই একটা অনুবর্ত ঘটে, সেখানেই কোন এক অর্থে বলা যায় যে, প্রাণী উদ্দীপকটাকে 'জানে'। সন্দেহ নেই যে, এটা 'জ্ঞান'-এর সাধারণ অর্থ নয়, কিন্তু সাধারণ অর্থে জ্ঞান বলতে যা বুঝি, এ বীজাণু থেকে তার উদ্ভব ঘটেছে এবং একে ছাড়া কোন জ্ঞান সম্ভব হতো না।

যে কোন উন্নততর অর্থে জ্ঞান কেবল শিক্ষণের ফল হিসাবেই সম্ভব—শিক্ষণের যে অর্থ আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সেই অর্থে। গোলকধাঁধাকে যে ইঁদুর শিখেছে সে তার ভেতর থেকে বাইরে আসার পথ 'জানে'; যে ছেলে কতকগুলো শাব্দিক প্রতিক্রিয়া শিখেছে সে নামতা 'জানে'। এই দু' ক্ষেত্রের মধ্যে কোন গুরুতর পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা বলি যে, কর্তা (subject) কিছু 'জানে' কারণ তার নিজের সুবিধাজনক কোন-এক প্রকারে সে প্রতিক্রিয়া করতে পারে, কতকগুলো অভিজ্ঞতা অর্জনের আগে যে প্রকারে সে প্রতিক্রিয়া করতে পারতো না। তবে আমি মনে করি না যে, জ্ঞানের প্রসঙ্গে "সুবিধাজনক"-এর (advantageous) মত কোন ধারণা আমাদের ব্যবহার করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গোলকধাঁধার ভেতরকার ইঁদুরের বেলায় আমরা যা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তা হচ্ছে প্রচণ্ড ক্রিয়াকলাপ, যা চলতে থাকে খাদ্যে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত, এবং তার পরে আসে খাদ্যে পৌঁছানোর পর ভক্ষণকার্য; এবং আমরা আরও দেখি যে, যে ক্রিয়াগুলো ইঁদুরকে খাদ্যের নিকট নিয়ে যায় না সেগুলো ধীরে ধীরে বাদ পড়ে যায়। এ জাতীয় আচরণ যেখানে দেখা যায়, আমরা সেখানে বলতে পারি যে, এর লক্ষ্যবস্তু খাদ্য, এবং প্রাণীটা যখন সবচেয়ে হ্রস্ব পথ ধরে তার কাছে পৌঁছে তখন সে পথটাকে 'জানে'।

কিন্তু এ অভিমত সত্য হলে, যে অবস্থার (circumstances) দিকে প্রাণীর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত তার কথা উল্লেখ না করে শিক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানের কোন সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি না। লৌকিক ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, প্রাণীটা এ জাতীয় অবস্থা "কামনা করে" (desires)। 'জ্ঞান'-এর মত 'কামনা'রও একটা আচরণবাদী সংজ্ঞা দেওয়া চলে, এবং মনে হয় যে, এ দুটো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। তাহলে 'কামনা' সম্পর্কে আচরণবাদী আলোচনার উপর কিঞ্চিৎ সময় ব্যয় করা যাক।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে কামনার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ক্ষুধা। ক্ষুধার উদ্দীপক একটা সুনির্দিষ্ট দৈহিক অবস্থা। কোন প্রাণী যখন এ অবস্থায় পড়ে তখন সে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করে; সে যদি খাবার দেখতে বা শুঁকতে পায় তাহলে সে এমনভাবে এগোবে যার ফলে অভ্যস্ত পরিবেশে সে খাবারের কাছে এসে পৌঁছাতে পারে; যদি সে তার কাছে পৌঁছায় তাহলে সে খায়, এবং তার পরিমাণটা যদি যথেষ্ট হয় তাহলে সে শান্ত হয়। সংক্ষেপে এ জাতীয় আচরণ সম্পর্কে বলা যায় যে, ক্ষুধার্ত প্রাণী খাদ্য "কামনা করে"। নির্জীব জড়ের আচরণ থেকে এ আচরণ নানাভাবে ভিন্ন, কারণ কোন একটা বিশেষ অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত অস্থির নড়াচড়া চলতে থাকে। উদ্দিষ্ট অবস্থার বাস্তবায়নের জন্য এই নড়াচড়া সবচেয়ে উপযুক্ত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এক পাইক-মাছকে (pike) কাচের দেয়ালের এক পার্শ্বে রাখা হয়েছিল, এবং অপর পার্শ্বে ছিল মাছের পোনা (minnows)—সে পাইকের কথা সবাই জানে। কাচের গায়ে সে নাক দিয়ে অবিরাম গুঁতা মারছিল, এবং ছয় সপ্তাহ পর সে তাদের ধরার প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয়। এর পর যখন দেয়াল সরিয়ে ফেলা হয় তখনও সে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা থেকে বিরত থাকে। আমি জানি না, ঘুরপথ ধরে মাছের পোনার কাছে পৌঁছানোর সম্ভাব্যতা রেখে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল কিনা। সম্ভবতঃ ঘুরপথ ধরতে শেখার জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধির দরকার তা মাছের সাধ্যাতীত; তবে এ বিষয়ে কুকুর বা বানরের বেলায় কোন অসুবিধা নেই।

ক্ষুধার বেলায় যা সত্য, বাসনার অন্যান্য রূপের ক্ষেত্রেও তা সত্য। প্রত্যেক প্রাণীরই 'বাসনা'র (desire) একটা সহজাত সাধন-উপায় (apparatus) আছে;

গুলো দৈহিক অবস্থায় সে এমন অস্থিরভাবে কাজ করতে প্রযোজিত য়, যার ফলে কোন একটা অনুবর্ত সম্পাদন করার প্রবণতা তার মধ্যে গে ওঠে, এবং বারংবার যদি কোন একটা বিশেষ অবস্থার পুনরাবৃত্তি টে তাহলে অধিক থেকে অধিকতর দ্রুতগতিতে প্রাণীটা সেই অনুবর্ত সম্পাদন করতে প্রয়াসী হয়। এই শেষের কথাটা অবশ্য কেবল উন্নততর প্রাণীর ক্ষেত্রে সত্য; অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রাণীর মধ্যে প্রক্রিয়াটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা অনুবর্ত, এবং সেজন্য কেবল স্বাভাবিক অবস্থায় তা সার্থকতা লাভ করে। উন্নততর প্রাণীকুলের, এবং তার চেয়েও বিশেষ াবে মানুষের আচরণের মধ্যে, আনুপাতিক হারে অনুবর্তের চেয়ে শিক্ষণের রিমাণ অধিক, এবং সেজন্য নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়া-ার ব্যাপারে তাদের সামর্থ্য বেশী। বয়স্কদের অভিযোজন ক্ষমতার পক্ষে শিশুদের অসহায় অবস্থা একটা অত্যাবশ্যক শর্ত; প্রাণীদের শাবকের চেয়ে শিশুদের হিতকর অনুবর্তের সংখ্যা কম, কিন্তু হিতকর অভ্যাস গঠন করার ক্ষমতা তাদের অনেক বেশী; এসব অভ্যাসকে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, এবং জন্ম থেকে তাদের কোন অপরিবর্তনীয় সুনির্দিষ্ট রূপ থাকে না। পশুর বুদ্ধির চাইতে মানব-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে এ সত্যটার যোগাযোগ আছে।

বাসনা আত্যন্তিকভাবে সাপেক্ষীকরণের অধীন। ক যদি একটা আদিম াসনা হয় এবং খ যদি বহু ক্ষেত্রে ক-এর উপায় হিসাবে কাজ করে, তাহলে পূর্বে যে অর্থে ক-কে কামনা করা হতো খ-কেও সে অর্থে কামনা করা হয়। এমনও হতে পারে—কৃপণদের ক্ষেত্রে যেমন—যে, খ-এর জন্য নো ক-এর জন্য বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করে ফেলে, খ-কে লাভ রার পর ক-এর উপায় হিসাবে আর তাকে ব্যবহার করা হয় না। এটা বশ্য অল্প-বিস্তর একটা ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ ক-এর জন্য বাসনাটা টিকে কে, যদিও খ-এর জন্য বাসনাটা অল্প-বিস্তর একটা স্বাধীন জীবন প্রাপ্ত হয়।

প্রাণীর জীবন থেকে আমাদের জীবন যে বিষয়ে পৃথক, মানুষের মধ্যে আদিম বাসনাগুলোর "সাপেক্ষীকরণ" তার অনেকখানির জন্যে দায়ী। অধিকাংশ প্রাণী কেবল ক্ষুধার্ত হলে খাদ্য অন্বেষণ করে; এবং, তারপর, খাদ্য খুঁজে পাওয়ার আগে তারা উপবাসে মৃত্যুবরণ করতে পারে। পক্ষান্তরে, মানুষ নিশ্চয়ই প্রাচীন কালেই একটা কলা (art) হিসাবে মৃগয়ার আনন্দের

সন্ধান পেয়েছিল, এবং নিশ্চয়ই তারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার্ত হবার আগেই খুপরায় বাহির হতো। গৃহপালিত পশুর সঙ্গে এল ক্ষুধার সাপেক্ষীকরণের আর এক পর্যায়; কৃষিকাজের সঙ্গে আরও এক পর্যায়। আজকাল মানুষ যখন তার জীবিকার জন্য কাজ করতে যায় তখনও, খুব সরাসরি না হলেও, তার কাজকর্ম ক্ষুধা ও অন্যান্য সেই-সব আদিম বাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে যেগুলো অর্থের সাহায্যে পূরণ করা যায়। বলতে গেলে, এসব আদিম বাসনা অদ্যাবধি শক্তির উৎস-কেন্দ্র (power station), যদিও তাদের শক্তি এমন হরেক রকমের কাজকর্মের মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাদের সঙ্গে আপাতঃদৃষ্টিতে যেসব কাজকর্মের কোনরূপ সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। 'স্বাধীনতা' (freedom) এবং যে সব রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের প্রেরণা সে যোগায়, তাদের কথা চিন্তা করুন; যে সব শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 'স্বাধীন' নয় তাদের মধ্যে ডঃ ওয়াটসন ক্রোধ নামক যে আবেগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার থেকে 'সাপেক্ষীকরণে'র মাধ্যমে এটাকে পাওয়া যায়। আবার, আমরা সাম্রাজ্যের 'পতন' (fall) এবং 'পতিতা' (fallen) স্ত্রীলোকের কথা বলি; নিরালম্ব অবস্থায় শিশুদের রেখে দিলে তারা যে ভয়ের ভাব দেখায়, এটা তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

বাসনার রাজ্যে এ ভ্রমণের পর এখন আমরা 'জ্ঞান'-এর কাছে ফিরে আসতে পারি। আমরা যেমন দেখেছি, 'জ্ঞান' শব্দটা 'বাসনা'র সঙ্গে অনুবন্ধ-যুক্ত (correlative), এবং এটা প্রযোজ্য একই ধরনের ক্রিয়াকলাপের অন্য একটা দিকের প্রতি। ব্যাপক অর্থে আমরা বলতে পারি যে, উপরোল্লেখিত অর্থে বাসনার সঙ্গে জড়িত কোন উদ্দীপকের উত্তরে কোন প্রতিবেদন যদি, যে অবস্থা (state of affairs) উপরোল্লেখিত অর্থে আচরণবাদীভাবে বাসনার উদ্দেশ্য, সে অবস্থার কাছে দ্রুততম ও সহজতম পথে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে তার মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। কাজেই জ্ঞান একটা মাত্রাগত ব্যাপার: গোলকধাঁধার মধ্যে তার ক্রমিক উন্নতি-কালে ইঁদুর ধীরে ধীরে অধিক থেকে অধিকতর জ্ঞান আহরণ করছে। ওই বিশেষ কাজটার বেলায়, এর সূচক হবে, গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে সে প্রথমে যে সময় নিয়েছিল এবং এখন যে সময় নিচ্ছে, এই দুটোর অনুপাত। আমাদের [illegible] জ্ঞানের সংজ্ঞা যদি গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে আরেকটা

থা এই যে, বিশুদ্ধ ধ্যানগত (contemplative) জ্ঞান বলে কিছু নেই ঃ বল বাসনার তৃপ্তি অথবা, আমরা যেমন বলি, আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ঠক উপায় পছন্দ করার ক্ষমতার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেই জ্ঞান থাকে।

কিন্তু উপরে প্রদত্ত সংজ্ঞার মত কোন সংজ্ঞা কি সত্যিই টিকে থাকার ? সচরাচর জ্ঞান বলতে যা বোঝানো হয়, এ কি আদৌ তা প্রকাশ ? আমার মনে হয় মূলতঃ তা করছে, কিন্তু কথাটাকে পরিষ্কার করতে লে কিছু আলোচনা দরকার।

কতকগুলো ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞার প্রযোজ্যতা সুস্পষ্ট। গোলকধাঁধার তরকার ইঁদুর, যার কথা আলোচনা করার ফলে আমরা সংজ্ঞাটায় এসে পৌঁছেছিলাম—তার সঙ্গে এ ক্ষেত্রগুলোর সাদৃশ্য আছে। ট্রাফালগার স্কায়্যার থেকে সেণ্ট প্যানক্রাসের পথ আপনি 'জানেন' কি ? হাঁ, যদি কান ভুল মোড় না নিয়ে আপনি এ পথের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন। ার্যতঃ, এ দূরত্বটুকু সত্যি-সত্যি অতিক্রম না করেও আপনি এ জ্ঞানের শাব্দিক প্রমাণ দিতে পারেন ; কিন্তু সেটা নির্ভর করে নাম ও রাস্তার অনুবন্ধের এবং সেটা বস্তুর বদলে শব্দ যোজনা করার প্রক্রিয়ারই একটা অংশ। বটে যে, সন্দেহজনক ক্ষেত্র দেখা দিতে পারে। একবার আমি াইটহলে (Whitehall) একটা বাসে ছিলাম, এবং আমার পার্শ্ববর্তী জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কোন্ রাস্তা ?" তাঁর অজ্ঞতায় বিস্মিত হয়ে মি তাঁর কথার উত্তর দিলাম। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন "ওটা কোন বিল্ডিং ?" এবং আমি উত্তর দিলাম, "ফরিন অফিস"। এর প্রত্যুত্তরে বললেন, "কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ফরিন অফিসটা ডাউনিং স্ট্রীটে।" এবার আমি যা দেখে বিস্মিত হলাম সেটা তাঁর জ্ঞান। আমরা কি বলতে যে, তিনি জানতেন ফরিন অফিসটা কোথায় ? তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে উত্তরটা হাঁ বা না হবে। সেখানে চিঠি পাঠানোর দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি জানতেন ; সেখানে হেঁটে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি জানতেন না। তঃ তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় একজন ব্রিটিশ কনসাল ছিলেন, এবং লণ্ডনে লেন প্রথম বারের মত।

কিন্তু এখন সেই-সব ক্ষেত্রগুলোতে আসা যাক, যেগুলো তত সুস্পষ্ট- আমাদের সংজ্ঞার আওতার মধ্যে পড়ে না। পাঠক 'জানেন' যে,

১৪৯২ সালে কলম্বাস মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি সেটা 'জানেন' বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই? সন্দেহ নেই যে, মূলতঃ আমরা এই বোঝাই যে, এ উক্তিটা লিখলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়; এবং সেটা আমাদের পক্ষে ঠিক তত দরকারী, গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসা ইঁদুরের পক্ষে যত দরকারী। কিন্তু কেবল এটাই আমরা বোঝাই না। এ সত্যটার পক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, অন্ততঃ আমি মনে করি যে, আছে। ঐতিহাসিক প্রমাণটা হচ্ছে মুদ্রিত গ্রন্থ এবং পাণ্ডুলিপি। যে-সব শর্ত পালিত হলে কোন গ্রন্থ অথবা পাণ্ডুলিপির উক্তিকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা কিছু নীতি দাঁড় করিয়েছেন, এবং (আমি মনে করি) আমাদের ক্ষেত্রে প্রমাণটা এ নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রায়শঃ ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর গুরুত্ব থাকে বর্তমান কালে; যেমন, উইল, এবং যে আইন এখনও বাতিল হয়নি। ঐতিহাসিক প্রমাণ তৌল করার নীতিমালা এ-রকম যে, সচরাচর তাদের থেকে আত্ম-সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায়। দুটো ফল তখনই আত্মসংগতিপূর্ণ যখন, যে বাসনার ক্ষেত্রে তারা উভয়ই প্রাসঙ্গিক, সে বাসনার ক্ষেত্রে তাদের জন্য একই ক্রিয়া, অথবা লক্ষ্যটার প্রতি একই গতির অংশ হতে পারে এমন ক্রিয়া-সমষ্টি আবশ্যক হয়। কেমব্রিজের কাছে কটনে (Coton) একটা সাইনপোস্ট আছে (অথবা আমাদের সময়ে ছিল) যার মধ্যে দুই বাহু সম্পূর্ণ বিপরীত দুই দিক নির্দেশ করে এবং প্রত্যেক বাহুই বলে (said) "কেমব্রিজ এদিকে"। আত্ম-বিরোধিতার এক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত এটা, যেহেতু বাহু দুটো এমন উক্তি করছিল যাতে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ বুঝাচ্ছিল। এবং এ দৃষ্টান্ত বুঝিয়ে দেয় কেন স্ব-বিরোধিতা এড়িয়ে চলা আবশ্যক। কিন্তু স্ব-বিরোধিতা এড়িয়ে চলার দাবী আমাদের উপর এক কঠিন ভার. হেগেল ও ব্র্যাডলী কল্পনা করেছিলেন যে, কেবল এ নীতির (principle) সাহায্যেই আমরা জগতের প্রকৃতি জানতে পারি। এটা তাঁদের পক্ষে ভুলই হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তথাপি এটা সত্য যে, আমাদের 'জ্ঞান' এর এক বড় অংশ এ নীতির উপরই অল্প-বিস্তর নির্ভরশীল।

পাক-প্রণালীর বইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান তারই মত—কতকগুলো নীতিমালা, প্রয়োজনে যেগুলোকে অনুসর

করতে হয়, কিন্তু দিনের প্রতি মুহূর্তে যেগুলো কাজে লাগে না। জ্ঞান যে-কোন সময় কাজে লাগতে পারে বলে, সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে, ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। ব্যবহারিক বিষয়ে যে পণ্ডিত ব্যক্তি অসহায়, তিনি একটা উদ্দেশ্যের মধ্যে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন, এবং সেদিক থেকে তিনি কৃপণের মত। এটাও লক্ষ্য করা দরকার যে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে জ্ঞান নিরপেক্ষ (neutral)। আপনি যদি জানেন যে, আর্সেনিক একটা বিষ, তাহলে আপনি স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে সেটাকে এড়িয়ে চলবেন, এবং সেই পরিমাণে আত্মহত্যাকামী হলে আপনি সেটাকে খাবেন। কোন ব্যক্তির ইচ্ছাগুলো (desires) না জানা পর্যন্ত আর্সেনিক প্রসঙ্গে তার আচরণ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন না সে জানে কি-না যে, এটা বিষ। জীবন তার কাছে দুঃসহ বোধ হতে পারে, কিন্তু তথাপি সে আর্সেনিক এড়িয়ে চলতে পারে, কারণ তাকে বলা হয়েছে যে, এটা একটা ভাল ওষুধ; এ ক্ষেত্রে এটাকে তার এড়িয়ে চলা তার জ্ঞানের 'অভাব'-এর পরিচায়ক।

কিন্তু কলম্বাসের কাছে ফেরা যাক: পাঠক নিশ্চয়ই বলবেন যে, কলম্বাস বাস্তবিকই ১৪৯২ সালে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন, এবং সেজন্যই এ উক্তিটাকে আমরা 'জ্ঞান' বলি। "সত্য ঘটনার অনুরূপতা" বলে 'সত্যে'র[১] যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় সেটা এই। আমি মনে করি যে, এ সংজ্ঞায় একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ভুল উপাদান আছে, কিন্তু তাকে বের করা হবে পরবর্তী এক পর্যায়ে, জড় জগৎ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পর। এবং—প্রয়োগবাদীরা (pragmatists) যেমন জোর দিয়ে বলেছেন—এর মধ্যে এ ত্রুটিটা আছে যে, "সত্য ঘটনা"র (facts) কাছে পৌঁছানো এবং আমাদের বিশ্বাসগুলোর সঙ্গে তাদের তুলনা করার কোন উপায় নেই: আমরা আদৌ যে বিষয়গুলোতে পৌঁছাতে পারি সেগুলো হচ্ছে 'অন্য' বিশ্বাস।[২] 'জ্ঞান' সম্পর্কে আমাদের এই বর্তমান আচরণবাদী ও প্রয়োগবাদী

১. সত্য ঘটনার অনুরূপতা = 'Correspondence with fact.'
সত্য = 'Truth.' (অনুবাদক)

২. অর্থাৎ, বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে আমরা বিচার্য বিশ্বাস থেকে কেবল অন্য 'বিশ্বাসে' পৌঁছাই, বাস্তব অবস্থার কাছে পৌঁছাতে পারি না। (অনুবাদক)

সংজ্ঞাকে আমি একমাত্র সম্ভাব্য সংজ্ঞা বলে উপস্থিত করছি না; তবে জ্ঞানকে যদি আমরা কারণিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা-কিছু বলে মনে করতে চাই, উদ্দীপকের উত্তরে আমাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যার দৃষ্টান্ত মিলবে, তাহলে যে সংজ্ঞায় এসে আমরা পৌঁছবো, সে সংজ্ঞা হিসাবেই একে আমি উপস্থিত করছি। মানুষকে যখন আমরা বাইরে থেকে বিবেচনা করি, এ পর্যন্ত যেমন আমরা করে আসছি, তখন এ-ই হচ্ছে সঠিক দৃষ্টিকোণ।

সে যাই হোক, আচরণবাদী দর্শনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যাকে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এ পরিচ্ছেদ আমরা শুরু করেছিলাম সংবেদনশীলতা দিয়ে, কিন্তু আমরা এসে পৌঁছেছিলাম শিক্ষালব্ধ প্রক্রিয়ার আলোচনায়, যেখানে শিক্ষণ নির্ভর করে অনুষঙ্গের উপর। কিন্তু আরেক রকমের শিক্ষণ আছে—আপাতঃদৃষ্টিতে অন্ততঃ এটা আরেক রকম—সংবেদনশীলতার বৃদ্ধি দিয়ে যা তৈরী। প্রাণী ও মানুষের সকল সংবেদনশীলতাকে এক প্রকারের জ্ঞান বলে গণ্য করতে হবে; অর্থাৎ, কোন এক প্রকারের উদ্দীপকের সাক্ষাতে কোন প্রাণী যদি এমনভাবে আচরণ করে, তার অসাক্ষাতে সে যেমনভাবে আচরণ করতো না, তাহলে, একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থে, সেই উদ্দীপক সম্পর্কে এর 'জ্ঞান' আছে। এখন, দেখা যায় যে, অভ্যাস (practice) অত্যন্ত বেশী করে সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়—সঙ্গীতে যেমন হয়। সামান্য পার্থক্য-সম্পন্ন উদ্দীপকের জবাবেও আমরা ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শিখি; তার চেয়েও বড় কথা, আমরা ভিন্নতার উত্তরে প্রতিক্রিয়া করতে শিখি।[১] একজন বেহালা-বাদক অত্যন্ত সঠিকভাবে পঞ্চমের কোন বিরতির জবাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারেন; বিরতিটা যদি নিতান্ত সামান্য কম বা বেশী হয় তাহলে স্বর বাঁধার ব্যাপারে তাঁর আচরণ পঞ্চম থেকে পার্থক্য যারা প্রভাবিত হবে। এবং ইতিমধ্যেই আমাদের লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে যে, অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা বর্ধিষ্ণু হারে আকারের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ি। এই বর্ধিত সংবেদনশীলতার সবটুকুকেই জ্ঞানের বৃদ্ধি বলে গণ্য করতে হবে।

কিন্তু একথা বলতে গিয়ে, জ্ঞানের যে সংজ্ঞা আমরা আগে দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে বিরোধিতাপূর্ণ কোন কথা আমরা বলছি না। বহু ক্ষেত্রেই সঠিক

১. অর্থাৎ, উদ্দীপকের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শিখি। (অনুবাদক)

প্রতিক্রিয়া বাছাই করার ব্যাপারে সংবেদনশীলতা অপরিহার্য। পাক-প্রণালীর কথাটা আবার ধরা যাক: এ যখন বলে "এক চিমটি লবণ নিন," তখন ভাল রাঁধুনী জানে কতটুকু নিতে হবে, এবং সেটা সংবেদনশীলতার একটা দৃষ্টান্ত। যে সঠিক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ব্যবহারিক গুরুত্ব এত বেশী, তা নির্ভর করে সংবেদনশীলতার উপর। এবং অন্য লোকের সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যবহারিক আদান-প্রদানের মধ্যেও সে-জাতীয় নির্ভরশীলতা রয়েছে: তাদের মেজাজ যদি আমরা 'অনুভব' করতে না পারি তাহলে সর্বদাই আমরা উল্টোপাল্টা বিতর্কের মধ্যে গিয়ে পড়বো।

অভ্যাসের মাধ্যমে যে পরিমাণে সংবেদনশীলতা বাড়ানো যায় তা বিস্ময়কর। শহরে জন্মগ্রহণকারী লোকেরা সংবাদপত্রে আবহাওয়া-বার্তা না পড়া পর্যন্ত জানে না আবহাওয়া উষ্ণ না শীতল। গ্রাম্য পথে চলার সময় একজন কীটতত্ত্ববিদ অন্য লোকজনের চেয়ে বহুগুণ বেশী গুবরে পোকার অস্তিত্ব টের পান।

যে সূক্ষ্মতা সহকারে সমঝদারেরা (connoisseurs) মদ ও চুরুটের মধ্যে পার্থক্য করেন সেটা দেখে বিষয়ী লোক হওয়ার সাধগ্রস্ত তরুণদের মনে হতাশা জাগে। অনুষঙ্গ নিয়মের সাহায্যে সংবেদনশীলতার এ বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা যায় কিনা আমি জানি না। সম্ভবতঃ অনেক ক্ষেত্রে তা করা যায়; কিন্তু জটিলতর অমূর্ত চিন্তা ও অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ে আকারের প্রতি যে সংবেদনশীলতা অত্যাবশ্যক, তাকে অনুষঙ্গ নিয়ম থেকে পাওয়া বলে মনে করা চলে না; একটা নতুন বোধশক্তির (sense) উন্মেষের সঙ্গেই বরং এর তুলনা চলে। সুতরাং জ্ঞানের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতার বৃদ্ধিকে আমি একটা স্বতন্ত্র (independent) উপাদান বলে মনে করবো। তবে এটা আমি করছি কিঞ্চিৎ দ্বিধার সঙ্গেই।

'জ্ঞান'-এর সংজ্ঞা আলোচনা করতে গেলে যত বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন, উপরের আলোচনায় তাদের সবগুলোকেই স্পর্শ করা হয়েছে—এমন কোন দাবী এখানে করা হচ্ছে না। অন্যান্য আরও দৃষ্টিকোণ আছে, প্রশ্নটার পূর্ণ আলোচনার জন্য সেগুলোও আবশ্যক। কিন্তু যতক্ষণ না জড় জগতের আলোচনার পর আমরা ভেতরের দিক থেকে মানুষকে আলোচনা করতে আরম্ভ করছি, ততক্ষণ তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

THE PHYSICAL WORLD

নবম অধ্যায়

পরমাণুর গঠন

বাইরে থেকে মানুষকে দেখার বিষয়ে এ-পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সব কিছুতেই জড় জগৎ সম্পর্কে আমরা একটা কাণ্ডজ্ঞান-লব্ধ ধারণা নিয়েছি। নিজেদের আমরা জিজ্ঞেস করিনি: জড় 'আসলে' কি ?[1] এ রকম কোন জিনিস আছে কি, অথবা বাইরের জগৎটা কি অন্য কোন প্রকারের উপাদান (stuff) দিয়ে তৈরী ? এবং জড় জগৎ সম্পর্কে কোন অভ্রান্ত মতবাদ প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর কিভাবে আলোকপাত করে ? পরবর্তী অধ্যায়-গুলোতে আমাদের এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এবং সেটা করতে গিয়ে যে বিজ্ঞানের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে সেটা হচ্ছে পদার্থবিদ্যা। তবে আধুনিক পদার্থবিদ্যা অত্যন্ত বিমূর্ত; সরল ভাষায় তার ব্যাখ্যা দেওয়া কোন মতেই সহজ নয়। সাধ্যানুযায়ী আমি চেষ্টা করবো, কিন্তু এখানে-সেখানে পাঠক যদি সামান্য জটিলতা বা অস্পষ্টতার সাক্ষাৎ পান তাহলে তিনি যেন আমাকে খুব সাংঘাতিকভাবে দোষারোপ না করেন। আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত সবচেয়ে সাম্প্রতিক মতবাদগুলো—এই উভয়ের দৌলতেই জড় জগৎ দৈনন্দিন জীবনের জগৎ থেকে, এবং অষ্টাদশ শতক জাতীয় বৈজ্ঞানিক জড়বাদ থেকেও, অনেকটা ভিন্ন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের লোকেরা পদার্থ-সম্পর্কিত আমাদের ধারণা-সমূহে যে-সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় মনে করেছেন, কোন দর্শনই সেগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে না; বস্তুতঃ এটা বলা চলে যে, সমস্ত ঐতিহ্যগত দর্শন বর্জন করতে হবে, এবং আমাদেরকে নতুন করে যাত্রা করতে হবে অতীতের মতবাদগুলোর জন্যে যথাসম্ভব অল্প শ্রদ্ধা নিয়ে। আমাদের যুগ অতীতের যে-কোন যুগের চেয়ে জগৎ প্রকৃতির গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করেছে, এবং সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দির

[1] What is matter ?

পরাতাত্ত্বিকদের (metaphysicians) কাছ থেকে এখনও যা শেখার আছে তাকে অতিরিক্ত মূল্য দিলে সেটা প্রকৃত বিনয়ের কাজ হবে না।

জড় এবং সাধারণভাবে জড় জগৎ সম্পর্কে পদার্থবিদ্যার যা বলার আছে, দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা দুটো প্রধান শিরোনামের মধ্যে পড়েঃ প্রথমে, পরমাণুর গঠন; দ্বিতীয়তঃ, আপেক্ষিক তত্ত্ব। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আগেরটা ছিল দার্শনিক দিক থেকে কম বৈপ্লবিক, যদিও পদার্থবিদ্যায় বেশী বৈপ্লবিক। ১৯২৫ পর্যন্ত, পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত মতবাদগুলোর ভিত্তি ছিল অবিনাশযোগ্য পদার্থ হিসাবে জড়ের প্রাচীন ধারণা, যদিও ইতিমধ্যেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, এটা একটা সুবিধার ব্যাপার ছাড়া অধিক কিছু নয়। এখন মূলতঃ হাইজেনবার্গ ও শ্রডিংগার নামক দুজন জার্মান পদার্থবিদের দৌলতে, পুরাতন কঠিন পরমাণুর শেষ চিহ্নগুলোও মিলিয়ে গেছে, এবং জড় হয়ে গেছে প্রেততত্ত্ববিদের সেয়াঁসের অন্তর্গত যে কোন কিছুর মত ভৌতিক। কিন্তু এসব নতুনতর মতবাদসমূহ বিবেচনা করার আগে, যে অধিকতর সরল মতবাদটাকে তারা স্থানচ্যুত করেছে, তাকে বোঝা দরকার। মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে আইনস্টাইন যে নতুন মতবাদগুলোর অবতারণা করেছেন, এখানে-সেখানে ছাড়া এ মতবাদ সেগুলোকে স্বীকার করে না, এবং আপেক্ষিকতার চেয়ে একে বোঝা অনেক সহজ। এর সাহায্যে এত ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা যায় যে, আর যাই কিছু ঘটুক না কেন, পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ মতবাদে এ একটা ধাপ হিসাবে অবশ্যই থেকে যাবে; বস্তুতঃ নতুনতর মতবাদগুলো সরাসরিভাবে এর ভেতর থেকেই জন্মলাভ করেছে, এবং অন্য কোনভাবে তারা উৎপন্ন হতে পারতে না। সুতরাং অল্প-কিছু সময় খরচ করে যৎসামান্য একটা রূপরেখা আমাদের দিতে হবে; তবে মতবাদটার নিজের মধ্যেই একটা আকর্ষণীয়তা আছে বলে এ সামান্যতার জন্য খেদ আমাদের বরং কম হওয়া উচিত।

জড় যে 'পরমাণু', অর্থাৎ, ক্ষুদ্র অবিভাজ্য খণ্ড দিয়ে তৈরী—এ মতবাদের উদ্ভব ঘটেছিল গ্রীকদের হাতে; কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এটা ছিল নিছক একটা দূর-কল্পনার ব্যাপার। পরমাণুবাদ (atomic theory) যাকে বলা হয় তা পাওয়া গেছে রসায়নবিদ্যা থেকে, এবং ঊনবিংশ শতকে এর যে আকার ছিল সে আকারে স্বয়ং এ মতবাদটার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিলেন

ড্যালটন। দেখা গেল যে, কতকগুলো 'উপাদান' আছে, এবং অন্যান্য পাদার্থগুলো এ উপাদানগুলোরই যৌগিক (compounds)। যৌগিক পদার্থগুলো অণু (molecule) দিয়ে গঠিত বলে দেখা গেল; প্রত্যেক অণু গঠিত এক পদার্থের 'পরমাণু'র সঙ্গে অন্য কিংবা সেই একই পদার্থের 'পরমাণু' মিলিত হয়ে। উদযানের দুইটা পরমাণু এবং অম্লযানের একটা পরমাণু মিলে পানির একটা অণু গঠিত; তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে তাদের পৃথক করা যায়। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মনে করা হতো যে, পরমাণু অবিনাশ-যোগ্য এবং অপরিবর্তনীয়। যে সব পদার্থ যৌগিক ছিলনা তাদের বলা হতো 'উপাদান'। রুশ রসায়নবিদ মেণ্ডেলিয়েভ আবিষ্কার করেন যে, উপাদান-গুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্রমিক পরিবর্তনের সাহায্যে একটা অনুক্রমে (series) সাজানো যায়; তাঁর সময়ে এ অনুক্রমের মধ্যে ফাঁক ছিল, কিন্তু নতুন-নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হয়ে অধিকাংশ ফাঁক পূরণ হয়ে গেছে। সবগুলো ফাঁক পূরণ হলে ৯২টা উপাদান হতো; কার্যতঃ, জানা সংখ্যাটা ৮৭, অথবা, যে তিনটার সম্পর্কে এখনও সন্দেহ আছে তাদের নিয়ে, ৯০। এ অনুক্রমের মধ্যে কোন উপাদানের স্থানকে বলা হয় তার "পারমাণবিক সংখ্যা"। উদযান প্রথম, এবং তার পারমাণবিক সংখ্যা ১; হিলিয়াম দ্বিতীয় এবং তার পারমাণবিক সংখ্যা ২; ইউরেনিয়াম সর্বশেষ, এবং তার পারমাণবিক সংখ্যা ৯২। সম্ভবতঃ তারকাদের মধ্যে উচ্চতর পারমাণবিক সংখ্যা-বিশিষ্ট উপাদান আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি।

তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারের ফলে 'পরমাণু' সম্পর্কে নতুন মতামতের প্রয়োজন দেখা দিল। দেখা গেল যে, কোন একটা তেজস্ক্রিয় উপাদানের পরমাণু অন্য কোন উপাদানের পরমাণু ও হিলিয়াম পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে, এবং আরও এক উপায়ে এর পরিবর্তন ঘটতে পারে। এও দেখা গেল যে, সেই অনুক্রমের মধ্যে একই স্থানে বিভিন্ন উপাদান থাকতে পারে; এগুলোকে বলা হয় 'আইসটোপ (isotope)। যেমন, রেডিয়াম বিয়োজিত হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত, এক জাতীয় সীসার জন্ম দেয়, কিন্তু সীসার খনিতে পাওয়া সীসা থেকে সেটা কতকটা ভিন্ন। ডঃ এফ. ডব্লিউ. অ্যাসটন দেখিয়েছেন যে, বহু 'উপাদান' বস্তুতঃ এমন আইসটোপের

মিশ্রণ যেগুলোকে সুচতুর প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করে ফেলা যায়। এসব ব্যাপার এবং বিশেষ করে উপাদানের তেজস্ক্রিয়ায় রূপান্তর থেকে এ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, 'পরমাণু' নামক জিনিসগুলো আসলে কতকগুলো জটিল সংগঠন (structures) যারা তাদের একটা অংশ ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রকারের পরমাণুতে পরিবর্তিত হতে পারে। পরমাণুর সংগঠন কল্পনা করার বিভিন্ন প্রচেষ্টার পর পদার্থবিদেরা শেষ পর্যন্ত স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের অভিমত গ্রহণ করলেন, যে অভিমত নীল্‌স্ বোরের হাতে আরও উন্নত হয়।

সাম্প্রতিক কালে এক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন সাধিত হওয়া সত্বেও, এ মতবাদ মূলতঃ ত্রুটিহীন রয়ে গেছে। এ মতবাদ অনুসারে, সব জড়ই ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন নামক দু'জাতীয় একক দিয়ে তৈরী। সব ইলেক্‌ট্রনই সম্পূর্ণ এক রকম, এবং সব প্রোটনই সম্পূর্ণ এক রকম। সব প্রোটনেই কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ আছে, এবং সব ইলেক্‌ট্রনেই কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আছে। কিন্তু একটা প্রোটনের ভর (mass) একটা ইলেক্‌ট্রনের চেয়ে ১৮৩৫ গুণ বেশী: ১৮৩৫টা ইলেক্‌ট্রন ওজনে একটা প্রোটনের সমান হয়। প্রোটনেরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, এবং ইলেক্‌ট্রনেরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, কিন্তু একটা ইলেক্‌ট্রন আর একটা প্রোটন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। প্রত্যেক পরমাণুই ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনে গঠিত একটা সংগঠন। উদযান পরমাণু সবচেয়ে সরল; তার মধ্যে আছে একটা প্রোটন এবং একটা ইলেক্‌ট্রন। কোন গ্রহ যেমন সূর্যের চতুর্দ্দিকে ঘোরে, সে ইলেক্‌ট্রনটা তেমনি করে প্রোটনের চতুর্দ্দিকে ঘোরে। ইলেক্‌ট্রনটা হারিয়ে গিয়ে প্রোটনটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে পারে; তখন পরমাণুটা ধনাত্মকভাবে বিদ্যুতায়িত। কিন্তু তার ইলেক্‌ট্রনটা যখন আছে তখন, সার্বিকভাবে, এটা স্থির-বিদ্যুৎ (electrically neutral), যেহেতু প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুৎ ইলেক্‌ট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ দ্বারা ঠিক-ঠিকভাবে সমতা প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় উপাদান হিলিয়ামের সংগঠন ইতিমধ্যেই এর চেয়ে অনেক বেশী জটিল। এর একটা কেন্দ্র (nucleus) আছে যার মধ্যে চারটা প্রোটন ও দুটো ইলেক্‌ট্রন পরস্পরের খুব কাছাকাছি, এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এর গ্রহের মত ভ্রাম্যমান দুটো ইলেক্‌ট্রন থাকে যারা এর কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘোরে।

কিন্তু এদের যে কোন একটাকে অথবা দুটোকেই এ হারিয়ে ফেলতে পারে, এবং তখন এ ধনাত্মকভাবে বিদ্যুতান্বিত।

পরবর্তী সকল উপাদানে আছে, হিলিয়ামের মত, প্রোটন ও ইলেক্ট্রনে গঠিত একটি কেন্দ্র, এবং কেন্দ্রের চতুর্দিকে আবর্তমান গ্রহের মত কতকগুলো ইলেক্‌ট্রন। কেন্দ্রের ভেতর ইলেক্‌ট্রনের চেয়ে বেশী আছে প্রোটন, তবে আবর্তমান ইলেক্‌ট্রনের মাধ্যমে এ অতিরেক সমতাপ্রাপ্ত হয়, এবং তখন পরমাণুটা তড়িতান্বিত থাকে না। কেন্দ্রের মধ্যবর্তী প্রোটনের সংখ্যা দ্বারা উপাদানের "পারমাণবিক ওজন" নির্ধারিত হয়ঃ ইলেক্‌ট্রনের তুলনায় অতিরিক্ত প্রোটন থেকে পাওয়া যায় "পারমাণবিক সংখ্যা"; এ সংখ্যা এবং পরমাণুর তড়িৎমুক্ত অবস্থায় আবর্তমান ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা একই। সর্বশেষ উপাদান ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রের ভেতর আছে ২৩৮টি প্রোটন আর ১৪৬টি ইলেক্‌ট্রন, এবং তড়িৎমুক্ত অবস্থায় এর থাকে ৯২টি আবর্তমান ইলেক্‌ট্রন। উদযান ছাড়া অন্য পরমাণুগুলোতে ইলেক্‌ট্রনের বিন্যাস সঠিক-ভাবে জানা নেই, কিন্তু এটুকু পরিষ্কার যে, কোন এক অর্থে, তারা বিভিন্ন বৃত্ত তৈরী করে, এবং বাইরের দিকের বৃত্তগুলোর অন্তর্গত ইলেক্‌ট্রনগুলো কেন্দ্রের অধিকতর কাছাকাছি ইলেক্‌ট্রনগুলোর চেয়ে বেশী সহজে হারিয়ে যায়।

রাদারফোর্ডের উদ্ভাবিত পরমাণুতত্ত্বে বোর যা যোগ করেছিলেন, আমি এখন সেটাতে আসছি। এটা ছিল একটা নিতান্ত অদ্ভুত আবিষ্কার—একটা নতুন ক্ষেত্রে এ এক বিশেষ রকমের বিচ্ছিন্নতার অবতারণা করেছিল, অন্যান্য আরও প্রাকৃতিক ব্যাপারে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বলে আগেই জানা ছিল। দর্শনে "natura non facit saltum"—প্রকৃতি কখনও লাফ দেয় না—এর চেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রবচন আর আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্য সব কিছুর চেয়ে যে জিনিসটা ভালভাবে শিখেছি সেটা এই যে, লাতিন অধিবচনগুলো (Latin tags) সব সময়ই ভুল কথা শেখায়; এবং এ ক্ষেত্রেও তাই প্রমাণিত হয়েছে। দৃশ্যতঃ, প্রকৃতি সত্যই লাফ দেয়—কেবল সময়ে সময়ে নয়, বরং যখনই কোন বস্তু আলো বিকিরণ করে এবং অন্যান্য আরও ক্ষেত্রে। উল্লম্ফনের প্রয়োজনীয়তা প্রথম দেখিয়ে-ছিলেন জার্মান পদার্থবিদ প্ল্যাংক। তিনি পরীক্ষা করছিলেন বস্তুপিণ্ড

যখন তাদের পারিপার্শ্বিকতা থেকে বেশী গরম হয় তখন তারা কি ভাবে তাপ বিকিরণ করে। বহুকাল ধরেই জানা আছে যে, তাপ সৃষ্ট হয় কম্পন দিয়ে; এসব কম্পন তাদের "পৌনঃপুনিকতা" (frequency) দিয়ে, অর্থাৎ সেকেণ্ড-প্রতি কম্পনের সংখ্যা দিয়ে পরস্পরের থেকে ভিন্ন হয়। প্ল্যাংক দেখালেন যে, একটা নির্দিষ্ট পৌনঃপুনিকতাসম্পন্ন কম্পনসমূহের পক্ষে শক্তির সকল পরিমাণ সম্ভব নয়; কেবল সেই পরিমাণগুলো সম্ভব, সেই পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে যাদের একটা অনুপাত আছে। এ অনুপাতটা হচ্ছে ১ অথবা ২ অথবা ৩ অথবা অন্য কোন পূর্ণ (whole) সংখ্যা দ্বারা গুণিত একটা পরিমাণ h, এবং কার্যতঃ এ সংখ্যাটা সর্বদাই একটা ছোট পূর্ণ সংখ্যা। h–পরিমাণটা "প্ল্যাংকের ধ্রুবক" নামে পরিচিত; যেখানেই এ ধ্রুবক জড়িত আছে কিনা তা জানার মত যথেষ্ট সূক্ষ্ম পরিমাপ সম্ভব, কার্যতঃ সেখানেই একে জড়িত বলে দেখা গেছে। এ পরিমাণটা এত সামান্য যে, যেখানে খুবই উন্নত মানের নির্ভুল পরিমাপ সম্ভব, সেখানে ছাড়া অবিচ্ছিন্নতার ব্যতিক্রমটা বোঝা যায় না।[১]

বোরের মহান আবিষ্কারটা এই ছিল যে, পরমাণুস্থিত আবর্তমান ইলেক্ট্রনের কক্ষপথেও এই একই h পরিমাণটা জড়িত আছে, এবং এ পরিমাণটা নানাভাবে সম্ভাব্য কক্ষপথগুলোকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। নিউটনীয় গতিবিদ্যায় এমন কিছু নেই যার ফলে এর জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি; এবং এ পর্যন্ত আপেক্ষিকতাবাদী গতিবিদ্যায়ও এমন কিছু নেই যার সাহায্যে এর ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। নিউটনীয় সূত্রানুসারে (principles), প্রত্যেক ইলেক্ট্রনেরই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে যে কোন বৃত্তাকারে, অথবা নিউক্লিয়াসকে অধিশ্রয়ণে রেখে যে কোন উপবৃত্তাকারে, নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘুরতে পারা উচিৎ; সম্ভাব্য কক্ষপথগুলোর মধ্য থেকে তার দিক ও গতিবেগ অনুসারে সে কোন একটা বেছে নেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব কক্ষপথের কয়েকটি মাত্র ঘটে। যেগুলো ঘটে সেগুলো নিউটনীয় সূত্রানুযায়ী যে কক্ষপথগুলো সম্ভব তাদেরই অন্তর্গত; তবে এগুলোর মধ্য থেকে বেছে

১. h-এর মাত্রাগুলো হচ্ছে 'ক্রিয়া'র মাত্রা, অর্থাৎ, শক্তি ও সময়ের গুণফল, অথবা ভরবেগের ঘূর্ণ-বল, অথবা ভর, দৈর্ঘ্য ও গতির গুণফল। এর পরিমাণ প্রায় $৬·৫৫ \times ১০^{-২৭}$ আর্গ সেকেণ্ড।

বেছে নিতান্ত অল্প সংখ্যক কক্ষপথই ঘটে। বোর প্রথমে যেমন করেছিলেন, তেমনি আমরা যদি বৃত্তাকার কক্ষপথগুলোর মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে ব্যাখ্যাটা সরল হবে; উপরন্তু আমরা কেবল উদযান পরমাণু— যার মধ্যে একটা আবর্তমান ইলেকট্রন এবং একটি প্রোটন-বিশিষ্ট একটা নিউক্লিয়াস আছে—তার কথাই আলোচনা করবো। যে বৃত্তাকার কক্ষপথ-গুলো সম্ভব বলে দেখা যায়, তাদের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য আমরা নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হবো: ইলেকট্রনের ভরকে তার কক্ষপথের পরিধি দিয়ে গুণ করুন, এবং এটাকে আবার ইলেকট্রনের গতিবেগ দিয়ে; ফলাফলটা সর্ব ক্ষেত্রেই হবে h অথবা ২h, অথবা ৩h, অথবা h-এর অন্য কোন ক্ষুদ্র সঠিক গুণিতক, যেখানে, পূর্বের মতোই, h হচ্ছে "প্ল্যাংকের ধ্রুবক"। সুতরাং এমন একটা ক্ষুদ্রতম-সম্ভব কক্ষপথ আছে যেখানে উপরোক্ত গুণফলটা h; পরবর্তী কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, যার মধ্যে ওই গুণফলটা ২h—তার দৈর্ঘ্য হবে এই নিম্নতম মাত্রার চার গুণ; পরবর্তীটার নয় গুণ; পরবর্তীটার ষোল গুণ; এবং এইভাবে "বর্গমৌলিক সংখ্যাগুলোর" (অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে তার নিজের দ্বারা গুণ করে যেগুলোকে পাওয়া যায়) সকলের ক্ষেত্রেই। আপাতদৃষ্টিতে, উদযান পরমাণুর মধ্যে এগুলো ছাড়া আর কোন বৃত্তাকার কক্ষপথ সম্ভব নয়। উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সম্ভব, এবং এগুলো থেকে আবার h-এর সঠিক গুণিতকের অবতারণা ঘটে; কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এমন নয় যে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আমাদের আছে।

কোন উদযান পরমাণু যখন একাকী থাকে তখন, ইলেকট্রনটা যদি ন্যূনতম কক্ষপথে থাকে, তাহলে বাইরে থেকে কোন কিছু দ্বারা ব্যাহত না হওয়া পর্যন্ত সে আবর্তিত হতেই থাকবে; কিন্তু ইলেকট্রনটা যদি সম্ভাব্য বৃহত্তর কক্ষপথগুলোর কোন একটাতে থাকে তাহলে, একটু আগে বা পরে, সে সহসা কোন ক্ষুদ্রতর কক্ষপথে লাফ দিয়ে পড়বে—হয় ন্যূনতমটাতে অথবা সম্ভাব্য মধ্যবর্তী (intermediate) কক্ষপথগুলোর কোন একটাতে। ইলেকট্রনটা যতক্ষণ না কক্ষপথ পরিবর্তন করছে ততক্ষণ পরমাণু শক্তি বিকিরণ করছে না, কিন্তু ইলেকট্রন যখন কোন ক্ষুদ্রতর কক্ষপথে লাফিয়ে পড়ে তখন পরমাণুর শক্তিক্ষয় ঘটে, যে শক্তি আলোক-তরঙ্গের

আকারে বাইরে বিকীর্ণ হয়ে আসে। সব সময়েই এ আলোক-তরঙ্গ এরকম যে, এর পৌনঃপুনিকতা দিয়ে এর শক্তিকে ভাগ করলে তার ফল ঠিকঠিকভাবে h। বাইরে থেকে পরমাণু শক্তি আহরণ করতে পারে, এবং কোন বৃহত্তর কক্ষপথে লাফিয়ে পড়া ইলেকট্রনের সাহায্যে সে তা করে। তারপর, শক্তির বহিঃস্থ উৎসটা সরিয়ে ফেলা হলে, সে আবার ক্ষুদ্রতর কক্ষপথে লাফিয়ে পড়তে পারে; এটাই প্রতিপ্রভার (fluorescence) কারণ, যেহেতু, একাজ করতে গিয়ে পরমাণু আলোর আকারে শক্তি বিকিরণ করে।

এই একই নিয়মগুলো, অধিকতর গাণিতিক জটিলতায় মণ্ডিত হয়ে, অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। তবে সর্বশেষ উপাদানগুলোর কতকগুলোর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে, উদযানের মধ্যে যার সদৃশ কোন ব্যাপার থাকতে পারে না, এবং সেটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা। কোন পরমাণু যখন তেজস্ক্রিয় হয় তখন সে তিন প্রকারের রশ্মি বিকিরণ করে, যাদের বলা হয় α-রশ্মি, β-রশ্মি, এবং γ-রশ্মি। এগুলোর মধ্যে, γ-রশ্মিগুলো আলোর মত; তবে তাদের পৌনপুনিকতা বেশী, অথবা তাদের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কম; তাদের নিয়ে আর আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে, পরমাণুর নিউক্লিয়াস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসাবে α-রশ্মি ও β-রশ্মিগুলো গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে, α-রশ্মিগুলো হিলিয়াম নিউক্লিয়াস দিয়ে তৈরী, এবং অন্য দিকে β-রশ্মিগুলো ইলেকট্রন দিয়ে তৈরী। উভয়ই বেরিয়ে আসে নিউক্লিয়াস থেকে, যেহেতু তেজস্ক্রিয়ার ফলে ভেঙ্গে যাওয়ার পর পরমাণু আগের থেকে ভিন্ন এক উপাদানে পরিণত হয়। কিন্তু কেউ-ই জানে না, পরমাণু যখন তার সংসক্তি হারিয়ে ফেলে তখন ঠিক কি জন্য সে তা হারায়, অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন রেডিয়াম-খণ্ডে কেন কতকগুলো পরমাণু ভেঙ্গে পড়ে এবং অন্যগুলো ভাঙ্গে না।

পরমাণু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের তিনটা প্রধান উৎস হচ্ছে তাদের দ্বারা নিঃসৃত আলো, রঞ্জন-রশ্মি, এবং তেজস্ক্রিয়া। সবাই জানে যে, কোন উজ্জ্বল (glowing) কাচ থেকে নিঃসৃত আলো যখন কোন প্রিজমের মধ্য দিয়ে চলে যায় তখন দেখা যায় যে, এর মধ্যে আছে বিভিন্ন বর্ণের সুনির্দিষ্ট কতকগুলো রেখা, এবং প্রত্যেক উপাদানের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগত এক একটা

রেখা-পুঞ্জ আছে, যাকে বলা হয় তার 'বর্ণালী' (spectium)। বর্ণালী দৃশ্য আলোর সীমার বাইরে, অবলোহিত ও অতিবেগনি—এদের উভয় পর্যন্ত চলে যায়। পরবর্তী [অতিবেগনির] দিকে এটা একেবারে রঞ্জনরশ্মির এলাকা পর্যন্ত চলে যায়, এবং রঞ্জনরশ্মি হচ্ছে অতি-অতিবেগনি আলো। দেখা গেছে যে, কেলাসের সাহায্যে সাধারণ আলোর মতই সঠিকভাবে রঞ্জন-রশ্মি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কোন উপাদানের কোন বিশেষ বর্ণালী কেন থাকে, সেটা আগে সম্পূর্ণভাবে একটা রহস্য ছিল; বোরের মতবাদের বড় মূল্যটা এই যে, এর সাহায্যে এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো। উদযান এবং ধনাত্মকভাবে বিদ্যুতায়িত হিলিয়ামের বেলায় এ ব্যাখ্যা থেকে তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে সূক্ষ্মতম সংখ্যাগত সামঞ্জস্য পাওয়া গেছে, এবং এটা ঘটেছে জার্মান পদার্থবিদ সমারফেল্‌ড্ (Sommerfeld) এ ব্যাখ্যার যে সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন তার ফলে; অন্যান্য ক্ষেত্রে গাণিতিক সমস্যা থাকার ফলে এ পূর্ণতা অসম্ভব হয়, কিন্তু এই একই সূত্রাবলীই যে যথেষ্ট সেকথা ভাবার সমুদয় কারণই উপস্থিত ছিল। বোরের মতবাদ গ্রহণ করার কারণটা ছিল এ-ই; এবং এটা নিশ্চয়ই একটা জোরালো কারণ। দেখা গেল যে, দৃশ্য আলোর সাহায্যে আমরা আবর্তমান ইলেকট্রনগুলোর বাইরের দিককার বৃত্তগুলো পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হলাম, রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে আমরা পর্য-বেক্ষণ করতে পারলাম ভেতরের দিককার বৃত্তগুলোকে, এবং তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা সমর্থ হলাম নিউক্লিয়াস পরীক্ষা করে দেখতে (study)। পরবর্তী উদ্দেশ্যটার জন্যে অন্যান্য পদ্ধতিও আছে, বিশেষতঃ রাদারফোর্ডের 'বোমাবর্ষণ'। এ পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে প্রাস (projectiles) নিক্ষেপ করে নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ফেলা—লক্ষ্যবস্তুর ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও এতে কখনও কখনও আঘাত করা সম্ভব হয়।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত যে মতবাদের রূপরেখা এইমাত্র দেওয়া হলো, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার আর সবকিছুর মতো, তাকে গাণিতিক সূত্রাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব; কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অনেক কিছুর মতো একে একটা কল্পিত চিত্রের আকারেও প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো এখানেও গাণিতিক প্রতীক ও চিত্রাত্মক শব্দাবলীর মধ্যে কড়াকড়িভাবে একটা ভেদরেখা টানা আবশ্যক। প্রতীকগুলোর অভ্রান্ততা

সম্পর্কে যথেষ্ট, অথবা প্রায় যথেষ্ট নিশ্চয়তা আছে; কিন্তু অন্য দিকে কাল্পনিক চিত্রটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে না। যে প্রমাণের উপর উপরে বর্ণিত পরমাণুতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে, আমরা যখন তার প্রকৃতি বিবেচনা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, যা ঘটে তার একটা চিত্র দাঁড় করাবার চেষ্টা করার ফলে, যতটুকু মূর্তভাবে চিন্তা করার অধিকার আমাদের আছে তার চেয়েও অনেক বেশী মূর্তভাবে আমরা চিন্তা করেছি। যেটুকু বিশ্বাস করার উপযুক্ত কারণ আমাদের আছে কেবল সেটুকু যদি আমরা বলতে চাই, তাহলে পরমাণুর ভেতরে যা ঘটে সে সম্পর্কে মূর্তভাবে কিছু বলার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে কেবল এরকম একটা কিছু আমাদের বলতে হবে: তার ইলেক্ট্রনগুলো-সহ কোন পরমাণু এমন একটা তন্ত্র (system), কতকগুলো পূর্ণসংখ্যার সাহায্যে যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যায়; এ সংখ্যাগুলোর সবকটিই ছোট, এবং সবকটিই স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্তনযোগ্য। এ পূর্ণ সংখ্যাগুলো সংশ্লিষ্ট h-এর গুণিতক। তাদের কোন একটা যখন কোন একটা ক্ষুদ্রতর পূর্ণ সংখ্যায় পরিবর্তিত হয়, তখন একটা সুনির্দিষ্ট (definite) পরিমাণ শক্তি নিঃসৃত হয়, এবং এর পৌনঃপুনিকতা পাওয়া যাবে সেই শক্তিকে h-এর সাহায্যে ভাগ করে। যখন সংশ্লিষ্ট পূর্ণ সংখ্যাগুলোর কোন একটা কোন বৃহত্তর পূর্ণ সংখ্যায় পরিবর্তিত হয়, তখন শক্তি পরিশোষিত (absorbed) হয়, এবং আবার পরিশোষিত পরিমাণটা সুনির্দিষ্ট। কিন্তু পরমাণু যখন শক্তি পরিশোষণ করছে না, অথবা নিঃসরণও করছে না, তখন কি ঘটে সেটা আমরা জানতে পারি না, কারণ তখন চতুর্দিককার কোন কিছুর উপর তার কোন ক্রিয়া নেই; ফলতঃ পরমাণু-সংক্রান্ত সকল প্রমাণ তাদের পরিবর্তন-সংক্রান্ত, তাদের স্থির অবস্থা সম্পর্কিত নয়।

কথাটা এই নয় যে, একটা ভ্রাম্যমান বস্তুতন্ত্র[১] হিসাবে পরমাণুর যে প্রকল্প, তার সঙ্গে তথ্যাবলীর (facts) সামঞ্জস্য ঘটছে না। একথা সত্য যে, কতকগুলো সমস্যা আছে যেগুলো থেকে, যে নতুনতর মতবাদ বোরের মতবাদকে আসনচ্যুত করেছে, তার সপক্ষে আভিজ্ঞাতিক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এরকম কোন প্রমাণের অস্তিত্ব না থাকলেও একথা সুস্পষ্টরূপে ধরা

১. Planetary system.

পড়তো যে, আমরা যা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তার থেকে যেটুকু অনুমান করার অধিকার আমাদের আছে, বোরের মতবাদে তার চেয়ে অধিক বলা হয়েছে। যে মতবাদগুলোতে এত অধিক বলা হয় সেগুলোর মত এমন অসংখ্য মতবাদ অবশ্যই থাকবে, আমাদের জ্ঞাত তথ্যাবলীর সঙ্গে যাদের সঙ্গতি আছে, এবং এদের সকলের মধ্যে যা সাধারণ, প্রকৃতপক্ষে কেবল সেটুকুই জোর দিয়ে বলার (assert) অধিকার আমাদের আছে। ধরা যাক, যেসব লোকজন ও জিনিসপত্র বন্দরগুলোতে প্রবেশ করছে এবং সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, গ্রেট ব্রিটেন সম্পর্কে আপনার জ্ঞান তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের অভ্যন্তর সম্পর্কে আপনি বহুসংখ্যক মতবাদ আবিষ্কার করতে পারতেন, যাদের সকলেই সমুদয় জ্ঞাত তথ্যাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। এ তুলনাটা একেবারে সঠিক। পদার্থিক জগতের মধ্যে আপনি যদি বড় বা ছোট একটা এলাকার সীমা বেঁধে দেন, যার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক থাকবেন না, তাহলে সে এলাকার অভ্যন্তর-ভাগে যাই কিছু ঘটুক না কেন, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকদের সকলেই একই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করবেন, যদি-না সে এলাকার সীমা পেরিয়ে যে শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর সে-সব ঘটনার কোনরূপ প্রভাব পড়ে। এবং সেজন্য, যদি সে এলাকায় একটা পরমাণু থাকে তাহলে, সে পরমাণু কর্তৃক বিকিরিত অথবা পরিশোষিত শক্তি সম্পর্কে সমরূপ ফলাফল-দায়ক যে-কোন দুটো মতবাদ অভিজ্ঞতার দিক থেকে অপ্রভেদযোগ্য হবে, এবং কেবল সরলতা ছাড়া তাদের একটাকে রেখে আরেকটাকে গ্রহণ করার আর কোন কারণ থাকবে না। অন্য কোন কারণ যদি-বা না থাকে তাহলেও কেবল এ কারণেই, পরমাণু সম্পর্কে রাদারফোর্ড ও বোরের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতবাদের চেয়ে আরও অমূর্ত একটা মতবাদ খুঁজতে আমরা বাধ্য, যদি আমরা সত্যিকার বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে চাই।

হাইজেনবার্গ ও শ্রডিংগার নামক যে দু'জন পদার্থবিদের কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুনতর মতবাদটা এসেছে প্রধানতঃ তাঁদের কাছ থেকে। যে দুই আকারে মতবাদটা তুলে ধরা হয়েছে তারা আপাতঃদৃষ্টিতে ভিন্ন, কিন্তু বস্তুতঃ গাণিতিকভাবে তারা সমমান। এখন পর্যন্ত সরল ভাষায় এ মতবাদের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু এর দার্শনিক তাৎপর্যের উপর

আলোকপাত করার জন্য কিছু বলা যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে, পরমাণু থেকে যে তেজস্ক্রিয়া বেরিয়ে আসে, এ তার সাহায্যেই পরমাণুর বিবরণ দেয়। বোরের মতবাদে মনে করা হয় যে, পরমাণুতে যখন তেজস্ক্রিয়া ঘটছে না তখন আবর্তমান (planetary) ইলেক্‌ট্রনগুলো পুনঃপুনঃ কক্ষপথে ঘুরবে নতুনতর মতবাদে এ সময়ে কি ঘটে সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি না। যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরখ করা যায়, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়া—লক্ষ্যটা হচ্ছে তার মধ্যে মতবাদটাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা; তেজস্ক্রিয়া যে স্থান থেকে আসছে সেখানে কি আছে সে বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না, এবং সে বিষয়ে কোনরূপ কল্পনা (speculate) করাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনাবশ্যক। এ মতবাদে দেশ সম্পর্কে আমাদের ধারণার মধ্যে এমন রকমের পরিবর্তন আবশ্যক হয়, যা এখনও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। এটাও এ মতবাদের একটা ফল যে, কোন এক সময়ের একটা ইলেক্‌ট্রনকে অন্য সময়ের আরেকটা ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখতে পারি না, যদি অন্তর্বর্তীকালে পরমাণুটা থেকে তেজস্ক্রিয়া বেরিয়ে এসে থাকে। কাণ্ডজ্ঞানে 'বস্তু' (thing) বলতে যা চিন্তা করা হয়, তার কোন ধর্ম মোটেই আর ইলেক্‌ট্রনের মধ্যে থাকে না; এটা কেবল এমন একটা জায়গা যেখান থেকে শক্তি বিকিরিত হতে পারে।

বিচ্ছিন্নতা (discontinuity) সম্পর্কে শ্রডিংগার ও অন্যান্য পদার্থবিদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁদের অধিকাংশের মতে, কোয়ান্টাম পরিবর্তনগুলো—অর্থাৎ, পরমাণু যখন শক্তি বিকিরণ অথবা পরিশোষণ করে তখন যে পরিবর্তনগুলো ঘটে—অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হবে। শ্রডিংগার অন্য রকম চিন্তা করেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এটা একটা বিতর্কের বিষয়, যে সম্পর্কে কোন মত দেওয়া দুঃসাহসের কাজ হবে। সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতেই কোন-না-কোন একভাবে এর মীমাংসা হয়ে যাবে।

আধুনিক মতবাদে দার্শনিকের জন্য প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে 'বস্তু' হিসাবে জড়ের নিরুদ্দেশ হওয়া। এর স্থান দখল করেছে কোন এক স্থান থেকে নির্গমন[১]—ভূতের গল্পে যে-জাতীয় প্রভাব ভুতুড়ে বাড়ীর বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী

১. **Emanations from a locality.**

অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখবো, ভিন্ন রকমের যুক্তির পথ ধরে আপেক্ষিকবাদও অনুরূপভাবে জড়ের কঠিনত্ব ধ্বংস করে দেয়। পদার্থিক জগতে সর্ব প্রকারের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু টেবিল ও চেয়ার, সূর্য ও চন্দ্র, এবং এমন-কি আমাদের প্রতিদিনকার রুটি পর্যবসিত হয়েছে পাণ্ডুবর্ণ বিমূর্ত কল্পনায়, পরিণত হয়েছে নিছক কতকগুলো নিয়মে যেগুলোর প্রকাশ ঘটে কতকগুলো জায়গা থেকে বিকিরিত হয়ে আসা ঘটনাবলীর অনুক্রমের মধ্যে।

দশম অধ্যায়

আপেক্ষিকতা

আমরা দেখেছি যে, পরমাণুর জগৎ বিবর্তনের জগৎ নয়, সেটা বরং বিপ্লবের জগৎ : যে ইলেক্‌ট্রন কোন এক কক্ষপথে ঘুরছে সেটা অকস্মাৎ অন্য কক্ষপথে লাফিয়ে পড়ে ; এজন্য এ সঞ্চরণকে বলা হয় 'বিচ্ছিন্ন' (discontinuous)—অর্থাৎ, ইলেক্‌ট্রনটা প্রথমে এক জায়গায় এবং তার পর মধ্যবর্তী কোন জায়গা পার না হয়েই সেটা অন্য এক জায়গায়। এটাকে যাদুবিদ্যার মত শোনায়, এবং এরকম একটা অপ্রতিভকর প্রবন্ধ এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় হয়তো আছে। আর যাই হোক, যে সব জায়গায় কোন ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন নেই সেখানে এ জাতীয় কোন কিছু ঘটে বলে মনে হয় না। আমরা যতদুর দেখতে পাই, এসব জায়গায় অবিচ্ছিন্নতা আছে ; অর্থাৎ, সবকিছুই ঘটে ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, লম্ফের মাধ্যমে নয়। যেসব জায়গায় কোন ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন নেই তাদের, আপনার পছন্দ মতো, 'ইথার' বা 'শূন্য দেশ' বলা যেতে পারে : পার্থক্যটা নিছক শাব্দিক। যেখানে ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন আছে সেখানে যা ঘটে তার বিপরীতে, এসব জায়গার সঙ্গেই আপেক্ষিকবাদ বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আপেক্ষিকবাদের বাইরে এ জায়গাগুলো সম্পর্কে আমরা যা জানি সেটা এই যে, তাদের ভেতর দিয়ে তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, এবং এ তরঙ্গগুলো আলোক অথবা তড়িৎচুম্বকত্বের (এ দুটো একই জিনিস) তরঙ্গ হলে তারা যেভাবে কাজ করে সেটাকে ম্যাক্‌স্যয়েল কতকগুলো সূত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছেন ; এ সূত্রগুলোকে বলা হয় "ম্যাক্‌স্যয়েলের সমীকরণ" (Maxwell's equations)। আমি যখন বলি আমরা এটা 'জানি', তখন সঠিক অর্থে যা সত্য তার চেয়ে আমি বেশী বলছি, কারণ, তরঙ্গগুলো যখন আমাদের দেহ পর্যন্ত পৌঁছে তখন যা ঘটে আমরা কেবল তাই জানি। ব্যাপারটা যেন এ রকম যে, আমরা সাগর দেখতে পারিনি ; দেখতে পেরেছি কেবল জাহাজ থেকে ডোভারে (Dover) অবতরণকারী লোকজন, এবং তরঙ্গের অস্তিত্ব অনুমান করেছি এই থেকে যে,

লোকগুলোকে সবুজ দেখাচ্ছিল। আর যাই হোক, এটা সুস্পষ্ট যে, যে পরিমাণে একদিকে তরঙ্গগুলোর নির্দিষ্ট কতকগুলো কারণ এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট কতকগুলো কার্যফল রয়েছে, কেবল সেই পরিমাণে আমরা তরঙ্গগুলো সম্পর্কে জানি। এ ভাবে যা অনুমান করা যায়, সবচেয়ে বেশী করে ধরলেও সেটা এমন কিছু হবে যাকে গাণিতিক সংগঠনের (structure) মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়। এটা আমরা মনে করতে পারি না যে, তরঙ্গগুলো অবশ্যই ইথারের 'মধ্যে' অথবা অন্য কোন কিছুর 'মধ্যে' থাকবে; ভাবতে হবে যে, তারা কেবল কতকগুলো ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া,[১] যাদের নিয়মগুলো কম-বেশী জানা আছে, কিন্তু যাদের অন্তর্নিহিত চরিত্র জানা নেই এবং কখনও জানা যেতে পারে না।

যে জায়গাগুলোতে কোন ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন নেই, সেখানে কি ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করার ফলেই আপেক্ষিকবাদ জন্মলাভ করেছে। যে-ক্ষেত্রে পরমাণু পর্যবেক্ষণ করার ফলে আমরা বিচ্ছিন্নতায় এসে পৌঁছেছি, সে-ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী মাধ্যম সম্পর্কে আপেক্ষিকবাদ এক সম্পূর্ণ ছেদহীন (continuous) মতবাদ দাঁড় করিয়েছে—যা অতীতে কল্পিত যে কোন মতবাদ থেকে অনেক বেশী বিচ্ছেদ-মুক্ত। বর্তমান মুহূর্তে এ দুটো দৃষ্টিকোণের মধ্যে অল্প-বিস্তর বিরোধ আছে, তবে সন্দেহ নেই যে, অল্পকালের মধ্যেই তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। এমন-কি বর্তমানেও তাদের মধ্যে কোন যৌক্তিক বিরোধ নেই; আছে কেবল প্রায় সম্পূর্ণভাবে একটা যোগসূত্রের অভাব।

আপেক্ষিকবাদ প্রসঙ্গে, দর্শনের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এক মহাজাগতিক কাল এবং এক পরিবর্তহীন দেশের বিলোপ-সাধন, এবং তাদের উভয়ের স্থলে দেশ-কালের প্রতিকল্পন। এ পরিবর্তনের গুরুত্ব বিপুল, যেহেতু এর ফলে পদার্থিক জগতের সংগঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, এবং আমি মনে করি, মনোবিজ্ঞানেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। আমাদের কালে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা না দিয়ে দর্শনের কথা বলা নিষ্ফল হবে। সুতরাং, কিছু জটিলতা সত্ত্বেও, আমি চেষ্টা করবো।

কাণ্ডজ্ঞান ও আপেক্ষিকতাপূর্ব পদার্থবিদদের বিশ্বাস ছিল যে, দুটো ঘটনা যদি ভিন্ন জায়গায় ঘটে তাহলে, তাত্ত্বিকভাবে, তারা যুগপৎ ঘটেছে

১. "Progressive periodic processes."

কিনা এ প্রশ্নের একটা সুনির্দিষ্ট উত্তর অবশ্যই থাকবে। দেখা গেল যে, এ ধারণা ভ্রান্ত। ধরা যাক দু'জন লোক, ক ও খ, পরস্পর থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে; প্রত্যেকের কাছেই আছে একটা আয়না এবং আলোক-সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা। ক-এর কাছে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তখন পর্যন্ত তাদের একটা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট কালক্রম (time-order) আছে, এবং খ-এর ঘটনাগুলোর বেলাও তাই; সমস্যা আসে ক-এর সময়ের সঙ্গে খ-এর সময়ের যোগসূত্র স্থাপন করার বেলায়। ধরা যাক, ক খ-এর কাছে একটা রশ্মি (flash) পাঠিয়ে দিল; খ-এর আয়নায় তা প্রতিফলিত হলো, এবং কিছু সময় পর সেটা ক-এর কাছে ফিরে গেল। ক যদি পৃথিবীতে থাকে এবং খ যদি সূর্যে থাকে তাহলে এ সময়টা হবে প্রায় ষোল মিনিট। স্বভাবতঃই আমরা বলবো যে, যে সময়ে খ আলোক-সংকেতটা পেল সেটা ক-এর আলোক-সংকেত পাঠানোর সময় এবং ফিরে পাওয়ার সময়ের মাঝামাঝি। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সংজ্ঞা অদ্ব্যর্থক নয়; এটা নির্ভর করবে, ক ও খ পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে কিভাবে নড়ছে, তার উপর। এ সমস্যাটাকে যতই পরীক্ষা করে দেখা যায়, ততই এটাকে দুরতিক্রম্য বোধ হয়। রশ্মিটা পাঠিয়ে দেওয়ার পর এবং সেটাকে ফিরে পাওয়ার আগে ক-এর কাছে যা-কিছু ঘটে তা-ই রশ্মিটার খ-এর নিকট পৌঁছানোর সঠিকভাবে আগেও নয়, সঠিকভাবে পরেও নয়, এবং সঠিকভাবে যুগপৎও নয়। এটুকু পর্যন্ত, বিভিন্ন জায়গার কালের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করার (correlating) কোন অদ্ব্যর্থক উপায় নেই।

'স্থান'-এর (place) ধারণাও সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। লণ্ডন কি একটা 'স্থান'? কিন্তু পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীটা কি একটা 'স্থান'? কিন্তু সূর্যের চতুর্দিকে এটা ঘুরছে। সূর্য কি একটা 'স্থান'? কিন্তু তারকামণ্ডলীর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে এটা নড়ছে। বড় জোর কোন নির্দিষ্ট (given) সময় ধরে আপনি কোন স্থানের কথা বলতে পারেন; কিন্তু 'নির্দিষ্ট' সময়ের ধারণাটা দ্ব্যর্থক, যদি-না কোন একটা স্থানের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। এইভাবে 'স্থান'-এর ধারণাটা উবে যায়।

আমরা স্বভাবতঃই মনে করি যে, জগৎ এক সময়ে এক অবস্থায় এবং অন্য সময়ে অন্য অবস্থায়। এটা ভুল ধারণা। মহাজাগতিক সময় বলে কিছু নেই,

এবং সেজন্য জগতের কোন নির্দিষ্ট সময়কালীন অবস্থার কথা আমরা বলতে পারি না। এবং অনুরূপভাবে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে দুটো বস্তুর (body) দূরত্বের কথাও আমরা অদ্ব্যর্থকভাবে বলতে পারি না। দুটো বস্তুর একটার ক্ষেত্রে যে সময় উপযুক্ত সে সময় ধরলে আমরা একটা হিসাব পাব; অন্যটার সময় ধরলে অন্য হিসাব। এর ফলে নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম দ্ব্যর্থক হয়ে যায়, এবং দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে এর পুনর্বর্ণন আবশ্যক।

জ্যামিতিরও ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। যেমন, একটা সরল রেখাকে মনে করা হয় দেশে অবস্থিত একটা চিহ্ন বলে, যার সবক'টি অংশ একই সময়ে আছে। এখন আমরা দেখবো যে, একজন পর্যবেক্ষকের পক্ষে যেটা সরল রেখা, অন্যজনের পক্ষে সেটা সরল রেখা নয়। সুতরাং জ্যামিতিকে আর পদার্থবিদ্যা থেকে পৃথক করা যায় না।

'পর্যবেক্ষক'কে মন (mind) হওয়ার প্রয়োজন নেই —সেটা একটা আলোকচিত্রের পাত হতে পারে। এ এলাকায় 'পর্যবেক্ষক'-এর বিশেষ, ধর্মগুলো পদার্থবিদ্যার আওতায় পড়ে, মনোবিজ্ঞানের নয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চলমান বস্তু-সমুদয়ের মাধ্যমে চিন্তা করে চলবো, এবং পর্যায়ক্রমিক শুদ্ধিকরণের সাহায্যে এ চিন্তাধারাকে নতুন নতুন ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করবো, ততক্ষণ আমরা কেবল অধিক থেকে অধিকতর বিশৃঙ্খলার মধ্যে গিয়ে পড়বো। পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে বস্তুর বদলে ঘটনা (events) নিয়ে নতুনভাবে যাত্রারম্ভ করা। পদার্থবিদ্যায়, প্রাচীন ধারণা অনুসারে যা-কিছুর, একটা তারিখ ও একটা স্থান, এই উভই আছে বলা হবে তাই একটা 'ঘটনা'। একটা বিস্ফোরণ, একটা বিদ্যুৎ-ঝলক, কোন পরমাণু থেকে একটা আলোক-তরঙ্গের যাত্রা, অন্য কোন বস্তুতে সেই আলোক-তরঙ্গের উপস্থিতি—এদের যে-কোনটা একটা 'ঘটনা'। কোন বস্তুর ইতিহাস বলে আমরা যাকে বুঝি, সেটা তৈরী কতকগুলো ঘটনা-পরম্পরা (strings of events) দিয়ে; একটা আলোক-তরঙ্গের গতিপথ তৈরী এদের কতকগুলো দিয়ে; এবং আর সবই তদ্রূপ। কোন বস্তুর ঐক্য ইতিহাসের ঐক্য—এটা কোন ঐকতানের (tune) ঐক্যের মত; ঐকতান বাজাতে সময় লাগে এবং কোন এক

মুহূর্তে অখণ্ডভাবে থাকে না। কোন এক মুহূর্তে যা থাকে তা কেবল সেই জিনিস যাকে আমরা 'ঘটনা' বলি। হতে পারে যে, পদার্থবিদ্যায় ব্যবহৃত 'ঘটনা' শব্দটাকে মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত সেই একই শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন করা যায় না; এখনকার মতো পদার্থিক প্রক্রিয়ার উপাদান হিসাবে 'ঘটনা'র সঙ্গেই আমাদের কাজ—মনোবিজ্ঞানের 'ঘটনা' নিয়ে আমাদের শিরঃপীড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

পদার্থিক জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে, এবং সে সম্বন্ধগুলো এ-রকম যে, তার ফলে দেশ ও কালের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। তাদের আছে ক্রমের সম্বন্ধ (relations of order), যার ফলে আমরা বলতে পারি যে, কোন ঘটনা তৃতীয়টার চেয়ে দ্বিতীয়টার অধিক নিকটবর্তী। এভাবে আমরা ঘটনার 'প্রতিবেশ'-এর (neighbourhood) ধারণায় এসে পৌঁছাতে পারি: সেটাতে থাকবে, মোটামুটিভাবে, সেইসব ঘটনার সব-কটি যেগুলো নির্দিষ্ট (given) ঘটনার খুব কাছাকাছি। আমরা যখন বলবো যে নিকটবর্তী ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে তখন আমরা বুঝাবো যে, দুটো ঘটনা পরস্পরের যত নিকটবর্তী হবে, তাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা তত বেশী হবে, এবং তাদেরকে পরস্পরের যত কাছাকাছি নেওয়া হবে, তারা সীমাহীনভাবে তত সে সম্বন্ধ অর্জন করার নিকটবর্তী হবে।

দুটো নিকটবর্তী ঘটনার মধ্যে 'বিরাম' (interval) বলে একটা পরিমাপযোগ্য পরিমাণগত সম্বন্ধ আছে; কখনও দেশগত দূরত্বের সঙ্গে, কখনও-বা কালাতিক্রমের[১] সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয় দেশ-সদৃশ, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কাল-সদৃশ।[২] দুটো ঘটনার মধ্যে বিরাম কাল-সদৃশ, যখন একটা বস্তু উভয়ের মধ্যেই থাকতে পারে—যেমন, যখন উভয়ই আপনার দেহের ইতিহাসের অংশ। বিপরীত ক্ষেত্রে বিরামটা দেশ-সদৃশ। উভয়ের মধ্যে প্রান্তবর্তী ক্ষেত্রে বিরামটা শূন্য; এটা তখন ঘটে যখন উভয়ই একটা আলোক-রশ্মির অংশ।

নিকটবর্তী দুটো ঘটনার মধ্যবর্তী বিরাম এ অর্থে বিষয়গত যে, যে-কোন দু'জন হুঁশিয়ার পর্যবেক্ষক তার সম্পর্কে একই হিসাবে এসে পৌঁছবেন।

১. Lapse of time.
২. Space-like ; time—like.

দুটো ঘটনার মধ্যবর্তী দেশগত দূরত্ব অথবা কালাতিক্রম সম্পর্কে তাঁরা একই হিসাবে এসে পৌঁছবেন না, কিন্তু বিরামটা একটা যথার্থ পদার্থিক সত্য,[১] সকলের জন্যই এক। কোন বস্তু যদি এক ঘটনা থেকে অপরটাতে স্বাধীন-ভাবে যেতে পারে তাহলে, দুই ঘটনার মধ্যবর্তী বিরাম এবং সে বস্তুর সঙ্গে ভ্রমণশীল ঘড়ি দ্বারা পরিমাপকৃত তাদের মধ্যবর্তী সময় অভিন্ন হবে। এ ধরনের ভ্রমণ যদি পদার্থিক দিক থেকে অসম্ভব হয়, তাহলে সে বিরাম এবং যে পর্যবেক্ষকের কাছে ঘটনা দু'টো যুগপৎ তার দ্বারা পরিমাপকৃত দূরত্ব অভিন্ন হবে। কিন্তু ঘটনা দুটো যখন পরস্পরের খুব কাছাকাছি, কেবল তখনই বিরামটা সুনির্দিষ্ট; অন্যথায় এক ঘটনা থেকে অপরটাতে ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত (chosen) পথের উপর সে বিরাম নির্ভরশীল।

কোন ঘটনার অবস্থান নির্ধারণের জন্য চারটা সংখ্যা আবশ্যক; পুরাতন গণনা-পদ্ধতিতে যে সময় এবং দেশের যে তিনটা মাত্রা (dimension) রয়েছে, এগুলো তাদের অনুবর্তী।[২] এ চারটা সংখ্যাকে বলা হয় ঘটনার স্থানাঙ্ক (co-ordinate)। নিকটবর্তী স্থানাঙ্ককে নিকটবর্তী ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে, এমন যে-কোন নিয়মানুসারে এগুলোকে [ঘটনায়] আরোপ করা যেতে পারে; এ শর্ত সাপেক্ষে এগুলো নিছক প্রচলগত। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, কোন একটা বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছে। চারটা সংখ্যার সাহায্যে আপনি দুর্ঘটনার অবস্থান নির্ধারণ করতে পারেনঃ অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরবর্তী উচ্চতা, এবং গ্রীনিচ গড় সময়। কিন্তু দেশ-কালের মধ্যে বিস্ফোরণের অবস্থানটা আপনি চারটার চেয়ে কম সংখ্যার সাহায্যে নির্ণয় করতে পারেন না।

আপেক্ষিকবাদে সবকিছুই (এক অর্থে) পরবর্তী থেকে পরবর্তীতে (next to next) যায়; কালগত বা দেশগত দূরত্বের মত কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দূরবর্তী ঘটনাসমূহের মধ্যে নেই। এবং দূর থেকে ক্রিয়াশীল কোন শক্তি (forces) অবশ্যই নেই; বস্তুতঃ একটা সুবিধাজনক উপকথা হিসাবে ছাড়া আদৌ কোন 'শক্তি' নেই। যে এলাকায় বস্তু আছে, সেই বিশেষ এলাকার দেশ-কালের প্রকৃতি অনুসারে প্রতি মুহূর্তে বস্তু সেই কার্যধারা অবলম্বন

১. **Physical fact.**
২. **'these correspond to......'**

করে যেটা সেই মুহূর্তে সহজতম; এ কার্যধারাকে বলা হয় 'ভূমিতিক' (geodesic)।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আমি অবাধে বস্তু ও গতির কথা বলে যাচ্ছি, যদিও আমি বলেছিলাম যে, বস্তু-সমুদয় কেবল কতকগুলো ঘটনামালা মাত্র। সুতরাং কোন্-কোন্ ঘটনামালায় বস্তুর সৃষ্টি হয়, সেকথা অবশ্যই বলা দরকার; যেহেতু অবিচ্ছিন্ন ঘটনামালার সবগুলোতে বস্তুর সৃষ্টি হয় না, এমনকি সকল ভূমিতিকেও নয়। যে জাতীয় জিনিসে বস্তুর সৃষ্টি হয়, তার একটা সংজ্ঞা আমরা যতক্ষণ না দিচ্ছি ততক্ষণ গতি সম্পর্কে কথা বলা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না; কারণ গতির মধ্যে আছে একই বস্তুর বিভিন্ন সময়ে অবস্থান। সুতরাং বস্তুর স্থায়িত্ব (persistence) বলতে আমরা কি বোঝাই, এবং বস্তু-সংগঠক ঘটনামালা, বস্তু গঠন করে না, এমন ঘটনামালা থেকে কি ভাবে ভিন্ন হয়, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলার জন্য আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় এটাই।

কিন্তু, সূচনা হিসাবে, আমাদের কল্পনাকে নতুন ধারণাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে শিক্ষা দিলে সেটা কাজে লাগতে পারে। হোয়াইটহেড যাকে বলেন জড়ের "ধাক্কা মারার প্রবণতা" (pushiness) তাকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে। স্বভাবতঃই পরমাণুকে আমরা বিলিয়ার্ড-বলের অনুরূপ একটা কিছু বলে চিন্তা করি; আমাদের বরং একে মনে করা উচিৎ ভূতের মত একটা কিছু বলে, যার "ধাক্কা মারার" কোন প্রবণতা নেই, অথচ যা আপনাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারে। দ্রব্য (substance) ও কারণ, উভয়ের ধারণাই আমাদের বদলাতে হবে। পরমাণুর স্থায়িত্ব আছে একথা বলা, ঐকতানের স্থায়িত্ব আছে, একথা বলার মতোই। কোন ঐকতান বাজাতে যদি পাঁচ মিনিট লাগে তাহলে আমরা মনে করি না যে, এটা একটা একক জিনিস যা সেই সময়টুকু ধরে টিকে আছে; আমরা বরং একে কতকগুলো স্বরের একটা অনুক্রম (series) বলে মনে করি, যে স্বরগুলো এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে তার ফলে একটা ঐক্যের সৃষ্টি হয়। ঐকতানের ক্ষেত্রে ঐক্যটা সংবেদনগত (aesthetic) পরমাণুর ক্ষেত্রে সেটা কারণিক। কিন্তু যখন 'কারণিক' বলি তখন শব্দটাকে

স্বাভাবিকভাবে যা বোঝায়, ঠিক তা আমি বোঝাইনে। বাধ্যবাধকতা বা 'শক্তি'র কোন ধারণা অবশ্যই থাকতে পারবে না—বিলিয়ার্ড-বলের মধ্যে যে সংস্পর্শজনিত শক্তি[১] দেখি বলে আমরা কল্পনা করি সে শক্তিও না, অথবা যে দূরবর্তী ক্রিয়াকে অতীতে মাধ্যাকর্ষণ বলে মনে করা হতো সেটাও না। পরবর্তী থেকে পরবর্তীতে অনুক্রমের যে একটা নিয়ম আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, এখানে কেবল তাই আছে। কোন এক মুহূর্তের এক ঘটনার পরে নিকটবর্তী কোন এক মুহূর্তের অন্য ঘটনা আসে, যাকে, ক্ষুদ্র রাশিমালার প্রথম ক্রমানুসারে,[২] পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। এর ফলে আমরা একটা ঘটনা-পরম্পরা দাঁড় করাতে পারি, যে ঘটনাগুলোর প্রতিটি, মোটামুটিভাবে (approximately), কোন এক অন্তর্নিহিত নিয়মানুসারে সামান্য পূর্ববর্তী কোন ঘটনা থেকে জন্মায়। বহিরাগত প্রভাব কেবল ক্ষুদ্র রাশিমালার দ্বিতীয় ক্রমের উপর ক্রিয়া করে। কোন এক মোটামুটিভাবে-সঠিক অন্তর্নিহিত পরিবর্তন-নিয়মানুসারে এভাবে সংযুক্ত ঘটনামালাকে বলা হয় এক খণ্ড জড়। এক খণ্ড জড়ের ঐক্য কারণিক, এ কথা বলে আমি এটাই বোঝাই। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ ধারণাটা আমি আরও পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করবো।

১. Force of contact.

২. 'to the first order of small quantities.

একাদশ অধ্যায়

পদার্থবিদ্যায় কারণিক নিয়মাবলী

দেশ ও কালের প্রতিকল্প হিসাবে দেশ-কালকে গ্রহণ করা, এবং তার ফলে দ্রব্য-রূপে কল্পিত 'বস্তু'র (things) প্রতিকল্প হিসাবে ঘটনা-পরম্পরাকে গ্রহণ করা—পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা এ ব্যাপারে কথা বলেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কার্য ও কারণকে কেমন মনে হয়, এ অধ্যায়ে আমরা তাই নিয়ে আলোচনা করবো। দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমাদের কল্পনাকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদি থেকে মুক্ত করা যত কঠিন, এ ব্যাপারেও সেটা অন্ততঃ তত কঠিন। গতিবিদ্যায় কারণের সেকেলে ধারণা দেখা দিয়েছিল 'বল'-এর (force) ধারণারূপে। সূর্যোদয়ের কথা যেমন আমরা বলি, তেমনি বলের কথাও এখনও আমরা বলি, কিন্তু আমরা স্বীকার করি যে, এক ক্ষেত্রের মত আরেক ক্ষেত্রেও, এটা একটা সুবিধাজনক বাচনভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নয়।

ভাষা ও কাণ্ডজ্ঞানে কার্যকরণ-সম্বন্ধ (causation) গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে। আমরা বলি যে, লোকে বাড়ী তৈরী করে অথবা রাস্তা বাঁধে : 'তৈরী' করা এবং 'বাঁধা',[১] উভয় ধারণার মধ্যেই কারণিকতা আছে। আমরা একজন লোককে বলি 'ক্ষমতাশালী' (powerful), এবং তার দ্বারা বোঝাতে চাই যে, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তার ইচ্ছা-অভিলাষ কারণ হিসাবে কাজ করে। কার্যকারণের কতক দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়, অন্যগুলো তার চেয়ে কম। আমাদের পেশী যে আমাদের ইচ্ছানুগত হবে, এটা স্বাভাবিক মনে হয়, এবং কেবল চিন্তা করার ফলেই আমরা বুঝতে পারি যে, এ বিষয়টার একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার প্রয়োজন আছে। এটা স্বাভাবিক মনে হয় যে, আপনি যখন দণ্ডের (cue) সাহায্যে বিলিয়ার্ড-বলে আঘাত করেন তখন সেটা নড়ে। যখন কোন ঘোড়াকে

১. 'to "build" and "to make"...'

আমরা গাড়ী টেনে নিয়ে যেতে দেখি, অথবা রজ্জুর সাহায্যে কোন ভারী জিনিসকে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে দেখি, তখন আমরা 'অনুভব' করি যে, এ বিষয়ে সবকিছু আমরা বুঝতে পারছি। এ জাতীয় ঘটনাবলী থেকেই কারণ ও বলে কাণ্ডজ্ঞানের যে বিশ্বাস, সে বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটেছে।

কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের চোখে জগতের যে জটিলতা ধরা পড়ে, জগৎ আসলে অবিশ্বাস্য রকমে তার চেয়ে বেশী জটিল। আমরা যখন মনে করি যে আমরা কোন প্রক্রিয়া বুঝতে পারছি—'আমরা' বলতে আমি আমাদের প্রত্যেকের ভিতরকার চিন্তাবিহীন অংশটা বোঝাচ্ছি—তখন আসলে যা ঘটে সেটা এই যে, এমন একটা ঘটনা-পরম্পরা আছে যা অতীতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এত পরিচিত হয়ে উঠেছে যে, প্রত্যেক পর্যায়েই আমরা পরবর্তী পর্যায়টা আশা করি। মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন এসে পড়ে তখন সমগ্র প্রক্রিয়াটাই আমাদের কাছে অদ্ভুতভাবে বোধগম্য মনে হয়—যেমন, কোন খেলা দেখার বেলায়ঃ বলটা যা করে এবং খেলোয়াড়েরা যা করে তা 'স্বাভাবিক' মনে হয়, এবং আমরা অনুভব করি যেন আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি কিভাবে পর্যায়গুলোর একটা আরেকটার পর আসে। এ ভাবে আমরা, যাকে 'অবশ্যম্ভাবী' অনুক্রম[১] বলে, তার ধারণায় এসে পৌঁছি। পাঠ্য-পুস্তক বলে যে, খ যদি 'অবশ্যম্ভাবীরূপে' ক-এর পরে আসে তাহলে ক খ-এর কারণ। মনে হয়, 'অবশ্যম্ভাবিতা'র ধারণাটা সম্পূর্ণ নরত্বারোপী (anthropomorphic), এবং জগতের কোন আবিষ্কারযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়। কতকগুলো নিয়মানুসারে ঘটনাগুলো (things) ঘটে; নিয়মগুলোকে সাধারণ করা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা থেকে যায় নিরেট তথ্য।[২] যদি নিয়মগুলো ছদ্মবেশী প্রচল বা সংজ্ঞা না হয়, তাহলে তারা যে কেন সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে না তার কোন কারণ দেওয়া যায় না।

সুতরাং খ 'অবশ্যম্ভাবীরূপে' ক-এর পরে আসে, একথা বলা এর চেয়ে বেশী কিছু বলা নয় যে, একটা সাধারণ নিয়ম (rule) আছে—বহু-সংখ্যক প্রত্যক্ষীকৃত দৃষ্টান্তে যাকে দেখা গেছে, এবং কোন দৃষ্টান্তে যা মিথ্যা প্রমাণিত

১. Necessary sequence.
২. Brute facts.

হয় নি—যে নিয়ম অনুসারে ক-এর অনুরূপ ঘটনার পেছনে খ-এর অনুরূপ ঘটনা আসে। কারণটা যেন কার্যটাকে ঘটতে 'বাধ্য' করেছে—এরূপ কোন 'বাধ্যবাধকতা'র ধারণা আমাদের অবশ্যই থাকবে না। এ বিষয়ে কল্পনার জন্য একটা উত্তম পরীক্ষা হচ্ছে কার্যকারণ নিয়মগুলোর প্রতিবর্তনযোগ্যতা (reversibility)। সম্মুখের দিকে আমরা যতবার অনুমান করতে পারি, পশ্চাতের দিকেও ততবার পারি। আপনি যখন একটা চিঠি পান তখন আপনি যুক্তিসম্মতভাবেই অনুমান করেন যে, কেউ এটা লিখেছিল; কিন্তু আপনি অনুভব করেন না যে, আপনার চিঠি-প্রাপ্তি প্রেরককে সেটা লিখতে 'বাধ্য' করেছিল। বাধ্যবাধকতার ধারণা কারণের প্রতি যেমন আরোপযোগ্য নয়, তেমনি কার্যের প্রতিও নয়। কার্য কারণকে বাধ্য করে, একথা বলা যেমন বিভ্রান্তিকর, কারণ কার্যকে বাধ্য করে একথা বলাও তেমনি বিভ্রান্তিকর। বাধ্যবাধকতা নরত্বারোপী: একজন মানুষ কোনকিছু করতে তখন বাধ্য হয় যখন সে বিপরীত কাজটা করতে চায়, কিন্তু মানুষ বা পশুর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা না আসা পর্যন্ত বাধ্যবাধকতার ধারণা প্রযোজ্য নয়। যা ঘটে, বিজ্ঞানের সম্পর্ক কেবল তারই সঙ্গে—যা 'অবশ্যই' (must) ঘটবে, তার সঙ্গে নয়।

প্রকৃতির মধ্যে আমরা যখন অপরিবর্তনীয় নিয়ম খুঁজি, তখন আমরা দেখি যে, কাণ্ডজ্ঞান তাদের যেভাবে দাঁড় করায় তারা সে রকম নয়। কাণ্ডজ্ঞান বলে: বিদ্যুৎ-ঝলকের পরে আসে বজ্র, বায়ুপ্রবাহের পরে আসে তরঙ্গ, ইত্যাদি।

ব্যবহারিক জীবনে এ জাতীয় নিয়ম অপরিহার্য, কিন্তু বিজ্ঞানে এদের সবগুলো মোটামুটি (approximate) মাত্র। কারণ ও কার্যের মধ্যে যদি সময়ের কোন সসীম বিরতি থাকে তাহলে, সেটা যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন, এমন কিছু একটা ঘটতে পারে যার ফলে কার্য-সংঘটনের পথে বাধার সৃষ্টি হবে। বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলো কেবল অন্তরাত্মক সমীকরণের (differential equations) মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে—যদিও আপনি কোন সসীম সময়ের পর কি ঘটবে তা বলতে পারেন না, তথাপি আপনি বলতে পারেন যে, আপনি যদি সময়টাকে সংক্ষিপ্ত থেকে আরও সংক্ষিপ্ত করে যেতে থাকেন তাহলে যা ঘটবে তা অধিক থেকে

অধিকতরভাবে এই-এই রকমের কোন-একটা নিয়মের অনুবর্তী হবে। খুব সরল একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক: আমি এখন এই কামরায় আছি; আপনি বলতে পারেন না আরেক সেকেণ্ডের মধ্যে আমি কোথায় থাকবো, কারণ একটা বোমা ফেটে গিয়ে আমাকে আকাশের উপর তুলে দিতে পারে; কিন্তু, এখন পরস্পরের খুব কাছাকাছি আছে, আমার দেহের এমন দুটো ক্ষুদ্র খণ্ডের কথা ধরলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, খুব সংক্ষিপ্ত ও সসীম 'কোন-একটা' খণ্ডকালের পরও তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকবে। এক সেকেণ্ড যদি যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত না হয় তাহলে তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত সময় আপনি নিতে পারেন; কত সংক্ষিপ্ত সময় আপনাকে নিতে হবে সে কথা আগে থেকে আপনি বলতে পারেন না, কিন্তু আপনি এ বিষয়ে বেশ সুনিশ্চিত হতে পারেন যে, যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত সময় একটা আছে।

কোয়াণ্টাম-গত ঘটনাবলী বাদ দিলে, পদার্থবিদ্যার পর্যায়ক্রমের (sequence) নিয়মাবলী দু'রকমের, ঐতিহ্যগত গতিবিদ্যায় যেগুলো বেগের নিয়মাবলী এবং ত্বরণের নিয়মাবলী হিসাবে দেখা দিয়েছিল। খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে কোন বস্তুর বেগ খুব অল্পই পরিবর্তিত হয়, এবং সময়টা যদি যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হয় তাহলে বেগের পরিবর্তন সীমাহীনভাবে হ্রাস পেতে থাকে। সর্বশেষ অধ্যায়ে এটাকেই আমরা বলেছিলাম 'অন্তর্নিহিত' কার্যকারণ নিয়ম। তারপর আছে বহির্জগতের কার্যফল—ঐতিহ্যগত গতিবিদ্যায় যে ভাবে সেটা ধরা পড়েছিল, এবং ত্বরণে যেটাকে দেখা যায়। বেগের মধ্যে অল্প সময়ে যে সামান্য পরিবর্তন সত্যিই ঘটে, তাকে আরোপ করা হয় চতুর্দিককার বস্তুসমূহে, কারণ তাদের পরিবর্তনের অনুরূপভাবে এ-ও পরিবর্তিত হয়, এবং সে পরিবর্তন ঘটে নির্ধারিত নিয়মানুসারে। এইভাবে আমরা মনে করি যে, চতুর্দিককার বস্তু-সমুদয় একটা প্রভাব ফেলে, যাকে আমরা 'বল' বলি, যদিও জ্যোতিষশাস্ত্রে তারকার প্রভাব যেমন রহস্যময় এ-ও ঠিক তেমনি রহস্যময় থেকে যায়।

মাধ্যাকর্ষণিক শক্তি-সমূহের বেলায়, আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব এ ধারণার বিলোপ সাধন করেছে। এ মতবাদে, সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তমান গ্রহ, সে প্রতিবেশে (neighbourhood) কোন সরল রেখার যত নিকটবর্তী থেকে ভ্রমণ করা সম্ভব, তত নিকটবর্তী থেকে ভ্রমণ করছে। প্রতিবেশকে মনে

করা হয় অ-ইউক্লিডীয়—অর্থাৎ, ইউক্লিড যে রকমের সরল রেখা কল্পনা করেছিলেন, তেমন কিছু তার মধ্যে নেই। কোন বস্তু যদি গ্রহমণ্ডলীর মত অবাধে (freely) ভ্রমণ করতে থাকে, তাহলে সে একটা নিয়ম মেনে চলে। এ নিয়মটাকে সব চেয়ে সরল ভাষায় উল্লেখ করতে হলে সেটা নিম্নরূপ হবে: ধরা যাক, পৃথিবীতে ঘটে এমন দুটো ঘটনা আপনি নিলেন, এবং পৃথিবীর সঙ্গে চলে এমন একাধিক সঠিক আদর্শ ঘড়ির সাহায্যে তাদের মধ্যবর্তী সময় আপনি পরিমাপ করলেন। ধরা যাক, কোন ভ্রমণকারী ম্যাজিক কার্পেটে চড়ে ইতিমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসেছেন; প্রথম ঘটনার সময়ে তিনি পৃথিবী ছেড়ে যান এবং দ্বিতীয় ঘটনাটার সময়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। তাঁর ঘড়িগুলোর মধ্যে যে সময় ধরা পড়বে সেটা, পৃথিবীস্থ ঘড়িগুলোর মধ্যে যে সময় ধরা পড়বে, তার চেয়ে কম হবে। পৃথিবী যে ভূমিতিক-আকারে ঘোরে, একথা বলতে এটাই বোঝানো হয়; এবং আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেখানে যে সরল রেখা পাওয়া যাবে, ভূমিতিকই হচ্ছে তার সব চেয়ে কাছাকাছি। বলতে গেলে, সবকিছুই জ্যামিতিক, এবং এর মধ্যে কোন 'বল' জড়িত নয়। যে কারণে পৃথিবী আবর্তিত হয় সেটা সূর্য নয়—সেটা পৃথিবী যেখানে আছে সেখানকার দেশ-কালের প্রকৃতি।

এমন-কি এটাও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়। দেশ-কাল পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে বাধ্য করে না; এ কেবল আমাদের 'বলতে' বাধ্য করে যে, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে। অর্থাৎ, যা ঘটে, দেশ-কাল এটাকে তার বর্ণনা দেওয়ার সংক্ষিপ্ততম উপায়ে পরিণত করে। অন্য কোন ভাষায়ও আমরা এর বর্ণনা দিতে পারতাম; সেটাও একই রকম অভ্রান্ত হতো, তবে এর চেয়ে কম সুবিধাজনক।

জ্যোতির্বিদ্যা যে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে, এ সত্যের সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যায় 'বল'-এর বিলোপ সাধনের যোগ আছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে, আমরা ধাক্কা দিই এবং টানাটানি করি, আমরা জিনিসপত্র স্পর্শ করি, এবং আমরা পৈশিক শ্রমকষ্ট (strains) অনুভব করি। এসব থেকেই 'বল'-এর ধারণা জন্মে আমাদের মধ্যে, কিন্তু এ ধারণাটা নরত্বারোপী। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির নিয়মাবলী কল্পনা করতে হলে দর্পণের ভেতরকার বস্তুসমূদয়ের

গমনাগমনের কথা চিন্তা করুন; তারা খুব দ্রুত গমনাগমন করতে পারে, যদিও দর্পণ-জগতে বল বলে কিছু নেই।

বলের জায়গায় যে জিনিসগুলোকে আমাদের বসাতে হবে তারা হচ্ছে অনুবন্ধের নিয়মাবলী। ঘটনাবলীকে তাদের অনুবন্ধের মাধ্যমে পুঞ্জাকারে সমবেত করা যায়। কারণিকতার পুরাতন ধারণার মধ্যে কেবল এটুকুই সত্য। এবং এটা কোন 'পূর্বস্বীকৃতি' (postulate) বা 'ক্যাটেগরি' (category) নয়; এটা একটা নিরীক্ষিত সত্য—সৌভাগ্যজনিত, অপরিহার্য নয়।

আমরা যেমন পূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছি, ঘটনাবলীর এ অনুবন্ধগুলোর সূত্র ধরেই স্থায়ী 'বস্তু'র (things) সংজ্ঞার আবির্ভাব ঘটে। দ্রব্যত্বের দিক থেকে, একটা ইলেক্ট্রন ও একটা আলোক-রশ্মির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। প্রত্যেকটাই বস্তুতঃ একটা ঘটনা-পরম্পরা অথবা ঘটনাপুঞ্জের পরম্পরা।[১] আলোক-রশ্মির ক্ষেত্রে অন্য কোনরূপ চিন্তা করার কোন প্রলোভন আমাদের নেই। কিন্তু ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে, আমরা একে একটা একক স্থায়ী সত্তা বলে মনে করি। এ রকম কোন সত্তা থাকতে 'পারে', কিন্তু থাকার সপক্ষে কোন প্রমাণ আমরা পেতে পারি না। আমরা যা আবিষ্কার করতে পারি তা হচ্ছে (ক) একটা ঘটনা-পুঞ্জ—সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এমন কতকগুলো ঘটনা যেগুলোতে একটা আলোক-তরঙ্গ তৈরী—যে ঘটনাগুলো একটা কেন্দ্র থেকে বহির্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং যেগুলোকে প্রাকল্পিকভাবে সেই কেন্দ্রবর্তী একটা কারণে আরোপ করা হয়েছে; (খ) অন্যান্য সময়ে, আরও অল্প-বিস্তর সদৃশ ঘটনা-পুঞ্জ, যেগুলো প্রথম ঘটনা-পুঞ্জের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে সম্পর্কিত, এবং সেজন্য অন্যান্য সময়েও সেই একই প্রাকল্পিক কারণে আরোপিত। কিন্তু আবিষ্কারযোগ্য কতকগুলো নিয়ম দ্বারা সম্পর্কিত কতকগুলো ঘটনা-পুঞ্জের পরম্পরা ছাড়া আরকিছু আমাদের কল্পনা করা (assume) উচিত নয়। এই পরম্পরাকে আমরা 'জড়' (matter) বলে 'সংজ্ঞায়িত' করতে পারি। অন্য কোন অর্থে জড় আছে কিনা তা কেউ বলতে পারে না।

কার্যকারণের পুরাতন ধারণার মধ্যে যা সত্য তা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন সময়ে ঘটনাবলী নিয়ম (অন্তরাত্মক সমীকরণ) দ্বারা সংযুক্ত। যখন

[১] 'a string of events or of sets of events.'

ক-ঘটনাকে খ-ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য কোন নিয়ম থাকে, তখন ঘটনা দুটোর মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট অদ্ব্যর্থক কাল-ক্রম্ আছে। কিন্তু ঘটনা দুটো যদি এ রকম হয় যে, ক থেকে যাত্রা করে কোন আলোক-রশ্মি খ সংঘটিত হবার পর খ-য়ে অবস্থানকারী কোন বস্তুতে এসে পেঁৗছে, এবং উলটো দিকেও তেমনি হয় (vice versa), তাহলে কোন নির্দিষ্ট কাল-ক্রম এবং ক ও খ-কে সংযোগকারী কোন সম্ভাব্য কার্যকারণ নিয়ম নেই। তাহলে ক ও খ-কে পৃথক ভৌগোলিক সত্য (facts) বলে মনে করতে হবে।

কতকগুলো লৌকিক বিশ্বাস আছে যেগুলোকে স্বতঃপ্রমাণ মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মতে তারা হয় মিথ্যা, নয় তো মিথ্যা ধারণার দিকে আমাদের পরিচালিত করতে পারে। সম্ভবতঃ এ বিশ্বাসগুলোর প্রসঙ্গে বর্তমান ও পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর তাৎপর্য দেখিয়ে তাদের আলোচনার পরিধি এবং উদ্দেশ্যের উপর স্পষ্টতর আলোকপাত করা যেতে পারে। আধুনিক পদার্থবিদ্যার দার্শনিক তাৎপর্য (outcome) ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালানোর সময় সত্যি সত্যি যেসব আপত্তি আমার কাছে উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যেই আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।[১]

"চলমান 'বস্তু' (thing) বাদ দিয়ে গতির ধারণা আমরা করতে পারি না।" এক অর্থে, এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য (truism): কিন্তু সচরাচর এর যে অর্থ দেওয়া হয় তাতে এটা একটা ভুল কথা। নাটক বা সঙ্গীতের 'গতি'র কথা আমরা বলি, যদিও এদের কোনটাকেই অনুষ্ঠানের প্রতি মুহূর্তেই অখণ্ডরূপে বিরাজমান কোন 'বস্তু' বলে ধারণা করিনে। আমরা যখন পদার্থিক জগতের ধারণা করার চেষ্টা করি তখন এ ধরনের একটা চিত্রই আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে এমন একটা ঘটনা-পরম্পরার কথা, যে ঘটনাগুলো কতকগুলো কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা সংযুক্ত এবং যেগুলোর মধ্যে এমন ঐক্য আছে যে তাদেরকে একটামাত্র নাম দেওয়া চলে। তখন আমরা কল্পনা করতে আরম্ভ করি যে, এই একটামাত্র নামে একটামাত্র 'বস্তু' বোঝায়, এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো যদি একই জায়গায়

১. মি. পার্সি গ্রিফিথ একজন সুপরিচিত প্রকৌশলী—দার্শনিক বিষয়াদির উপর তিনি একজন লেখকও বটে। আমার কাছে লেখা তাঁর এক চিঠি থেকে (সদয় অনুমতিক্রমে) এ আপত্তিগুলো আমি উদ্ধৃত করছি।

া থাকে তাহলে আমরা বলি যে, 'বস্তু'টা 'নড়েছে'। কিন্তু এটা কেবল কটা সুবিধাজনক সংক্ষেপণ (shorthand)। চলচ্চিত্রে মনে হয় যেন মরা দেখছি যে, একটা লোক গগনচুম্বী অট্টালিকা থেকে পড়ে যাচ্ছে, টলিগ্রাফের তার সাপটে ধরছে, এবং তা সত্ত্বেও মাটিতে এসে ঠেকছে। আমরা জানি যে, প্রকৃতপক্ষে এখানে কতকগুলো স্বতন্ত্র আলেকচিত্র আছে, বং একটা-মাত্র চলমান 'বস্তু'র প্রতীয়মান উপস্থিতিটা বিভ্রান্তিকর। এদিক থেকে বাস্তব জগৎ চলচ্চিত্রের অনুরূপ।

গতির প্রসঙ্গে 'অভিজ্ঞতা' ও 'পূর্বসংস্কারে'র মধ্যে যে পার্থক্যটা করা কঠিন, তারই উপর জোর দেওয়া আবশ্যক। মোটামুটিভাবে, আপনি যা দেখেন সেটাই অভিজ্ঞতা, এবং আপনি যা দেখেন বলে কেবল মনে করেন সেটাই পূর্বসংস্কার। পূর্বসংস্কার আপনাকে বলে যে, দুটো ভিন্ন সময়ে আপনি একই 'অভিন্ন' টেবিল দেখছেন; আপনি "মনে করেন" যে অভিজ্ঞতা আপনাকে এ-ই বলে। এ যদি সত্যিই অভিজ্ঞতা হতো তাহলে আপনার ল হতে পারতো না; তথাপি অভিজ্ঞতাটার কোনরূপ পরিবর্তন না করে নুরূপ অন্য একটা টেবিল তার জায়গায় বসানো যেতে পারে। দুটো ভিন্ন ময়ে আপনি যদি একটা টেবিলের দিকে তাকান, তাহলে আপনার যে ংবেদন জন্মে সেগুলো খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ, এবং স্মৃতি আপনাকে বলে যে সগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ; কিন্তু সংবেদন দুটো যে একই অভিন্ন জিনিস দ্বারা ষ্ট হচ্ছে সেটা দেখাবার মত কিছুই নেই। টেবিলটা যদি চলচ্চিত্রে থাকে, াহলে আপনি জানেন যে, এরূপ কোন সত্তা নেই, যদিও আপনি দেখতে ান যে, আপাত-প্রতীয়মান অবিচ্ছিন্নতা-সহ এ পরিবর্তিত হচ্ছে। 'বাস্তব' real) টেবিলের ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতাটা ঠিক সেরকম; সুতরাং 'বাস্তব' টবিলের ক্ষেত্রেও প্রকৃত অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই নেই যা থেকে আমরা দেখতে পারি স্থায়ী কোন সত্তা আছে কিনা। সেজন্য আমি বলিঃ আমি ানি না কোন স্থায়ী সত্তা আছে কিনা, তবে আমি জানি যে তার অস্তিত্ব ধরে া নিয়েও আমার অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সুতরাং স্থায়ী সত্তাকে স্বীকার বা অস্বীকার করা কোন বিধিসম্মত বিজ্ঞানের অঙ্গ হতে পারে না; এর কোনটা করতে গেলেই সে বিজ্ঞান অভিজ্ঞতা-লব্ধ নিশ্চয়তার warrant) সীমা ডিঙিয়ে যায়।

উপরে 'বল' সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল, উল্লিখিত পত্রের এক অংশে তার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয়েছিল। নীচে সে অংশটা আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

"বলের ধারণাটার উৎস পদার্থবিদ্যিক নয়, সেটা মনোবৈজ্ঞানিক। ঠিক হোক বা বেঠিক হোক—যে নাক্ষত্রিক বিশ্বে আমরা অসংখ্য গোলাকার বস্তুকে তাদের কক্ষের উপর আবর্তিত হতে এবং কক্ষপথে পরস্পরের চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরতে দেখি, সে বিশ্ব সম্পর্কে সবচেয়ে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা-ধ্যানের মধ্যে এর উদ্ভব ঘটে। নির্ভুলভাবেই হোক বা ভ্রমক্রমেই হোক, আমরা স্বভাবতঃই মনে করি যে, এগুলোকে এভাবে তৈরী করেছে এবং এভাবে রক্ষা করছে কোন একটা বা কতিপয় বল।"

এখানে আমরা যা নিরীক্ষণ করছি বলে বলা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে আমরা তা 'নিরীক্ষণ' (observe) করি না; এর সবকিছুই অনুমিত। জ্যোতির্বিদ্যায় আমরা যা নিরীক্ষণ করি তা হচ্ছে আলোকবিন্দুর একটা দ্বিমাত্রিক প্যাটার্ন; দূরবীণযোগে তাকালে তার মধ্যে দেখা যায় কয়েকটি পরিমাপযোগ্য আয়তনের উজ্জ্বল বহির্ভাগ[১] (গ্রহগুলো), এবং তার মধ্যে অবশ্য আরও আছে দুটো বৃহত্তর বহির্ভাগ যাদেরকে আমরা বলি সূর্য ও চন্দ্র। এ প্যাটার্নের অধিকাংশ (স্থির নক্ষত্রগুলো) প্রতি তেইশ ঘণ্টা ও ছাপ্পান্ন মিনিটে পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার পরিভ্রমণ করে। সূর্যের আবর্তনকাল বিভিন্ন হয়, যাদের গড়পড়তা পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা, এবং সূর্য কখনও সে গড় থেকে খুব দূরে সরে যায় না। চন্দ্র ও গ্রহমালারও আপাতপ্রতীয়মান গতি আছে, যেগুলো তার চেয়ে অনিয়মিত। 'নিরীক্ষিত' সত্যগুলো এই। পৃথিবীর চতুর্দিকে কতকগুলো গোলক (spheres) আবর্তিত হচ্ছে—প্রতি গ্রহের জন্য একটা এবং নক্ষত্ররাজির জন্য একটা—এ মধ্যযুগীয় তত্ত্বের মধ্যে যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা কিছু নেই। আধুনিক মতবাদগুলো সরলতর, কিন্তু নিরীক্ষিত সত্যগুলোর সঙ্গে বিন্দুমাত্র অধিক সামঞ্জস্যও তাদের নেই; 'সরল' নিয়মাবলীর জন্যে প্রবল অনুরাগ থেকেই আমরা তাদের অবলম্বন করেছি।

উপরের উদ্ধৃতির সর্বশেষ বাক্যটা থেকে আরও কিছু চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। লেখক বলেন, "নির্ভুলভাবেই হোক বা ভ্রমক্রমেই হোক

১. Surface.

আমরা স্বভাবতঃই মনে করি যে, এগুলোকে এভাবে তৈরী করেছে এবং এভাবে রক্ষা করছে কোন একটা বা কতিপয় বল।" এটা আমি অস্বীকার করি না। এটা "স্বাভাবিক", এবং এটা "নির্ভুল অথবা ভ্রান্ত"—আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, এটা ভ্রান্ত। ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের যে অনুরাগ, 'বল' তারই অংশ। সেই হিন্দুর কথা প্রত্যেকেই জানে যিনি ভেবেছিলেন যে, জগৎটা পড়ে যায় না এজন্য যে একটা হাতী তাকে ধরে রেখেছে, এবং হাতীটা পড়ে যায় না এজন্য যে একটা কচ্ছপ তাকে ধরে রেখেছে। যখন তার ইউরোপীয় সংলাপী বললেন, "তাহলে কচ্ছপটার ব্যাপারে কি বলা যায়?" তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, পরাতত্ত্ব (metaphysics) করে করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি চাচ্ছেন বিষয় পরিবর্তন করতে; ব্যাখ্যা হিসাবে 'বল' হাতী আর কচ্ছপ থেকে উত্তম কিছু নয়। এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কেবল 'কিরূপে' (how) নয়, তাদের 'কেন'-তে (why) পৌঁছানোর একটা প্রচেষ্টা। একটা সীমার মধ্যে, যা ঘটে তাই আমরা নিরীক্ষণ করি; এবং নিরীক্ষেয় বিষয়গুলো যে সব নিয়মে ঘটে তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি, কিন্তু সে নিয়মাবলীর কোন হেতুতে (reason) নয়। কোন হেতু যদি আমরা আবিষ্কার করি তাহলে তার জন্য আর একটা হেতুর প্রয়োজন, এবং এমনি করেই সেটা এগোতে থাকবে। 'বল' হচ্ছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যৌক্তিগায়ন (rationalising), কিন্তু সেটা নিষ্ফল যৌক্তিগায়ন, যেহেতু 'বল'-কেও তখন যৌক্তিগায়িত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

যখন বলা হয়—প্রায়ই যেমন হয়ে থাকে—যে, 'বল' অভিজ্ঞতার জগতের অন্তর্গত, তখন যা বোঝানো হতে পারে, সেটা বোধগম্য করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। প্রথমতঃ, বোঝানো হতে পারে যে, যে সব গণনায় বলের ধারণা ব্যবহৃত হয় সেগুলো কার্যক্ষেত্রে সঠিক ফলাফলে পৌঁছে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, এটা স্বীকার করা হয়: কেউ এ প্রস্তাব করবেন না যে, প্রকৌশলীর উচিত তাঁর পদ্ধতিগুলো বদলে ফেলা, অথবা চাপ ও মোচড়াদি পরিমাপ করা ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু তার থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, চাপ ও মোচড়াদি আছে। চিকিৎসক তাঁর হিসাব রাখেন গিনিতে (guineas), যদিও গিনির কোন অস্তিত্ব নেই; তাঁর সঠিক পারিশ্রমিক তিনি পান, যদিও তিনি যে মুদ্রা ব্যবহার করেন সেটা

কাল্পনিক। সেইরূপ, প্রকৌশলীর ভাবনা তাঁর পুলটা খাড়া থাকবে কিনা সে প্রশ্ন নিয়েঃ অভিজ্ঞতায় যে সত্যটা পাওয়া যায় তা এই যে, সেটা খাড়া থাকে (অথবা খাড়া থাকে না), এবং চাপ ও মোচড়াদি হচ্ছে, কি ধরনের পুল খাড়া থাকবে, সে বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার একটা উপায় মাত্র। গিনি থেকে যেমন কাজ পাওয়া যায়, তাদের থেকেও তেমনি কাজ পাওয়া যায়, কিন্তু তারাও গিনির মতই কাল্পনিক।

কিন্তু যখন বলা হয় যে, বল একটা অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বোঝানো হতে পারে। বোঝানো হতে পারে যে, চাপ অথবা পৈশিক শ্রান্তির মত কোন জিনিসের অভিজ্ঞতা যখন আমাদের হয় তখন আমরা বল প্রত্যক্ষ (experience) করি। এ বিষয়টা আমরা পর্যাপ্তভাবে আলোচনা করতে পারি না মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সম্বন্ধের কথা না এনে, যে প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো পরবর্তী এক পর্যায়ে। তবে এটুকু আমরা বলতে পারিঃ কোন কঠিন বস্তুর উপর আপনার আঙ্গুলের ডগা যদি চেপে ধরেন তাহলে আপনার একটা অভিজ্ঞতা হয় যা আপনি আঙ্গুলের ডগাতে আরোপ করেন, কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিকের ভেতরে অন্তর্বর্তী কার্যকারণের এক দীর্ঘ শৃঙ্খল আছে। যদি আপনার আঙ্গুল কেটে বাদ দেওয়া হতো তাহলেও আঙ্গুল ও মস্তিষ্ক সংযোজনকারী স্নায়ুমণ্ডলীর উপর উপযুক্ত অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আপনি একই অভিজ্ঞতা পেতে পারতেন; সুতরাং, একটা অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য হিসাবে, আঙ্গুলের ডগা না থাকলেও আঙ্গুলের ডগা এবং কঠিন বস্তুটার মধ্যবর্তী বলের অস্তিত্ব থাকতো। এটা থেকে দেখা যায় যে, এ অর্থে বল এমন কিছু-একটা হতে পারে না, যার সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সংশ্লেষ থাকতে পারে।

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক জিনিসের অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না, যেগুলোর অভিজ্ঞতা হয় বলে আমরা মনে করি। সুতরাং, অতিরিক্ত নিশ্চয়তার আশা পোষণ না করে আমাদের জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, কোন্ অর্থে পদার্থবিদ্যা অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হতে পারে, এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বলে এর দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এর সত্তা (entities) ও অনুমানগুলোর প্রকৃতি কিরূপ হতে হবে। এ অনুসন্ধান আমরা শুরু করবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পদার্থবিদ্যা ও প্রত্যক্ষণ

স্মরণ করা যেতে পারে যে, পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষণকে 'সংবেদনশীলতা'র এক প্রজাতি হিসাবে বিবেচনা করেছিলাম। পরিপার্শ্বের কোন নির্দিষ্ট দিকের[১] প্রতি আমাদের যে সংবেদনশীলতা তাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করেছিলাম এই বলে যে, এ হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্যসূচক প্রতিক্রিয়া,[২] ওই দিকটা উপস্থিত থাকলেই নিয়মিতভাবে যাকে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন অবস্থায় নয়; নির্দিষ্ট দিকে, সজীব দেহের চেয়ে বরং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য অধিকতর পূর্ণভাবে উপস্থিত, যদিও যেসব উদ্দীপকের উপর তারা [যন্ত্রপাতি] প্রতিক্রিয়া করবে সেগুলোর ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বাছবিচার বেশী। আমরা সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, বহিঃস্থ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষণ ও অন্য ধরনের সংবেদনশীলতার মধ্যে যে বিষয়ে পার্থক্য সেটা হচ্ছে অনুষঙ্গ অথবা সাপেক্ষ অনুবর্তের নিয়ম। কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে, এভাবে প্রত্যক্ষণকে সম্পূর্ণ বাহ্যিকভাবে দেখার মধ্যে পদার্থিক জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে একটা চলতি ব্যাপার (going concern) বলে আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয়। এখন আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে এ পূর্বধারণা সম্পর্কে, এবং ভেবে দেখতে হবে কিভাবে আমরা পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে জানতে পারি, এবং কতটুকু আমরা প্রকৃতপক্ষে জানি।

পঞ্চম অধ্যায়ের মতবাদ অনুসারে, দেহের সঙ্গে যে-সব জিনিসের দৈশিক সংস্পর্শ নেই তাদেরকেও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। পরিপার্শ্বের কোন দিকের উপর একটা প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে, কিন্তু সে দিকটা প্রত্যক্ষকের দেহ থেকে কম বা বেশী দূরে থাকতে পারে; এ সজ্ঞার সীমার মধ্যে, আমরা এমন কি সূর্য ও তারকাসমূহও প্রত্যক্ষ করতে পারি। তার জন্য যা প্রয়োজন সেটা কেবল এই যে, আমাদের প্রতিক্রিয়াটার ভিত্তি হওয়া উচিত আমাদের দেহ

১. Given feature. ২. Characteristic reaction.

এবং পরিবেশের দিকটার মধ্যবর্তী সম্বন্ধ। আমাদের পিঠ যখন সূর্যের দিকে তখন আমরা তাকে দেখি না; আমাদের মুখ যখন তার দিকে, তখন দেখি।

যখন আমরা কোন বাহ্য ঘটনার দৃষ্টিগত বা শ্রুতিগত প্রত্যক্ষণ বিবেচনা করি, তখন পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনটা বিষয় আছে। প্রথমতঃ আছে ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষকের দেহ পর্যন্ত বিস্তৃত বাহ্য জগতের একটা প্রক্রিয়া; তারপর আছে তার দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়াটা, যে পর্যন্ত কোন বহিঃস্থ পর্যবেক্ষক তাকে জানতে পারে; সবশেষে আছে একটা প্রশ্ন, আগে হোক বা পরে হোক যার সম্মুখীন হতেই হবেঃ অর্থাৎ, প্রত্যক্ষক তার দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়াটার এমন কিছু জানতে পারে কিনা, যা অন্য কোন পর্যবেক্ষক জানতে পারতো না। ক্রমানুসারে আমরা এ বিষয়গুলো আলোচনা করবো।

প্রত্যক্ষকের দেহের মধ্যে নয় এমন কোন প্রক্রিয়া "প্রত্যক্ষ" (precive) করা যদি সম্ভব হতে হয় তাহলে বহির্জগতে এমন একটা পদার্থিক প্রক্রিয়া থাকতে হবে যে, কোন ঘটনা যখন ঘটে তখন তার ফলে প্রত্যক্ষকের দেহের উপরিভাগে (surface) কোন এক ধরনের উদ্দীপকের সৃষ্টি হবে। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক, কোন এক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের কাছে ম্যাজিক লণ্ঠনের উপরে বিভিন্ন প্রাণীর চিত্র প্রদর্শিত হলো; পর্যায়ক্রমে সব ছেলেমেয়েকেই প্রত্যেক প্রাণীর নাম বলতে বলা হলো। আমরা ধরে নিতে পারি যে, প্রাণীকুলের সঙ্গে এ ছেলেমেয়েদের এতটুকু পরিচয় আছে যে, তারা সঠিক মুহূর্তটিতে 'বিড়াল' 'কুকুর,' 'জিরাফ', 'হিপোপটেমাস' ইত্যাদি বলতে পারে। তারপর, পদার্থিক জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের মনে করতে হবে যে, একটা প্রক্রিয়া প্রত্যেক ছবি থেকে যাত্রা করে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের চোখ পর্যন্ত চলে যায়, এবং এ ভ্রমণগুলোর সর্বত্র এ প্রক্রিয়াটার এমন-কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, যাতে প্রক্রিয়াটা যখন তাদের চোখে পৌঁছে তখন তার ফলে এক ক্ষেত্রে 'বিড়াল' শব্দটা এবং অন্য ক্ষেত্রে 'কুকুর' শব্দটা বেরিয়ে আসতে পারে। আলোর পদার্থিক তত্ত্বে[১] এসব কথা আমরা পাই। কিন্তু ভাষা সম্পর্কে একটা মজার কথা আছে যা এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার। আলো সম্পর্কিত সাধারণ পদার্থিক তত্ত্ব যদি নির্ভুল হয় তাহলে বিভিন্ন শিশুর

১. অথবা, পদার্থবিজ্ঞিক তত্ত্বে। (অনুবাদক)।

মন-সব উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করবে, যেগুলো চিত্র থেকে তাদের [শিশুদের] দূরত্ব ও দিক অনুসারে এবং আলোর পতন-ভঙ্গি অনুসারে বিভিন্ন হবে। তাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও ভেদাভেদ আছে, কারণ তারা সকলেই 'বিড়াল' শব্দটা উচ্চারণ করলেও কেউ-কেউ উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে, কেউ-কেউ মৃদু স্বরে, কেউ-কেউ স্ত্রী-কণ্ঠের সর্বোচ্চ পর্দায়, কেউ-কেউ সর্বনিম্ন পর্দায়। কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়াসমূহের বিভিন্নতা উদ্দীপকসমূহের বিভিন্নতার চেয়ে অনেক কম। আমরা যদি বিভিন্ন বিড়ালের ছবি বিবেচনা করে দেখি—এগুলোর সব-ক'টির ক্ষেত্রেই তারা 'বিড়াল' শব্দটার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া করে—তাহলে একথা আরও সত্য বলে প্রমাণিত হবে। সুতরাং ভাষা এমন-সব প্রতিবেদন উৎপাদনের হাতিয়ার যেগুলো, যে সব ক্ষেত্রে উদ্দীপক-সমূহের সাদৃশ্য আমাদের কাছে তাদের পার্থক্যের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সে সব ক্ষেত্রে উদ্দীপকসমূহের চেয়ে অল্প মাত্রায় পরস্পর থেকে ভিন্ন হয়। এর ফলে, যে সব উদ্দীপক থেকে প্রায় অভিন্ন প্রতিবেদনের উৎপত্তি ঘটে, তাদের বিভিন্নতা উপেক্ষা করার একটা প্রবণতা আমাদের জন্মে।

উপরের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, কতিপয় লোক যখন একই সময়ে একটা বিড়ালের ছবি দেখে তখন তাদের প্রত্যক্ষণের অনুবর্তী উদ্দীপকগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকে, এবং স্পষ্টতঃই এ পার্থক্যের ফলে তাদের প্রতিক্রিয়াতেও পার্থক্য দেখা দেবে। 'শাব্দিক' প্রতিবেদনগুলোর মধ্যে অতি সামান্যই পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু "ওই প্রাণীটা কি?"—নিছক এ প্রশ্নের চেয়ে আরও জটিল প্রশ্ন ক'রে এমন-কি শাব্দিক প্রতিবেদনগুলোর মধ্যেও পার্থক্য আনা যেতে পারতো। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারতোঃ "হাত-পরিমাণ দূরে ধরে রেখে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে ছবিটা ঢেকে ফেলা যায় কি?" এক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষক ছবিটার নিকটে না দূরে—সে অনুসারে উত্তরটা ভিন্ন হবে। কিন্তু কোন স্বাভাবিক (normal) প্রত্যক্ষককে যদি দেখিয়ে না দেওয়া হয় তাহলে তিনি এ জাতীয় ভিন্নতা লক্ষ্য করবেন না; অর্থাৎ, উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিবেদন অভিন্ন হবে।

কিছুসংখ্যক লোক যে একই শব্দ (noise) অথবা একই রঙীন প্যাটার্ন প্রত্যক্ষ করতে পারে, এ বিষয়টা স্পষ্টতঃই এজন্য সম্ভব যে, একটা পদার্থিক প্রক্রিয়া একটা কেন্দ্র থেকে বহির্দিকে ভ্রমণ করতে পারে তার কতকগুলো

বৈশিষ্ট্যকে অপরিবর্তিত রেখে, অথবা নিতান্ত সামান্য পরিবর্তন করে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে তরঙ্গ-গতির স্প সংখ্যা।[১] সন্দেহ নেই যে, এর থেকে আমরা এ সত্যটার একটা জৈবি (biological) কারণ পাই যে, আমাদের সব চেয়ে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দৃষ্টি শ্রবণ সেই-সব স্পন্দনসংখ্যা অনুভব করতে পারে, যেগুলো আমরা যা দে তার রঙ এবং আমরা যা শুনি তার উচ্চগ্রাম নির্ধারণ করে। যদি পদার্থ জগতে, কেন্দ্র থেকে বহির্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কতকগুলো বৈশিষ্ট্য কার্যতঃ অপরিবর্তিত রাখে, এমন প্রক্রিয়া না থাকতো, তাহলে বিভি পর্যবেক্ষকের পক্ষে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই জিনিস প্রত্যক্ষ অসম্ভব হতো, এবং আমরা সকলেই যে একটা সাধারণ জগতে বাস ক এ বিষয়টা আমরা আবিষ্কার করতে পারতাম না।

এখন আমরা, প্রত্যক্ষকের দেহের মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াটাকে বাইরের কো পর্যবেক্ষক প্রত্যক্ষ করলে সেটা যেভাবে ধরা পড়ে, তার প্রসঙ্গে এসে পড়ছি এ প্রসঙ্গ থেকে কোন নতুন দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয় না, কারণ আগে মতোই এখনও পর্যবেক্ষকের দেহের বাইরের ঘটনাবলীর সঙ্গেই আমাদে সম্পর্ক। এখন পর্যবেক্ষককে একজন শরীরতাত্ত্বিক (physiologist) বলে মনে করা হবে—যিনি, ধরা যাক, আলো এসে চোখে পড়লে তার ভে কি ঘটতে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করছেন। নির্জীব জড় পর্যবেক্ষণ ক সময় যে উপায়ে জ্ঞান অর্জন করা হয়, নীতিগতভাবে তাঁর জানার উপায় ঠিক তাই। যে চোখের উপর আলো এসে পড়ছে তার ভেতরকার কো ঘটনা ঘটার ফলে কোন একভাবে আলোক-তরঙ্গ চলতে থাকে, যতক্ষণ তারা শরীর-তাত্ত্বিকের চোখ পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে তারা শরীরতাত্ত্বিকে চক্ষু, অক্ষিস্নায়ু এবং মস্তিষ্কে একটা প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়, যার সমাপ্তি ঘ তাতে, তিনি যাকে বলেন "তিনি যে চক্ষু পর্যবেক্ষণ করেছেন তার ভেত যা ঘটছে তা দেখা"। কিন্তু শরীরতাত্ত্বিকের মধ্যে সংঘটিত এই যে ঘটনা, তিনি যে চক্ষু পর্যবেক্ষণ করছিলেন সে চক্ষুর ভেতরে যা ঘটেছিল, এটা তা নয়; এটা কেবল তার সঙ্গে একটা জটিল কার্যকারণ শৃঙ্খল দ্বারা জড়িত

১. Frequency in a wave-motion.

২. অর্থাৎ, সেই প্রক্রিয়া যার কথা পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হলো। (অনুবাদক

কাজেই নির্জীব জড়ের ভেতরকার প্রক্রিয়াসমূহের জ্ঞানের চেয়ে আমাদের শরীরতত্ত্বের জ্ঞান অধিক প্রত্যক্ষ বা অন্তরঙ্গ নয়; যে চক্ষু দ্বারা আমরা গাছপালা, প্রান্তর ও মেঘ দেখি, এদের চেয়ে সে চক্ষু সম্পর্কে আমরা অধিক জানি না। কোন শরীরতাত্ত্বিক যখন কোন চক্ষু পর্যবেক্ষণ করেন তখন যে ঘটনা ঘটে সেটা তাঁরই ভেতরে, তিনি যে চক্ষু পর্যবেক্ষণ করছেন তার ভেতরে নয়।

সবশেষে আমরা আত্ম-নিরীক্ষণের (self-observation) প্রশ্নে আসছি, এতক্ষণ পর্যন্ত যে প্রশ্নটা এড়িয়ে চলেছি। আমি বরং 'আত্ম-নিরীক্ষণে'র কথা বলছি 'অন্তর্দর্শনে'র (introspection) কথা না বলে, কারণ পরবর্তী শব্দটার সঙ্গে যে সব বিতর্কমূলক বিষয়ের যোগাযোগ আছে সেগুলোকে আমি এড়াতে চাই। 'আত্ম-নিরীক্ষণ' বলতে আমি বোঝাতে চাই যা-কিছু একজন মানুষ তার নিজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ করতে পারে, কিন্তু অন্যেরা পারে না, তারা যে অবস্থানেই থাকুক না কেন। নীচে যা বলা হচ্ছে তা নিছক প্রাথমিক কথাবার্তা, কারণ ষোড়শ অধ্যায়ে বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, আমরা নিজেদের সম্বন্ধে এমন-কিছু কথা জানি, যা আমরা বলে না দিলে অন্যেরা জানতে পারে না। আমরা জানি কখন আমাদের দাঁতব্যথা হচ্ছে, কখন আমাদের পিপাসা পাচ্ছে, জেগে ওঠার সময় কি স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম, ইত্যাদি। ডঃ ওয়াটসন বলতে পারেন যে, দন্তচিকিৎসক কোন দাঁতের মধ্যে গর্ত দেখে জানতে পারেন যে, আমাদের দাঁতব্যাথা হচ্ছে। উত্তরে আমি বলবো না যে, দন্তচিকিৎসকের প্রায়ই ভুল হয়; এর [ভুল করার] কারণ কেবল এই হতে পারে যে, দন্তচিকিৎসা-কলাটার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়নি। আমি স্বীকার করবো যে, ভবিষ্যতে দন্তবিজ্ঞান (odontology) এমন এক অবস্থায় উন্নীত হতে পারে, যখন দন্তচিকিৎসক সর্বদাই জানতে পারবেন আমি দন্তশূল অনুভব করছি কিনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার জ্ঞানের চরিত্র থেকে তাঁর জ্ঞানের চরিত্র ভিন্ন। তাঁর জ্ঞান একটা অনুমান, যার ভিত্তি হচ্ছে এই আরোহী নিয়ম (inductive law) যে, এই-এই ধরনের গর্তওয়ালা লোকেরা কোন এক ধরনের যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। কিন্তু কেবল গর্ত নিরীক্ষণ

করার ভিত্তিতে এ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না ; এর জন্য প্রয়োজন, যেক্ষেত্রে এগুলো দেখা যায় সে ক্ষেত্রে গর্তওয়ালা লোকেরা বলবে যে, তারা দন্তশূল অনুভব করছে। এবং, তার চেয়েও বেশী, তাদেরকে অবশ্যই সত্য কথা বলতে হবে। নিছক বাহ্যিক নিরীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করা যায় যে, গর্তওয়ালা লোকেরা 'বলে' যে তাদের দাঁতব্যথা আছে, এটা নয় যে তাদের দাঁতব্যথা আছে। কারও দাঁতব্যথা আছে একথা বলা আর দাঁতব্যথা থাকা ভিন্ন ব্যাপার ; তা না হলে দাঁতব্যথা সম্বন্ধে কথা না বলেই আমরা তা সারাতে পারতাম এবং দন্তচিকিৎসকের বিলের টাকাটা বাঁচাতে পারতাম। আমি নিশ্চিত যে, দন্তচিকিৎসকদের বিশেষজ্ঞসুলভ অভিমত আমার সঙ্গে একমত হবে যে, এটা অসম্ভব।

অবশ্য, এ যুক্তির উত্তরে বলা হতে পারে যে, দন্তশূল দেহের একটা অবস্থা, এবং আমার যে দন্তশূল আছে সেটা জানা হচ্ছে এই দৈহিক উদ্দীপকের জবাবে একটি প্রতিবেদন। বলা হবে যে, তত্ত্বগতভাবে, আমার দন্তশূল থাকাকালীন দৈহিক অবস্থা বাইরের কোন ব্যক্তি নিরীক্ষণ করতে পারেন, এবং তিনি তখন এটাও জানবেন যে, আমার দন্তশূল আছে। তবে এ উত্তরে ওই কথাটা খণ্ডিত হয় না। যখন বহিঃস্থ নিরীক্ষক জানেন যে আমার দাঁতব্যথা আছে তখন ইতিপূর্বে আমরা যেমন দেখিয়েছি, তাঁর জ্ঞান আরোহী অনুমানের উপর নির্ভরশীল ; শুধু তাই নয়, অনুমিত পদ 'দন্তশূল' সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হবে। কোন মানুষ যদি কখনও দাঁতব্যথা অনুভব না করতো, তাহলে দন্তচিকিৎসার জ্ঞান থেকে সে জানতে পারতো না দাঁতব্যথা কি। তাহলে, দাঁতব্যথা যদি সত্যিই দেহের একটা অবস্থা হয়—এ মুহূর্তে আমি যা স্বীকার করছি না, আবার অস্বীকারও করছি না—তাহলে এটা দেহের এমন একটা অবস্থা যা কেবল সে মানুষ নিজে প্রত্যক্ষ করতে পারে। এক কথায়, যে ব্যক্তিই দাঁতব্যথা অনুভব করার পর তা স্মরণ করতে সক্ষম হোক না কেন, তার অধিকারে এমন জ্ঞান আছে যে জ্ঞান দাঁতব্যথার অভিজ্ঞতাহীন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

এর পর আমাদের নিজেদের স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান, সে প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি যতদূর জানি, ডঃ ওয়াটসন কখনও স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা

করেননি, তবে আমি কল্পনা করি যে, তিনি এ রকমের একটা-কিছু বলতেন : স্বপ্নে সম্ভবতঃ বাগযন্ত্রের মধ্যে এমন ধরনের মৃদু আন্দোলন ঘটে, যে আন্দোলনগুলো আরও বড় হলে কথা বলায় পর্যবসিত হতো ; বস্তুতঃ স্বপ্নে মানুষ সত্যি-সত্যি চীৎকার দিয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যেও উদ্দীপনা জাগতে পারে, যার ফলে স্বপ্ন চলা-কালে মস্তিষ্কে বিশেষ ধরনের (peculiar) শারীরিক অবস্থা থাকার দরুন অসাধারণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে : কিন্তু এ প্রতিক্রিয়াগুলোর সব ক'টিই অবশ্য তৈরী হবে মৃদু আন্দোলন দিয়ে, যাদেরকে তত্ত্বগতভাবে বাইরে থেকে—যেমন, এক্স্-রে যন্ত্রকে কোন বিশেষভাবে আরও উন্নত করে তার সাহায্যে—দেখা যেতে পারে। এসব খুবই ভাল কথা, কিন্তু আপাততঃ এটা প্রাকল্পিক, এবং স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং এ লম্বা-চওড়া অনুমানটা ছাড়াই তার বিষয়াদি জানে। আমরা কি বলতে পারি যে, সে প্রকৃতপক্ষে এই প্রাকল্পিক ক্ষুদ্রকায় দৈহিক আন্দোলনগুলোকেই জানে, যদিও সে মনে করে যে, সে অন্য কিছু জানে? ওয়াটসনের অভিমত তাই হতো বলে মনে করা যায়, এবং এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, 'জ্ঞান'-এর যে সংজ্ঞা আমরা অষ্টম অধ্যায়ে বিবেচনা করেছিলাম সে-রকম কোন সংজ্ঞা মেনে নিলে, এ জাতীয় কোন অভিমতকে এই বলে ঝট্ করে প্রত্যাখ্যান করা যাবেনা যে, এর অযৌক্তিকতা নিতান্ত স্পষ্ট। অধিকন্তু, আমাদের যদি বলতে হয় যে, প্রত্যক্ষণ পদার্থিক জগতের জ্ঞান দেয় তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা এর প্রতীয়মান রূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। একটা টেবিলকে বহু-সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন বলে মনে হয় না ; এমন তরঙ্গশ্রেণী[১] বলেও মনে হয় না, যেগুলো মিলিত হচ্ছে এবং পরস্পরকে ধাক্কা মারছে। তথাপি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে টেবিলকে এ রকম একটা জিনিস বলেই উল্লেখ করা হয়। তাহলে আমাদের কাছে যে জিনিসটা কেবল এমন একটা টেবিল বলে প্রতীয়মান হয় যাকে যে কোন দিন দেখা যেতে পারে, সে জিনিসটা যদি প্রকৃতই এমনি অদ্ভুত ধরনের একটা বস্তু হয়, তাহলে এটা সম্ভব যে, আমাদের কাছে যা একটা স্বপ্ন বলে মনে হয় তা আসলে মস্তিষ্কস্থিত কতকগুলো আন্দোলন (movement) মাত্র।

১. **Train of waves.**

এটাও আবার খুবই ভাল কথা বটে, কিন্তু একটা বিষয়ের ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায় না—অর্থাৎ, "প্রতীয়মান হওয়া" (seeming) বলতে কি বোঝানো হয়। একটা স্বপ্ন বা টেবিল যদি এক রকমের জিনিস বলে 'প্রতীয়মান হয়' অথচ 'আসলে' (really) অন্য রকমের হয়, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এটা 'আসলেই' প্রতীয়মান হয় এবং এটা যে জিনিসরূপে প্রতিয়মান হয় তার একটা নিজস্ব বাস্তবতা আছে। শুধু তাই নয়, এ 'আসলে' যা তাতে আমরা পৌঁছি এর প্রতীয়মান রূপ থেকে বৈধ বা অবৈধ (valid or invalid) একটা অনুমানের মাধ্যমে। প্রতীয়মান হওয়ার প্রসঙ্গে আমরা যদি বিভ্রান্ত হই, তাহলে বাস্তবতার প্রসঙ্গে আমরা দ্বিগুণভাবে বিভ্রান্ত হবো, যেহেতু ইলেকট্রন ও প্রোটনে তৈরী টেবিলের অস্তিত্ব ঘোষণা করার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে আমরা যে টেবিল দেখি সেই টেবিল, অর্থাৎ, 'প্রতীয়মান' টেবিল। সুতরাং মর্যাদার সঙ্গে 'প্রতীয়মান হওয়া'কে আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

ভেবে দেখা যাক যে, ডঃ ওয়াটসন মনোযোগ-সহকারে গোলক-ধাঁধার ভেতরে একটা ইঁদুরকে লক্ষ্য করছেন। তিনি সম্পূর্ণ বিষয়গত হতে চান, এবং যা বাস্তবিকই ঘটছে কেবল তারই বিবরণ দিতে চান। তিনি কি কৃতকার্য হতে পারেন? এক অর্থে তিনি পারেন। তিনি যা দেখেন তার সম্পর্কে এমন-সব শব্দ ব্যবহার করতে পারেন যেগুলো বৈজ্ঞানিক-ভাবে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত অন্য যে কোন নিরীক্ষক সেই একই সময়ে একই ইঁদুরকে মনোযোগ-সহকারে লক্ষ্য করলে যে সব শব্দ ব্যবহার করবেন, সেগুলোর সঙ্গে অভিন্ন হবে। কিন্তু, জোরালো অর্থেই, ডঃ ওয়াটসনের বিষয়নিষ্ঠতা অন্য লোকেরা যে সব শব্দ ব্যবহার করে সেই একই শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে নিহিত নয়; তাঁর শব্দমালা (vocabulary) অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর শব্দমালা থেকে অনেকটা ভিন্ন। মানবজাতির মতান্বয়কে তিনি সত্যের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। "Securus judicat orbis terrarum" হচ্ছে ভ্রান্ত ল্যাটিন অধিবচনের আরেকটি দৃষ্টান্ত, এবং ডঃ ওয়াটসন এটাকে সত্য বলে বিবেচনা করতেন না। মানুষের

১. **The concensus of mankind.**

ইতিহাসে বার বার এ-রকম ঘটেছে যে, পূর্বে কখনও বলা হয়নি এমন কথা যে ব্যক্তি বলেছেন তিনি অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছেন, কিন্তু যে লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানগর্ভ প্রবাদবাক্যগুলোর (saws) পুনরুক্তি করেছে তারা অর্থহীন শব্দোচ্চারণ করেছে। সুতরাং, ডঃ ওয়াটসন যখন ইঁদুর নিরীক্ষণ করার সময় বিষয়ীমুখিতা (subjectivity) বাদ দিতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি এটা বোঝান না যে, অন্য সকলে যা বলে তিনিও তাই বলেন। তিনি বোঝান যে, ইঁদুরটার সম্পর্কে তার দৈহিক সঞ্চলনের বাইরে অন্যকিছু অনুমান করা থেকে তিনি বিরত থাকছেন। এর সবটুকুই ভালো কথা, কিন্তু আমার মতে তিনি এটা বুঝতে পারছেন না যে, ইঁদুরটার 'মন' সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যে দীর্ঘ ও জটিল অনুমানের প্রয়োজন, প্রায় তেমনি দীর্ঘ ও জটিল অনুমানের প্রয়োজন আছে তার দৈহিক সঞ্চলন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য। এবং এর চেয়েও বড় কথা, ইঁদুরটার দৈহিক সঞ্চলন সম্পর্কে জানার জন্য আমাদেরকে যে তথ্যাবলী থেকে যাত্রা করতে হবে সে তথ্যাবলী ঠিক সেই জাতের যে জাতের তথ্যাবলী ডঃ ওয়াটসন এড়িয়ে চলতে চান—অর্থাৎ, ব্যক্তিগত (private) তথ্যাবলী, যেগুলো আত্ম-নিরীক্ষণের কাছে ধরা পড়ে কিন্তু নিরীক্ষক ছাড়া অন্য কারুর কাছে ধরা পড়ে না। আমার মতে, এটাই হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে 'চূড়ান্ত দর্শন হিসাবে' আচরণবাদ ভেঙ্গে পড়ে।

কতিপয় লোক যখন একই সঙ্গে গোলকধাঁধার ভেতরে একটা ইঁদুর অথবা আমরা যাকে স্বভাবতঃই গতিশীল জড় বলবো তার কোন একটা দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে, তখন যেসব পদার্থিক ঘটনা তাদের চোখের উপরিভাগে ঘটে এবং তাদের প্রত্যক্ষণের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে সে সব ঘটনার মধ্যে কোনমতেই পূর্ণ অভিন্নতা থাকে না। পরিপ্রেক্ষিত, আলো ও ছায়া, আপাত-প্রতীয়মান আকার, ইত্যাদি ব্যাপারে পার্থক্য থাকে, এবং বিভিন্ন নিরীক্ষকের চোখ যে সব স্থানে আছে সে সব স্থান থেকে আলোকচিত্র গ্রহণ করলে সে চিত্রগুলোতে এ পার্থক্যগুলো প্রতিফলিত হবে। এসব পার্থক্য থেকে নিরীক্ষকদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়—এবং চিন্তায় অনভ্যস্ত কোন ব্যক্তি এগুলোকে উপেক্ষা (overlook) করলেও প্রত্যেক শিল্পীর কাছেই এগুলো সুপরিচিত। এখন, এরূপ মনে করা সকল বৈজ্ঞানিক

অনুশাসনের বিরোধী যে, প্রত্যক্ষিত কোন বস্তু উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম ছাড়াও সরাসরিভাবে কোন রহস্যময় এপিফ্যানির[১] সাহায্যে আমাদের উপর ক্রিয়া করে; কোন আচরণবাদী নিশ্চয়ই এ কথা বলতে আগ্রহী হবেন না। সুতরাং, যে উদ্দীপক অন্তর্বর্তী মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আমাদের নিকট পৌঁছে, তার উপর আমরা যে প্রতিক্রিয়া করবো—পদার্থিক জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকবে সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে; এবং এটা সম্ভব মনে হয় না যে, বস্তুটার সঙ্গে উদ্দীপকের চেয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হবে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রে উদ্দীপকটা বিভিন্ন হয় বলে প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও বিভিন্নতা দেখা দেয়; ফলতঃ, পদার্থিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আমাদের সমুদয় প্রত্যক্ষণের মধ্যে একটা বিষয়ীগত উপাদান আছে। অতএব, পদার্থবিদ্যা যদি তার স্থূল রূপরেখায় সত্য হয় (উপরের যুক্তিটাতে তাকে যেমন মনে করা হয়েছে), তাহলে আমরা যাকে কোন পদার্থিক প্রক্রিয়ার 'প্রত্যক্ষণ' বলি তা, অন্ততঃ আংশিকভাবে, ব্যক্তিগত ও বিষয়ীগত একটা-কিছু, এবং তা সত্ত্বেও পদার্থিক জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের এটাই একমাত্র সম্ভাব্য যাত্রাবিন্দু।

উপরোক্ত যুক্তিটার বিপক্ষে একটা আপত্তি স্বভাবতঃই উত্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা প্রকৃতপক্ষে অবৈধ হবে। বলা হতে পারে যে, আমরা বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যক্ষণ থেকে পদার্থিক জগৎকে 'অনুমান' করতে অগ্রসর হই না; আমরা প্রথমেই পদার্থিক জগৎ সম্পর্কে স্থূল ও পূর্বপ্রস্তুত[২] জ্ঞান নিয়ে আরম্ভ করি, এবং কেবল উন্নয়ন ও সূক্ষ্মীকরণের এক পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের পদার্থিক জগতের জ্ঞানকে একটা অনুমান বলে মনে করতে নিজেদেরকে বাধ্য করি। এ উক্তির মধ্যে সঙ্গত কথাটা এই যে, পদার্থিক জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রথমে অনুমানলব্ধ নয়, তবে সেটা কেবল এজন্য যে, আমাদের প্রত্যক্ষণগুলোকেই (percepts) আমরা পদার্থিক জগৎ বলে মনে করি। সূক্ষ্মীকরণ আর দর্শন আসে সেই পর্যায়ে যে পর্যায়ে আমরা উপলব্ধি করি যে, পদার্থিক জগৎকে আমাদের প্রত্যক্ষণের সঙ্গে একীভূত

১. **Epiphany** : যেহাইদের নিকট যীশুর আবির্ভাব। (অনুবাদক)
২. **Rough-and-ready.**

করা যায় না। আমার ছেলের বয়স যখন তিন, তখন আমি তাকে বৃহস্পতি-গ্রহ দেখালাম এবং বললাম যে, বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে বড়। সে জোর দিয়ে বললো যে, আমি নিশ্চয় অন্য কোন বৃহস্পতির কথা বলছি, কারণ সে যেটাকে দেখছিল সেটা স্পষ্টতঃই খুব ছোট, এবং এ কথাটা খুব ধৈর্যের সঙ্গে সে ব্যাখ্যা করছিল। কয়েকবার চেষ্টা করার পর তার মনে বিশ্বাস না জন্মিয়েই আমি সে প্রচেষ্টা ছেড়ে দিলাম। জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সম্পর্কে বয়স্করা এ ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে যা আছে তা কেবল তারা যা দেখে তা থেকে 'অনুমান' করা যায়; কিন্তু গোলকধাঁধার ভেতরকার ইঁদুরদের বেলায় তারা এখনও চিন্তা করে যে, পদার্থিক জগতে যা ঘটছে তারা তাই দেখছে। কিন্তু পার্থক্যটা কেবল মাত্রার, এবং সরল বাস্তববাদ (naive realism) এক ক্ষেত্রে যেমন অসমর্থনীয় আরেক ক্ষেত্রেও তেমনি। একই প্রক্রিয়া নিরীক্ষণকারী দু' ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থক্য আছে; কখনও কখনও বিভিন্ন প্রক্রিয়া[১] —যেমন, বিশুদ্ধ পানি এবং জীবাণুপূর্ণ পানি—নিরীক্ষণ করার বেলায় একই ব্যক্তির দুটো প্রত্যক্ষণের মধ্যে লক্ষণীয় কোন পার্থক্য থাকে না। এইভাবে, আমাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়ীমূলকতার (subjectivity) তাত্ত্বিক গুরুত্ব যেমন আছে তেমনি ব্যবহারিক গুরুত্বও আছে।

আমি এ-কথা বলছিনা যে, আমরা মূলতঃ যা জানি তা আমাদেরই নিজস্ব প্রত্যক্ষণ। এটা অনেকাংশে একটা শাব্দিক প্রশ্ন; কিন্তু অষ্টম অধ্যায়ে জ্ঞানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সে অনুসারে এটা বলা নির্ভুল হবে যে, প্রথম থেকেই আমরা বাইরের বস্তুসমূদয়কে (objects) জানি। আমরা যেসব বস্তুর জ্ঞান পাই সেগুলো কি,—প্রশ্নটা তা নয়; প্রশ্নটা হচ্ছে, কতটুকু সঠিকভাবে আমরা তাদের জানি। কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের অনুমান-বহির্ভূত জ্ঞান[২] সে বস্তুর উপর আমাদের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশী সঠিক হতে পারে না, কারণ সে জ্ঞান সেই প্রতিক্রিয়ারই একটা অংশ। এবং আমাদের প্রতিক্রিয়াও উদ্দীপকের চেয়ে বেশী সঠিক হতে পারে না। কিন্তু

১. রাসেল এখানে 'processes' শব্দটা ব্যবহার করেছেন—অর্থাৎ, পানি একটা 'প্রক্রিয়া'। (অনুবাদক)

২. Non-inferential knowledge.

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে, উদ্দীপকের 'সঠিকতা' (accuracy) বলতে আপনি আদৌ কি বুঝাতে পারেন? কোন মানচিত্র অথবা পরিসংখ্যানের সঠিকতা বলতে যা বোঝানো যেতে পারে, আমি ঠিক তাই বোঝাই। আমি এক জাতীয় অনুরূপতা (correspondence) বোঝাই। যদি কোন প্যাটার্ণের (pattern) প্রতিটি উপাদানকে অন্য কোন প্যাটার্ণের ঠিক একটিমাত্র উপাদানের প্রতিনিধি হিসাবে নেওয়া যায়, এবং যে সম্বন্ধগুলো এ দুটো স্তবককে দুটো প্যাটার্ণে পরিণত করে তাদের মধ্যে যদি অনুরূপতা থাকে, তাহলে একটা প্যাটার্ণ অপরটার সঠিক প্রতিস্থাপনা (representation) হবে। এ অর্থে, লেখা কতকটা সঠিকভাবে কথার প্রতিস্থাপনা হতে পারে; প্রতিটি কথিত শব্দের অনুবন্ধী হয়ে এক-একটা লিখিত শব্দ, এবং কথিত শব্দগুলোর কালক্রমের অনুবন্ধী হয়ে লিখিত শব্দগুলোর দেশ-ক্রম থাকে। কিন্তু বিশেষ শব্দরূপ (inflexions) এবং স্বরের ধ্বনিগুলোকে লেখার মধ্যে প্রতিস্থাপন করা যায় না; কেবল, কিয়ৎ পরিমাণে, স্বরলিপিতে সেটা করা যেতে পারে। যে-কোন লেখার পক্ষে কণ্ঠজাত শব্দের যত সঠিক প্রতিস্থাপনা হওয়া সম্ভব, গ্রামোফোন রেকর্ড তার চেয়েও অনেক সঠিক প্রতিস্থাপনা; কিন্তু এমন-কি সর্বোৎকৃষ্ট গ্রামোফোন রেকর্ডও সম্পূর্ণ সঠিক হতে পারে না। কোন নিরীক্ষকের উপর যে সংবেদন (impression) পড়ে, গ্রামোফোন রেকর্ড অথবা আলোকচিত্রের সঙ্গে তার প্রচুর সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অনুষঙ্গ-নিয়মের প্রভাব ও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সূক্ষ্মতার অভাবের দরুন সেটা সচরাচর কম সঠিক। এবং আমাদের সংবেদনের সঠিকতার বেলায় যত রকমের সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন, সেগুলো বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের অনুমান-বহির্ভূত জ্ঞানেরও সীমাবদ্ধতা।

আরেকটা কথা: ৮ম অধ্যায়ে জ্ঞানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল এবং যাকে আচরণবাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব সুবিধাজনক করে খাড়া করা হয়েছিল, সে সংজ্ঞা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে কোন নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে নানা রকমের বিভিন্ন ঘটনার জ্ঞান বলে মনে করা যেতে পারে। সে সংজ্ঞা অনুসারে, আমরা যখন বৃহস্পতিকে দেখি তখন বৃহস্পতির জ্ঞান পাই, কিন্তু চোখের উপরিভাগস্থ উদ্দীপক এবং এমন-কি চক্ষুস্নায়ুস্থ প্রক্রিয়াটারও জ্ঞান আমরা পাই। কারণ যে প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে শেষ

পর্যন্ত মস্তিষ্কের ভেতরে কোন একটা ঘটনা ঘটে, সে প্রক্রিয়ার কোন্ বিন্দু থেকে আমরা যাত্রা করবো সেটা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে : এ ঘটনা এবং তার থেকে উৎপন্ন দৈহিক ক্রিয়াকে তার পূর্ববর্তী যে কোন বিন্দু থেকে শুরু হওয়া প্রক্রিয়ার উপর একটা প্রতিক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এবং আমাদের যাত্রাবিন্দু মস্তিষ্কের যত নিকটবর্তী হয়, আমাদের প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশিত জ্ঞানও তত সঠিক হয়ে আসে। কোন উচ্চ দালানের উপরকার একটা প্রদীপ বৃহস্পতির মত একই উদ্দীপকের জন্ম দিতে পারে, কিংবা অন্ততঃ এমন একটা উদ্দীপকের জন্ম দিতে পারে যাকে বৃহস্পতি-জাত উদ্দীপক থেকে পৃথক করা কার্যতঃ অসম্ভব। নাকের উপর আঘাত পেলে আমরা "তারা দেখতে" পারি। তাত্ত্বিক দিক থেকে, চক্ষুস্নায়ুতে সরাসরিভাবে কোন উদ্দীপক প্রয়োগ করা সম্ভব হওয়া উচিৎ, এবং তার ফলে আমাদের মধ্যে একটা সংবেদন সৃষ্টি হওয়া উচিৎ। কাজেই আমরা যখন মনে করি যে, আমরা বৃহস্পতি দেখছি, তখন আমাদের ভুল হতে পারে। যদি আমরা বলি যে, আমাদের চোখের উপরিভাগ কোন-একভাবে উদ্দীপিত (stimulated) হচ্ছে তাহলে আমাদের ভুল করার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম, এবং আমরা যদি বলি আমাদের চক্ষুস্নায়ু কোন একভাবে উদ্দীপিত হচ্ছে, তাহলে আমাদের ভুল করার সম্ভাবনা আরও কম। যতক্ষণ না আমরা একথা বলার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখছি যে, মস্তিষ্কের ভেতরে কোন-এক রকমের একটা ঘটনা ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভুল করার ঝুঁকি সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারছি না ; যদি আমরা স্বপ্নে বৃহস্পতি দেখি তাহলেও এ উক্তি সত্য হতে পারে।

কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, মস্তিষ্কের ভেতরে যা ঘটছে সে সম্পর্কে আপনি কি জানেন? কিছুই না নিশ্চয়ই। উত্তরে আমি বলি, তা নয়। বহির্জগতে যা ঘটছে সে সম্পর্কে সরল বাস্তববাদ যা জানে বলে মনে করে, ঠিক তাই আমি জানি মস্তিষ্কের ভেতরে যা ঘটছে সে সম্পর্কে : কিন্তু এর একটা ব্যাখ্যা আবশ্যক, এবং অন্যান্য কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে প্রথমে ব্যাখ্যা করা দরকার।

কোন স্থির নক্ষত্র থেকে আলো এসে যখন আমার কাছে পৌঁছে তখন, সময়টা যদি রাত্রি হয় এবং আমি যদি সঠিক দিকে তাকাই, তাহলে

নক্ষত্রটাকে আমি দেখি। আলোটা যাত্রা করেছিল কয়েক বছর, সম্ভবতঃ বহু বছর আগে, কিন্তু মূলতঃ আমি যার উপর প্রতিক্রিয়া করছি তা ঘটছে 'এখন'। আমার চোখ দুটো যখন খোলা তখন আমি নক্ষত্রটাকে দেখি; সে দুটো যখন বন্ধ তখন দেখি না। বেশ অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েরা আবিষ্কার করে যে, তাদের চোখ বন্ধ থাকলে তারা কিছুই দেখে না। দেখা ও না দেখার পার্থক্য, এবং খোলা ও বন্ধ চোখের পার্থক্যও তারা জানে; ধীরে ধীরে তারা আবিষ্কার করে যে, এ পার্থক্য দুটো অনুবন্ধী (correlated)— আমি বলতে চাই যে, তাদের মধ্যে কিছু প্রত্যাশা জাগে, যার বুদ্ধিজীবী-সুলভ প্রতিরূপ এটাই। আবার, ছেলেমেয়েরা রঙের নাম বলতে, এবং কোন জিনিস নীল অথবা লাল অথবা হলুদ অথবা অন্য কিছু কি-না তা নির্ভুলভাবে উল্লেখ করতে শেখে। এ বিষয়ে তাদের নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, উপযুক্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট আলো সে জিনিসটা থেকে যাত্রা করেছিল। লণ্ডনের কুয়াশায় সূর্যকে লাল দেখায়, নীল চশমার ভেতর দিয়ে ঘাসকে নীল দেখায়, পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাছে সবকিছুই মনে হয় হলুদ। কিন্তু ধরা যাক আপনি প্রশ্ন করলেন: কি রঙ দেখছেন আপনি? এসব ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি সূর্যের বেলায় উত্তরে বলেন লাল, ঘাসের বেলায় নীল, এবং পাণ্ডুরোগগ্রস্ত রোগীর পীড়া-ঘরের (sick-room) বেলায় হলুদ, তার উত্তর সম্পূর্ণ সত্য। এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রে সে এমন কিছু বলছে যা সে 'জানে'। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে সে যা জানে তাকে আমি বলি 'প্রত্যক্ষ' (percept)। পরে আমি অভিমত দেব যে, পদার্থ-বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রত্যক্ষ থাকে মস্তিষ্কের ভেতরে; এখনকার মত, আমি কেবল বলতে চাই যে, বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে যা সবচেয়ে সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ তা-ই।

এক জাতীয় পরাতত্ত্ব (metaphysic) হিসাবে আচরণবাদের সামনে নিম্নলিখিত উভয়-সংকটটা উপস্থিত করা যেতে পারে। হয় পদার্থবিদ্যা তার মূল ধারাগুলোর দিক থেকে বৈধ (valid), নতুবা নয়। যদি না হয় তাহলে জড়ের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না; কারণ মানব-বুদ্ধির পক্ষে এ পর্যন্ত সবচেয়ে আন্তরিক ও যত্নশীল যে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে, পদার্থবিদ্যা তারই ফল। পক্ষান্তরে, পদার্থবিদ্যা যদি তার মূল

ধারাগুলোর দিক থেকে বৈধ হয় তাহলে, যে কোন পদার্থিক প্রক্রিয়া দেহের ভেতর থেকেই আরম্ভ হোক বা বাইরে থেকেই আরম্ভ হোক, সে প্রক্রিয়া যদি মস্তিষ্কে পৌঁছে, তাহলে অন্তর্বর্তী মাধ্যমের ভিন্নতা অনুসারে সে প্রক্রিয়া ভিন্ন হবে; অধিকন্তু, শুরুতে নিতান্ত ভিন্ন—এমন দুটো প্রক্রিয়া বিস্তৃত এবং ক্ষীণতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রভেদযোগ্য হয়ে যেতে পারে। উভয় কারণেই, অন্যত্র যা ঘটে তার সঙ্গে মস্তিষ্কের ভেতরকার ঘটনা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে যুক্ত নয়, এবং সেজন্য নিছক পদার্থিক কারণেই আমাদের প্রত্যক্ষণগুলো বিষয়ী-মূলকতা দোষে দুষ্ট। সুতরাং, এমন-কি আমরা যখন পদার্থবিদ্যার সত্যতা ধরে নিই, তখনও প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সবচেয়ে সংশয়াতীতভাবে আমরা যা জানি তা জড়ের নড়াচড়া নয়—সেটা আমাদের নিজেদের ভেতরকার কতকগুলো ঘটনা যেগুলো জড়ের নড়াচড়ার সঙ্গে সংযুক্ত, এবং এ সংযোগের ধারা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় নয়। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ডঃ ওয়াটসন যখন গোলকধাঁধার ভেতর ইঁদুর পর্যবেক্ষণ করেন তখন, কতকগুলো জটিল অনুমান ছাড়া, তিনি যা জানেন তা তাঁর নিজের ভেতরকার কতকগুলো ঘটনা। ইঁদুরগুলোর আচরণ কেবল পদার্থবিদ্যার সাহায্যে অনুমান করা যায়: কোন অবস্থায়ই এটা স্বীকার করা যায় না যে, সে আচরণ এমন কিছু যাকে সরাসরি প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সঠিকভাবে জানা যায়।

পদার্থবিদ্যা যে তার মূল ধারাগুলোর দিক থেকে সত্য, সে বিষয়ে আমার মনে বস্তুতঃ কোন সংশয় নেই। পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা এমন এক ব্যাপার যার সম্পর্কে বেশ-কিছু (considerable) অনিশ্চয়তা থাকা সম্ভব; কিন্তু ব্যাখ্যা যে একটা আছে এবং সেটা যে মোটামুটিভাবে এবং মৌলিক বিষয়ে সত্য, সে সম্পর্কে খুব একটা সন্দেহ আমাদের মনে থাকতে পারে না। ব্যাখ্যার প্রশ্নে আমি পরে আসবো; এখনকার মতো, আমি ধরে নেব যে, পদার্থবিদ্যাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে সে আলোচনার ঝামেলায় না গিয়ে তার প্রধান রূপরেখার দিক থেকে তাকে গ্রহণ করা যায়। এ ভিত্তিতে, প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্যগুলোকে অনস্বীকার্য মনে হয়। যা ঘটছে সে বিষয়ে প্রায়শঃই আমরা বিভ্রান্ত হই, এবং তার কারণ জ্ঞেয়বস্তু ও দেহের মধ্যবর্তী মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য, অথবা আমাদের দেহের অসাধারণ অবস্থা, অথবা মস্তিষ্কের কোন অস্থায়ী বা স্থায়ী অস্বাভাবিকতা (abnormality)।

কিন্তু এদের সকল ক্ষেত্রেই 'কিছু-একটা' ঘটছে যার সম্পর্কে আমরা এমন জ্ঞান অর্জন করতে পারি যা বিভ্রান্তিকর নয়, যদি তার প্রতি আমরা নজর দিই। কোন এক সময় অসুস্থতার দরুন প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন খাওয়ার ফলে শব্দের ব্যাপারে আমি অতি-সংবেদনশীল হয়ে পড়েছিলাম; তার ফলে নার্স সংবাদপত্র নাড়াচাড়া করার সময় খস্‌খস্‌ শব্দ উঠলে আমার মনে হতো যেন তিনি একপাত্র কয়লা মেঝের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ভাষ্যটাতে ভুল ছিল, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, আমি একটা উচ্চ শব্দ শুনতাম। এটা সাধারণ ব্যাপার যে, কোন লোকের পা কেটে বাদ দিলেও সে ব্যথা অনুভব করতে পারে; এখানেও আবার সে যথার্থই ব্যথা অনুভব করে, এবং তার ভুলটা কেবল এই যে, সে বিশ্বাস করে যে, ব্যথাটা আসছে তার পা থেকে। কোন প্রত্যক্ষণ একটা নিরীক্ষণযোগ্য ঘটনা, কিন্তু পদার্থিক জগৎ-বর্তী এই বা ওই ঘটনার জ্ঞান হিসাবে তাকে ব্যাখ্যা করলে তার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, এবং এ ভ্রান্তির পেছনে এমন-সব কারণ আছে যেগুলোকে পদার্থবিদ্যা ও শরীর তত্ত্ব বেশ সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে।

প্রত্যক্ষের (percepts) বিষয়ীমূলকতা একটা মাত্রাগত ব্যাপার। লোকেরা যখন মিতাচারী এবং সজাগ তখনকার চেয়ে, তারা যখন মাতাল ও নিদ্রিত তখন সেগুলো অধিকতর বিষয়ীমূলক (subjective)। নিকটের জিনিসের চেয়ে দূরের জিনিসের বেলায় সেগুলো অধিকতর বিষয়ীমূলক। মস্তিক অথবা স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিষয়ীমূলকতা দেখা দিতে পারে। কোন প্রত্যক্ষকে আমি যখন 'বিষয়ীমূলক' বলি তখন তার অর্থ এই যে, এর সূত্র ধরে যেসব শরীরতাত্ত্বিক অনুমানের উদ্ভব ঘটে সেগুলো ভ্রান্ত অথবা অস্পষ্ট। কিয়ৎ পরিমাণে এটা সব সময়ই ঘটে, কিন্তু এক অবস্থার চেয়ে অন্য এক অবস্থায় এর অনেক তারতম্য ঘটে। এবং যে-ধরনের ত্রুটির দরুন বিভ্রান্তি দেখা দেয় সেটাকে, যে-ধরনের ত্রুটি থেকে অস্পষ্টতা দেখা দেয়, তার থেকে পৃথক করতে হবে। সিকি মাইল দূরে কোন মানুষ দেখতে পেলে আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি থাকলে আপনি বলতে পারেন যে, এটি একজন মানুষ, কিন্তু মানুষটি আপনার বিশেষ পরিচিত হলেও সম্ভবতঃ আপনি বলতে পারবেন না সে কে। প্রত্যক্ষের মধ্যে এ-ই হচ্ছে অস্পষ্টতা: আপনি যে অনুমানগুলো করেন সেগুলো

এমনিতে ত্রুটিমুক্ত, কিন্তু তাদের দৌড় খুব বেশী নয়। অপর দিকে, আপনি যদি সব জিনিসকে দ্বিগুণভাবে দেখতে শুরু করেন এবং মনে করেন যে, এখানে দু'জন লোক আছে, তাহলে আপনি ভুল করছেন। অল্পাধিক মাত্রায় অস্পষ্টতা সার্বজনীন ও অবশ্যম্ভাবী; পক্ষান্তরে, কষ্ট স্বীকার করলে এবং সর্বক্ষেত্রে শরীরতত্ত্বীয় অনুমানের উপর আস্থা স্থাপন না করলে সচরাচর ভ্রান্তিগুলো এড়ানো যায়। স্বেচ্ছাক্রমে যে-কোন লোক কোন দূরবর্তী বস্তুতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে এবং নিকটবর্তী বস্তু লক্ষ্য করে দ্বিগুণভাবে দেখতে পারে; কিন্তু এর ফলে কোন ভ্রান্তি দেখা দেবে না, যেহেতু লোকটি তার যুগ্ম-দৃষ্টির (double vision) মধ্যে যে বিষয়ীমূলক উপাদান আছে তার সম্পর্কে সচেতন। তেমনি, অনুবেদন (after-image) থেকে আমরা প্রতারিত হই না, এবং গ্রামোফোন কেবল কুকুরকেই ঠকাতে পারে।

এ অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তা থেকে একথা পরিষ্কার যে, বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে যদি যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করতে হয় তাহলে তার সূচনা হতে হবে প্রত্যক্ষ থেকে, এবং তার মধ্যে প্রত্যক্ষের সহগামী শরীর-তত্ত্বীয় অনুমানগুলোর সম্যক পর্যালোচনা থাকতে হবে। শরীরতত্ত্বীয় অনুমান এ অর্থে অনুমান যে, কখনও কখনও এর ফলে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ি; এবং পদার্থবিদ্যা থেকে আমরা এরূপ আশা করার কারণ পাই যে, প্রত্যক্ষ-গুলোকে আমরা যদি মস্তিষ্ক-বহির্ভূত কোনকিছুর চিহ্ন হিসাবে ধরি তাহলে, কোন কোন অবস্থায়, তাদের দ্বারা আমরা কম বেশী প্রতারিত হবো। এসব বিষয় থেকেই, অন্ততঃ তার প্রারম্ভের দিকটাতে, পদার্থবিদ্যার দর্শনের[১] উপর বিষয়ীমূলকতার একটা ছাপ এসে পড়ে। যে জগৎ সম্পর্কে যে-কোন দু'জন প্রকৃতিস্থ ও স্থির-মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষককে একমত হতে হবে—গতিশীল জড়ের তেমন কোন জগৎ নিয়ে আমরা সানন্দ-চিত্তে যাত্রারম্ভ করতে পারি না। কতক পরিমাণে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব একটা স্বপ্ন দেখছে, এবং আমাদের প্রত্যক্ষগুলো থেকে স্বপ্নময় উপাদানটা পৃথক করা সহজ ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এ কাজটা করাই বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যার লক্ষ্য।

১. Philosophy of Physics.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পদার্থিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশ

আধুনিক বিজ্ঞান দেশ (space) সম্পর্কে আমাদের যা ভাবতে বাধ্য করে, কল্পনাকে তা অনুভব করতে শেখানোর মত কঠিন কাজ সম্ভবতঃ আর কিছু নেই। বর্তমান অধ্যায়ে এ কাজটাই করার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা বলেছিলাম যে, জগতের মধ্যে যা ঘটছে সে সম্পর্কে সরল বাস্তববাদ (naive realism) যা জানে বলে মনে করে, মস্তিষ্কের ভেতরে যা ঘটছে সে সম্পর্কে আমরা ঠিক তাই জানি। এ মন্তব্যটাকে হয়তো রহস্যপূর্ণ মনে হয়েছে; একে এখন বিস্তারিত এবং ব্যাখ্যা করতে হবে।

বিষয়টার সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী (last) অধ্যায়ের শেষাংশে আমরা যেসব প্রত্যক্ষের কথা বলেছিলাম সেগুলো আমাদের মাথার মধ্যে; প্রত্যক্ষই হচ্ছে সেই জিনিস যার সম্বন্ধে আমরা সবচেয়ে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, এবং সরল বাস্তববাদ জগৎ সম্পর্কে যা জানে বলে মনে করে তা আছে প্রত্যক্ষেরই মধ্যে।

কিন্তু আমি যখন বলি যে, প্রত্যক্ষগুলো আমার মাথার মধ্যে তখন আমি যা বলি, বিভিন্ন রকমের দেশ ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত তা দ্ব্যর্থক থেকে যায়, কারণ উক্তিটা কেবল 'পদার্থিক' (physical) দেশ প্রসঙ্গে সত্য। আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যেও একটা দেশ আছে, এবং এ দেশের বেলায় উক্তিটি সত্য হবে না। আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে দেশ আছে, একথা যখন বলি তখন আমি এমন কিছু বোঝাইনে যা বুঝতে আদৌ কষ্ট হতে পারে। দর্শনেন্দ্রিয়ই এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই আমি বলতে চাই যে, কোন সময় আমরা যা দেখি তার মধ্যে উর্ধ্ব ও অধঃ, দক্ষিণ ও বাম, এবং অন্তর ও বাহির আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যদি কোন ব্ল্যাকবোর্ডে একটা বৃত্ত দেখি তাহলে আমরা যা দেখি তার মধ্যে এই সবগুলো সম্বন্ধই আছে। বৃত্তটার মধ্যে আছে উপরের দিকের অর্ধাংশ এবং নীচের দিকের অর্ধাংশ, ডান দিকের অর্ধাংশ এবং বাম দিকে

াংশ, এবং একটা ভেতরের দিক ও একটা বাইরের দিক। কোন এক রনের দেশ গঠনের পক্ষে এ সম্বন্ধগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের শকে ভরাট করা হয় স্পর্শ ও অঙ্গ-সঞ্চালন (movement) থেকে আমরা া পাই—অর্থাৎ, কোন-একটা জিনিসকে স্পর্শ করলে যে ধরনের অনুভূতি য়ে, এবং সেটাকে ধরার জন্যে যে-যে অঙ্গ-সঞ্চালন দরকার—তা দিয়ে। র্শন থেকে চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটেনি এমন প্রতিটি লোক যে দেশে বিশ্বাস করে, ার উৎপত্তির জন্যে আরও কিছু উপাদান দায়ী ; কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের দক থেকে এ প্রশ্নের আরও গভীরে প্রবেশ করা অনাবশ্যক। যে বিষয়টা মামাদের বিবেচ্য সেটা এই যে, কোন মানুষের প্রত্যক্ষগুলো তার পক্ষে ্যক্তিগত (private): আমি যা দেখি তা আর কেউ দেখে না ; আমি া শুনি তা আর কেউ শোনে না ; আমি যা স্পর্শ করি তা আর কেউ স্পর্শ করে না ; ইত্যাদি। সত্য বটে যে, আমি যা শুনি ও দেখি, সঠিক অবস্থানে থাকলে অন্যেরাও তার খুব সদৃশ একটা-কিছু শোনে ও দেখে : কিন্তু পার্থক্য সব সময়ই আছে। একটু দূরে শব্দের উচ্চতা কম হয় ; প্রেক্ষিতের নিয়মাবলী (laws of perspective) অনুসারে বস্তুর দৃশ্য-রূপের পরিবর্তন ঘটে। সেজন্য দু'জন ব্যক্তির পক্ষে একই সঙ্গে ঠিক এক রকম প্রত্যক্ষ পাওয়া অসম্ভব। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রত্যক্ষের মত প্রত্যক্ষের দেশও অবশ্যই ব্যক্তিগত ; প্রত্যক্ষকের সংখ্যা যা প্রাত্যক্ষিক (perceptual) দেশের সংখ্যাও তাই। কোন টেবিল সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ, আমার মাথা সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষের বাইরে, আমার প্রাত্যক্ষিক দেশের মধ্যে ; কিন্তু তার থেকে অনুমান করা যায় না যে, এটা আমার মাথার বাইরে পদার্থিক দেশের ভেতর একটা পদার্থিক বস্তু[১] হিসাবে আছে। পদার্থিক দেশ নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য (public): এ দেশে আমার সকল প্রত্যক্ষই আমার মাথার ভেতরে, এমন-কি 'আমার দেখা অনুসারে' সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্রটাও। পদার্থিক ও প্রাত্যক্ষিক দেশের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেগুলো অভিন্ন নয়, এবং তাদের ভেতরকার পার্থক্য বুঝতে পারার ব্যর্থতা ভাবগত বিশৃঙ্খলার (confusion) এক বড় উৎস।

১. Physical object.

লণ্ডনে কোন নিউজীল্যাণ্ডবাসীকে দেখলে আপনি নিউজীল্যাণ্ড দেখেন, এটা বলার চেয়ে, কোন নক্ষত্রাগত আলো দেখলে আপনি নক্ষত্রটাকে দেখেন, এটা বলা বেশী নির্ভুল নয়। যখন (আমরা যেমন বলি) আপনি একটা নক্ষত্র দেখছেন তখন আপনার প্রত্যক্ষণ প্রথমে মস্তিষ্ক, অক্ষিস্নায়ু এবং চোখে যা ঘটছে তার সঙ্গে, এবং তারপর একটা আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত। পদার্থবিজ্ঞানের মতে, এ আলোক-তরঙ্গের উৎস ওই নক্ষত্র। আলোটা যদি কোন মাস্তুলের উপরস্থিত প্রদীপ থেকে আসে তাহলে আপনার সংবেদনগুলো প্রায় একই রকম হবে। যে পদার্থিক দেশের মধ্যে 'আসল' (real) নক্ষত্রটা আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন সেটা এক জটিল অনুমান; যা প্রত্যক্ষ (given) তা সেই ব্যক্তিগত দেশ যার মধ্যে আপনার দেখা আলোকবিন্দুটার অবস্থান। দৃষ্টির দেশের[১] গভীরতা আছে কিনা অথবা এটা, বার্কলি যেমন বলেছিলেন, নিছক একটা তল (surface) কিনা, সে প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। আমাদের উদ্দেশ্যের দিক থেকে তাতে কিছু এসে যায় না। যদি আমরা স্বীকার করি যে, চোখ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে অবস্থিত কোন বস্তু এবং কয়েক ফুট দূরে অবস্থিত কোন বস্তুর মধ্যে কেবল দৃষ্টির মাধ্যমে কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না, তথাপি কেবল দৃষ্টির সাহায্যে আপনি বুঝতে (see) পারেন না যে, কোন স্থির নক্ষত্রের চেয়ে মেঘের দূরত্ব কম, যদিও আপনি সেটা 'অনুমান' করতে পারেন এজন্য যে মেঘ নক্ষত্রটাকে আড়াল করতে পারে। দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত থেকে জ্যোতির্বিদ্যার জগৎ একটা তল। এমন একটা অন্ধকার ঘরে যদি আপনাকে রাখা হতো যার ছাদে নক্ষত্রের আকৃতির অনুরূপ ছিদ্র করা হয়েছে, যাদের মধ্য দিয়ে আলো এসে ঢুকছে, তাহলে আপনার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিজ উপাত্তগুলোর মধ্যে এমন কিছুই থাকতো না, যা থেকে আপনি বুঝতে পারতেন যে, আপনি 'নক্ষত্র দেখছেন' না। এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, আপনি যা দেখছেন পদার্থবিজ্ঞানের অর্থে তা 'বাইরে'[২] 'নেই', একথা বলতে আমি কি বোঝাই।

১. Space of sight.

২. Out there.

শৈশবে আমরা শিখি যে, যে-সব জিনিস আমরা দেখি, কখনও কখনও আমরা সেগুলো ধরতে পারি এবং কখনও কখনও পারিনে। যখন আমরা তাদেরকে তৎক্ষণাৎ ধরতে পারিনে, তখন কখনও কখনও তাদের কাছে হেঁটে গিয়ে তাদের আমরা ধরতে পারি। অর্থাৎ, আমরা দৃষ্টিজ সংবেদনগুলোকে কখনও কখনও স্পর্শজ সংবেদন এবং কখনও কখনও স্পর্শজ সংবেদনের পূর্ববর্তী গতির সংবেদনের সঙ্গে অনুবদ্ধ করতে (correlate) শিখি। এভাবে একটা ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে আমরা আমাদের সংবেদনগুলোর অবস্থান নির্দেশ করি। যেগুলোর মধ্যে কেবল দৃষ্টি জড়িত সেগুলোকে আমরা 'বাহ্য' (external) বলে মনে করি, কিন্তু এ মতের সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। শির-পীড়া অনুভব করার সময় আপনি যা অনুভব করেন ঠিক তার মতোই, কোন নক্ষত্র দেখার সময় আপনি যা দেখেন তা আভ্যন্তরীণ। অর্থাৎ, 'পদার্থিক' দেশের পরিপ্রেক্ষিত থেকে এটা আভ্যন্তরীণ। আপনার ব্যক্তিগত দেশে এটা দূরবর্তী, কারণ স্পর্শজ সংবেদনগুলোর সঙ্গে এটা অনুষক্ত নয় এবং আপনার পক্ষে সম্ভব কোন ভ্রমণের সাহায্যেই এটা তাদের সঙ্গে অনুষক্ত হতে পারে না।

সরাসরি প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আপনার নিজ দেহকে আপনি যেভাবে জানেন এবং পদার্থবিদ্যা আপনার নিজ দেহকে যেভাবে বিবেচনা করে, এ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনি নিজের দেহ সম্পর্কে অন্য যে-কোন দেহ থেকে বেশী জানেন, যেহেতু আপনার দেহ থেকে আপনি এমন কতকগুলো সংবেদন পেতে পারেন যেগুলো অন্য কোন দেহ থেকে পেতে পারেন না—যেমন, হরেক রকমের দৈহিক যন্ত্রণা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি একে জানেন কেবল সংবেদনের মাধ্যমে, অনুমান বাদ দিলে এটা নিশ্চয়ই একটা সংবেদন-পুঞ্জ, এবং সেজন্য, পদার্থবিদ্যা যাকে জড়বস্তু (body) বলে তা থেকে এটা 'আপাতদৃষ্টিতে' সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যখন (লোকে যেমন বলে) আপনি আপনার নিজ দেহ দেখেন তখন আপনি যা দেখেন, আপনার দেখা অধিকাংশ জিনিস তার বাইরে। অর্থাৎ: আপনি দৃষ্টিগত দেশে ভিন্নভাবে অবস্থিত কতকগুলো রঙের ছাপ[১] দেখেন, এবং বলেন যে, আপনি আপনার দেহের বাইরে কতকগুলো

১. **Patches of colour.**

জিনিস দেখছেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনি যা দেখেন তাকে অবশ্যই আপনার দেহের ভেতরে বলে মনে করতে হবে; অন্যত্র যা ঘটে তাকে কেবল অনুমান করা চলে। এইভাবে, পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে সমগ্র দেশ তার সমুদয় প্রত্যক্ষ-সহ একটি অতিক্ষুদ্র অঞ্চল হিসাবে গণ্য।

এক ব্যক্তি যা দেখে এবং অন্যে যা দেখে, তাদের মধ্যে কোন সরাসরি দৈশিক সম্বন্ধ নেই, কারণ কোন দুই ব্যক্তি কখনও একেবারে অভিন্ন জিনিস দেখে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের একটা ব্যক্তিগত দেশ ইতস্ততঃ বয়ে বেড়ায়, গৌণ পদ্ধতিতে পদার্থিক দেশে যার অবস্থান নির্দেশ করা যায়; কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত দেশ আর এর মধ্যে কোন সাধারণ স্থান (place) নেই। এর থেকে দেখা যায় কিরূপ সম্পূর্ণভাবে পদার্থিক দেশ অনুমান আর সংগঠনের (construction) ব্যাপার।

বিষয়টাকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য ধরা যাক কোন শরীরতত্ত্ববিদ একটা জীবন্ত মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করছেন—আগের মত এখন আর এটা অসম্ভব কল্পনা নয়। মনে করা স্বাভাবিক যে, শরীরতত্ত্ববিদ যা দেখছেন সেটা, তিনি যে মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করছেন, তারই ভেতরে। কিন্তু আমরা যদি পদার্থিক দেশের কথা বলি, তাহলে শরীরতত্ত্ববিদ যা দেখছেন তা তাঁর নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে। তিনি যে মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করছেন, কোন অর্থেই সেটা তার মধ্যে নয়; যদিও সেটা সেই মস্তিষ্কের প্রত্যক্ষের মধ্যে, যে মস্তিষ্ক শরীরতত্ত্ববিদের প্রাত্যক্ষিক দেশের অংশ-বিশেষ দখল করে আছে। কার্যকারণিক অবিচ্ছিন্নতা থেকে বিষয়টা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে: যে চোখের পর্যবেক্ষণ চলছে সে চোখ থেকে আলোক-তরঙ্গ শরীরতত্ত্ববিদের চোখে চলে আসে; সেখানে আসে কেবল কিছু সময়ের বিরতির পর, এবং সে সময়টা সংক্ষিপ্ত হলেও সান্ত (finite)। শরীরতত্ত্ববিদ যা পর্যবেক্ষণ করছেন, কেবল আলোক তরঙ্গগুলো তাঁর চোখে পৌঁছানোর পর তিনি তা দেখতে পান; সুতরাং তাঁর দেখাটা যে ঘটনা দিয়ে তৈরী, সেটা আসে একটা ঘটনানুক্রমের শেষ প্রান্তে। পর্যবেক্ষিত মস্তিষ্ক থেকে এ ঘটনাধারা শরীরতত্ত্ববিদের মস্তিষ্কে ভ্রমণ করে। একটা অসঙ্গত ধরনের বিচ্ছিন্নতা না এনে আমরা মনে করতে

পারি না যে, এ অনুক্রমের শেষপ্রান্তে শরীরতত্ত্ববিদের যে প্রত্যক্ষ আসে সেটা শরীরতত্ত্ববিদের দেহ ছাড়া অন্য কোথাও।

প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং অধিবিদ্যাকে যদি ঠিকভাবে ধরতে হয় তাহলে একে বুঝতে হবে। মন ও জড়ের পরম্পরাগত দ্বিত্ব, যাকে আমি ভ্রান্ত বলে মনে করি, এ বিষয়-সম্পর্কিত বিশৃঙ্খলার (cofusions) সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। যতক্ষণ আমরা মন ও জড়ের প্রচলিত ধারণাকে ধরে রাখছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তার শাস্তি-স্বরূপ আমাদেরকে এমন এক মত গ্রহণ করতে হবে যেখানে প্রত্যক্ষণ এক অলৌকিক ব্যাপার। আমরা মনে করি যে, কোন দৃশ্য বস্তু থেকে কোন একটা পদার্থিক প্রক্রিয়া যাত্রা শুরু করে চোখে এসে পৌঁছে, সেখানে অন্য একটা পদার্থিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়, অক্ষি-স্নায়ুতে অপর একটা পদার্থিক প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়, শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে একটা কার্য উৎপন্ন করে; ঠিক এ সময়ে আমরা যে বস্তু থেকে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল সেটাকে দেখি, এবং এ দেখাটা 'মানসিক' (mental) একটা-কিছু—যে পদার্থিক প্রক্রিয়াগুলো এর আগে এবং সঙ্গে ঘটে, তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। এ অভিমত এত উদ্ভট যে, পরাতাত্ত্বিকেরা (metaphysicians) এর চেয়ে কম অবিশ্বাস্য একটা প্রতিকল্প দাঁড় করাতে গিয়ে হরেক রকমের মতবাদ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু একটা মৌলিক ধারণাগত বিশৃঙ্খলা কেউ লক্ষ্য করেন নি।

অন্য লোকের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণকারী শরীরতত্ত্ববিদের কাছে ফিরে আসা যাক: শরীরতত্ত্ববিদ যা দেখেন এবং তিনি যে মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করছেন তার মধ্যে যা ঘটে, এ দুটো কোনক্রমেই অভিন্ন নয়; আগেরটা কিয়ৎ পরিমাণে একটা পরোক্ষ[১] কার্যফল। সুতরাং, তিনি যা দেখছেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি বিচার করতে পারেন না, মস্তিষ্কের ভেতরে যা ঘটছে তা সেই জাতীয় ঘটনা কি-না যাকে তিনি 'মানসিক' বলবেন। তিনি যখন বলেন যে, মস্তিষ্কের ভেতরে কতকগুলো দৈহিক (physical) ঘটনার সহগামী হয়ে কতকগুলো মানসিক ঘটনা ঘটে, তখন তিনি মনে করছেন যে, তিনি যা দেখছেন দৈহিক ঘটনাগুলো যেন তাই। যে মস্তিষ্ক তিনি পর্যবেক্ষণ

১. Remote [দূরবর্তী]।

করছেন তার ভেতরে কোন মানসিক ঘটনা তিনি দেখেন না, এবং সেজন্য তিনি মনে করেন যে, সে মস্তিকে একটা দৈহিক প্রক্রিয়া আছে যেটাকে তিনি দেখতে পান, এবং একটা মানসিক প্রক্রিয়া আছে যেটাকে তিনি দেখতে পান না। কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক অর্থে, অন্য মস্তিষ্কটাতে তিনি কিছুই দেখতে পান না; সে মস্তিষ্কের সঙ্গে তাঁর উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হলে (অনুবীক্ষণের সঙ্গে চোখের, ইত্যাদি) তিনি স্বয়ং যে প্রত্যক্ষগুলো পান, কেবল সেগুলোই তিনি দেখতে পান। আমরা প্রথমে আমাদের প্রত্যক্ষের সঙ্গে দৈহিক প্রক্রিয়াগুলোকে অভিন্ন করি, এবং তার পর, যেহেতু আমাদের প্রত্যক্ষগুলো অন্যলোকের চিন্তা নয়, সুতরাং আমরা যুক্তি দিই যে, তাদের [অন্য লোকের] মস্তিষ্কের ভেতরকার দৈহিক প্রক্রিয়াগুলো তাদের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু-একটা। বস্তুতঃ, পদার্থিক জগতের যা-কিছু আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি তা-ই ঘটে আমাদের মাথার ভেতরে, এবং, 'মানসিক' শব্দটার অন্ততঃ একটা অর্থে, তা-ই 'মানসিক' ঘটনা দিয়ে তৈরী। যেসব ঘটনা পদার্থিক জগতের অংশ, সেগুলো দিয়েও এ তৈরী। এ দৃষ্টিকোণের সূত্র ধরে অগ্রসর হলে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবো যে, মন ও জড়ের (matter) পার্থক্য অবাস্তব। আমাদের পছন্দ অনুসারে, জগতের উপাদানকে (stuff) পদার্থিক (physical) অথবা মানসিক অথবা উভয়ই অথবা এদের কোনটাই নয় বলা যেতে পারে; বস্তুতঃ, শব্দগুলো কোন কাজেই লাগে না। শব্দগুলোর একটা-মাত্র সংজ্ঞা আছে যা অনাপত্তিযোগ্যঃ পদার্থবিদ্যা যা নিয়ে কাজ করে তাই 'পদার্থিক', এবং মনোবিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ করে তাই 'মানসিক'। সে অনুসারে, আমি যখন 'পদার্থিক' দেশের কথা বলি তখন পদার্থবিদ্যায় যে দেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, আমি তার কথাই বোঝাই।

যে জগৎ আমরা দৃষ্টি ও স্পর্শের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি, পদার্থিক জগৎ যে সেই জগৎ, এ বিশ্বাস থেকে আমাদের নিজেদেরকে মুক্ত করা নিতান্ত কঠিন কাজ; যদিও আমাদের দার্শনিক মুহূর্তগুলোতে আমরা সচেতন যে, এটা একটা ভ্রান্তি, তথাপি অসতর্ক হলেই আবার আমরা এ ভ্রান্তির কবলে পড়ি। যা আসলে ঘটছে বলে পদার্থবিদ্যা মনে করে, এবং আমাদের ইন্দ্রিয়যোগে যা ঘটছে বলে আমরা দেখতে পাই, এ দুটোর পার্থক্য যখন আমরা অনুধাবন করতে

থাকি, তখন, আমরা যা দেখি তা পদার্থিক দেশের 'বাইরে' (out there) আছে, এ ধারণা আর টিকে থাকতে পারে না। কেবল দীর্ঘকালীন চিন্তার মাধ্যমেই একটা মৌলিক অভিনবত্ব-সম্পন্ন দৃষ্টিকোণ সুপরিচিত ও সহজ হয়ে উঠতে পারে।

এ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টান্তগুলো নেওয়া হয়েছে দর্শনেন্দ্রিয় থেকে ; এখন স্পর্শেন্দ্রিয় থেকে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধরা যাক, চোখ বন্ধ করে আপনি আপনার আঙুলের ডগা দিয়ে একটা শক্ত টেবিলে চাপ দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে? পদার্থবিদ বলেন যে, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, আপনার আঙুলের ডগা ও টেবিলটা তৈরী বিপুল-সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন দিয়ে; আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে, প্রতিটি ইলেকট্রন ও প্রোটনকে মনে করতে হবে বিকিরণ-প্রক্রিয়ার একটা সমষ্টি (collection) বলে, তবে আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ বিষয়টা আমরা উপেক্ষা করতে পারি। যদিও আপনি মনে করেন যে, আপনি টেবিলটা স্পর্শ করছেন, তথাপি আপনার আঙুলের কোন ইলেকট্রন বা প্রোটন প্রকৃতপক্ষে টেবিলের কোন ইলেকট্রন বা প্রোটনকে স্পর্শ করে না, কারণ সে রকম কিছু ঘটলে এক অনন্ত শক্তির জন্ম হতো। আপনি যখন চাপ দেন, তখন আপনার আঙুলের কিছু অংশ এবং টেবিলের কিছু অংশের মধ্যে বিকর্ষণ গড়ে ওঠে। কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থের উপর আপনি যখন চাপ দিতে চেষ্টা করেন, তখন তার মধ্যে বিকর্ষিত অংশগুলোর সরে যাওয়ার মত জায়গা থাকে। কিন্তু আপনি যদি কোন কঠিন ঘনবস্তুর উপর চাপ দেন তাহলে আপনার আঙুল থেকে আসা বৈদ্যুতিক শক্তির দরুন যে ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো সরে যেতে চায় তারা সরে যেতে পারে না, কারণ সেগুলো অন্য আরও ইলেকট্রন-প্রোটনের সঙ্গে গাদাগাদি করে আছে, যাদের ধাক্কা খেয়ে তারা, ভিড়ের ভেতরকার লোকের মত, অল্প-বিস্তর তাদের আদি অবস্থানে ফিরে আসে। কাজেই আপনি যতই চাপ দেন, তারা আপনার আঙুলকে ততই বিকর্ষণ করে। বিকর্ষণটা গড়ে ওঠে কতকগুলো বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে, যারা স্নায়ুর মধ্যে এমন একটা প্রবাহ সৃষ্টি করে যার প্রকৃতি সম্বন্ধে খুব সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি। এ প্রবাহটা মস্তিষ্কে চলে যায়, এবং সেখানে সে যে-সব কার্য উৎপন্ন করে, শরীরতত্ত্ববিদের কাছে সেগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে

আন্দাজের ব্যাপার। কিন্তু একটা কার্য আন্দাজের ব্যাপার নয়, এবং সেটা হচ্ছে স্পর্শ-সংবেদন। শরীরতাত্ত্বিক অনুমান অথবা সম্ভবতঃ কোন অনুবর্তের (reflex) দরুন এ কার্যটা আমাদের দ্বারা আঙ্গুলের ডগার সঙ্গে অনুষক্ত হয়। কিন্তু যদি কোন কৃত্রিম উপায়ে মস্তিষ্কের অধিকতর কাছাকাছি স্নায়ুটার কিছু অংশ উপযুক্তভাবে উত্তেজিত হয় তাহলে একই সংবেদন পাওয়া যায়—যেমন, আপনার হাত যদি কেটে বাদ দেওয়া হয় এবং সঠিক স্নায়ুগুলোকে দক্ষতার সাথে নাড়াচাড়া করা হয়। সুতরাং, যে স্থান স্পর্শ করা হচ্ছে সে স্থানে বস্তু (bodies) আছে বলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত (mis-placed)। সচরাচর আমাদের ধারণা ঠিক, কিন্তু ভুলও আমাদের হতে পারে; এ ব্যাপারে অকাট্য ঐশীবাণীর (revelation) মত কিছুই নেই। এমন-কি, সব চেয়ে অনুকূল ক্ষেত্রেও, আপনার আঙ্গুলের ডগায় প্রকৃতপক্ষে যা ঘটছে বলে পদার্থবিদ্যা মনে করে—অর্থাৎ, আপনার আঙ্গুলের ডগায় ইলেকট্রন ও প্রোটন পাগলের মত নৃত্য করতে করতে পরস্পরের পথ থেকে সরে আসার চেষ্টা করছে—আপনার স্পর্শানুভূতি তার থেকে অনেক ভিন্ন। অথবা, তাকে অন্ততঃ অনেক ভিন্ন 'মনে হয়'। কিন্তু, পরে আমরা যেমন দেখবো, পদার্থবিদ্যা-লব্ধ আমাদের জ্ঞান এত অমূর্ত যে, পদার্থিক জগতে যা ঘটছে তা আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা ঘটনাবলী থেকে মূলগতভাবে (intrinsically) অনেক ভিন্ন কি ভিন্ন নয়, সেকথা বলার মত উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রত্যক্ষণ ও পদার্থবিদ্যার (Physical) কার্য-কারণ নিয়ম

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা কারণ সম্পর্কে পরম্পরাগত ধারণার অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তার প্রতিকল্প হিসাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে কার্য-কারণ নিয়মগুলো স্থান পেয়েছে তাদের কোন সঠিক ব্যাখ্যা আমরা দিইনি। এখন সময় এসেছে যখন এ ত্রুটি মোচন করা এবং সেটা করতে গিয়ে পদার্থিক কারণ-শৃঙ্খলের মধ্যে প্রত্যক্ষণকে তার সঠিক স্থানে বসানো সম্ভব, এবং যখন পূর্ববর্তী যুক্তিগুলোর মূল বিষয়গুলো স্মরণ করা যেতে পারে।

প্রাচীন মতটা এই যে, ক-নামক ঘটনার পরে নিয়মিতভাবে খ-নামক ঘটনা আসবে, এবং কার্য-কারণ নিয়ম আবিষ্কারের সমস্যা হচ্ছে, খ-নামক ঘটনাটা যখন জানা আছে তখন ক-নামক সেই ঘটনাটা খুঁজে বের করা যেটা তার অপরিবর্তনীয় পূর্বগ (antecedent), অথবা তার উল্টোটা করা। কোন বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে এ দৃষ্টিভঙ্গি হিতকর; এর থেকে এমন-সব নিয়ম পাওয়া যায় যেগুলো, সম্ভবতঃ সব সময় সত্য না হলেও, সচরাচর সত্য, এবং এদের চেয়েও সঠিক নিয়ম পাওয়ার ভিত্তিও রয়েছে এর মধ্যে। কিন্তু কোন দার্শনিক বৈধতা (validity) এর নেই, এবং সত্যিকার নিয়মে এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে এটা বাতিল হয়ে যায়। উন্নত বিজ্ঞানগুলোতে সত্যিকার নিয়মগুলো কার্যতঃ সর্বক্ষেত্রেই 'প্রবণতা'র (tendency) পরিমাণ-গত নিয়ম। পদার্থবিদ্যায় এর যে সরলতম উদাহরণ পাওয়া সম্ভব, তার সাহায্যে আমি এর দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করবো।

একটা উদযান পরমাণু কল্পনা করুন, যার মধ্যে ইলেকট্রনটা ন্যূনতম কক্ষপথে আবর্তিত না হয়ে তার পরবর্তী কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে, যে কক্ষপথ ন্যূনতমের চতুর্গুণ। এ অবস্থা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তার অতিক্ষুদ্র (infinitesimal) মাধ্যাকর্ষণিক ক্রিয়া ছাড়া পরমাণুটার আর কোন বাহ্যিক কার্য-ফল নেই; সুতরাং, এর যখন অবস্থান্তর ঘটে তখন ছাড়া এর অস্তিত্বের কোন

প্রমাণ আমরা পেতে পারি না। বস্তুতঃ কোন টিকিট সংগ্রাহক তাঁর শহরের অধিবাসীদের যে জ্ঞান রাখেন, পরমাণু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও সে রকম: বাড়ীর ভেতরে যারা গোপন থেকে যায় তাদের সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। এখন, কতকগুলো নিয়মানুসারে—যে নিয়মগুলোর বিষয়ে আমাদের কেবল পরিসংখ্যানিক জ্ঞান আছে—আমাদের পরমাণুটার মধ্যে যে ইলেকট্রন আছে সেটা লাফ দিয়ে একটা ক্ষুদ্রতর কক্ষপথে চলে যায়, এবং [তার ফলে] পরমাণু যে শক্তি হারায় সে শক্তি আলোক-তরঙ্গরূপে বহির্দিকে চলে যায়। কখন যে ইলেকট্রনটা লাফ দেবে সে সম্পর্কে কোন কার্যকারণ নিয়ম আমাদের জানা নেই, যদিও লাফ দিয়ে এ কতদূর যাবে এবং তখন প্রতিবেশে ঠিক কি ঘটবে সেটা আমরা জানি। অন্ততঃ, আমি যখনি বলি যে আমরা জানি ঠিক কি ঘটবে, তখন আমার বলা উচিৎ যে, যা ঘটবে—সঠিক অর্থে তার গাণিতিক নিয়মগুলোই আমরা জানি। ইলেকট্রন থেকে কতকগুলো সমীকরণ-নিয়ন্ত্রিত পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন একটা ঘটনানুক্রম বহির্মুখীভাবে সকল দিকে চলে যাবে, এবং অন্য কোন জড়পদার্থের সঙ্গে মুখোমুখী না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্র জলাশয়ের তরঙ্গ-প্রবাহের মত নিয়মিতভাবে চলতে থাকবে। এখানে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও আপাতদৃষ্টিতে মৌলিক ধরনের কার্য কারণ নিয়ম পাচ্ছি, যে ধরনের নিয়ম শূন্যতার মধ্যে আলোর বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করে। এ কথাটাই ম্যাক্সয়েলের (Maxwell) সমীকরণগুলোতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে—যাদের ভিত্তিতে আমরা কোন উৎস থেকে বেরিয়ে আসা কোন বিদ্যুৎচুম্বকধর্মী আলোড়নের (disturbance) প্রসারণের মাত্রা নির্ণয় করতে পারি। এ ধরনের দুটো আলোড়ন যতক্ষণ না সম্মিলিত হচ্ছে ততক্ষণ বিষয়টা নিতান্ত সরল; কিন্তু তারা যখন সম্মিলিত হয় তখন কি ঘটে সমীকরণগুলো সেটাও আমাদের বলে দেয়। তখন, পদার্থবিদ্যায় সব সময় যেমন হয়, আমরা দুটো পৃথক প্রবণতার সাক্ষাৎ পাই, যাদের একটা অনুফল (resultant) আছে যা কতকগুলো গাণিতিক নিয়ম-নির্ধারিত সংমিশ্রণের ফল—যে নিয়মগুলোর মধ্যে সামন্তরিক নিয়মটা সব চেয়ে পুরাতন ও সরল অর্থাৎ, দেশ-কালিক পরিপার্শস্থ প্রতিটি পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে একটা প্রবণতা বেরিয়ে আসে, এবং তৎসৃষ্ট ঘটনাটা পাওয়া যায় একটা গাণিতিক নিয়মানুসারে এই প্রবণতাগুলোকে সংমিশ্রিত করে।

এ পর্যন্ত আমরা কেবল শূন্য দেশের মধ্যে তড়িৎচুম্বকধর্মী ঘটনাবলী বিবেচনা করছি। শূন্য দেশ সম্পর্কে আরেক প্রস্থ সত্য (facts) আমাদের হাতে আছে—অর্থাৎ, সেইগুলো যেগুলোর উপর মাধ্যাকর্ষণ নির্ভর করে। এগুলোর কাজ দেশ-কালের কাঠামো নিয়ে, এবং এগুলো থেকে দেখা যায় যে, যে জায়গাগুলোতে জড়বস্তু আছে সেখানে এ কাঠামোর মধ্যে এমন-কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য (singularities) আছে যেগুলো, এসব জায়গা থেকে আমাদের সরে আসার সময়, ক্ষীয়মান তীব্রতার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। একটা ফোয়ারা-বিশিষ্ট পুকুরের উপমার সাহায্যে আপনি দেশ-কালের কাঠামোর একটা ধারণা করতে পারেন : ফোয়ারাটা এমনভাবে খেলছে যে, যখনই একটা পানির ছিটা ফোয়ারা থেকে এসে নীচে পড়ছে তখনই পানির একটা ছোট পাহাড় গড়ে উঠছে, এবং যে জায়গায় ছিটাটা পড়ছে সেখান থেকে আপনি সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টা দ্রুতগতিতে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে। এখানেও আবার একই রকমের জিনিস প্রযোজ্য : পরিপার্শ্বস্থ কোন কাঠামো থেকে দেশ-কালের কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলের (region) কাঠামো অনুমান করতে হলে গাণিতিক নিয়মানুসারে কতকগুলো প্রবণতার একটাকে আরেকটার উপর বসাতে (superpose) হবে। কাজেই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ফলে কোন নতুনত্বের অবতারণা করা হচ্ছে না।

কিন্তু এখন বিবেচনা করে দেখুন, আমাদের উদযান পরমাণু থেকে যে আলোক-তরঙ্গ যাত্রা করেছিল সেটা যখন জড়বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন কি ঘটে। বিভিন্ন রকমের ব্যাপার ঘটতে পারে। জড়বস্তুটা আলোক-রশ্মির সমুদয় অথবা কতক-পরিমাণ শক্তি বিশোষণ করে নিতে পারে; আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই কৌতূহলজনক ব্যাপার (case)। বিশোষণটা এরকম হতে পারে যে তার ফলে ইলেকট্রনগুলো বৃহত্তর কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে; সে ক্ষেত্রে, পরে তারা যখন তাদের পূর্ববর্তী কক্ষপথে ফিরে আসে তখন আমরা প্রতিপ্রভা-প্রপঞ্চের[১] সাক্ষাৎ পাই। অথবা জড়বস্তুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে; কিংবা সেটা রেডিওমিটারের মত দৃশ্যমানভাবে নড়তে পারে। জড়বস্তুর উপর যে সব ক্রিয়া হয় সেগুলো নির্ভর করে জড়বস্তু

১. **Phenomenon of flourescence.**

এবং আলোক উভয়েরই উপর। তাদের কতকগুলোকে এক-একটি করে আলাদাভাবে পূর্বানুমান (predict) করা যেতে পারে, অন্যগুলোকে কেবল পরিসংখ্যানিক গড় হিসাবে নির্ণয় করা যেতে পারে; এটা নির্ভর করে, পরিমাণগত বিবেচনা[১] এসে পড়ে কিনা তার উপর। যেখানে এ বিবেচনা এসে পড়ে সেখানে আমরা সম্ভাবনাগুলো পরিগণন করতে পারি, এবং যে সব আপেক্ষিক পৌনপুনিকতা অনুসারে তারা বাস্তবায়িত হবে তাদের উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্‌গুলো বাস্তবায়িত হবে সেটা বলতে পারি না।

এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনার বিষয় হয়েছে জড়বস্তু থেকে শূন্য দেশে শক্তির বিকিরণ, শূন্য দেশে তার প্রসারণ এবং শূন্য দেশ থেকে জড়বস্তুর উপর তার প্রভাব। কোন বিশেষ (given) জড়খণ্ডের ইতিহাস অথবা জড়বস্তু ও শূন্য দেশের মধ্যেকার পার্থক্য আমরা বিবেচনা করিনি।

মনে হচ্ছে জড়ের সারসত্তা এই: আমরা দেশ-কালের মধ্যে সেইসব ঘটনানুক্রমের (series of events) মধ্যে পার্থক্য করতে পারি যাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে এমন ধরনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে যে কাণ্ডজ্ঞান তাদেরকে একই 'জিনিস'-এর (thing) প্রকাশ বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ কোন একটা ইলেক্‌ট্রনের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের কথা ধরা যাক। এর[২] অর্থ এই যে, কোন পরিপার্শ্বের মধ্যবর্তী ঘটনাগুলো এ রকম হবে যে, সে পরিপার্শ্বের মধ্যস্থলে কোন একটা প্রমাণ আয়তন-বিশিষ্ট বিদ্যুৎ-আধান (electric charge) আছে—এ প্রকল্পের ভিত্তিতে তাদের নিরূপণ করা সম্ভব; এবং যেসব পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে এ কথাটা সত্য তাদের দিয়ে দেশ-কালের মধ্যে একটা 'টিউব' গড়ে ওঠে।

যতক্ষণ আমরা বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণের মধ্যে নিজেদের সংবদ্ধ রাখছি ততক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই পরস্পরের গাত্র-প্রক্ষালনের একটা ভাব আছে। শূন্য দেশের মধ্যবর্তী ঘটনাগুলোকে আমরা কেবল তাদের অমূর্ত গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর দিক থেকে জানতে পারি; জড় কেবল শূন্য

১. Quantum considerations.

২. অর্থাৎ, এই অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের। (অনুবাদক)

দেশস্থ ঘটনাবলীর একটা অমূর্ত গাণিতিক বৈশিষ্ট্য। মনে হয় এটা একটা নীরস (cold) জগৎ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কতকগুলো জিনিস জানি, যেগুলো এর চেয়ে আরেকটু মূর্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা জানি কোন জিনিস দেখার সময় কি ধরনের অনুভূতি আমাদের হয়। বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, আমাদের আলোক-তরঙ্গ যদি শূন্য দেশের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে অনতিবিলম্বে আমাদের চোখে পৌঁছায় তাহলে আমরা কারণ-শৃঙ্খলের একটা আংটাকে (link), অর্থাৎ দৃষ্টিগত সংবেদনটাকে, একটা অমূর্ত গাণিতিক ফরমুলার পদ-বিশেষ বলে না জেনে অন্যভাবে জানি। এবং এই একটা পদই, অবশিষ্ট সবগুলোতে আমাদের যে বিশ্বাস, তার ভিত্তি। দেখাই বিশ্বাস করা।

এখানে এসে আলোচনার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমি কার্য-কারণ নিয়ম সম্পর্কে আমাদের প্রমাণাদির বিষয়টার উপর সংক্ষেপে কিছু বলার প্রস্তাব করছি। প্রথমে আমরা যেসব নিয়মের সপক্ষে প্রমাণ পাই সেগুলো কেবল সাধারণভাবে খাটে, সব সময় খাটে না। সচরাচর, আপনি যখন আপনার বাহু নাড়াতে চান তখন সেটা নড়ে ; কিন্তু কখনও কখনও এটাকে পক্ষাঘাতে পায় এবং তখন এটা নিশ্চল থাকে। সচরাচর, আপনি যখন কোন পুরনো বন্ধুকে লক্ষ্য করে কেমন আছেন বলেন, তখন তিনিও আপনাকে সে কথা বলেন ; কিন্তু আপনার সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাতের পর থেকে তিনি হয়তো অন্ধ ও বধির হয়ে গেছেন, এবং আপনার কথা বা ভঙ্গী লক্ষ্য না-ও করতে পারেন। সচরাচর, আপনি যদি দেশলাইয়ের কাঠি বারুদের উপর রাখেন তাহলে তাতে বিস্ফোরণ ঘটে ; কিন্তু সেটা হয়তো ভিজে গেছে। ঘটনা পরম্পরার এজাতীয় নিয়মগুলোই আমরা প্রথমে জানি, যেগুলো সাধারণ তবে অপরিবর্তনীয় নয়। কিন্তু বিজ্ঞান সর্বদাই চেষ্টা করছে তাদের জায়গায় এমন-সব নিয়মের যোগান দিতে যেগুলোর মধ্যে কোন ব্যতিক্রম থাকার সম্ভাবনা নেই। প্রথমে আমরা লক্ষ্য করি যে, ভারী বস্তুগুলো নীচে পড়ে, তারপর দেখি যে, কতকগুলো বস্তু পড়ে না। তারপর উভয়-প্রস্থ সত্যগুলোকে আমরা মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম এবং বায়ুর প্রতিবন্ধের নিয়মগুলোর আকারে সাধারণ রূপ দিই। এই অধিকতর সাধারণ নিয়মগুলো এটা বলে না যে কোনকিছু বাস্তবিকই ঘটে ঃ তারা উল্লেখ করে একটা প্রবণতা, এবং এই সিদ্ধান্তে নিয়ে

যায় যে, যা বাস্তবিক ঘটে তা কতকগুলো প্রবণতার ফল। সংশ্লিষ্ট পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অনেক-কিছু না জানা পর্যন্ত ফলটা কি হবে তা আমরা জানতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, পরবর্তী কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একটা উল্কা এসে আমার মাথায় আঘাত করতে পারে; এটা ঘটতে যাচ্ছে কিনা তা জানতে হলে আমাকে জানতে হবে পৃথিবীর আশপাশে কি জড়বস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, সম্পূর্ণ বৈধ নিয়মের ভিত্তির উপর স্থাপিত বাস্তব ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে, যাকে আমরা ভূগোল বলতে পারি, তার কোন সত্য ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারে। উপরন্তু, আমাদের বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলো যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, সে বিষয়ে আমরা কখনও 'নিশ্চিত' হতে পারি না; মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের আইনস্টাইনীয় পরিবর্তনের মধ্যে এর একটা স্মরণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে।

এখন প্রত্যক্ষণ ও পদার্থবিদ্যার কার্য-কারণ নিয়মের সম্বন্ধে ফিরে যাওয়া যাক।

পদার্থবিদ্যার যা বলবার আছে তার অমূর্ততা উপলব্ধি করার পর কার্য-কারণ-পরম্পরার মধ্যে প্রত্যক্ষণের সঠিক স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে এখন আমাদের কোন অসুবিধা নেই। অবিমিশ্র পদার্থিক ঘটনাবলী[১] থেকে শেষ পর্যন্ত মানসিক কোন কিছুর উদ্ভব ঘটবে, এটাকে 'রহস্যময়' মনে করা হতো। তার কারণটা এই যে, লোকে মনে করতো যে পদার্থিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তারা অনেক জানে, এবং তারা সুনিশ্চিত ছিল যে মানসিক ঘটনাবলী আর এগুলোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, পদার্থিক ঘটনাবলী যখন সংবেদন হয় তখন ছাড়া তাদের স্বনিহিত (intrinsic) গুণ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, এবং সেজন্য তাদের কতকগুলোর সংবেদন হওয়ায় বিস্মিত হবার অথবা অন্যগুলোকে সংবেদন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। মন ও জড়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান ঘুচে গেছে—অংশতঃ মন সম্পর্কে নতুন মতামতের ফলে, কিন্তু, তার চেয়েও বেশী, এই উপলব্ধির ফলে যে, জড়ের স্বনিহিত প্রকৃতি সম্পর্কে পদার্থবিদ্যা আমাদের কিছুই বলে না।

[১] Physical phenomena.

আমরা যখন কোন বস্তু দেখি তখন যা ঘটে, সে সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ। সহজবোধ্যতার খাতিরে একটা ছোট স্ব-ভাস্বর (self-luminous) বস্তুর কথাই ধরা যাক। এ বস্তুটাতে কিছু-সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন শক্তি হারাচ্ছে এবং কোয়াণ্টাম নিয়ম অনুসারে সেটাকে বিকিরণ করছে। তার ফলে যেসব আলোক-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে, সাধারণ গাণিতিক নিয়মানুসারে সেগুলোর একটা আরেকটার উপর স্থাপিত (superposed) হয়; প্রতিটি আলোক-তরঙ্গের প্রতিটি অংশ দেশ-কালের কোন একটা অঞ্চলবর্তী ঘটনাসমূহের দ্বারা গঠিত। মানব-দেহের সংস্পর্শে এলে আলোক-তরঙ্গের ভেতরকার শক্তি নতুন নতুন রূপ ধারণ করে, কিন্তু তথাপি কারণিক অবিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। সর্বশেষে শক্তিটা মস্তিষ্কে পৌঁছে, এবং সেখানে যেসব ঘটনা দিয়ে এটা তৈরী তার কোন একটাকে আমরা বলি একটা দৃষ্টিজ (visual) সংবেদন। লৌকিকভাবে, এ দৃষ্টিজ সংবেদনকেই বলা হয় সেই বস্তু দেখা যার থেকে আলোক-তরঙ্গগুলো যাত্রা করেছিল, অথবা—যদি বস্তুটা স্ব-ভাস্বর না হয়—যার থেকে সেগুলো প্রতিফলিত হয়েছিল।

কাজেই যাকে প্রত্যক্ষণ বলা হয়, কেবল পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলীর মাধ্যমেই তা তার বস্তুর (object) সঙ্গে সম্পর্কিত। বস্তুটার সঙ্গে এর সম্পর্ক কারণিক ও গাণিতিক; এটা এবং এর বস্তুটা উভয়েই দেশ-কালের মধ্যবর্তী ঘটনা, কেবল এটুকু ছাড়া আর কোন অন্তর্নিহিত (intrinsic) দিক থেকে বস্তুর সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে কিনা আমরা তা বলতে পারি না।

আমার মনে হয় উন্নত বিজ্ঞানের কার্য-কারণ নিয়মগুলোর নিম্নলিখিত সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা নির্দেশ করতে পারি। যে-কোন ঘটনার ক্ষেত্রে, দেশ-কালের মধ্যে পরিপার্শ্বস্থ সামান্য দূরবর্তী স্থানগুলোতে আরও কতকগুলো ঘটনা আছে, যেগুলো ঘটবে যদি-না অন্য কোন কারণ (factors) এসে হস্তক্ষেপ করে; কিন্তু কার্যতঃ অন্যান্য কারণ এসে প্রায় সব সময়ই হস্তক্ষেপ করে, এবং সেক্ষেত্রে দেশ-কালের যে-কোন বিন্দুতে যে ঘটনাটা বাস্তবিক ঘটে সেটা সেই-সব ঘটনার এক গাণিতিক ফল যেগুলো বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী ঘটনার পরে আসতো যদি কেবল সেগুলোই ব্যাপারটার মধ্যে জড়িত

হতো। পদার্থবিদ্যার সমীকরণগুলোতে সেইসব নিয়ম দেওয়া আছে যেগুলো অনুসারে ঘটনা সংযুক্ত হয়, কিন্তু সবগুলোই উপরোল্লিখিত রকমের।

ইতিপূর্বে মনে করা হয়েছিল যে, কোন সসীম কাল-খণ্ড সম্পর্কে সবগুলো সত্য দেওয়া থাকলে—সে খণ্ডটুকু যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেন—পদার্থিক জগতের ঘটনাধারা নির্ধারণ করার পক্ষে, তাত্ত্বিকভাবে, পদার্থবিদ্যার সমীকরণ-গুলোই যথেষ্ট। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, জানা সমীকরণগুলোর বেলায় একথা সত্য নয়। শূন্য দেশে যা ঘটে তা নির্ণয়ের জন্য, এবং জড়বস্তুর বেলায় যা ঘটে তার সম্বন্ধে পরিসংখ্যানিক গড় নির্ণয়ের জন্য জানা সমীকরণগুলোই যথেষ্ট; কিন্তু তারা আমাদের বলে না কখন একটা স্বতন্ত্র (individual) পরমাণু শক্তি বিশোষণ বা বিকিরণ করবে। এদিক থেকে কোন স্বতন্ত্র পরমাণুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করছে, পরিসংখ্যানের নিয়মগুলো ছাড়া তেমন আর কোন নিয়ম আছে কি-না তা আমরা জানি না।

লক্ষ্য করা দরকার যে, বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার কার্য-কারণ নিয়মগুলো থেকে ভিন্ন আরও কার্য-কারণ নিয়ম আছে; দৃষ্টিগত সংবেদনের 'কারণ' আলোক-তরঙ্গ এবং শ্রুতিগত সংবেদনের 'কারণ' শব্দ-তরঙ্গ—এগুলো এ জাতীয় নিয়ম। পদার্থবিদ্যার সপক্ষে অভিজ্ঞতা থেকে যা-কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, এ জাতীয় নিয়মই তার ভিত্তি; সুতরাং পদার্থবিদ্যার কোন কিছুতে এ জাতীয় নিয়মের উচ্চতর মাত্রার নিশ্চয়তা থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে 'কারণ' বলতে আমরা কি বোঝাই, সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে অল্পক্ষণের জন্য থামা যাক।

আমরা পদার্থবিদ্যা থেকে যাত্রা করছি, না মনোবিজ্ঞান থেকে যাত্রা করছি—সে অনুসারে দৃষ্টিগত সংবেদনের সঙ্গে আলোক-তরঙ্গের সংযুক্তিটাকে দেখতে কিছুটা ভিন্ন মনে হয়, যদিও শেষ পর্যন্ত ফলাফলটাকে অবশ্যই অভিন্ন হতে হবে। প্রথমে পদার্থবিদ্যা নিয়ে শুরু করা যাক। তাহলে আমি বলবো যে, কোন আলোক-তরঙ্গ যখন কোন জড়বস্তু (body) থেকে বাইরের দিকে যায় তখন আনুক্রমিক স্থানগুলোতে আনুক্রমিক ঘটনা ঘটে, এবং স্বাভাবিক চক্ষুর পশ্চাৎবর্তী মস্তিষ্কে যে অনুরূপ (corresponding) ঘটনা ঘটে সেটা একটা দৃষ্টিগত সংবেদন। গোটা ধারাটার মধ্যে এটাই একমাত্র ঘটনা যার সম্পর্কে আমি এমন কিছু বলতে পারি যা অবিমিশ্রভাবে অমূর্ত ও গাণিতিক নয়।

এখন সংবেদনটা থেকে যাত্রা করা যাক। তখন আমি বলবো যে, এ সংবেদনটা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এক সুদীর্ঘ ঘটনাধারার মধ্যে একটি ঘটনা; একটা কেন্দ্র থেকে এটা বাইরের দিকে যাত্রা করেছে কতকগুলো গাণিতিক নিয়মানুসারে, যে নিয়মগুলো থাকার দরুন সংবেদনটা অন্য স্থানের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু জানতে সক্ষম করে। সে জন্য সংবেদনটা পদার্থিক জ্ঞানের অন্যতম উৎস।

দেখা যাবে যে, আমি যে মতের পক্ষ সমর্থন করে কথা বলছি সে মত অনুসারে, মন ও দেহের পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। কোন সংবেদন কোন একটা পদার্থিক কার্য-কারণ শৃঙ্খলের মধ্যে একটা আংটা মাত্র; যখন আমরা সংবেদনটাকে এ ধরনের একটা শৃঙ্খলের প্রান্ত হিসাবে ধরি তখন আমরা যা পাই তাকে মনের উপর জড়ের কার্য বলে মনে করা হবে; যখন প্রারম্ভ হিসাবে ধরি তখন যা পাই তাকে মনে করা হবে জড়ের উপর মনের কার্য হিসাবে। কিন্তু মন কেবল পদার্থিক কার্য-কারণ-ধারার একটা প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) মাত্র, এবং তার পক্ষে পদার্থিক জগতে কার্য ও কারণ উভয়ই হওয়ার মধ্যে কিম্ভুত-কিমাকার কিছুই নেই। সুতরাং পদার্থিক কার্য-কারণ নিয়মগুলোই হচ্ছে মৌলিক।

কার্য-কারণকে অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a priori) মনে করার কোন হেতু আছে বলে মনে হয় না, যদিও এ প্রশ্নটা সরল নয়। দেশ-কালের কাঠামো সম্পর্কে কতকগুলো সাধারণ ধারণাকে সত্য বলে মেনে নিলে, আমরা যাদের কার্য-কারণ নিয়ম বলি সেগুলো থাকতেই হবে। এই সাধারণ স্বীকৃত ধারণাগুলো অবশ্যই আমাদের মূল নীতি হিসাবে কার্য-কারণের স্থান দখল করবে। কিন্তু সাধারণ হলেও তাদেরকে অভিজ্ঞতা-পূর্ব বলে ধরা যায় না; কার্য-কারণ নিয়মগুলো যে আছে, তারা হচ্ছে এ সত্যেরই একটা সাধারণীকরণ এবং অমূর্ত সার-সংক্ষেপ,[১] এবং এটাকে কেবল এমন একটা আভিজ্ঞাতিক সত্য হিসাবে থেকে যেতে হবে, আরোহী যুক্তি যাকে নিশ্চিত না করলেও সম্ভাব্য করে তোলে।

১. 'the generalisation and abstract epitome.'

পঞ্চদশ অধ্যায়

পদার্থবিত্তার জ্ঞানের প্রকৃতি

এ অধ্যায়ে আমরা দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবো: প্রথমে পদার্থবিদ্যায় যে জগৎ নিয়ে আলোচনা করা হয় সে জগৎ সম্বন্ধে আমরা 'কিভাবে' জানি? দ্বিতীয়তঃ, অধুনিক পদার্থবিত্তার সত্যতা স্বীকার করে নিলে, এর সম্বন্ধে আমরা 'কি' জানি?

প্রথমে: পদার্থিক জগৎ সম্বন্ধে আমরা কিভাবে জানি? আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, এ প্রশ্নের কোন সরল উত্তর হতে পারে না, যেহেতু অনুমানের ভিত্তি আমাদের মাথার ভেতরকারই একটা ঘটনা, এবং আমাদের মাথার বাইরের যেকোন জিনিস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অবশ্যই অল্প-বিস্তর অনিশ্চিত (precarious) হবে। এখনকার মত আমি সত্য বলে ধরে নেব যে, উপযুক্ত সাবধানতা-সহ আমরা সাক্ষ্য-কে (testimony) গ্রহণ করতে পারি। অন্য কথায়, আমি ধরে নেব যে, অন্যে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে বলে আমরা যখন বিশ্বাস করি তখন আমরা যা শুনি, বক্তার কাছেও তার একটা 'অর্থ' আছে, কেবল আমাদের কাছে নয়; এবং লেখা সম্পর্কেও অনুরূপ একটা-কিছু স্বীকার করে নেব। পরবর্তী এক পর্যায়ে এ পূর্ব-স্বীকৃতিটাকে পরীক্ষা করে দেখা হবে। এখনকার মতো আমি কেবল জোর দিয়ে বলবো যে, এটা একটা পূর্ব-স্বীকৃতি (assumption) এবং এর পক্ষে ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়, যেহেতু স্বপ্নে লোকে আমাদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়, অথচ জেগে ওঠার পর আমরা বিশ্বাস করি যে স্বপ্নটা আমাদেরই আবিষ্কার। কোন প্রতিপাদক যুক্তির[১] সাহায্যে প্রমাণ করা যাবে না যে, আমরা সর্বক্ষণই স্বপ্ন দেখছি না; সবচেয়ে বেশী যা আমরা আশা করতে পারি সেটা এই প্রমাণ যে, এটা অসম্ভাব্য (improbable)। এখনকার মতো এ আলোচনা বাদ দেওয়া যাক, এবং ধরে নেওয়া যাক যে, যে শব্দগুলো আমরা শুনি বা পড়ি সেগুলোর সেই 'অর্থ' আছে, আমরা বললে বা লিখলে তাদের যে অর্থ থাকতো।

১, Demonstrative argument.

এ ভিত্তিতে, আমাদের এটা জানার পক্ষে যুক্তি আছে যে, বিভিন্ন লোকের জগৎগুলো কতকগুলো বিষয়ে সদৃশ এবং কতকগুলো বিষয়ে বিসদৃশ। উদাহরণস্বরূপ, কোন নাট্যালয়ের শ্রোতৃমণ্ডলীর কথা ধরা যাক: আমরা বলি যে, তারা একই শব্দ শোনে এবং একই অঙ্গভঙ্গি দেখে, এবং এ ছাড়া, অভিনেতারা তাদেরকে যে সব শব্দ শোনাতে এবং যে সব অঙ্গভঙ্গি দেখাতে চায়, এগুলো তাই। কিন্তু নাট্যমঞ্চের কাছে যারা, দূরবর্তীদের চেয়ে বেশী জোরে তারা শব্দগুলো শোনে; কতকটা আগেও তারা শোনে। এবং বাম দিকে অথবা মধ্যস্থলে যারা বসে তারা যা দেখে, ডান দিকের আসনগ্রহণকারীরা ঠিক তা দেখে না। এ বিভিন্নতাগুলো দু' রকমের: একদিকে, কিছু লোকে অন্যের নিকট অদৃশ্য কিছু-একটা দেখতে পারে; অপর দিকে, দু'ব্যক্তি যখন, আমরা যেমন বলি, 'একই' জিনিস দেখে, তখন পরিপ্রেক্ষিত ও আলোর প্রতিফলন-ধারার ক্রিয়ার দরুন তারা সেটাকে ভিন্নভাবে দেখে। এর সবটাই পদার্থবিদ্যার প্রশ্ন, মনোবিজ্ঞানের নয়; কারণ নাট্যশালার কোন একটা খালি আসনে আমরা যদি একটা ক্যামেরা বসাই তাহলে উৎপন্ন আলোকচিত্রটার পরিপ্রেক্ষিত তার দু'দিকে বসা লোকেরা যে পরিপ্রেক্ষিতগুলো দেখবে তাদের মাঝামাঝি; বস্তুতঃ পরিপ্রেক্ষিতের সমগ্র ব্যাপারটাই নিতান্ত (quite) সরল জ্যামিতিক নিয়মানুসারে নির্ধারিত। দু'জন লোক যখন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে 'একই' জিনিস দেখে তখন তাদের দেখা আকৃতিগুলোর (shapes) মধ্যে যা সাধারণ, এ নিয়মগুলো থেকে তাও জানা যায়: যা সাধারণ তার অনুসন্ধান হয় অভিক্ষেপী জ্যামিতিতে, এবং জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলোতে যা পরিমাপ-নিরপেক্ষ[১] তারই আলোচনা হয় এ জ্যামিতিতে। পরিপ্রেক্ষিতের দরুন প্রতীয়মানতার (appearance) মধ্যে যেসব পার্থক্য হয়, অঙ্কনবিদ্যা শিখতে গিয়ে সেগুলো শিখতে হয়: এ উদ্দেশ্যে বস্তুসমুদয় প্রকৃতপক্ষে যেভাবে প্রতীয়মান হয় (seem) সেইভাবে তাদেরকে দেখতে শিখতে হয়, যেভাবে তারা প্রতীয়মান হয় বলে প্রতীয়মান হয়,[২] সে ভাবে নয়।

১. Independent of measurement.

২. Seem to seem.

কিন্তু বলা হবে, বস্তু-সমুদয় 'প্রকৃতপক্ষে' যে ভাবে প্রতীয়মান হয় এবং যে ভাবে তারা প্রতীয়মান হয় বলে 'প্রতীয়মান হয়'—এসব কথা বলে আপনি কি বোঝাতে পারেন? এখানে আমরা শিক্ষণ সম্পর্কিত একটা গুরুতর সত্যে এসে পড়ি। অতি শৈশবে আমরা যখন দৃষ্টি ও স্পর্শের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করতে শিখছি, তখন কোন দৃষ্টিগত উদ্দীপকের উপর একটা ক্যামেরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া করে তার চেয়েও বেশী 'বিষয়গত' (objective) ভাবে প্রতিক্রিয়া করার অভ্যাস আমরা আয়ত্ত করি। সরাসরি আমাদের সামনে নয়, এমন কোন মুদ্রা যদি আমরা দেখি তাহলে তাকে আমরা বৃত্তাকার বলে বিবেচনা করি, যদিও ক্যামেরায় তাকে ডিম্বাকার বলে দেখাতো, এবং কোন দৃশ্যের ছবিতে এটা স্থান পেলে তার মধ্যে এটাকে ডিম্বাকার করতে হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছেঃ যেকোন দৃশ্য বস্তুতে আমাদের আগ্রহ জন্মালে আমরা স্বভাবতঃ তৎক্ষণাৎ তার উপর আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করি; কিন্তু তা যদি আমরা না করি তাহলে, কোন দৃষ্টিগত আকার দৃষ্টিক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে থাকলে তাকে যেরকম দেখাতো, সে অনুসারে তার উপর আমরা প্রতিক্রিয়া করতে শিখি। প্রকৃতপক্ষে, আমরা সর্বক্ষণ বিভিন্ন দিকে তাকাচ্ছি, এবং সচরাচর কেবল সে জিনিস লক্ষ্য করছি যা সেই মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে। কাজেই আমাদের দৃষ্টির জগৎ সেইসব জিনিস দিয়ে তৈরী নয় যেগুলোকে আমরা দৃষ্টিক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলকে স্থির রেখে যুগপৎ দেখি; বরং সেটা তৈরী সরাসরি ক্রমানুসারে দেখা বস্তু-সমষ্টির সমন্বয় দিয়ে। এটা অন্যতম কারণ যেজন্য পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মগুলো শিখতে হয়, যদিও যে ছবিতে এ নিয়মগুলো উপেক্ষিত হয় তাকে আমরা 'ভুল' বলে মনে করি।

দৃষ্টি থেকে আমরা যে সব সংবেদন (impression) পাই তাদের বিষয়মূলকতার আরেকটি কারণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, বিশেষতঃ স্পর্শের সঙ্গে তাদের অনুবন্ধ। এ অনুবন্ধের মাধ্যমে আমরা অচিরেই 'জানতে' পারি যে, বিশ গজ দূরের লোকটি 'আসলে' ঠিক এক গজ দূরবর্তী লোকটির মতোই বড়। ছেলেমেয়েরা যখন অঙ্কনবিদ্যা শিখতে আরম্ভ করেছে তখন তাদের পক্ষে দূরবর্তী জিনিসগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে ছোট করা খুবই কষ্টকর হয়, কারণ তারা জানে সেগুলো 'আসলে' ছোট নয়। আমরা অনতিবিলম্বে দৃষ্টিগত বস্তুর দূরত্ব বিচার করতে শিখি, এবং তাকে স্পর্শ করলে অথবা, পর্বতের

বৃহদাকার বস্তুর বেলায়, তার কাছে গেলে তার যে আকার (size) ধরা পড়তো সে অনুসারে তার উপর প্রতিক্রিয়া করতে শিখি। আকার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান (sense) স্পর্শ ও সঞ্চরণ জাতীয়[১] উৎস থেকে পাওয়া, দৃষ্টি থেকে পাওয়া নয়; উদ্দীপকটা যখন কেবল দৃষ্টিগত মাত্র তখন পরিমাপ-সংক্রান্ত আমাদের অবধারণগুলো অতীত অভিজ্ঞতার ফল।

কোন শিশু যখন ভাল করে কথা বলতে শিখেছে, তখন ইতিমধ্যেই সে বহুল পরিমাণে এ জাতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছে। ফলতঃ আমাদের শাব্দিক প্রতিক্রিয়াগুলো যদি শৈশবের আরও পূর্ববর্তী কোন পর্যায়ে দেখা দিত তাহলে তাদের মধ্যে যে পরিমাণ বিষয়মূলকতা থাকতো এখন তার পরিমাণ অনেক বেশী। তার ফল এই হয় যে, কতিপয় লোক কোন একটা দৃশ্যকে একই সঙ্গে দেখতে পারে, এবং তার সম্বন্ধে ঠিক একই শব্দাবলী ব্যবহার করতে পারে। আমরা যা দেখি তা বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবে যে সব শব্দ ব্যবহার করি সেগুলো, এবং যে সব দিক (features) আমাদের প্রতিবেশের অন্যান্যের কাছেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে তাদের বর্ণনায় যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়, এ দুটো অভিন্ন। আমরা বলি "ওখানে একজন লোক আছে"; আমরা বলি না—"ওখানে একটি রঙীন আকৃতি আছে যার দৃষ্টিগত মাত্রাগুলো (dimensions) লম্বভাবে এই-এই কোণের, এবং আনুভূমিকভাবে এই-এই কোণের"। অনুমানটা শরীরবৃত্তীয় অনুমান, এবং কেবল পরবর্তী চিন্তন থেকে আমরা জানতে পারি যে, এটা ঘটেছে। তবে মাঝে মাঝে ভুল করার ফলে আমরা সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারি; জানালার পরকলার একটা বিন্দুকে (dot) ভুল করে কোন দূরবর্তী প্রান্তরের একজন মানুষ বলে ধরে নেওয়া হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা দরজা খুলে অথবা মাথা নেড়ে আমাদের ভুলটা আবিষ্কার করতে পারি। তবে, সচরাচর এ জাতীয় শরীরবৃত্তীয় অনুমানগুলো অভ্রান্ত, যেহেতু তাদের পেছনে থাকে নিতান্ত সাধারণ (common) অনুবন্ধ, এবং কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সে অনুবন্ধগুলো উপস্থিত থাকারই সম্ভাবনা। ফলতঃ আমাদের শব্দগুলোর (words) মধ্যে এ রকম একটা প্রবণতা আছে যে, আমাদের সংবেদনগুলোর

১. Touch and locomotion.

মধ্যে যা ব্যক্তিগত ও বিশেষ (peculiar) তাকে তারা আড়াল করতে চায়, এবং বিভিন্ন লোকে প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণে একটা সাধারণ জগতে বাস করে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে তারা তা করে বলে আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চায়।

'বিষয়মূলকতা' (objectivity) শব্দটা আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে ব্যবহার করে আসছি; এখন সময় এসেছে, একে দিয়ে আমরা ঠিক কি বোঝাই, তা বিবেচনা করার। ধরা যাক কোন নাট্যশালায় কোন একটা দৃশ্য একই সঙ্গে কতিপয় লোকে দেখেছে এবং কয়েকটা ক্যামেরাতে তার ছবি তোলা হয়েছে। একজন লোকের উপর বা একটা ক্যামেরায় তার যে ছাপ (impression) পড়েছে তা, অবশিষ্ট লোকের উপর বা অবশিষ্ট ক্যামেরাগুলোতে যেসব ছাপ পড়েছে, কতকগুলো বিষয়ে সেগুলোর অনুরূপ, এবং আর কতক বিষয়ে ভিন্ন। যে উপাদানগুলো অনুরূপ সেগুলোকে আমরা 'বিষয়মূলক', এবং যেগুলো বিশেষ (peculiar) সেগুলোকে 'বিষয়ীমূলক' বলবো। সুতরাং অভিক্ষেপী জ্যামিতিতে আকৃতির যেসব দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো 'বিষয়মূলক' হবে, এবং পরিমাপী জ্যামিতিতে[১] (যেখানে দৈর্ঘ্য ও কোণ পরিমাপ করা হয়) যেগুলো বিবেচনা করা হয় সেগুলোকে বিষয়মূলক করতে হলে কেবল দৃষ্টির মাধ্যমে তা সম্ভব নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ আবশ্যক। সবগুলো ক্যামেরাকে এক রকম বলে ধরে নিয়ে বলা যায় যে, ক্যামেরা মঞ্চ থেকে দূরে থাকলে আলোকচিত্রে মঞ্চস্থিত কোন লোক যত দীর্ঘ হবে, ক্যামেরাটা কাছাকাছি থাকলে সে তার চেয়ে বেশী দীর্ঘ হবে। কিন্তু কোন ছবিতে যদি চারজন অভিনেতা এক সারিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকেন, তাহলে অন্য কোন ক্যামেরাতেও তারা এক সারিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে; এ হচ্ছে মুদ্রণটার একটা 'বিষয়গত' দিক। এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন কতিপয় দর্শকের দৃষ্টিগত মুদ্রণের পার্থক্যগুলো আর আলোকচিত্রের পার্থক্যগুলো সম্পূর্ণ অনুরূপ; তাদের সাদৃশ্যগুলোও তেমনি। কাজেই এখন আমরা যে 'বিষয়ীমূলকতা' সম্পর্কে কথা বলছি, তার স্থান পদার্থিক জগতে, মনোবিজ্ঞানে নয়। এটা থেকে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকটা চোখের উপরই পড়ুক অথবা ক্যামেরার

১. **Metrical geometry.**

উপরই পড়ুক, সেটা চোখ বা ক্যামেরার অবস্থান-নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র ঠিক অভিন্ন নয়; উদ্দীপকটার কতকগুলো দিক আছে যেগুলো (একটা সীমার মধ্যে) ধ্রুব, কিন্তু আরও কিছু দিক আছে যেগুলো যে কোন দুই দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন।

আমাদের প্রত্যক্ষগুলোর প্রবণতা হচ্ছে বর্ধিষ্ণু মাত্রায় কোন সংবেদনের বিষয়গত উপাদানগুলোর উপর জোর দেওয়া; তবে, শিল্পীদের যেমন থাকে, তেমনি কোন বিশেষ কারণ যদি আমাদের থাকে, তবে আমরা এর উল্টোটা করি। এ প্রবণতা শুরু হয় কথা বলা আরম্ভ হওয়ার আগে, কথা বলার শক্তি অর্জনের পর এটা অনেক বেড়ে যায়, এবং বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যায় এটা দীর্ঘায়িত হয়। সংবেদন থেকে বিষয়ীগত উপাদানগুলোকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে এ পর্যন্ত আপেক্ষিকবাদ কেবল সর্বশেষ ধাপ মাত্র। কিন্তু এটা মনে করা সঙ্গত হবে না যে, বিষয়ীগত উপাদানগুলো কোন অর্থে বিষয়গত উপাদান থেকে কম 'বাস্তব'; তারা কেবল কম গুরুত্বপূর্ণ। তারা কম গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, অন্যগুলোর মত তারা নিজেদের বাইরে আর-কিছুর ইঙ্গিত বহন করে না। আমরা চাই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আমাদেরকে জ্ঞান (information) দেবে, অর্থাৎ, আমাদের ক্ষণস্থায়ী সংবেদন ছাড়াও আর-কিছু সম্পর্কে আমাদের বলবে। যদি আমরা সংবেদনের বিষয়গত উপাদানগুলোর প্রতি নজর দিই এবং অন্যগুলোকে উপেক্ষা করি তাহলে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান পাই; কিন্তু বিষয়ীগত উপাদানগুলো সমভাবেই বাস্তব সংবেদনের অংশ। ক্যামেরা যে আমাদের মতোই বিষয়ীগত, এ উপলব্ধি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা অতি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

এসব পর্যালোচনা থেকে এ বৈজ্ঞানিক অভিমতে না এসে পারা যায় না যে, কতিপয় দৃষ্টিকোণ থেকে যখন কোন বস্তুকে দেখা বা তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তখন কোন কেন্দ্র থেকে বহির্গামী ও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলো ঘটনা (আলোক-তরঙ্গ) ঘটে; এবং তাছাড়া কতকগুলো বিষয়ে সবগুলো ঘটনা এক রকমের হয়, এবং অন্য কতকগুলো বিষয়ে ভিন্ন রকমের হয়। কোন আলোক-তরঙ্গকে আমরা অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও তাল-লয়-বিশিষ্ট কতকগুলো ঘটনার সমষ্টি[১] বলে মনে করবো, একটা

[১] ....connected group of rhythmical events.

'জিনিস' (thing) বলে মনে করবো না। একটা সীমার মধ্যে, এ ধরনের একটা সমষ্টির গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো পদার্থবিদ্যা অনুমান করতে পারে ; কিন্তু যে ঘটনাগুলো দিয়ে এ সমষ্টি তৈরী তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুমান করা যায় না। যেসব ঘটনা দিয়ে আলোক-তরঙ্গ তৈরী—আমাদের চোখ, অক্ষিস্নায়ু, ও মস্তিষ্কের উপর তাদের যে কার্য, কেবল সেগুলোর মাধ্যমেই আমরা তাদের জানতে পারি ; এবং স্নায়ু ও মস্তিষ্ক যে স্বচ্ছ নয় এ সত্য থেকে একথাটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এ কার্যগুলো নিজেরা আলোক তরঙ্গ নয়। সুতরাং, আমরা যখন দেখি তখন যেসব ঘটনা ঘটে, পদার্থিক জগতে আলোক-কে এমন-সব ঘটনা দিয়ে তৈরী হতে হবে যেগুলো কোন একভাবে সেসব ঘটনা থেকে ভিন্ন ; কিন্তু এসব বাহ্য ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী আর কিছু আমরা বলতে পারবো না। অধিকন্তু, কতিপয় লোক যখন, আমরা যেমন বলি, "একই জিনিস দেখে," তখন যে কথাটা আমাদের বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে সেটা এই যে, কোন-একটা জায়গা থেকে আলোক-তরঙ্গ বেরিয়ে এসে এদের সকলের চোখে পৌঁছেছে। যে জায়গা থেকে আলোক-তরঙ্গগুলো আসে সেখানে কি আছে, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারবো না।

কিন্তু সাধারণ লোকে এভাবে যুক্তি দিতে প্রলুব্ধ হয় যে, আমরা বেশ ভালভাবেই তা বলতে পারি, কারণ আমরা যেসব জিনিস দেখি সেগুলোকে আমরা স্পর্শ করতে পারি, এবং আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, যেখান থেকে আলোক-তরঙ্গটা আসছে সেখানে শক্ত ও ঘন একটা-কিছু আছে। অথবা, আমরা দেখতে পারি যে, সেখানে একটা-কিছু আছে যা ঘন না হলেও অত্যন্ত গরম এবং সেটাকে আমরা ছুঁতে গেলে পুড়ে যাই। আমরা সবাই বোধ করি যে, দৃষ্টির চেয়ে স্পর্শের কাছ থেকে আমরা 'বাস্তবতা'র (reality) বেশী প্রমাণ পাই ; ভূতপ্রেত ও রামধনু দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। বাস্তবতার এ গভীরতর বোধের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা যখন আমাদের আঙুলের ডগা দিয়ে কোন বস্তু স্পর্শ করি, তখন বস্তুটার সঙ্গে আমাদের দৈশিক সম্বন্ধটা উপস্থিত থাকে (given), এবং সেজন্য বস্তুটা দৃষ্টির বেলায় ভিন্ন ভিন্ন লোককে যে রকম ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি দেয়, স্পর্শের বেলায় সে রকম দেয় না। অন্য একটা কারণ এই যে, কতকগুলো জিনিস

আছে যেগুলোকে দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না—প্রতিফলন, ধোঁয়া, কুয়াশা, ইত্যাদি—এবং অনভিজ্ঞ লোকদেরকে হতবুদ্ধি করার জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ সত্যগুলোর কোনটা থেকেই সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত হয় না যে, স্পর্শ থেকে সে বাস্তব সত্তার আসল প্রকৃতি জানতে পারে, যদিও শাব্দিকভাবে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, স্পর্শ তাকে বাস্তব সত্তার 'সংস্পর্শে' (contact) নিয়ে আসে।

ইতিপূর্বে এক সময় আমরা দেখেছি, আমরা যখন কোন জিনিস স্পর্শ করি তখন বস্তু থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পদার্থিক ও শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটা কত জটিল ; এবং আমরা দেখেছি যে, কৃত্রিম উপায়ে স্পর্শগত অধ্যাস (illusion) উৎপন্ন করা যায়। সুতরাং, কোন বস্তুর দিকে তাকালে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় সে অভিজ্ঞতার চেয়ে, স্পর্শগত সংবেদন-লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্টতরভাবে কিছু জানা যায় না। বস্তুতঃ আধুনিক পদার্থবিদ্যাকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে, বিচক্ষণতার সঙ্গে দৃষ্টিকে ব্যবহার করতে পারলে বস্তু সম্পর্কে যে রকম সূক্ষ্ম জ্ঞান পাওয়া যায়, স্পর্শ থেকে কখনও সে রকম জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে না। কোন একক (individual) ইলেকট্রনের গতিপথের আমরা আলোকচিত্র নিতে পারি। আমরা বিভিন্ন রঙ প্রত্যক্ষ করি যাদের থেকে, পরমাণুর ভেতরে যে সব পরিবর্তন হচ্ছে, সে সব পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাই। অনুজ্জ্বল তারকাগুলোকে আমরা দেখতে পারি, যদিও তাদের থেকে যে আলো এসে আমাদের কাছে পৌঁছে, তার শক্তি অকল্পনীয়ভাবে ক্ষুদ্র। অসতর্ক ব্যক্তিকে স্পর্শের চেয়ে দৃষ্টি বেশী ঠকাতে পারে, কিন্তু যথাযথ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের চেয়ে এ অতুলনীয়ভাবে উন্নততর।

প্রধানতঃ দৃষ্টি-লব্ধ ধারণাবলী থেকেই পদার্থবিদেরা পরমাণু সম্পর্কিত এই আধুনিক ধারণায় পৌঁছেছেন যে, পরমাণু একটা কেন্দ্র যার মধ্য থেকে তেজস্ক্রিয়া (radiation) বেরিয়ে আসে। কেন্দ্রের ভেতরে কি ঘটে তা আমরা জানি না। সেখানে যে একটা ক্ষুদ্র শক্ত পিণ্ড আছে, যে পিণ্ডটাই 'নিঃসন্দেহে' ইলেকট্রন বা প্রোটন, এ ধারণা স্পর্শ-লব্ধ কাণ্ডজ্ঞানিক প্রত্যয়ের অবৈধ অনধিকার-প্রবেশের একটা দৃষ্টান্ত। আমরা যতদূর জানি, পরমাণুর ভেতর থেকে যে সব তেজস্ক্রিয়া বেরিয়ে আসে, পরমাণু সম্পূর্ণভাবে তাদের দ্বারাই

গঠিত হতে পারে। তেজস্ক্রিয়াগুলো অসত্তা (nothing) থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, এ যুক্তি দেওয়া নিরর্থক। আমরা জানি যে, তারা বেরিয়ে আসে; এবং তারা একটা ক্ষুদ্র পিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে বলে কল্পনা করলে তাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাস্তবিক পক্ষে স্পষ্টতর হয় না।

অতএব, আধুনিক পদার্থবিদ্যা জড়কে পর্যবসিত করে এক-প্রস্থ ঘটনায় যেগুলো একটা কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। যদি কেন্দ্রের নিজের ভেতরে আর-কিছু থাকে, আমরা তার সম্পর্কে জানতে পারি না, এবং পদার্থবিদ্যায় সেটা অপ্রাসঙ্গিক। যে ঘটনাগুলো প্রাচীন অর্থে বস্তুর জায়গা দখল করেছে, সেগুলো চোখ, আলোকচিত্রের পাত, এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি থেকে অনুমিত। তাদের সম্পর্কে আমরা যা জানি তা তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি নয়; সেটা তাদের কাঠামো এবং তাদের গাণিতিক নিয়মাবলী। "একই কারণ, একই কার্য," প্রধানতঃ এ সূত্রের (maxim) মাধ্যমে তাদের কাঠামো অনুমান করা হয়। এ সূত্র থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, কার্যগুলি যদি ভিন্ন হয়, তাহলে কারণগুলোও ভিন্ন হবে; সুতরাং আমরা যদি নীল আর লাল পাশাপাশি দেখি, তাহলে আমরা বৈধভাবেই অনুমান করতে পারি যে, যে দিকে আমরা নীল দেখছি সেদিক থেকে, যে দিকে আমরা লাল দেখছি সে দিকে ভিন্ন কিছু ঘটছে। এ যুক্তি-ধারাকে সম্প্রসারিত করে আমরা পদার্থিক জগতের গাণিতিক নিয়মগুলোতে এসে পৌঁছি। পদার্থিক জগৎ সম্পর্কে আমরা এত বেশী জানি বলে নয়, বরং আমরা এত কম জানি বলেই পদার্থবিদ্যা গাণিতিক: আমরা কেবল এর গাণিতিক বৈশিষ্ট্য-গুলোই জানতে পারি। বাকীটুকুর বেলায় আমাদের জ্ঞান নঞর্থক। যে সব স্থানে কোন চোখ অথবা কান অথবা মস্তিষ্ক নেই সেখানে কোন রঙ কিংবা শব্দ নেই, কিন্তু সেখানে ঘটনা আছে, যাদের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে যেসব জায়গায় চোখ এবং কান এবং মস্তিষ্ক আছে সেখানে রঙ ও শব্দের সৃষ্টি হয়। যে জায়গায় কোন লোক নেই সেখান থেকে জগৎটা দেখতে কেমন তা আমরা আবিষ্কার করতে পারি না, কারণ তাকাবার জন্য আমরা সেখানে গেলেই সেখানে একজন লোক হয়ে গেল; এ প্রচেষ্টা নিজের ছায়ার উপর ঝাঁপ দিতে চেষ্টা করার মতোই নিরর্থক।

কাণ্ডজ্ঞানের কাছে জড়কে যে রকম মনে হয়, এবং সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত

পদার্থবিদ্যার কাছে জড়কে যে রকম মনে হয়েছে সে অর্থে জড়কে বর্জন করতে হবে। 'পদার্থ'-এর (substance) ধারণার সঙ্গে জড়ের প্রাচীন ধারণা সংশ্লিষ্ট, এবং এটাও আবার কাল সম্পর্কে এমন এক মতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আপেক্ষিকবাদ যাকে অসমর্থণীয় বলে দেখিয়েছে। প্রাচীন মতটা এই ছিল যে, একটা জাগতিক কাল (cosmic time) আছে, এবং বিশ্বের যে কোন দুই অংশের যে কোন দুটো ঘটনার ক্ষেত্রে, হয় তারা সমকালীন (simultaneous), নয়তো প্রথমটা দ্বিতীয়টার পূর্বগামী, কিংবা দ্বিতীয়টা প্রথমটার পূর্বগামী। মনে করা হয়েছিল যে, দুটো ঘটনার কাল-ক্রম সব সময়ই বিষয়গতভাবে সুনির্দিষ্ট, যদিও 'আমরা' সেটাকে সুনির্দিষ্ট করতে অপারগ হতে পারি। এখন আমরা দেখছি যে, কথাটা সত্য নয়। এখনও পর্যন্ত, যে সব ঘটনার সব-ক'টিকে এক জায়গায় আছে বলে, অথবা এক খণ্ড জড়ের ইতিহাসের সমুদয় অংশ বলে মনে করা যায়, তাদের একটা সুনির্দিষ্ট কালক্রম আছে। তেমনি আছে দুটো ভিন্ন জায়গার দুটো ভিন্ন ঘটনার, যদি দ্বিতীয় ঘটনাটা যে স্থানে ঘটে সে স্থানে অবস্থিত কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটার আগে প্রথমটাকে দেখতে পায়, অথবা, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, যদি একটা ঘটনার স্থান থেকে অন্য ঘটনার স্থানে আলো এমনভাবে ভ্রমণ করতে পারে যে, দ্বিতীয় ঘটনাটার আগে তা অন্য স্থানে পৌঁছায়। [এখানে 'স্থান' বলতে আমরা কোন নির্দিষ্ট (given) জড়খণ্ডের অবস্থান বোঝাচ্ছি: অন্য জড়ের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে এ জড়টা যেভাবেই নড়াচড়া করুক না কেন, এর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সব সময় একই জায়গায় আছে]। কিন্তু যদি এক ঘটনার স্থান থেকে অন্য ঘটনার স্থানে যেতে গিয়ে আলো অন্য ঘটনাটা ঘটার পর অন্য ঘটনাটার স্থানে এসে পৌঁছায়, এবং বিপরীতক্রমেও তাই ঘটে, তাহলে ঘটনা দুটোর কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়গত কাল-ক্রম নেই, এবং তাদের একটাকে অপরটার পূর্ববর্তী বলে অথবা দুটোকে সমকালীন (simultaneous) বলে মনে করার কোন কারণ নেই; সতর্কতার দিক থেকে আদর্শ পর্যবেক্ষকগণ তাঁদের গতির ধরন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাবেন। সুতরাং কাল জাগতিক (cosmic) নয়; প্রতিটি জড়খণ্ডের বেলা তা কিয়ৎ পরিমাণে একক ও ব্যক্তিগত।[১]

১. Individual and personal.

এ উক্তিতে 'জড়খণ্ড' (piece of matter) বলতে আমরা কি বোঝাই? আমরা এমন কিছু বোঝাই না যা তার গোটা ইতিহাস জুড়ে একটা সরল অভেদত্ব বজায় রাখে, অথবা কঠিন ও ঘন একটা-কিছুও আমরা বোঝাই না, অথবা এমন-কি কেবল তার কার্যের মাধ্যমে জ্ঞাত কোন প্রকল্পাত্মক শুদ্ধ সত্তাও (thing-in-itself) বোঝাই না। 'কার্যগুলো'কেই আমরা বোঝাই; কেবল আমরা এখন আর তার জন্য কোন অজ্ঞেয় কারণকে ডেকে আনছি না। আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে শক্তি বিভিন্নরূপে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে; আমরা আরও দেখতে পাই যে, এ কেন্দ্রগুলোর কিয়ৎ পরিমাণ স্থায়িত্ব (persistence) আছে, যদিও এ স্থায়িত্ব পূর্ণাঙ্গ নয়—আধুনিক পদার্থবিদ আনন্দের সঙ্গে এ সম্ভাবনার মুখোমুখী হন যে, একটা ইলেকট্রন ও একটা প্রোটন পরস্পরকে ধ্বংস করে দিতে পারে, এবং তিনি এমন-কি এ ইঙ্গিতও দেন যে, এটাই সম্ভবতঃ নক্ষত্রপুঞ্জের বিকিরিত শক্তির প্রধান উৎস, যেহেতু এটা যখন ঘটে তখন তার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে। এ কথাটাকে এই-ভাবে বলা যেতে পারে: যখন কোন কেন্দ্র থেকে শক্তি বিকিরিত হয় তখন কেন্দ্রের মধ্যে কিছু-একটা, যাকে আমরা অবস্থানুসারে ইলেকট্রন বা প্রোটন বলি, কল্পনা করে তার [শক্তির] বিকিরণের নিয়মগুলোকে সুবিধাজনকভাবে বর্ণনা করতে পারি, এবং কতকগুলো উদ্দেশ্যে এ কেন্দ্রটাকে স্থায়ী বলে মনে করা সুবিধাজনক। স্থায়ী মনে করার অর্থ একে দেশ-কালস্থ একটা একক (single) বিন্দু মনে করা নয়; বরং একে এ-রকম বিন্দুর একটা পরম্পরা (series) বলে মনে করা, যে বিন্দুগুলো সময়-সদৃশ বিরতি[১] দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এর সবটুকুই হচ্ছে অন্যত্র যা ঘটে তার, অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে দূরে শক্তির বিকিরণের, একটা সুবিধাজনক বর্ণনা। কেন্দ্রের নিজের ভেতরে যদি কিছু ঘটে তাহলে কি ঘটে, সে বিষয়ে পদার্থবিদ্যা নীরব।

ডঃ হোয়াইটহেড যাকে জড়ের 'ধাক্কাপ্রবণতা' (pushiness) বলেন, এ মতানুসারে সেটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে যায়। জড় যেখানে নেই সেখানে যা ঘটে, 'জড়' হচ্ছে তার বর্ণনা দেওয়ার জন্য একটা সুবিধাজনক সূত্র (formula)। আমি পদার্থবিদ্যা বলছি, পরাতত্ত্ব[২] নয়; পরাতত্ত্বে আমরা

১. Time-like interval.
২. Mataphysics.

যখন আসি তখন, পরীক্ষাচ্ছলে, আমরা এ উক্তির সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞানের একার পক্ষে এর সঙ্গে কিছু যোগ করা সুকঠিন। জড়ের এ বাষ্পীভবনের আলোকে দর্শন হিসাবে জড়বাদকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা কঠিন। কিন্তু আগে যারা জড়বাদী ছিলেন তাঁরা এখনও এমন এক দর্শন অবলম্বন করতে পারেন যা বহু দিক থেকে অনেকটা একই রকম জিনিসে এসে দাঁড়ায়। তাঁরা বলতে পারেন যে, পদার্থবিত্তায় যে ধরনের কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটাই মৌলিক, এবং সব ঘটনাই পদার্থিক নিয়মাবলীর বশীভূত। এ ধরনের অভিমত কতটুকু গ্রহণযোগ্য, সেটা আমি এখনও বিবেচনা করতে চাই না; আমি কেবল এই ইঙ্গিত দিচ্ছি যে, গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষণযোগ্য একটা মত হিসাবে এ অবশ্যই জড়বাদের স্থান দখল করবে।

তৃতীয় খণ্ড

ভেতরের দিক থেকে মানুষ
MAN FROM WITHIN

ষোড়শ অধ্যায়

আত্ম-নিরীক্ষণ

স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথম খণ্ডের সর্বত্র আমরা মানুষ সম্পর্কে কেবল সেই সব সত্য (facts) বিবেচনা করতে রাজী হয়েছিলাম যেগুলোকে বাহ্য নিরীক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায়, এবং এর ফলে কোন সত্যিকার জ্ঞান বাদ পড়ে যায় কিনা সে প্রশ্ন মুলতবী রেখেছিলাম। প্রচলিত মতটা এই যে, আমরা অনেক জিনিস জানি যেগুলোকে আত্মনিরীক্ষণ ব্যতিরেকে জানা যেত না, কিন্তু আচরণবাদী মনে করেন যে, এ মতটা ভ্রান্ত। ২য় খণ্ডে আমরা যখন পদার্থিক জগৎ সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান পরীক্ষা করছিলাম তখন যে সব বিবেচ্য বিষয় জোর করে আমাদের উপর এসে পড়েছিল, সেগুলো না থাকলে আমি হয়তো আচরণবাদীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবার দিকে ঝুঁকে পড়তাম। তখন আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, পদার্থবিদ্যাকে নির্ভুল বলে ধরে নিলে পদার্থবিদ্যা-লব্ধ আমাদের জ্ঞানের উপাত্ত-সমূহ বিষয়ীমূলকতা (subjectivity) দ্বারা কলুষিত হয়, এবং একটা মোটামুটি ও কাছাকাছি অর্থে ছাড়া দু'জন মানুষের পক্ষে একই ঘটনা (phenomenon) নিরীক্ষণ করা অসম্ভব হয়। অন্ততঃ নীতিগতভাবে, এর ফলে আচরণবাদী পদ্ধতির কল্পিত বিষয়মূলকতার (objectivity) ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে; মাত্রাগতভাবে, কিয়ৎ পরিমাণে এটা টিকে যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, পদার্থবিদ্যা যদি সত্য হয় এবং অষ্টম অধ্যায়ের মতো জ্ঞানের কোন আচরণবাদী সংজ্ঞা আমরা যদি গ্রহণ করি, তাহলে সচরাচর মস্তিষ্ক থেকে দূরে যে সব বিষয় (things) ঘটে তাদের চেয়ে মস্তিষ্কের কাছাকাছি যে সব বিষয় ঘটে, তাদের সম্পর্কে আমাদের বেশী জানা উচিৎ, এবং মস্তিষ্কের ভেতরে যে সব বিষয় ঘটে তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানা উচিৎ। এটাকে মিথ্যা 'মনে হয়েছিল' এজন্য যে লোকে ভেবেছিল যে, মস্তিষ্কের ভেতরে যা ঘটে, মস্তিষ্ক পরীক্ষা করার সময় শরীরতত্ত্ববিদ তাই দেখেন; কিন্তু দ্বাদশ অধ্যায়ের মতবাদ অনুসারে এটা ঘটে শরীর

তত্ত্ববিদের মস্তিষ্কের ভেতরে। কাজেই, আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে যা ঘটে তাই আমরা সবচেয়ে ভালভাবে জানি, এ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রাকসিদ্ধ (a priori) আপত্তিটা আর থাকে না, এবং জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপায় হিসাবে আত্ম-নিরীক্ষণেই আমরা ফিরে যাই। বর্তমান অধ্যায়ে এ অভিমতটাকেই (thesis) সম্প্রসারিত ও প্রমাণিত করতে হবে।

প্রত্যেকেই জানে যে, ডেকার্টের যে মতবাদ (system) নিয়ে আধুনিক দর্শন শুরু হয়েছিল, আত্ম-নিরীক্ষণের নিশ্চয়তাই ছিল তার ভিত্তি। যা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত কেবল তার উপর তাঁর পরাতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে আগ্রহী হয়ে, সূচনা হিসাবে, যা-কিছু তাঁর পক্ষে সন্দেহ করা সম্ভব ছিল তাই তিনি সন্দেহ করতে লেগে গেলেন। সমস্ত বাহ্য জগতকে তিনি সন্দেহ করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন। কারণ কোন বিদ্বেষপরায়ণ অপদেবতা থাকতে পারতো যার আনন্দ হচ্ছে তাঁর সামনে বিভ্রান্তিকর অবভাস[১] উপস্থিত করায়। (তার জন্য স্বপ্ন থেকে পর্যাপ্ত একটা যুক্তি পাওয়া যেতে পারতো।) কিন্তু তাঁর নিজের অস্তিত্ব তিনি সন্দেহ করতে পারলেন না। কারণ, তিনি বললেন, আমি সত্যিই সন্দেহ করছি ; অন্য যা কিছুই সন্দেহের যোগ্য হোক না কেন, আমি যে সন্দেহ করছি এ সত্যটা সন্দেহের অযোগ্য। এবং আমার যদি অস্তিত্ব না থাকতো তাহলে আমি সন্দেহ করতে পারতাম না। যুক্তিটাকে তিনি তাঁর বিখ্যাত সূত্রে এক সংক্ষিপ্ত রূপ দিলেন : 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি'। এ নিশ্চয়তায় পৌঁছার পর তিনি পর্যায়-ক্রমিক অনুমানের সাহায্যে জগতটাকে আবার গড়ে তুলতে অগ্রসর হলেন। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সংশয়বাদে প্রবেশ করার আগে তিনি যে জগতে বিশ্বাস করতেন, এটা ছিল বহুলাংশে তারই মতো। ডঃ ওয়াটসনের যুক্তির সঙ্গে এর বিরোধ দেখালে তা থেকে কিছু শিক্ষা পাওয়া যাবে। অনেক জিনিস, যেগুলো অন্যেরা সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেয়, ডেকার্টের মতো ডঃ ওয়াটসনও সেগুলোর ব্যাপারে সংশয়বাদী ; এবং, ডেকার্টের মতো, তিনিও বিশ্বাস করেন যে কতকগুলো জিনিস আছে যেগুলো এত নিশ্চিত যে, তাদেরকে কোনরূপ বিপদের ভয় না করে একটা চমকপ্রদ দর্শনের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার

১. Deceitful appearances.

করা চলে। কিন্তু ডঃ ওয়াটসন যে সব বিষয়কে নিশ্চিত বলে মনে করেন, ঠিক সেগুলোকেই ডেকার্ট সন্দেহজনক বলে মনে করেছিলেন, এবং ডঃ ওয়াটসন যে জিনিসটাকে নিতান্ত প্রচণ্ডভাবে বর্জন করেন, ঠিক সেটাকেই ডেকার্ট সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত বলে মনে করেছিলেন। ডঃ ওয়াটসন মনে করেন যে, চিন্তন বলে কোন জিনিস নেই। সন্দেহ নেই যে, তিনি তাঁর নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন ; কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, তিনি মনে করেন যে, তিনি চিন্তা করতে পারেন। যে সব জিনিস তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সংশয়াতীত বলে মনে হয় সেগুলো হচ্ছে গোলকধাঁধার ভেতরের ইঁদুর, সময়ের পরিমাপ, গ্রন্থি ও পেশী সম্পর্কিত শরীরতাত্ত্বিক তথ্যাবলী (facts), ইত্যাদি। দু'জন সুযোগ্য ব্যক্তি যখন এ ধরনের বিপরীত মত পোষণ করেন তখন আমরা কি মনে করতে পারি ? স্বাভাবিক অনুমানটা এই হবে যে, 'সব কিছুই' সন্দেহজনক। এটা সত্য হতে পারে, কিন্তু সন্দেহপূর্ণতার মাত্রাভেদ আছে, এবং আমরা জানতে চাইব, ন্যূনতম সন্দেহপূর্ণতার ক্ষেত্র প্রসঙ্গে এ দু'জন দার্শনিকের কোন একজন যদি অভ্রান্ত হন তাহলে তিনি কে ?

ডেকার্টের অভিমতের পরীক্ষা নিয়েই আরম্ভ করা যাক। তিনি বলেন, "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি", কিন্তু কথাটা যে রকম আছে তাতে চলবে না। তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকেই, তিনি যা জানেন বলে তাঁর দাবী (profess) করা উচিত, সেটা "আমি চিন্তা করি" নয় ; সেটা বরং "চিন্তন আছে"।[১] তিনি দেখতে পান যে, সন্দেহ এগিয়েই চলেছে, এবং বলেন : সন্দেহ আছে। সন্দেহ এক রকমের চিন্তা, সুতরাং চিন্তা আছে। এটাকে "আমি চিন্তা করি"-তে অনুবাদ করার মধ্যে এমন অনেক-কিছু ধরে নেওয়া হয় যাকে সংশয়বাদের পূর্ববর্তী অনুশীলনের ফলে ডেকার্টের সন্দেহ করা উচিত ছিল। তিনি বলবেন যে, চিন্তাগুলো একজন চিন্তাকারীর ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু কেন তারা সেটা করবে ? কেন চিন্তাকারী কেবলমাত্র কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত চিন্তার একটা অনুক্রম (series) হবে না ? মানসিক এবং জড় উভয় জগতেই ডেকার্ট 'পদার্থে' (substance) বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, গতিশীল কিছু-

১. ..."there is thinking."

একটা না থাকলে গতি থাকতে পারতো না, এবং কেউ চিন্তা না করলে চিন্তা থাকতে পারতো না। সন্দেহ নেই যে, এখন পর্যন্ত অধিকাংশ লোক এ মত পোষণ করবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর উৎস হচ্ছে এই—সচরাচর অবচেতন—ধারণা যে, ব্যাকরণের ক্যাটেগরিগুলো (categories) বাস্তবতারও ক্যাটেগরি। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে, 'জড়' কতকগুলো ঘটনাপুঞ্জের শৃঙ্খলের একটা নাম মাত্র। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, আমরা যাকে জড়ের গতি বলি তার অর্থ এই যে, কোন এক সময়ে এ জাতীয় কোন ঘটনাপুঞ্জের কেন্দ্রের অন্য ঘটনাগুলোর সঙ্গে যে দৈশিক সম্বন্ধ থাকে, অন্য সময়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট অন্য ঘটনাগুলোর সঙ্গে সেই একই সম্বন্ধ থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে, কোন একটা নির্দিষ্ট সত্তা—অর্থাৎ, এক খণ্ড জড়—আছে, যা এখন এক জায়গায় এবং তখন অন্য জায়গায়। একইভাবে, আমরা যখন বলি, "আমি প্রথমে এটা চিন্তা করি এবং তারপর ওটা," তখন আমাদের এটা বোঝানো উচিত নয় যে, 'আমি' নামক একটা একক সত্তা আছে যার দুটো আনুক্রমিক (successive) চিন্তা 'আছে' ('has')। আমাদের কেবল এই বোঝানো উচিত যে, দুটো আনুক্রমিক চিন্তা আছে যাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকার দরুন আমরা বলি যে, কতকগুলো আনুক্রমিক সুর যেভাবে একটা ঐকতানের অংশ হয় সেভাবে তারাও একটা জীবনীর অংশ, এবং এ চিন্তা দুটো দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত—যে দেহ সেইভাবে (যে বিষয়ে পরে আরও অনুসন্ধান চালানো হবে) কথা বলছে যেভাবে চিন্তা এবং দেহ সম্বন্ধযুক্ত হয়। এর সবটাই বরং একটা জটিল ব্যাপার, এবং একে কোন চরম নিশ্চয়তার অংশ বলে স্বীকার করা যায় না। ডেকার্ট যে বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত বোধ করেছিলেন সেটা ছিল একটা ঘটনা, যাকে তিনি "আমি চিন্তা করি" শব্দগুলোর দ্বারা বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু শব্দগুলো ঘটনাটার কোন সম্পূর্ণ নির্ভুল প্রতিবেদন (representation) ছিল না; বস্তুতঃ, কতকগুলো ব্যাকরণিক এবং সামাজিক আবশ্যকতার হাত থেকে শব্দ কখনই মুক্ত থাকতে পারে না, যার ফলে আমরা যা প্রকৃত পক্ষে বোঝাই তারা একই সঙ্গে তার চেয়ে বেশী ও কম বলে। আমি মনে করি যে, এমন একটা ঘটনা যে ছিল, যার সম্পর্কে সংশয় ছিল অসম্ভব, সে বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করার ব্যাপারে ডেকার্টের মধ্যে কোন অযৌক্তিকতা ছিল না;

কিন্তু এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে 'আমি' শব্দটা আনা তাঁর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয়নি, এবং 'চিন্তা করি' ('think') শব্দটা আনা তাঁর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল কিনা তা এখনও বিবেচনা করা হয়নি।

যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'চিন্তা করি'-র মতো কোন সাধারণ শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে স্পষ্টতঃই আমরা উপাত্তের বাইরে চলে যাচ্ছি। একটা শিরোনামের নীচে একটা বিশেষ ঘটনাকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি, এবং শিরোনামটা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। এখন, সব শব্দই বহু ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; সুতরাং সব শব্দই যে-কোন সম্ভাব্য উপাত্তের বাইরে চলে যায়। এ অর্থে, কোন মূর্ত অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব (particularity) শব্দের মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব নয়; সমস্ত শব্দই অল্প-বিস্তর অমূর্ত। এটা অন্ততঃ একটা আপাতসিদ্ধ যুক্তির ধারা, কিন্তু এটা যে বৈধ সে বিষয়ে আমি মোটেই নিশ্চিত নই। উদাহরণ স্বরূপ, কোন বিশেষ কুকুর দেখতে পেলে মার মুখে 'কুকুর' নামক সাধারণ শব্দটা চলে আসতে পারে; তখন আপনি জানেন যে এটা একটা কুকুর, কিন্তু এটা কি রকমের কুকুর, তা আপনি ক্ষ্য নাও করতে পারেন। এ অর্থে, যে জ্ঞান নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু রি তা অমূর্ত ও সাধারণ; অর্থাৎ, কোন এক ধরনের উদ্দীপকের উত্তরে শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই এ তৈরী। যে পরিমাণে এ প্রতিক্রিয়াগুলো শাব্দিক, অন্ততঃ সেই পরিমাণে প্রতিক্রিয়াগুলো উদ্দীপকগুলোর চেয়ে নিয়মান্-ী। কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে "আপনি কি একটা কুর দেখেছিলেন?" "হ্যাঁ।" "কি রকমের কুকুর?" "আহা—সেরেফ একটা সাধারণ কুকুর; তার সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী আর কিছু আমার মনে পড়ে অর্থাৎ, সাক্ষীর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কেবল 'কুকুর' নামক সাধারণীকৃত শব্দটা আছে, আর কিছু নেই। পরমাণুর মধ্যবর্তী কোয়াণ্টাম ঘটনাবলী আয় মনে পড়ে যাচ্ছে। আলো যখন কোন উদযান পরমাণুর উপর পড়ে খন তার ফলে ইলেকট্রনটা প্রথম কক্ষপথ থেকে দ্বিতীয়, অথবা তৃতীয়, ত্যাদি কক্ষপথে লাফিয়ে পড়তে পারে। এদের প্রত্যেকটাই এমন একটা দ্দীপকের প্রতি একটা সাধারণীকৃত প্রতিক্রিয়া যার অনুরূপ কোন সাধারণত্ব (generality) নেই। সুতরাং কুকুর ও বিড়ালের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ষ্টাবলী (peculiarities) আছে, কিন্তু সাধারণ অপর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তি—

'কুকুর' অথবা 'বিড়াল' এ দুটো সাধারণীকৃত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে প্রতিবেদন করে, এবং উদ্দীপকের বিশেষত্ব থেকে জ্ঞান-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন অনুরূপ বিশেষত্বের উদয় হয় না।

ডেকার্ট এবং তাঁর চিন্তনের কাছে ফিরে যাওয়া যাক: এইমাত্র আমরা যা বললাম সে অনুসারে এটা সম্ভব যে, ডেকার্ট কি সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন সে বিষয়ের চেয়ে তিনি যে চিন্তা করছিলেন সেটা তিনি অধিকতর নিশ্চয়তার সঙ্গে জানতেন। এ সম্ভাবনা থেকে এটা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, 'চিন্তন'-এর (thinking) দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছিলেন তা আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। এবং যেহেতু তাঁর পক্ষে চিন্তনই ছিল মৌলিক (primitive) নিশ্চয়তা, সুতরাং কোন বাহ্য উদ্দীপকের অবতারণা আমরা করতে পারি না, কারণ কোন বাহ্য জিনিস আছে কিনা এ সন্দেহ পোষণ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেছিলেন।

'চিন্তন' কথাটাকে আজকাল আমাদের পক্ষে সাধারণতঃ যে ভাবে ব্যবহার করা উচিত, ডেকার্ট তার চেয়ে কিছুটা ব্যাপকতর অর্থে সেটাকে ব্যবহার করেছিলেন। যেগুলোকে 'বৌদ্ধিক' প্রক্রিয়া বলা হয় কেবল সেগুলোকে নয়—সকল প্রত্যক্ষ, আবেগ, এবং ইচ্ছা তিনি তার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষণের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করলে আমাদের সুবিধা হবে। ডেকার্ট বলতে পারতেন যে, যখন তিনি 'চাঁদ দেখেন,' তখন বহিঃস্থ বস্তুটা সম্পর্কে তিনি যতটুকু নিশ্চিত তাঁর দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষ সম্পর্কে তিনি তার চেয়ে বেশী নিশ্চিত। আমরা যেমন দেখেছি, পদার্থবিদ্যা ও শরীরতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এ মনোভাব যুক্তিসঙ্গত, কারণ মস্তিষ্কের ভেতরকার কোন বিশেষ (given) ঘটনার নানা রকমের কারণ থাকতে পারে, এবং যেখানে কারণটা অসাধারণ (unusual) সেখানে কাণ্ডজ্ঞান বিভ্রান্ত হবে। চন্দ্র থেকে আগত আলো যে ভাবে অক্ষিস্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করে ঠিক সেইভাবে কৃত্রিম উপায়ে তাকে উদ্দীপ্ত করা তত্ত্বগতভাবে সম্ভব; এ ক্ষেত্রে আমরা যখন চাঁদ দেখি তখন আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় সেই একই অভিজ্ঞতা আমাদের হবে, কিন্তু এর বহিঃস্থ উৎসের ব্যাপারে আমরা প্রতারিত হব। একজন প্রতারক অপদেবতার সম্ভাব্যতার কথা যখন ডেকার্ট তুললেন তখন এ জাতীয় একটা যুক্তির প্রভাবই তাঁর উপর পড়েছিল। সুতরাং প্রত্যক্ষণের কারণ সম্পর্কে যুক্তি-চিন্তার পর যা অবশিষ্ট

রইল তার সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত বোধ করলেন, শুরুতে যে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত বোধ করেছিলেন সে সম্পর্কে নয়। এইভাবে আমরা একটা পার্থক্যের কাছে এসে পড়েছি যা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যার প্রয়োগ কঠিন কাজ; এটা হচ্ছে, আমরা যাকে বস্তুতঃ সন্দেহ করি না এবং সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী হলে আমরা যাকে সন্দেহ করতাম না তার মধ্যবর্তী পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে সূর্য ও চন্দ্রের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলি না, যদিও সম্ভবতঃ দীর্ঘ দিন কার্টেজীয় (Cartesian) সন্দেহের অনুশীলন করলে আমরা নিজেদেরকে তা করতে শেখাতে পারতাম। কিন্তু তথাপি, ডেকার্টের মতানুসারে, আমরা যে সব অভিজ্ঞতাকে এ পর্যন্ত "সূর্য দেখা" এবং "চন্দ্র দেখা" বলেছি, সেগুলোকে সন্দেহ করতে পারতাম না, যদিও এ অভিজ্ঞতাগুলোর নির্ভুল বর্ণনা দিতে হলে আমাদের পক্ষে ভিন্ন শব্দ আবশ্যক হতো।

প্রশ্ন ওঠেঃ কেন আমরা সব কিছুতেই সন্দেহ করবো না? কেন আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকবো যে, এ অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের হয়? কোন প্রতারক অপদেবতা কি নিরন্তর আমাদেরকে মিথ্যা স্মৃতি যোগাতে পারেন না? আমরা যখন বলি "এক মুহূর্ত আগে সেই অভিজ্ঞতাটা আমার হয়েছিল যাকে আমি এ পর্যন্ত সূর্য দেখা বলেছি", তখন সম্ভবতঃ আমরা প্রতারিত হই। স্বপ্নে আমরা প্রায়ই এমন-সব জিনিস স্মরণ করি যেগুলো কখনো ঘটেনি। সুতরাং, এমন-কি আধ মিনিট আগে যা ঘটেছে তার সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত হতে পারিনে; বড় জোর আমরা আমাদের বর্তমান ক্ষণিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তা পারি। এবং কোন দর্শনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার মত করে আমাদের কোন ক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে সুনির্দিষ্ট করার আগেই সেটা অতীত, এবং সেজন্য অনিশ্চিত, হয়ে যাবে। ডেকার্ট যখন বলেছিলেন "আমি চিন্তা করি", তখন তিনি হয়তো নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন; কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি বললেন "সুতরাং আমি আছি" সে মুহূর্তে তিনি নির্ভর করছিলেন স্মৃতির উপর, এবং হয়তো প্রতারিত হয়েছিলেন। এ যুক্তিধারা প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই পরিপূর্ণ সংশয়বাদে পৌঁছে। এ ধরনের ফলাফল যদি আমরা এড়াতে চাই তাহলে আমাদেরকে কোন একটা অভিনব নীতি (principle) খুঁজে পেতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, হরেক রকমের জিনিস সম্পর্কে নিশ্চয়তার অনুভূতি নিয়েই

আমরা যাত্রা শুরু করি, এবং কেবল যেখানে কোন সুনির্দিষ্ট যুক্তি আমাদেরকে নিঃসংশয় করেছে যে, এ অনুভূতি আমাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে, সেখানেই এ অনুভূতি আমরা বর্জন করি। যখন আমরা প্রাথমিক (primitive) নিশ্চয়তার এমন কোন শ্রেণীর সন্ধান পাই যা কখনও বিভ্রান্ত করে না, তখন সেই শ্রেণী সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস আমরা টিকিয়ে রাখি। অর্থাৎ, যেখানেই আমরা প্রারম্ভিক নিশ্চয়তা অনুভব করি, সেখানে সন্দেহ করার জন্য আমাদের কোন একটা যুক্তির আবশ্যক হয়, বিশ্বাস করার জন্য আবশ্যক হয় না। সুতরাং, আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে, আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে বলে দেখানো যায় না এমন যে-কোন শ্রেণীর মৌলিক নিশ্চয়তাগুলোকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ডেকার্ট তাই করেন, যদিও নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিষ্কার নয়।

অধিকন্তু, পূর্বে আমরা নিশ্চিত ছিলাম এমন-কিছুর মধ্যে আমরা যখন কোন ভ্রান্তি খুঁজে পাই তখন সচরাচর যে বিশ্বাস আমাদের বিভ্রান্ত করে তাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করি না; বরং যদি পারি তাহলে আমরা সেটাকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে চাই, যেন তাকে আর সুস্পষ্টরূপে (demonstrably) মিথ্যা বলে মনে হয় না। প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। যখন আমরা মনে করি যে, আমরা একটা বাহ্য বস্তু দেখছি, তখন নানাবিধ কারণ দ্বারা প্রতারিত হতে পারি। সেখানে একটা মরিচীকা বা প্রতিফলন থাকতে পারে; এ ক্ষেত্রে বিভ্রমের উৎসটা বাহ্য জগতে, এবং কোন আলোকচিত্রের পর্দা একইভাবে প্রতারিত হত। যে উদ্দীপক আমাদেরকে "তারা দেখায়," চোখের উপর সে ধরনের কোন উদ্দীপক ক্রিয়া করতে পারে, অথবা পীড়াগ্রস্ত যকৃতের দরুন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো বিন্দু দেখতে পারি, যে ক্ষেত্রে ভুলের উৎসটা দেহের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে নয়। আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি, যার মধ্যে আমরা হরেক রকমের জিনিস দেখছি বলে মনে করি; এ ক্ষেত্রে ভ্রান্তির উৎসটা মস্তিষ্কের ভেতর। কালক্রমে ভ্রান্তির এসব সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করার ফলে লোকেরা তাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়ীগত তাৎপর্যের ব্যাপারে কতকটা সতর্ক হয়ে উঠেছে; কিন্তু যে-সব প্রত্যক্ষণ তাদের ঘটেছিল বলে তারা মনে করেছিল সেগুলো যে সত্যি ঘটেছিল সে বিষয়ে তারা নিঃসংশয় থেকে গেছে, যদিও কখনও কখনও তাদের

[কা]ণ্ডজ্ঞান-লব্ধ ব্যাখ্যাটা ভ্রান্ত। এইভাবে তারা যে 'কিছু-একটা'র ব্যাপারে [নিশ্চিত সে বিষয়ে নিঃসংশয় থাকার সঙ্গে সঙ্গে, তারা যে কি সম্পর্কে নিশ্চিত সে বিষয়ে ধীরে ধীরে তাদের মত তারা পরিবর্তিত করেছে। আমাদের যে-সব প্রত্যক্ষণ ঘটে বলে আমরা চিন্তা করি সেগুলো সত্যিই ঘটে—এমতটা যে ভ্রান্ত, আমাদের জানা কোন কিছুর মধ্যে তা দেখাবার প্রবণতা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্য কোন কিছুর চিহ্ন বলে ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে আমরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিই। 'চিন্তা' যে বাহ্য বস্তুর চেয়ে [বেশী] নিশ্চিত, ডেকার্টের এ মতের এটাই হচ্ছে বৈধ (valid) ভিত্তি। আমরা সচরাচর যে-সব অভিজ্ঞতাকে বস্তুর প্রত্যক্ষ (percepts) বলে বিবেচনা করি, 'চিন্তা'র দ্বারা যখন সেগুলো বোঝানো হয়, তখন এটুকু পর্যন্ত ডেকার্টের মত গ্রহণ করার সঙ্গত কারণ আছে।

এবার ওয়াটসনের মতে আসা যাক। যদি আমার ভুল না হয় তো আমরা দেখবো যে, তাঁর অভিমতও বহুল পরিমাণে বৈধ। যদি তাই হয়, তাহলে এই উভয় প্রবক্তার মতামতের মধ্যে যা বৈধ বলে মনে হয় তাকে গ্রহণ করে এবং যাকে সন্দেহজনক বলে মনে হয় তাকে বর্জন করে আমরা একটা মধ্যপন্থী (intermediate) অভিমতে পৌঁছার চেষ্টা করবো।

সব চেয়ে যা নিশ্চিত সে বিষয়ে ওয়াটসনের অভিমত কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমস্ত মনোবৈজ্ঞানিক বিষয়কে সাধারণ লোকে কম-বেশী সংশয়যোগ্য বলে মনে করে; কিন্তু তার কার্যালয়, তার ভোরের ট্রেন, তার কর আদায়কারী, আবহাওয়া এবং এ জীবনের অন্যান্য সুখবস্তুর (blessings) ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। কোন লোক যখন [জীবন] একটা স্বপ্ন, এ ধারণা নিয়ে খেলা করতে থাকে, অথবা ট্রেনের ভেতর-[কা]র লোকের চিন্তাগুলো ট্রেনের চেয়েও বেশী বাস্তব বলে ইঙ্গিত করে, [তখ]ন কোন অলস মুহূর্তে সে-কথা শুনে সে আমোদ পেতে পারে। কিন্তু সে [য]দি কোন দার্শনিক প্রভাষক[১] না হয়, তাহলে কাজ করার সময়গুলোতে [এ] ধরনের ধারণা সে সমর্থন করে না। কে এমন কেরাণীর কথা কল্পনা [ক]রতে পারে, যে তার কার্যালয়ে তার কর্মকর্তার (boss) অস্তিত্ব সম্পর্কে

১ Philosophical lecturer.

পরাজাগতিক সন্দেহ পোষণ করে? তাঁর রেলপথ কেবল অংশীদারদের মনের ভেতরকার একটা ধারণা মাত্র—কোন রেলপথ প্রেসিডেন্ট কি এ তত্ত্ব সমবেদনা সহকারে বিবেচনা করবেন? তিনি বলবেন যে, যদিও প্রায়ই এ ধরনের অভিমত স্বর্ণখনির ক্ষেত্রে অভ্রান্ত, তথাপি রেলপথের কথা যখন ওঠে, তখন তা নেহাৎ আহাম্মকি মাত্র: যে-কোন লোক এটাকে দেখতে পায়, এবং রেল-লাইনগুলোর অস্তিত্ব নেই, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সে যদি তাদের উপরে ঘোরাফেরা করে তাহলে সে চাপা পড়তে পারে। জড়ের অবাস্তবতায় বিশ্বাস অকালমৃত্যুর কারণ হতে পারে, এবং সম্ভবতঃ সেটাই এ বিশ্বাসের বিরল অস্তিত্বের কারণ, যেহেতু যারা এ বিশ্বাস পোষণ করেছিল তাদের মৃত্যু ঘটেছে। কাণ্ডজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা নিছক নির্বুদ্ধিতা বলে উড়িয়ে দিতে পারি না, যেহেতু দৈনন্দিন জীবনে এর থেকে সাফল্য আসে; যদি আমরা একে অংশতঃ বর্জন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যে, ব্যবহারিক সমস্যা মোকাবিলা করার উপায় হিসাবে সমপরিমাণে মজবুত কিছু-একটার খাতিরেই আমরা তা করছি।

ডেকার্ট বলেন: আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি। ওয়াটসন বলেন গোলকধাঁধায় ইঁদুর আছে, সুতরাং আমি চিন্তা করি না। অন্ততঃ কোন লালিকা-রচয়িতা এভাবে তাঁর দর্শনের সার-সংক্ষেপ দিতে পারতেন। ওয়াটসন আসলে যা বলেন তা অপেক্ষাকৃত বেশী সঠিক অর্থে এরই মতো: (১) সবচেয়ে নিশ্চিত সত্য হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো প্রত্যক্ষ (public) এবং কিছু-সংখ্যক পর্যবেক্ষকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যাদের প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এ ধরনের সত্যগুলোই হচ্ছে পদার্থিক বিজ্ঞান সমূহের ভিত্তি: আলোচ্য বিষয়ে যেগুলো প্রাসঙ্গিক সেগুলোকে উল্লেখ করতে গেলে আমরা উল্লেখ করবো পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, শরীরবিদ্যা। (২) মানুষের আচরণ সম্পর্কে যে সব সত্য প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণযোগ্য, পদার্থিক বিজ্ঞানগুলো তাদের সকলেরই একটা ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। মানুষ সম্পর্কে, কেবল অন্য কোন ভাবে জানা সম্ভব, এমন কোন সত্য আছে মনে করার কোন কারণ নেই। (৪) বিশেষতঃ অন্যের প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে নীতিগতভাবে অনাবিষ্কারযোগ্য বিষয়গুলোকে আত্মনিরীক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করার উপায় হিসাবে 'অন্তর্দর্শন' (introspection) একটা স্বর্গ

কুসংস্কার, যাকে ধুয়ে-মুছে ফেলে না দিলে মানুষ সম্পর্কে কোন সত্যিকার নির্ভুল জ্ঞান সম্ভব হবে না। (৫) এবং তার অনুসিদ্ধান্তস্বরূপ—বচন এবং অন্যান্য দৈহিক আচরণের বিরুদ্ধ একটা-কিছু হিসাবে 'চিন্তা'র অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

উপরের যুক্তিবাক্যগুলোকে পৃথক রাখা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি তাদেরকে সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করেছি। মোটের উপর, আমার কাছে (১), (২), এবং (৩) সত্য বলে মনে হয়, কিন্তু (৪) এবং (৫) আমার কাছে মনে হয় মিথ্যা। আমি মনে করি যে, (৪) এবং (৫)-কে (১), (২), এবং (৩) থেকে অনুমান করা যায়, এরূপ চিন্তা করার প্রবণতা আচরণবাদীদের আছে; কিন্তু যে সব কথাকে আমি পদার্থবিদ্যার ভিত্তি সম্পর্কিত ভ্রান্তি বলে মনে করি সেগুলোকেই আমি এ অভিমতের উৎস বলে মনে করি। সেজন্যেই আত্ম-নিরীক্ষণ সম্পর্কিত এ প্রশ্নের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে পদার্থবিদ্যার আলোচনা আবশ্যক হয়েছিল। কিন্তু উপরের যুক্তিবাক্যগুলোকে এক-এক করে পরীক্ষা করা যাক।

(১) এটা সত্য যে, যে সব সত্যের (facts) উপর পদার্থিক বিজ্ঞানগুলো প্রতিষ্ঠিত তাদের সবগুলোই এ অর্থে প্রকাশ্য (public) যে, বহু লোকে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে। কোন ঘটনার আলোকচিত্র নেওয়া হলে যে-কোন সংখ্যক মানুষ সে আলোকচিত্রটাকে পরীক্ষা করতে পারে। যদি [কোন কিছুর] কোন পরিমাপ নেওয়া হয়, তাহলে সেখানে যে কেবল জনাকতক লোক উপস্থিত থাকতে পারে তা নয়, বরং অন্যরাও পরীক্ষণটার পুনরাবৃতি করতে পারে। যদি ফলাফল থেকে প্রথম নিরীক্ষকের ধারণা প্রমাণিত না হয় তাহলে গৃহীত সত্যটাকে বর্জন করা হয়। পদার্থিক সত্য-গুলোর প্রকাশ্যতাকে (publicity) সর্বদাই পদার্থবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোর অন্যতম বলে বিচার করা হয়। সুতরাং কাণ্ডজ্ঞানের ভিত্তিতে, যে যুক্তি-বাক্যগুলোর মধ্যে আমরা আচরণবাদী দর্শনকে সংক্ষেপিত করেছি তাদের প্রথমটাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

তবে এমন কতকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত (provisos) আছে যেগুলোর উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমতঃ, আশা করা হয় যে, কোন বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষক কোন অবস্থার উপর তাঁর প্রতিক্রিয়ার সমগ্রটাকে লক্ষ্য করবেন না; তিনি

কেবল তার সেই অংশটা লক্ষ্য করবেন, অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যাকে 'বিষয়-গত', (objective) অর্থাৎ অন্য যে-কোন সুযোগ্য নিরীক্ষকের প্রতিক্রিয়া থেকে অভিন্ন বলে বিবেচনা করেন। আমরা যেমন দেখেছি, আমাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কেবল 'বিষয়গত' দিকগুলো লক্ষ্য করতে শেখার এ প্রক্রিয়াটা শৈশবেই আরম্ভ হয়; বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যা বিশেষভাবে তাঁর স্বকীয়, কোন 'ভাল' পর্যবেক্ষক তার উল্লেখ করেন না। তিনি বলেন নাঃ "একটা ক্লান্তিকর আলোকবিন্দু আমার চোখের শ্রান্তি এবং বিরক্তি উৎপাদন করে চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছিল; শেষ পর্যন্ত এই-এই রকম একটা বিন্দুতে তা স্থিরতা লাভ করে।" তিনি কেবল বলেনঃ "পড়াটা (reading) এই-এই রকম ছিল।" এই বিষয়মূলকতার সবটুকুই প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফল। বস্তুতঃ, কেউ বলতে পারে যে কোন বৈজ্ঞানিক অবস্থার উপর অতি অল্প লোকেরই 'সঠিক' প্রতিক্রিয়া ঘটে। সুতরাং বিজ্ঞানে যাকে বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ বলে মনে করা হয়, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ তত্ত্ব এসে মিশে যায়। এ তত্ত্বের প্রকৃতি ও প্রমাণ অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

দ্বিতীয়তঃ পদার্থিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যতার (publicity) প্রকৃতির কোন ভুল ব্যাখ্যা আমরা অবশ্যই দেব না। কতিপয় লোক কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে খুব কাছাকাছি ধরনের প্রতিক্রিয়া করে—প্রকাশ্যতাটা এ সত্যের মধ্যেই নিহিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক যে, বারোজন লোককে বলা হলো এমন একটা পর্দা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে, যার উপর একটা উজ্জ্বল আলো এসে পড়বে, এবং সেটা যখন এসে পড়ে তখন "এখন" বলতে। ধরা যাক যে, পরীক্ষক নিজে যখন আলোটা দেখেন ঠিক তখনই তিনি তাদের সকলের কথা শুনতে পান; তখন তাদের প্রত্যেকের উদ্দীপকই যে তাঁর উদ্দীপকের অনুরূপ হয়েছে তা বিশ্বাস করার পক্ষে তাঁর উপযুক্ত কারণ আছে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা আমাদেরকে এটা মনে করতে বাধ্য করে যে, তাদের বারোটা পৃথক উদ্দীপক ছিল, যে-কারণে আমরা যখন বলি যে, তারা সকলেই একই আলো দেখেছে তখন যুক্তিসঙ্গতভাবে আমরা কেবল এই বোঝাতে পারি যে,

Scientific situation.

তাদের বারোটা উদ্দীপকের একটা সাধারণ কারণিক (causal) উৎস ছিল। আমাদের প্রত্যক্ষণগুলোকে যখন আমরা আমাদের বাইরে অবস্থিত কোন স্বাভাবিক কারণিক উৎসে আরোপ করি তখন আমরা ভুল করার ঝুঁকি নিই, যেহেতু উৎসটা অসাধারণ (unusual): চোখে পৌঁছানোর পথে প্রতিফলন অথবা প্রতিসরণ ঘটতে পারে, চোখ অথবা মস্তিষ্কের কোন অস্বাভাবিক (unusual) অবস্থা থাকতে পারে। এ সমস্ত বিবেচনা থেকে এই সামান্য সম্ভাব্যতাটুকু বেরিয়ে আসে যে, কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, আমরা যে-রকম মনে করি সে-রকম কোন বহিঃস্থ কারণ নেই। তবে, যদি কিছু-সংখ্যক লোক আমাদের সঙ্গে একমত হয়—অর্থাৎ, একই সঙ্গে তাদের এমন-সব প্রতিক্রিয়া হয় যেগুলোকে তারা এমন একটা বহিঃস্থ কারণে আরোপ করে থাকে, আমরা যে কারণ অনুমান করেছিলাম, তার সঙ্গে একীভূত করা যায়—তাহলে ভুলের সম্ভাব্যতা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পায়। ঠিক এটাই হচ্ছে যুগপৎ প্রমাণের[1] সাধারণ দৃষ্টান্ত। যদি এমন বারোজন লোক, যাদের প্রত্যেকেই কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, কোন একটা ঘটনা ঘটেছে, তাহলে তাদের সকলের সত্য বলার পক্ষে সম্ভাবনার অনুপাত হচ্ছে ১-এর বিপরীতে ৪০৯৫। একই ধরনের যুক্তি থেকে দেখা যায় যে, যখন আমাদের প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়গুলোর সপক্ষে অন্যের কাছ থেকে দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন, যেসব ক্ষেত্রে মরীচিকা অথবা নির্দেশের[2] মতো সামষ্টিক অধ্যাসের (collective illusion) উৎস আছে সে সব ক্ষেত্র ছাড়া, ইন্দ্রিয়গুলো সম্ভবতঃ সত্য বলছে।

তবে, এদিক থেকে, বাহ্য নিরীক্ষণের বিষয়াদি এবং আত্ম-নিরীক্ষণের বিষয়াদির মধ্যে কোন 'মূলগত' (essential) পার্থক্য নেই। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আপনি জীবনে প্রথম বারের মতো হিঙ্ শুঁকছেন। নিজের কাছে আপনি বলছেন "ওটা একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর গন্ধ।" এখন, অপ্রীতিকরতা একটা আত্মনিরীক্ষণের ব্যাপার। অন্যের মধ্যে যেসব শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায় তাদের সঙ্গে এর 'অনুবন্ধ' স্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই অবস্থাগুলো থেকে অভিন্ন নয়, কারণ সুখ এবং তার উল্টোটার

---

১. Concurrent testimony.
২. Mirage or suggestion.

সঙ্গে যে সব শরীরবৃত্তীয় অবস্থা সহগামী তাদের সম্পর্কে জানার আগেই লোকে জানতো যে, বস্তু প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর। সুতরাং আপনি যখন বলেন "ওই গন্ধটা অপ্রীতিকর" তখন আপনি একটা-কিছু লক্ষ্য করছেন যা সাধারণ ধারণায় পদার্থবিদ্যার যে জগৎ তার মধ্যে পড়ে না। তবে আপনি মনোবিশ্লেষণের ছাত্র, এবং আপনি শিখেছেন যে কখনও কখনও ঘৃণা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন ভালবাসা এবং ভালবাসা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন ঘৃণা। সুতরাং আপনি নিজেকে বলেন: "সম্ভবতঃ আমি প্রকৃতপক্ষে হিঙের গন্ধ পছন্দ করি, কিন্তু তাকে পছন্দ করতে আমার লজ্জাবোধ হয়।" কাজেই আপনি আপনার বন্ধুবর্গকে এর গন্ধ শুঁকতে প্রযোজিত করেন, এবং তার ফল এই হয় যে অচিরেই আপনার আর কোন বন্ধু থাকে না। তখন আপনি শিশুদের উপর পরীক্ষা চালান, এবং শেষ পর্যন্ত শিম্পাঞ্জীর উপর। বন্ধু এবং শিশুরা কথার মাধ্যমে তাদের বিরাগ প্রকাশ করে; শিম্পাঞ্জীরাও প্রকাশ করে, যদিও শব্দের মাধ্যমে নয়। এসব বিষয় থেকে আপনি এই বলতে চান: "হিঙের গন্ধ অপ্রীতিকর।" যদিও এর মধ্যে আত্মনিরীক্ষণ আছে, তথাপি যেসব সত্য পদার্থবিদ্যার অভিজ্ঞতালব্ধ ভিত্তি রচনা করে, এ সিদ্ধান্ত তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে এর যে রকমের নিশ্চয়তা এবং যে রকমের বিষয়গত প্রমাণ থাকতো, ঠিক সেই রকমের নিশ্চয়তা ও প্রমাণ এর আছে।

(২) দ্বিতীয় যুক্তিবাক্যটার বক্তব্য এই যে, পদার্থিক বিজ্ঞানগুলো মানুষের আচরণ সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে (publicly) নিরীক্ষণযোগ্য সমুদয় সত্যের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। সহজ-সরল সত্য কথাটা এই যে, আমরা এখনও জানিনা এটা সত্য না মিথ্যা। সাধারণ বৈজ্ঞানিক কারণে এর সপক্ষে অনেক কিছু বলবার আছে, বিশেষতঃ যদি একে কোন মতবাদ (dogma) হিসাবে উপস্থিত না করে একটা পদ্ধতিগত উপদেশ হিসাবে, যে পথে বৈজ্ঞানিক গবেষকদেরকে তাঁদের সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজতে হবে সে পথ সম্পর্কে একটা সুপারিশ হিসাবে, উপস্থিত করা হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পদার্থিক নিয়মাবলীর সাহায্যে মানুষের আচরণের অনেকখানি অব্যাখ্যাত থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ নির্বিচারভাবে আমরা বলতে পারি না যে, কোন পরিশিষ্ট (residue) নেই যাকে এ পদ্ধতির সাহায্যে তত্ত্বগতভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আমরা বলতে পারি যে, এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের গতিধারা এ-রকম

একটা মতকে অসম্ভাব্য করে রেখেছে বলে মনে হয়; কিন্তু এমনকি এ-টুকু বলাও সম্ভবতঃ হঠকারিতার পরিচায়ক, যদিও আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি এটা বলা আরও বেশী হঠকারিতার পরিচায়ক বলে মনে করবো যে, এ রকম একটা পরিশিষ্ট নিশ্চয়ই আছে। কাজেই যুক্তির খাতিরে আমি এ বিষয়ের উপর আচরণবাদী অভিমত গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি, যেহেতু কোন চরম দর্শন হিসাবে আচরণবাদীর বিরুদ্ধে আমার আপত্তিগুলো আসে সম্পূর্ণ ভিন্ন কতকগুলো বিবেচনা থেকে।

(৩) এখন যে যুক্তিবাক্যটা আমাদের পরীক্ষা করতে হচ্ছে, তাকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়: "মানুষ সম্পর্কে যে-সব সত্য কথা জানা যায় তাদেরকে সেই একই পদ্ধতিতে জানা যায়, যে পদ্ধতিতে পদার্থবিদ্যার সত্যগুলো জানা যায়।" এটাকে আমি সত্য বলে মনে করি, কিন্তু আচরণবাদী যে কারণ দ্বারা প্রভাবিত হন আমার কারণটা ঠিক তার বিপরীত। আমি মনে করি যে, মনোবিজ্ঞানের সত্যগুলোর মতো পদার্থবিদ্যার সত্যগুলোও তারই মাধ্যমে পাওয়া যায় যা আসলে আত্মনিরীক্ষণ, যদিও কাণ্ডজ্ঞান ভুল ক'রে মনে করে যে, সেটা বাহ্য বস্তুর নিরীক্ষণ। ১৩শ অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছিলাম, আপনার দৃষ্টিগত, শ্রুতিগত, এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষগুলোর সবই পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার মাথার ভেতর। সুতরাং, আপনি যখন "সূর্য দেখেন", তখন, সঠিকভাবে বলতে গেলে, আপনি যা জানছেন তা আপনারই ভেতরকার একটা ঘটনা: বাহ্য কারণের অনুমানটা অল্প-বিস্তর অনিশ্চিত, এবং কখনও কখনও তা ভ্রান্তও। হিঙের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলা যায়: হিঙের গন্ধ যে অপ্রীতিকর তা আপনি জানেন কতকগুলো আত্মনিরীক্ষণের মাধ্যমে, এবং সূর্য যে উজ্জ্বল ও উষ্ণ তাও আপনি জানেন কতিপয় আত্মনিরীক্ষণের মাধ্যমে। এই দু'ক্ষেত্রের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কেউ বলতে পারে যে, যে-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপাত্তগুলো ওই-সব ব্যক্তিগত (private) সত্য, দেহ-বহিঃস্থ সত্যগুলোর সঙ্গে যাদের খুব প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই, সে-ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যার উপাত্তগুলো সেই-সব ব্যক্তিগত সত্য দেহ বহিঃস্থ সত্যগুলোর সঙ্গে যাদের খুব প্রত্যক্ষ একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কাজেই পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের একই পদ্ধতি; কিন্তু যাকে পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি বলে মনে করা হয় তার চেয়ে যাকে

সচরাচর মনোবিজ্ঞানের বিশেষ পদ্ধতি বলে ধরা হয়, এ বরং তা-ই। আচরণবাদী থেকে আমাদের পার্থক্য এই যে, পদার্থবিদ্যার পদ্ধতিকে আমরা বরং মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করি, তার উল্টোটা না করে।

(৪) 'আত্মনিরীক্ষণে'র কাছে যাঁরা আবেদন জানান তাঁরা জ্ঞানের যে উৎসে বিশ্বাস করেন সে রকম কোন উৎস আছে কি? আমরা এইমাত্র যা বলছিলাম সে অনুসারে, সমস্ত জ্ঞান এমন একটা-কিছুর উপর নির্ভর করে যাকে, কোন এক অর্থে, 'আত্মনিরীক্ষণ' বলা যায়। তথাপি কিছু পার্থক্য আবিষ্কার করা যেতে পারে। আমি নিজে এই মনে করি যে, গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র পার্থক্যটা রয়েছে পর্যবেক্ষকের দেহ-বহিঃস্থ ঘটনাবলীর সঙ্গে অনুবন্ধের মাত্রার মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক যে, কোন আচরণবাদী গোলকধাঁধার মধ্যে একটা ইঁদুর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছেন, এবং একজন বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে। বন্ধুকে তিনি বলেন, "তুমি কি ওই ইঁদুরটা দেখছ?" বন্ধু যদি হাঁ বলেন তাহলে আচরণবাদী তাঁর পদার্থিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করার স্বাভাবিক পেশায় নিজেকে নিযুক্ত রাখছেন। কিন্তু বন্ধু যদি না বলেন, তাহলে আচরণবাদী চিৎকার দিয়ে ওঠেন "এই চোরাই (boot-legged) হুইস্কি আমি অবশ্যই ছেড়ে দেব"।[১] সে ক্ষেত্রে, তাঁর মনে প্রচণ্ড ভয় থাকা সত্ত্বেও তিনি যদি পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হন, তাহলে তিনি বলতে বাধ্য হবেন যে, কল্পিত ইঁদুর লক্ষ্য করার সময় তিনি আত্ম-নিরীক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটছিল, এবং যা ঘটছিল তা নিরীক্ষণ করে তিনি তখনও জ্ঞান অর্জন করতে পারতেন যদি তিনি মনে না করতেন যে, তাঁর দেহের বাইরে তার একটা কারণ ছিল। কিন্তু বহিরাগত সাক্ষ্য অথবা অন্য কোন বহির্লব্ধ তথ্য ছাড়া 'বাস্তব' ইঁদুর এবং 'কল্পিত' ইঁদুরের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করতে পারেন না। সুতরাং 'বাস্তব' ইঁদুরের ক্ষেত্রেও তাঁর মূল উপাত্ত আত্মনিরীক্ষণলব্ধ বলে প্রতীয়মান না হলেও তাঁর উচিত সেটাকে সে হিসাবে বিবেচনা করা; কারণ 'কল্পিত' ইঁদুরের ক্ষেত্রেও উপাত্তটা নিছক আত্মনিরীক্ষণলব্ধ 'মনে হয়' না।

১. কারণ এ হুইসকি খাওয়ার দরুন তিনি ইঁদুর না থাকা সত্ত্বেও ইঁদুর দেখার মতিভ্রমে ভুগছেন। (অনুবাদক)।

আসল কথাটা মনে হয় এই: কতকগুলো ঘটনার এমন-সব কার্যফল (effects) আছে যেগুলো তাদের চারদিকে আলো বিকীর্ণ করতে থাকে, এবং সেজন্যে কিছু সংখ্যক নিরীক্ষকের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে; সাধারণ কথাবার্তা হচ্ছে এগুলোর একটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু অন্যান্য আরও ঘটনা আছে যেগুলোর কার্যফল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে না, যেখানে তো চলে; কোন শব্দ-নিয়ন্ত্রিত (sound proof) টেলিফোনের বাক্স থেকে কোন টেলিফোনে কথা বলাকে এগুলোর একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে। বক্তা ছাড়া কেবল অন্য একজন লোক তাকে শুনতে পায়; বক্তাকে বাদ দিয়ে মাউথপিসে আমরা যদি একটা যন্ত্র রাখতাম তাহলে কেবল একজন লোকে শব্দটা শুনতে পারতো, অর্থাৎ যে ব্যক্তি টেলিফোনের অন্য প্রান্তে আছে। কোন মানবদেহের ভেতরে যেসব ঘটনা ঘটে সেগুলো টেলিফোনের ভেতরকার আওয়াজের (noise) মতো: তাদের এমন-সব কার্যফল আছে যেগুলো, প্রধানতঃ, চতুর্দিকে সমভাবে ছড়িয়ে না পড়ে, স্নায়ুর পথ ধরে মস্তিষ্কের দিকে চলে যায়। ফলতঃ, একজন লোক তার নিজের দেহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে, অন্য লোকে যা কেবল গৌণভাবে জানতে পারে। অন্য লোকে আমার দাঁতের ভেতরকার গর্তটা দেখতে পারে, কিন্তু সে আমার দাঁত ব্যথা অনুভব করতে পারে না। যদি সে অনুমান করে যে আমি দাঁত ব্যথা অনুভব করছি, তাহলেও আমি যে জ্ঞান পাচ্ছি তার জ্ঞান ঠিক তা নয়; একই শব্দাবলী সে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তার সেগুলো ব্যবহার করার পেছনে যে উদ্দীপক আছে সেটা আমার ক্ষেত্রস্থিত উদ্দীপক থেকে ভিন্ন, এবং যে ব্যথা আমার শব্দগুলোর পেছনকার উদ্দীপক সে ব্যথা সম্পর্কে আমি তীব্রভাবে সচেতন হতে পারি। এসব উপায়ে মানুষ তার নিজের দেহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, এবং অন্য দেহগুলো সম্পর্কে সে যে উপায়ে জ্ঞান লাভ করে, এ জ্ঞান সে লাভ করে তার থেকে ভিন্ন উপায়ে। এক অর্থে এই বিশেষ ধরনের জ্ঞান 'আত্মনিরীক্ষণ-লব্ধ,' (introspective), যদিও ওয়াটসন যে অর্থটাকে অস্বীকার করেন সে ঠিক অর্থে নয়।

(৫) এখন আমরা এসে পড়ছি সমস্ত বিষয়টার প্রকৃত সারাংশে, অর্থাৎ এ প্রশ্নটাতে: আপনি চিন্তা করেন কি?[১] 'চিন্তন'-কে (thinking) যতক্ষণ

১. Do you think ?

না শক্তিরূপে সংস্থাপিত করা হচ্ছে ততক্ষণ এ প্রশ্ন অত্যন্ত যথার্থক। সম্ভবতঃ বিষয়টাকে আমরা এভাবে উল্লেখ করতে পারি : আমাদের ভেতরকার এমন কোন ঘটনার কথা কি আপনি জানেন যেগুলোকে পদার্থবিদ্যার একান্ত সম্পূর্ণ (absolutely complete) জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হতো না ? পদার্থ-বিদ্যার সম্পূর্ণ জ্ঞান বলতে আমি কেবল পদার্থিক নিয়মাবলীর জ্ঞান বুঝাই না, যাকে আমরা ভূগোল (geography), অর্থাৎ দেশ-কালের সর্বত্র শক্তির বিতরণ[১] বলতে পারি, তার জ্ঞানও বুঝাই। প্রশ্নটাকে যদি এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে আমার মতে এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, আমরা এমন-সব জিনিস জানি যেগুলো পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন অন্ধ লোক সমগ্র পদার্থবিদ্যাটা জানতে পারতো, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকের চোখে বস্তু-সমুদয় কেমন দেখায়, অথবা দেখার বিষয় হিসাবে লাল আর নীলের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সে জানতে পারতো না। তরঙ্গ-দৈর্ঘ সম্পর্কে সে সব কিছু জানতে পারতো, কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ সম্পর্কে কিছু জানার আগে লোকে দেখার বিষয় হিসাবে লাল ও নীলের পার্থক্যটা জানত। যে ব্যক্তি পদার্থবিদ্যা জানেন ও দেখতে পারেন তিনি জানেন যে, কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ তাঁকে লালের সংবেদন দেবে, কিন্তু এ জ্ঞান পদার্থবিদ্যার অংশ নয়। আবার, 'প্রীতিকর' এবং 'অপ্রীতিকর' দ্বারা আমরা কি বুঝাই তা আমরা জানি, এবং আমরা যখন আবিষ্কার করলাম যে প্রীতিকর জিনিসগুলোর এক রকমের শরীরবৃত্তীয় কার্যফল আছে এবং অপ্রীতিকর জিনিসগুলোর আরেক রকম, তখন যে আমরা এ কথাটা আরও ভাল করে জানলাম তা নয়। আমরা যদি ইতিপূর্বেই, কোন্ জিনিসগুলো প্রীতিকর এবং কোন্ জিনিসগুলো অপ্রীতিকর, তা না জানতাম, তাহলে আমরা কখনও এ অনুবন্ধ আবিষ্কার করতে পারতাম না। কিন্তু কতকগুলো জিনিস যে প্রীতিকর এবং কতকগুলো জিনিস অপ্রীতিকর, এ জ্ঞানটা পদার্থবিদ্যার অংশ নয়।

পরিশেষে, আমরা কল্পনা, মতিভ্রম ও স্বপ্নের প্রসঙ্গে চলে আসছি। এদের সব ক্ষেত্রেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, একটা বাহ্য উদ্দীপক রয়েছে; কিন্তু কার্যকারণ শৃংখলের মস্তিষ্কস্থিত অংশ সব ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে না,

১. Distiibution of energy throughout space-time.

যে কারণে স্বাভাবিক প্রত্যক্ষণের সঙ্গে বাহ্য জগতের কিছু-একটা যে ভাবে যুক্ত, আমাদের কল্পনার বিষয়ের সঙ্গে তেমন কিছু সে ভাবে যুক্ত নয়। তথাপি এ রকম ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে জানতে পারি আমাদের কাছে কি ঘটছে; যেমন, প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের স্বপ্নগুলোর কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। আমি মনে করি, স্বপ্নগুলোকে 'চিন্তা' হিসাবে গণ্য করতে হবে—এ অর্থে যে, তারা পদার্থবিদ্যার আওতার বাইরে। নড়াচড়া (movements) তাদের সহগামী হতে পারে; কিন্তু তাদের জ্ঞান এ সব নড়াচড়ার জ্ঞান নয়। বস্তুতঃ জড়ের সঞ্চলন সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞান অনুমানগত, এবং যে জ্ঞানকে কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাঁর প্রাথমিক উপাত্ত হিসাবে বিবেচনা করা উচিত সে জ্ঞান ইঁদুর অথবা জ্যোতির্মণ্ডলীর নড়াচড়া সম্পর্কিত জ্ঞানের চেয়ে বরং আমাদের স্বপ্ন সম্পর্কিত জ্ঞানের অনুরূপ। আমি বলবো যে, ওয়াটসনের বিপরীতে এটুকু পর্যন্ত ডেকার্ট অভ্রান্ত। মনে হয় ওয়াটসনের অভিমত বাহ্য জগৎ সম্পর্কিত সরল বাস্তববাদের (naive realism) উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু পদার্থিক কার্যকারণ এবং আমাদের প্রত্যক্ষণের পূর্বগ সম্পর্কে পদার্থ-বিদ্যার নিজের যা বলবার আছে তার দ্বারাই সরল বাস্তববাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এসব কারণে আমি মনে করি যে, আত্মনিরীক্ষণ এমন জ্ঞান দিতে পারে এবং দেয় যা পদার্থবিদ্যার অংশ নয়, এবং 'চিন্তা'র বাস্তবতা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।

সপ্তদশ অধ্যায়

মানসচিত্র

এ অধ্যায়ে আমরা মানসচিত্রের প্রশ্নটা বিবেচনা করবো। পাঠক নিঃসন্দেহে জানেন যে, আচরণবাদের অন্যতম যুদ্ধ-হুংকার হচ্ছে "মানসচিত্র নিপাত যাক"।* পটভূমিকাটাকে আগেই যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার না করে আমরা এ প্রশ্ন আলোচনা করতে পারি না। 'মানসচিত্রে'র সমর্থকদের ধারণা অনুসারে এগুলো কি? প্রথমে [মানসচিত্রের দ্বারা] যে-সব ঘটনাবলী বোঝানো হয় তাদেরকে জানার প্রচেষ্টা অর্থে, এবং কেবল তারপর একটা রীতিসিদ্ধ সংজ্ঞা (formal definition) খোঁজার অর্থে এ প্রশ্নটাকে নেওয়া যাক।

সাধারণ অর্থে, আমরা যদি চোখ বন্ধ করি, এবং যে সব দৃশ্য ও মুখ আমরা জেনেছি সেগুলোর ছবি যখন চিন্তা করি, তখন আমরা দৃষ্টিগত মানসচিত্র (visual images) পাই; যখন কার্যতঃ গুন গুন করে না গেয়ে কোন একটা সুর আমরা স্মরণ করি, তখন আমরা পাই শ্রুতিগত মানসচিত্র; যখন আমরা এক প্রস্থ সুন্দর ফারের (fur) দিকে তাকাই এবং তাকে আঘাত করলে সেটা যে কি রকম প্রীতিকর হতো সে কথা চিন্তা করি, তখন আমরা পাই স্পর্শগত মানসচিত্র। অন্যান্য প্রকারের মানসচিত্র উপেক্ষা করে আমরা এই সব দৃষ্টিগত, শ্রুতিগত এবং স্পর্শগত মানসচিত্রের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারি। উপরের শব্দগুলোর সাহায্যে আমি যে সব অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দিয়েছি, সন্দেহ নেই যে, সে-সব অভিজ্ঞতা আমাদের হয়; এসব অভিজ্ঞতা কি ভাবে বর্ণনা করা উচিত, প্রশ্নটা কেবল তা-ই। তারপর আছে আরেক প্রস্থ অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ স্বপ্ন, যেগুলোকে সেই মুহূর্তে সংবেদনের মত মনে হয়, কিন্তু বাহ্য জগতের সঙ্গে সংবেদনের অনুরূপ কোন সম্বন্ধ যেগুলোর নেই। সন্দেহ নেই যে, স্বপ্নও ঘটে; এবং আমরা তাদের মধ্যে মানসচিত্র আছে বলবো, না নেই বলবো, এটাও আবার বিশ্লেষণের একটা প্রশ্ন।

*"Death to images."

আচরণবাদী মানসচিত্র স্বীকার করেন না, কিন্তু একইভাবে তিনি সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণও স্বীকার করেন না। যদিও তিনি তেমন নির্দিষ্ট করে বলেন না, তথাপি আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁর মতে গতিবিশিষ্ট জড় ছাড়া আর কিছুই নেই। সেজন্য প্রথমে সুস্পষ্টভাবে সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের অস্তিত্ব প্রমাণ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের সংজ্ঞা দান না করা পর্যন্ত এদের সঙ্গে মানসচিত্রের বিরুদ্ধতা দেখিয়ে তাদের সমস্যাটা আমরা বিবেচনা করতে পারি না। এখন, স্মরণীয় যে, পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষণের একটা আচরণবাদী সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছিলাম, এবং এ সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, এর সবচেয়ে আবশ্যকীয় দিক হচ্ছে 'সংবেদনশীলতা' (sensitivity)। অর্থাৎ, যদি—যখন ক-জাতীয় একটা বস্তুর সঙ্গে কোন ব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট দৈশিক সম্বন্ধ আছে তখন প্রতি বারই তার মধ্যে খ-জাতীয় একটা প্রতিক্রিয়া জাগে, কিন্তু অন্যভাবে না জাগে—তাহলে আমরা বলি যে, লোকটি ক-এর প্রতি 'সংবেদনশীল'। এর থেকে 'প্রত্যক্ষণে'র একটা সংজ্ঞা পেতে হলে অনুষঙ্গ নিয়মকে গণনার মধ্যে আনা দরকার; কিন্তু এখনকার মত এ জটিলতার প্রতি আমরা নজর দেব না, এবং বলবো যে, কোন ব্যক্তি তার পরিপার্শ্ব অথবা তার নিজের দেহের যে-কোন দিক 'প্রত্যক্ষ' (perceives) করে, যদি সে তার প্রতি সংবেদনশীল হয়। সে যাই হোক, এখন ষোড়শ অধ্যায়ের আলোচনার ফলস্বরূপ, কেবল অন্যেরা যা নিরীক্ষণ করতে পারে তা নয়, সে একা যা নিরীক্ষণ করতে পারে তাও আমরা তার প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এর ফলে, তাত্ত্বিকভাবে না হলেও কার্যতঃ, প্রত্যক্ষণের জানা ক্ষেত্রটার আয়তন বেড়ে যায়। কিন্তু এর ফলে একটা সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। সেটা এই যে, প্রত্যক্ষণের সারবস্তুটা হচ্ছে পরিবেশের কোন একটা দিকের সঙ্গে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ; জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়া অন্যত্র এই দিকটা মোটামুটিভাবে প্রত্যক্ষণটার সমকালীন, যদিও আলো ও শব্দের ভ্রমণে যে সময় লাগে এবং স্নায়ুপথে তরঙ্গ পাঠানোর মধ্যে যে বিরতি ঘটে তার দরুন সেটা সর্বদাই অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে আগে ঘটে।

আপনি যখন চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে বসেন, এবং আপনি বিদেশে যে-সব জায়গা দেখেছেন তাদের ছবি স্মরণ করতে থাকেন এবং সম্ভবতঃ

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েন, তখন যা ঘটে, এর সঙ্গে তার বৈপরিত্য দেখানো যাক। ডঃ ওয়াটসনকে আমি যদি ঠিকমত বুঝে থাকি তাহলে, তাঁর মতে, হয় সেখানে অক্ষিপটের কোন প্রকৃত উদ্দীপনা আছে নয়তো আপনার চিত্রগুলো কেবল শব্দচিত্র মাত্র, এবং শব্দগুলোর জায়গায় আছে এমন-সব ছোট ছোট প্রকৃত আন্দোলন (movements) যেগুলোকে সম্প্রসারিত ও দীর্ঘায়িত করলে তার ফলে সত্যি-সত্যিই শব্দগুলো উচ্চারিত হতো। তখন, আপনি যদি অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে থাকেন তাহলে বাইরে থেকে অক্ষি-পটের উপর কোন উদ্দীপক এসে পড়ছে না। এটা সম্ভব যে, অনুষঙ্গের ফলস্বরূপ অন্য ইন্দ্রিয়গুলোর উপরকার উদ্দীপক দ্বারা চোখটা প্রভাবিত হতে পারে ; ইতিমধ্যেই আমরা এ সত্যের মধ্যে এর একটা দৃষ্টান্ত পেয়েছি যে, বার বার যদি কোন উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে কোন উচ্চ শব্দের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তাহলে চোখের মনিকে সে শব্দ শুনে সংকোচিত হতে শেখানো যেতে পারে। সুতরাং, এক ইন্দ্রিয়ের উপরকার উদ্দীপক, অতীত ঘটনার ফলস্বরূপ, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের অঙ্গসমূহের উপর ক্রিয়া করতে পারে, এ ধারণা আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। এভাবে উৎপন্ন কার্যফল হিসাবে 'মানসচিত্রে'র সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। এমন হতে পারে যে, আপনি যখন নেপোলিয়নের একটা ছবি দেখছেন তখন আপনার কানের স্নায়ু-গুলোর উপর এমন একটা কার্যফল সংঘটিত হচ্ছে যা আপনার সম্মুখে 'নেপোলিয়ন' শব্দটা উচ্চারিত হওয়ার কার্যফলের অনুরূপ, এবং সেজন্যেই আপনি যখন ছবিটা দেখেন তখন আপনার মাথায় 'নেপোলিয়ন' শব্দটা আসে। এবং অনুরূপভাবে, আপনি যখন চোখ বন্ধ করেন এবং বিদেশী দৃশ্যাবলীর ছবি স্মরণ করেন তখন, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে, আপনি প্রকৃতপক্ষে 'ইটালী' শব্দটা উচ্চারণ করতে পারেন, এবং, অনুসঙ্গের মাধ্যমে, কোন পূর্ববর্তী সময়ে ইটালীর কোন বাস্তব জায়গা আপনার অক্ষিস্নায়ুকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল, কম-বেশী তার মত করে এর ফলে আপনার অক্ষিস্নায়ু উদ্দীপ্ত হতে পারে। তখন থেকে অনুষঙ্গ একাই আপনাকে একটার-পর-একটা ভ্রমণের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যতক্ষণ-না শেষ পর্যন্ত আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন আপনি মনে করেন যে, সেই মুহূর্তে ভ্রমণ-গুলো আপনি করছেন। এ সবই সম্ভব, কিন্তু আমি যতদূর জানি, এর

যে-কোন ব্যাখ্যা বাদ দেয় এমন কোন পূর্বতঃসিদ্ধ মতবাদ ছেড়ে দিলে, এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, এটা সম্ভবের চেয়ে বেশী কিছু।

ডঃ ওয়াটসন কখনও জোর দিয়ে বলেন যে, যখন আমরা—আমরা যেমন নে করি—চোখ বন্ধ করে কল্পিত ছবি দেখছি, তখন আমরা বস্তুতঃ কেবল স-রকম শব্দ ব্যবহার করছি যেগুলোর সাহায্যে তাদের বর্ণনা দেওয়া যায়; মতটাকেই আমি স্পষ্টতঃ অসমর্থনীয় বলে মনে করি। কোন বিষয়ের পক্ষে ততটুকু নিশ্চিত হওয়া সম্ভব আমার কাছে এটাকে ততটুকুই নিশ্চিত মনে য় যে, যখন আমি মনশ্চক্ষুতে দেখি (visualise) তখন কিছু-একটা ঘটছে া দর্শনেন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, শৈশবে আমি যে বাড়ীটাতে বাস করেছিলাম তার নিতান্ত স্পষ্ট মানসিক চিত্র (mental pictures) আমি মনের মধ্যে জাগাতে পারি; সে বাড়ীর কামরাগুলোর কোন একটার আসবাবপত্র সম্পর্কে আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি প্রথমে একটা মানসচিত্র জাগিয়ে এবং তারপর তার মধ্যে উত্তরটা কি হবে তা লক্ষ্য করে, ঠিক যেমন কোন বাস্তব কামরায় আমি তাকিয়ে দেখতাম। আমার কাছে এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, ছবিটা প্রথমে আসে এবং পরে শব্দগুলো; তাছাড়া, শব্দগুলো আদৌ না এলেও চলে। মনশ্চক্ষুতে দেখার এ মুহূর্তগুলোতে আমার অক্ষিপট ও অক্ষিস্নায়ুতে কি ঘটছে তা মি বলতে পারি না, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, কিছু-একটা ঘটছে দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যার এমন একটা সম্বন্ধ আছে যা অন্য ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে নেই। এবং শ্রুতিগত ও স্পর্শগত মানসচিত্র সম্পর্কেও আমি সেই একই কথা বলতে পারি। এ বিশ্বাস যদি এমন আর কিছুর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় যা মার কাছে একই রকম নিশ্চিত বলে মনে হয়, তাহলে আমি একটাকে র্জন করতে প্রবৃত্ত হতে পারি। কিন্তু আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, এ রকম ান অসঙ্গতি নেই।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, আমরা এ মতের সপক্ষে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম , প্রত্যক্ষণে আমরা যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, প্রত্যক্ষণগুলো তাদের থেকে ন্ন এবং তাদের সঙ্গে কেবল কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত। সুতরাং, পেশী গ্রন্থির এলাকায় যেমন তেমনিভাবে অনুষঙ্গ কেন এ এলাকাতেও কাজ

করবে না; তার কোন কারণ নেই; অন্য কথায়, যাকে 'ধারণার অনুষঙ্গ'¹ বলা হতো, দৈহিক পরিবর্তনগুলোর পক্ষে অনুষক্ত (associated) হওয়ার সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। কোন পদার্থিক ভিত্তি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা মস্তিষ্কের ভেতরে আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। মস্তিষ্কের যে অবস্থার দরুন আমরা 'নেপোলিয়ন' শব্দটা শুনি এবং মস্তিষ্কের যে অবস্থার দরুন আমরা নেপোলিয়নের একটা ছবি দেখি, সে দুটোর মধ্যে একটা অনুষঙ্গ গড়ে উঠতে পারে, এবং তার ফলে শব্দ ও ছবিটা পরস্পরকে জাগিয়ে দেবে। অনুষঙ্গটা ইন্দ্রিয় অথবা স্নায়ুর মধ্যে 'থাকতে পারে' (may), কিন্তু সেটা একইভাবে মস্তিষ্কের মধ্যেও থাকতে পারে। আমি যতদূর জানি, এ দুটোর কোন পক্ষেই চূড়ান্ত প্রমাণ নেই; এমনকি অনুষঙ্গ যে সম্পূর্ণ 'মানসিক' নয় সে সম্বন্ধেও কোন চূড়ান্ত প্রমাণ নেই।

সংবেদন এবং মানসচিত্রের পার্থক্যের কোন সংজ্ঞা পাওয়ার জন্য আমরা যখন চেষ্টা করি তখন প্রথমে অন্তর্নিহিত (intrinsic) পার্থক্যগুলো সন্ধান করাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায় যে, সাধারণ সংবেদন এবং সাধারণ মানসচিত্রের মধ্যবর্তী অন্তর্নিহিত পার্থক্যগুলো—যেমন 'সজীবতা'—ব্যতিক্রমের অধীন, এবং সেজন্য সংজ্ঞাবদ্ধ করার দিক থেকে তারা অনুপযুক্ত। এভাবেই আমরা কারণ ও কার্য সম্পর্কিত পার্থক্যগুলোর কাছে এসে পড়ি।

এটা সুস্পষ্ট যে, সাধারণ ক্ষেত্রে আপনি একটা টেবিল প্রত্যক্ষ করেন এজন্য যে, টেবিলটা (কোন এক অর্থে) আছে। অর্থাৎ, একটা কার্যকারণ শৃঙ্খল আছে যা আপনার প্রত্যক্ষণ থেকে পেছনের দিকে আপনার দেহের বাইরে অবস্থিত একটা-কিছু পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে মানদণ্ড হিসাবে কেবল এটুকুকে যথেষ্ট বলা কঠিন। ধরা যাক আপনি পিটের (peat) ধোঁয়ার গন্ধ নিচ্ছেন এবং আয়ারল্যাণ্ডের কথা ভাবছেন; আপনার চিন্তার সূত্রটা সমভাবেই আপনার দেহের বাইরে কোন কারণের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। একমাত্র সত্যিকার পার্থক্য এই যে, বহিঃস্থ কারণের (পিটের ধোঁয়া) কার্যফলটা (আয়ারল্যাণ্ডের মানসচিত্র) প্রত্যেক স্বভাবস্থ লোকের উপরেই বর্তাতো না; যারা আয়ারল্যাণ্ডে পিটের ধোঁয়ার গন্ধ নিয়েছে কেবল

১। Association of ideas.

তাদের উপর বর্তাতো, তাদের সকলের উপরে নয়। অর্থাৎ, যেখানে ইতিপূর্বে কতকগুলো অভিজ্ঞতা ঘটেছে সেখানে ছাড়া স্বাভাবিক মস্তিষ্ক-যন্ত্রটা সেই নির্দিষ্ট উদ্দীপককে সেই নির্দিষ্ট কার্যফল উৎপন্ন করতে প্রযোজিত করে না। এ পার্থক্যটা অত্যন্ত মৌলিক (vital)। বহিরাগত কোন উদ্দীপকের প্রভাবে আমাদের মধ্যে যা ঘটে তার অংশবিশেষ অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে; অংশবিশেষ করে না। আগের অংশটার মধ্যে মানসচিত্র আছে, পরেরটা বিশুদ্ধ সংবেদন দিয়ে তৈরী। তবে, আমরা এর পর যেমন দেখবো, সংজ্ঞা হিসাবে এটা অপর্যাপ্ত।

অতীত অভিজ্ঞতার উপর যে সব মানসিক ঘটনা নির্ভরশীল, সেমনের (Semon) মতানুসারে, সেগুলোকে 'স্মৃতিক' (mnenic) ঘটনা বলা হয়। এ জন্যেই, অন্ততঃ মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে যতদূর দেখা যায়, মানসচিত্রকে স্মৃতিক ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তবে তাদের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য এটুকু যথেষ্ট নয়, যেহেতু অন্যান্য আরও [ঘটনা] আছে—যেমন, স্মরণ (recollections)। যে জিনিসের দ্বারা তাদের সংজ্ঞা আরও যথাযথ হয় তা হচ্ছে সংবেদনের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য। সঠিক অর্থে, একথা কেবল সরল মানসচিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; জটিল মানসচিত্রগুলো কোন মূলাদর্শ (prototype) ছাড়াই ঘটতে পারে, যদিও সংবেদনের মধ্যে তাদের সকল অংশের মূলাদর্শ থাকবে। অন্ততঃ হিউমের নীতিটা (principle) এ রকম, এবং মোটামুটিভাবে তাকে সত্য বলে মনে হয়। তবে একটা সীমার বাইরে তাকে চাপ দিয়ে ঠেলে নেওয়া ঠিক হবে না। সচরাচর, একটা মানসচিত্র অল্প-বিস্তর অস্পষ্ট, এবং তার মূলাদর্শ হিসাবে কতকগুলো অনুরূপ সংবেদন থাকে। সাধারণভাবে সংবেদনের সঙ্গে সম্বন্ধটা এতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সম্বন্ধটা হয় কতিপয় সংবেদনের সঙ্গে, কেবল একটার সঙ্গে নয়।

এ রকম ঘটে থাকে যে, যখন কোন-এক সময়ে কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় কোন-একটা সংবেদনপুঞ্জ (complex of sensations) ঘটেছে, তখন সমগ্রটার কোন অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার ফলে অবশিষ্ট অংশগুলোর অথবা তাদের কতকগুলোর মানসচিত্র উৎপন্ন হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এরই নাম অনুষঙ্গ, এবং স্মৃতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

সংবেদনগুলো উদ্রিক্ত হয় কোন ইন্দ্রিয়-বিশেষের উদ্দীপকের সাহায্যে; এদের সঙ্গে বৈপরীত্য দেখিয়ে মানসচিত্রগুলোকে "কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্রিক্ত" (centrally excited) বলে উল্লেখ করাটা একটা সাধারণ ব্যাপার। মূলগত-ভাবে এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল, কিন্তু এ শব্দগুচ্ছটার ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে কিছু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। সংবেদনেরও মস্তিষ্কের ভেতরে গৌণ (proximate) কারণ আছে; মানসচিত্রগুলো যখন অনুষঙ্গের মাধ্যমে কোন সংবেদন দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন তাদেরও কারণ হিসাবে কোন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা থাকতে পারে। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রগুলোতে, অতীত অভিজ্ঞতা এবং মস্তিষ্কের উপর তার কার্যফল ছাড়া তাদের সংঘটন ব্যাখ্যা করার মত কিছুই নেই। সদৃশ ইন্দ্রিয় কিন্তু ভিন্ন অতীত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির মধ্যে তারা একই উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হবে না। অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধটা পরিষ্কারভাবে জানা আছে; তবে, এ সম্বন্ধটা মস্তিষ্কের উপরে অতীত অভিজ্ঞতার কোন কার্যফলের মাধ্যমে কাজ করে এরূপ মনে করা একটা ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প, জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় যার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব নয়। এ প্রকল্পকে সন্দেহজনক বলে মনে করতে হবে, কিন্তু একে গ্রহণ করলে বাগাড়ম্বর (circumlocution) এড়ানো যাবে। কাজেই, প্রতি ক্ষেত্রেই আমি একথার পুনরাবৃত্তি করবো না যে, এর সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত বোধ করতে পারি না। সাধারণভাবে, অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যেখানে কার্যকারণ সম্বন্ধটা সুস্পষ্ট সেখানে, স্মৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন বিশেষ প্রকল্পের ইঙ্গিত না দিয়েই, আমরা কোন ঘটনাকে 'স্মৃতিক' বলে থাকি।

যে সব সংবেদন তাদের মূলাদর্শ, মানসচিত্রগুলো যে তাদের অনুরূপ সেটা আমরা কি করে জানি, সম্ভবতঃ এ প্রশ্ন করা লাভজনক। এ প্রশ্নের জটিলতা দেখা দেয় নিম্নলিখিতভাবে। ধরা যাক, আপনি ওয়াটার্লু ব্রীজের (Waterloo Bridge) একটা মানসচিত্র জাগিয়ে তুললেন, এবং আপনি সুনিশ্চিত যে, ওয়াটার্লু ব্রীজের দিকে তাকালে আপনি যা দেখেন, এ তারই মত। একথা বলা স্বাভাবিক মনে হবে যে, আপনি সাদৃশ্যটা জানেন এজন্যে যে, ওয়াটার্লু ব্রীজকে আপনি স্মরণ করছেন, কিন্তু প্রায়ই মনে করা হয় যে, স্মরণের একটা অপরিহার্য উপাদান হিসাবে তার মধ্যে এমন কোন মানস-

চিত্রের সংঘটন থাকে, কোন মূল আদর্শের প্রতি যার মধ্যে একটা ইঙ্গিত থাকে। মানসচিত্র ছাড়া আপনার পক্ষে যদি স্মরণ করা সম্ভব না হয় তাহলে, মানসচিত্রগুলো যে মূলাদর্শের অনুরূপ, সে সম্পর্কে আপনি কিভাবে নিশ্চিত হতে পারেন সেটা বোঝা কঠিন। আমি মনে করি যে, প্রকৃতপক্ষে তুলনা করার কোন অপ্রত্যক্ষ উপায় খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াটার্লু ব্রীজের এমন-সব আলোকচিত্র আপনার কাছে থাকতে পারে যেগুলো কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে দু'টো ভিন্ন দিনে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং আপনার কাছে তাদেরকে অভিন্ন ঠেকতে পারে, যার ফলে মনে হবে যে, অন্তর্বর্তীকালে ওয়াটার্লু ব্রীজের কোন পরিবর্তন হয়নি। এ দিনগুলোর প্রথমটাতে আপনি ওয়াটার্লু ব্রীজ দেখতে পারেন, দ্বিতীয়টাতে স্মরণ করতে পারেন, এবং ঠিক পর মুহূর্তেই তার দিকে তাকাতে পারেন। এর দিকে তাকানোর সময় আপনার মনে হতে পারে যে, তার প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ আপনার কাছে পৌঁছানোর সময় আপনার মধ্যে একটা প্রত্যাশার অনুভূতি জাগছে, অথবা আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে, কতকগুলো ক্ষুদ্র অংশ আসছে বিস্ময়ের অনুভূতি নিয়ে। এক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে, যে অংশগুলো বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল তাদের ক্ষেত্রে আপনার মানসচিত্র ছিল ভ্রান্ত। আবার ধরুন, স্মৃতির উপর নির্ভর করে আপনি কাগজের উপর ওয়াটার্লু ব্রীজের একটা ছবি আঁকতে পারেন, এবং তারপর মূলের সঙ্গে অথবা কোন আলোকচিত্রের সঙ্গে তার তুলনা করতে পারেন। অথবা আপনি শব্দযোগে তার একটা বর্ণনা লিখে এবং প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের মাধ্যমে তার সঠিকতা যাচাই করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। এ ধরনের অসংখ্য পদ্ধতি আবিষ্কার করা যেতে পারে যেগুলোর সাহায্যে আপনি তার মূলাদর্শের সঙ্গে কোন মানসচিত্রের সাদৃশ্য পরীক্ষা করতে পারেন। ফলটা এই যে, প্রায়ই প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়, যদিও পূর্ণ সঠিকতা দেখা যায় কদাচিৎ। অবশ্য তার মূলাদর্শের সঙ্গে কোন মানসচিত্রের সাদৃশ্যের বিশ্বাসটা এভাবে উৎপন্ন হয় না, এভাবে কেবল পরীক্ষিত হয়। আমাদের অধিকাংশ বিশ্বাসের মত এ বিশ্বাসটা থাকে এর অভ্রান্ততা সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়ার আগেই। এ বিষয়ে আমার আরও কিছু বলবার থাকবে পরবর্তী অধ্যায়ে, যেখানে স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে তাদের মূলাদর্শের

সঙ্গে মানসচিত্রগুলোর যে অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে, এ ধারণার যৌক্তিকতা দেখাবার পক্ষে যথেষ্ট বলা হয়েছে বলে আমি মনে করি। এরচেয়ে বেশী দাবী করা ঠিক সঙ্গত হবে না।

এখন প্রত্যক্ষণ, সংবেদন এবং মানসচিত্র সম্পর্কে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। কল্পনা করা যাক যে, কয়েকজন লোক, যতদূর সম্ভব, একই পরিবেশের মধ্যে আছে; আমরা ধরে নেব যে, একটা অন্ধকার কামরায় কোন একটা চেয়ারে তারা একের-পর-এক বসছে, এবং পরিষ্কারভাবে পরস্পর-বিরোধী দু'দলের দু'জন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদের উজ্জ্বল ছবি দেখতে পাচ্ছে, যাঁদের নাম ছবিগুলোর নীচে লেখা আছে। তাদের প্রতিক্রিয়া হবে অংশতঃ সদৃশ এবং অংশতঃ ভিন্ন। এ পর্যবেক্ষকদের কেউ-কেউ যদি এমন অল্পবয়স্ক শিশু হয় যে তারা এখনও দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে শেখেনি, তাহলে তারা স্পষ্ট রূপরেখা না দেখে দেখবে কেবল একটা অস্পষ্ট চিহ্ন (blurr); এবং তার কারণ পেশীর উপর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণের অভাব, কোন দৃষ্টিগত ত্রুটি নয়। এ বিষয়ে বিশুদ্ধ সংবেদন বলে যাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এমন-কি তার উপরও অভিজ্ঞতার একটা প্রভাব আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ পার্থক্য কোন একজনের পক্ষে তার চোখ খোলা রাখা এবং বন্ধ রাখার মধ্যবর্তী পার্থক্যের অনুরূপ; পার্থক্যটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, যদিও মস্তিষ্কের ভেতরকার কোন পার্থক্য তার কারণ হতে পারে। সুতরাং আমরা ধরে নেব যে, চোখকে যতদূর সম্ভব ভাল দেখার জন্য কিভাবে অভিযোজিত করা যায় তা সব দর্শকেই জানে, এবং সকলেই যতদূর সম্ভব ভাল দেখতে চেষ্টা করে। আমরা তাহলে বলবো যে, স্বাভাবিক (normal) মানুষের পক্ষে যত বেশী সম্ভব এ দর্শকেরা যদি পরস্পর থেকে তত বেশী পৃথক হয়, তাহলে তাদের সকলের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যা সাধারণ তা হচ্ছে সংবেদন, যদি এ সাধারণ জিনিসটা দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয়, অথবা, আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, যদি তার সেই বৈশিষ্ট্য থাকে যাকে আমরা দৃশ্য বস্তুসমূহের সকলের মধ্যে সাধারণভাবে এবং স্বকীয়ভাবে (peculiar) উপস্থিত থাকতে দেখি। কিন্তু তাদের বয়স যদি তিন মাসের বেশী হয়, তাহলে ছবি দেখার সময় সম্ভবতঃ তাদের সকলের মধ্যে স্পর্শগত মানসচিত্র জাগবে। এবং তাদের বয়স যদি প্রায় এক বছরের বেশী হয়, তাহলে তারা সেগুলোকে ত্রিমাত্রিক

বস্তুর প্রতিনিধিত্বকারী ছবি হিসাবে ব্যাখ্যা করবে; সে বয়সের আগে তারা সেগুলোকে দেখতে পারে রঙীন প্যাটার্ণ হিসাবে, মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি (representation) হিসাবে নয়। সব প্রাণী না হলেও, অধিকাংশ প্রাণী ছবিকে প্রতিকৃতি হিসাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ নয়। কিন্তু কোন বয়স্ক মানুষের মধ্যে এ ব্যাখ্যা ইচ্ছাপ্রসূত নয়; এটা [ততদিনে] স্বতঃক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমি মনে করি যে, এ বিষয়টা প্রধানতঃ স্পর্শগত মানসচিত্রের একটা প্রশ্নঃ কোন ছবির দিকে তাকানোর সময় আপনার মধ্যে যে সব মানসচিত্র জাগে সেগুলো কোন মসৃণ চেপ্টা তলের উপযোগী নয়, বরং সেগুলো প্রতিবেদিত (represented) বস্তুটারই উপযোগী। যদি প্রতিবেদিত বস্তুটা বড় আকারের হয় তাহলে নড়াচড়ার মানসচিত্র জাগবে—বস্তুটার চারদিকে হাঁটা, তার উপরে ওঠা, ইত্যাদি। স্পষ্টতঃই এর সবকিছুই অভিজ্ঞতার ফলাফল, এবং সেজন্য সংবেদনের অংশ হিসাবে তাদের গণ্য করা যায় না। রাজনীতিকদের নামগুলো পড়া, তাঁদের সাদৃশ্য সঠিক হয়েছে কি না তা বিবেচনা করা, এবং তাঁদের একজনকে কত ভাল একজন লোকের মত দেখাচ্ছে এবং আরেকজনের মুখাবয়বের উপর কেমন অপ্রশমিত দুরাত্মাপনা মুদ্রিত হয়ে আছে তা অনুভব করার বেলায় অভিজ্ঞতার এ প্রভাবটা তার চেয়েও বেশী সুস্পষ্ট। এদের কোনটাকেই সংবেদন বলে গণ্য করা যায় না, তথাপি তা কোন বহিরাগত উদ্দীপকের উপর কোন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ারই একটা অংশ।

কোন উদ্দীপকের উপর কোন মানুষের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অভিজ্ঞতার কার্যফল এবং অন্য সব কিছুর কার্যফলের মধ্যে পার্থক্য করতে গেলে এক ধরনের কৃত্রিমতা এড়িয়ে চলা স্পষ্টতঃই কঠিন কাজ। সম্ভবতঃ সামান্য ভিন্ন উপায়ে আমরা এ বিষয়টার মীমাংসা করতে পারতাম। নানা রকমের উদ্দীপকের মধ্যে আমরা পার্থক্য করতে পারিঃ চোখের উপরকার উদ্দীপক, কানের উপরকার, নাসিকার উপরকার, জিবের উপরকার, ইত্যাদি। প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও বিভিন্ন রকমের উপাদানের মধ্যে আমরা পার্থক্য করতে পারিঃ দৃষ্টিগত উপাদান, শ্রুতিগত উপাদান, ইত্যাদি। পরবর্তীগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে, উদ্দীপকের মাধ্যমে নয়। দৃষ্টিগত সংবেদন এবং দৃষ্টিগত মানসচিত্রের মধ্যে একটা

সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যা কোন শ্রুতিগত সংবেদন অথবা শ্রুতিগত মানসচিত্রের মধ্যে নেই। তাহলে আমরা বলতে পারি: কোন দৃষ্টিগত মানসচিত্র হচ্ছে এমন একটা ঘটনা যার মধ্যে দৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যটা উপস্থিত, কিন্তু যার কারণ চোখের উপরকার কোন উদ্দীপক নয়—অর্থাৎ, অক্ষিপটের উপর আলোক-তরঙ্গের আপতন যার কোন প্রত্যক্ষ কারণিক পূর্বগ (causal antecedent) নয়। অনুরূপভাবে, কোন শ্রুতিগত মানসচিত্র হবে এমন একটা ঘটনা যার মধ্যে শ্রুতিগত বৈশিষ্ট্যটা আছে, কিন্তু কানে-পৌঁছা শব্দ-তরঙ্গ যার কারণ নয়; এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্পর্কেও সেই একই কথা। এর অর্থ হচ্ছে সংবেদন ও মানসচিত্রের মধ্যে কোন মনোবৈজ্ঞানিক পার্থক্য দেখাবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা; পার্থক্যটা কেবলমাত্র পদার্থিক পূর্বগ (physical antecedent) প্রসঙ্গে করা যায়। এটা সত্য যে বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যা ছাড়াই আমরা পার্থক্যটায় এসে পৌঁছাতে পারি এবং পৌঁছিও বটে, কারণ আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের অখণ্ড প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলো উপাদানের—অন্যের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের নিজের অতীত ও ভবিষ্যত অভিজ্ঞতা উভয়েরই সঙ্গে—সেইসব অনুবন্ধ আছে যেগুলো থাকার দরুন বহিঃস্থ কোনকিছুর প্রতিষঙ্গ[1] হিসাবে তাদেরকে আমরা বিবেচনা করি, এবং অন্য উপাদানগুলোর তা নেই। কিন্তু যখন আমরা এই কাণ্ডজ্ঞানগত পৃথকীকরণটাকে পরিশোধন করি এবং তাকে সুনির্দিষ্ট (precise) করতে চাই, তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে-করা একটা পার্থক্য, এইমাত্র যার উল্লেখ করা হলো।

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মানসচিত্র হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন একটা ঘটনা, যে বৈশিষ্ট্য কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্দীপনার (stimulation) সঙ্গে অনুষক্ত, কিন্তু এ ধরনের উদ্দীপনা থেকে উৎপন্ন নয়। মানুষের মধ্যে মানসচিত্রগুলো অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল মনে হয়, কিন্তু সম্ভবতঃ অধিকতর উৎপ্রেরণা-নিয়ন্ত্রিত প্রাণীকুলের[2] মধ্যে আংশিকভাবে তারা সহজাত মস্তিষ্কগত কলকব্জা দ্বারা উৎপন্ন। যে-কোন ক্ষেত্রে, তাদেরকে যে চিহ্নের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করতে হবে, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীলতা সে চিহ্ন নয়। এর

[1] as corresponding to something external.
[2] More instinctive animals.

থেকে দেখা যায়, গতানুগতিক মনোবিজ্ঞান কত ঘনিষ্ঠভাবে পদার্থবিদ্যার উপর নির্ভরশীল, এবং মনোবিজ্ঞানকে একটা স্বনির্ভর বিজ্ঞানে (autonomous science) পরিণত করা কত কঠিন।

তবে এখানে আরেকটু পরিশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের বর্তমান সংজ্ঞার আওতার মধ্যে যা-কিছু অন্তর্ভুক্ত তাই একটা মানসচিত্র, কিন্তু অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কতকগুলো জিনিসও মানসচিত্র। কোন একটা বস্তু দেখতে পেলে তার ফলে এমন আরেকটা বস্তুর মানসচিত্র জেগে উঠতে পারে যার সঙ্গে সেটা প্রায়শই অনুষক্ত রয়েছে। এই পরেরটাকে বলা হয় মানসচিত্র, সংবেদন নয়; কারণ, যদিও এ নিজেও দৃষ্টিগত, তথাপি কোন এক অর্থে এ উদ্দীপকের উপযোগী নয়: দৃশ্যটার কোন আলোকচিত্রের মধ্যে অথবা অক্ষিপটের কোন আলোকচিত্রের মধ্যে একে দেখা যাবে না। কাজেই আমরা বলতে বাধ্য: কোন উদ্দীপকের উপর যে প্রতিক্রিয়া হয় তার মধ্যে সাংবেদনিক উপাদানটা হচ্ছে সেই অংশটা যা, মস্তিষ্ক-বহির্ভূত যে ঘটনাটা (তেমন কিছু যদি থাকে) উদ্দীপক[1] হিসাবে কাজ করেছে, তার প্রকৃতি সম্পর্কে অনুমান করতে আপনাকে সক্ষম করে; বাকী সবই মানসচিত্র। সৌভাগ্যবশতঃ, সচরাচর মানসচিত্র ও সংবেদনের মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পার্থক্য থাকে; এর ফলে সাধারণ অন্তর্নিহিত পার্থক্যগুলোর সাহায্যে বাহ্যজগৎ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া, এবং পরে যথাযথ কারণিক সংজ্ঞার মাধ্যমে তাকে সংশোধন করা সম্ভব হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল না হয়ে পদার্থবিদ্যা ও শরীরতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল বলে বিষয়টা কঠিন ও জটিল। মানসচিত্র সম্পর্কে এটাই প্রধান প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে 'মানসচিত্র' শব্দটার একটা সংজ্ঞার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। আমরা কোন ঘটনাকে 'মানসচিত্র' বলতে পারি যদি বোঝা যায় যে, সেটা 'প্রত্যক্ষ'-এর সমশ্রেণীভুক্ত, কিন্তু প্রত্যক্ষ হলে তার যে উদ্দীপক থাকতো, সে উদ্দীপক তার নেই। কিন্তু এ সংজ্ঞাটাকে সন্তোষজনক করতে হলে 'প্রত্যক্ষ' (percept) শব্দটার জায়গায় অন্য কোন শব্দ বসানো

[1] অর্থাৎ, অব্যবহিত (immediate) উদ্দীপক, "পদার্থিক বস্তু"টা নয়।

আবশ্যক হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন দৃশ্য বস্তুর প্রত্যক্ষের বেলায় সচরাচর কতকগুলো অনুষঙ্গ-বদ্ধ স্পর্শগত উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হবে; কিন্তু, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এগুলোকে মানসচিত্র হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং, এটা বললে আরও ভালো হয় যে, 'মানসচিত্র' একটা ঘটনা যাকে দৃষ্টিগত (অথবা ক্ষেত্রভেদে শ্রুতিগত, অথবা ইত্যাদি) বলে চেনা যায়, কিন্তু যা এমন কোন উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হয় না যা আলোর (অথবা ক্ষেত্রভেদে শব্দের, অথবা ইত্যাদি) সমধর্মী, অথবা, আর যাই হোক না কেন, যা অনুষঙ্গের ফলস্বরূপ গৌণভাবে এ উপায়ে উৎপন্ন। এ সংজ্ঞা পাওয়ার পর, মানসচিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি নিজে কোন সন্দেহ অনুভব করি না। এটা স্পষ্ট যে, স্বপ্ন ও দিবা স্বপ্নের বেশীরভাগ উপাদান তারাই, সংগীত রচনায় সুরকারেরা তাদের ব্যবহার করেন, অন্ধকারে কোন পরিচিত কামরা থেকে বেরোবার সময় আমরা তাদের কাজে লাগাই (যদিও এখানে গোলকধাঁধার ভেতরকার ইঁদুরের দরুন অন্য একটা পৃথক ব্যাখ্যাও সম্ভব), এবং যখন আমরা লবণকে চিনি ভেবে মুখে দিই অথবা (আমার বেলায় সম্প্রতি যে রকম ঘটেছে) সিরকাকে কফি মনে করে মুখে দিই, তখন আমাদের উপর বিস্ময়ের যে ধাক্কা লাগে তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাদের থেকে। মানসচিত্রের শরীরবৃত্তীয় কার্যকারণের প্রশ্নটা—অর্থাৎ এটা মস্তিষ্কের ভেতর অথবা শরীরের অন্য অংশগুলোতে কিনা—এমন নয় যে, তার মীমাংসা করা আমাদের উদ্দেশ্যের দিক থেকে আবশ্যক; এটা সৌভাগ্যের কথা, যেহেতু, আমি যতদূর জানি, এ বিষয়ে বর্তমানে কোন পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। কিন্তু, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখবো, মানসচিত্রের অস্তিত্ব এবং প্রত্যক্ষণের সাথে তাদের সাদৃশ্য অবশ্যই (*is*) একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

মানসচিত্র দেখা দেয় নানান ভাবে, এবং নানান ভূমিকা পালন করে। কতকগুলো আসে কোন সংবেদনের পরিবৃদ্ধি (accretion) হিসাবে, যেগুলোকে মনোবিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ মানসচিত্র বলে স্বীকার করে না; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যে সব জিনিস আমরা কেবল দেখি তাদের স্পর্শগত বৈশিষ্ট্য, এবং যে সব জিনিস কেবল আমরা স্পর্শ করি তাদের দৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য তৈরী হয় এদের দিয়ে। আমি মনে করি যে, স্বপ্ন অংশতঃ মানসচিত্রের এই শ্রেণীর অন্তর্গত : কতকগুলো স্বপ্ন ঘটে কোন সাধারণ উদ্দীপকের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে

এবং এসব ক্ষেত্রে মানসচিত্র হচ্ছে সেইগুলো যেগুলোর ইঙ্গিত পাওয়া যায় সংবেদন থেকে, কিন্তু এ ইঙ্গিত আসে আমরা জাগ্রত থাকলে যে রকম হতো তার চেয়ে বেশী নির্বিচারভাবে। তারপর আছে সেই সব মানসচিত্র যেগুলো, তাদের সম্পর্কে আমাদের অনুভূতির দিক থেকে, আদৌ কোন সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়ঃ সেই সব মানসচিত্র যেগুলো দিবা স্বপ্নে অথবা প্রবল বাসনায় কেবল ভেসে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের মাথার ভেতর এসে ঢোকে। এবং সবশেষে আছে সেই সব মানসচিত্র যেগুলো জেগে ওঠে ঐচ্ছিকভাবে—উদাহরণস্বরূপ, একটা কামরা কি ভাবে সাজানো যায় তা বিবেচনা করার সময়ে। এই সর্বশেষ প্রকারটার গুরুত্ব আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে এর সম্পর্কে আমি আর কিছুই বলবো না, কারণ 'ঐচ্ছিক' (voluntary) শব্দটার দ্বারা আমরা কি বুঝাতে পারি তার মীমাংসা করার আগে পর্যন্ত এর আলোচনা থেকে আমরা কোন উপকার পাব না। প্রথম প্রকারটা সংবেদনের পরিবৃদ্ধি হিসাবে আসে, এবং বস্তু সম্পর্কে আমাদের অনুভূতিকে এমন এক ধরনের পরিপুষ্টি ও শক্তিশালিতা[১] দেয়, কেবল উদ্দীপক থেকে যার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ প্রকারটা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখনকার মতো [আলোচনার জন্য] যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে স্মৃতি ও কল্পনায় মানসচিত্রের ব্যবহার; এবং এ দুটোর মধ্যে আমি আরম্ভ করবো স্মৃতি নিয়ে।

১. Rotundity and full-bloodedness.

অষ্টাদশ অধ্যায়

কল্পনা ও স্মৃতি

এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে কল্পনা ও স্মৃতি, এ দু'টো বিষয় নিয়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরেরটা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে আমরা এটাকে দেখেছি বাইরে থেকে। এখন আমরা চাই স্মরণকারী ব্যক্তির কাছে কেবল যা প্রত্যক্ষণযোগ্য তাকেই হিসাবের মধ্যে এনে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে এর সম্পর্কে আর কিছু জানার আছে কিনা।

মানসচিত্র যে ভূমিকা পালন করে, আমি মনে করি না যে তার ক্ষেত্রে এ জিজ্ঞাসা অত্যাবশ্যক। কখনও কখনও স্মৃতি-মানসচিত্র আছে, কখনও কখনও নেই। কখনও কখনও স্মৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যখন মানসচিত্র আসে তখন আমরা তা সত্ত্বেও জানতে পারি যে, মানসচিত্রগুলো ভ্রান্ত; যার থেকে আমরা দেখতে পারি যে, স্মৃতির অন্য এবং তার চেয়েও বিশ্বস্ত একটা উৎস আমাদের আছে। স্মৃতি মানসচিত্রের উপর নির্ভর করতে 'পারে' (may)—উপরোক্ত ক্ষেত্রে, আমি শৈশবে যে ঘরে বাস করতাম তার মানসচিত্রের উপর; কিন্তু এটা সম্পূর্ণ শাব্দিকও হতে পারে। আমার বয়স দশ বছর হওয়ার আগে আমি যেসব জিনিস দেখেছিলাম তাদের ক্ষেত্র ছাড়া মনশ্চক্ষে দেখার শক্তি আমার সামান্য; এখন কোন লোকের সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তার মুখাবয়ব আমি মনে রাখতে ইচ্ছা করি, তখন আমি দেখি যে, তার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে দেখার সময় শব্দযোগে তাকে বর্ণনা করা এবং তারপর শব্দগুলোকে মনে রাখা। নিজের কাছে আমি বলি: "এ লোকটার নীল চোখ, বাদামী দাড়ি এবং ছোট নাক আছে; সে খাটো এবং তার পৃষ্ঠদেশ গোলাকার এবং কাঁধ ঢালু।" মাসের পর মাস এ শব্দগুলো আমি মনে রাখতে পারি, এবং এ বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এমন দু'জন ব্যক্তি একসঙ্গে উপস্থিত না থাকলে, এগুলোর সাহায্যে আমি লোকটাকে চিনতে পারি। এ বিষয়ে কোন মনশ্চক্ষে দর্শনকারী আমার উপর সুবিধা নিতে পারতো। তথাপি আমি যদি আমার শব্দের তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ ও সুনির্দিষ্ট করতে পারতাম তাহলে এ বেশ নিশ্চিতভাবে তার উদ্দেশ্য

পূর্ণ করতে পারতো। আমি মনে করি না যে, স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্যে ঐকান্তিকভাবেই (absolutely) শব্দের বিপরীতে মানসচিত্র অত্যাবশ্যক হয়। 'চিন্তা'য় আমরা যে সব শব্দ ব্যবহার করি তারা স্বয়ং কখনও কখনও শব্দের মানসচিত্র কিনা, অথবা সব সময়ই (ওয়াটসন যেমন মনে করেন) তারা প্রারম্ভিক আন্দোলন[১] কিনা, সেটা আরেক প্রশ্ন, যে সম্পর্কে আমি কোন মত দিচ্ছি না, যেহেতু পরীক্ষামূলকভাবে এর মীমাংসা করা সম্ভব হওয়া উচিৎ।

স্মৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেটাই, মানসচিত্রের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই, এবং ওয়াটসনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যা উল্লেখিত হয় নি। অতীতের প্রতি ইঙ্গিত (reference) আমি বুঝাচ্ছি। অতীতের প্রতি এ ইঙ্গিত কেবল যে অভ্যাস-স্মৃতির মধ্যে—যেমন, স্কেটিং অথবা আগে-শেখা কোন কবিতার পুনরাবৃত্তির মধ্যে—আছে, তা নয়। কিন্তু অতীত ঘটনার স্মৃতির মধ্যে এটা আছে। এ ক্ষেত্রে, আমরা পূর্বে যা করেছিলাম কেবল তার পুনরাবৃত্তি করি না : তখন আমরা ঘটনাটাকে বর্তমান হিসাবে অনুভব করেছিলাম, কিন্তু এখন আমরা একে অনুভব করি অতীত হিসাবে। এটা দেখানো হয় অতীত কালের ব্যবহারের মধ্যে।[২] সেই মুহূর্তে নিজেদেরকে আমরা বলি "আমি ভাল ডিনার 'খাচ্ছি'," কিন্তু পরের দিন আমরা বলি "আমি ভাল ডিনার 'খেয়েছিলাম'।" কাজেই, গোলকধাঁধার ভেতরকার ইঁদুরের মতো আমরা আমাদের পূর্বে-সম্পাদিত কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটাই না : আমরা শাব্দিক সূত্রটাকে পরিবর্তন করি। কেন আমরা এ রকম করি? অতীতের প্রতি কোন স্মৃতির এ ইঙ্গিত কি দিয়ে তৈরী?[৩]

প্রথমে সংবেদনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটা বিবেচনা করা যাক। সন্দেহ নেই যে, সর্বদাই কোন স্মৃতির উদ্দীপক বর্তমানের অন্তর্গত কোন জিনিস, কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়া (অথবা তার অংশ) বর্তমান উদ্দীপকের চেয়ে কোন অতীত ঘটনার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। কোন নির্জীব

১. Movements.
২. 'in the use of the past tense.'
৩. এ প্রসঙ্গে, দ্রঃ ব্রড, 'মন ও প্রকৃতির মধ্যে তার স্থান,' "স্মৃতি" সম্পর্কিত অধ্যায়ের পৃঃ ২৬৪ ও তার পরবর্তী।

পদার্থের মধ্যে এর নিজের একটা তুলনা পাওয়া যেতে পারে, যেমন, গ্রামোফোন রেকর্ডের মধ্যে। এ মুহূর্তে আমাদের আলোচ্য বিষয়টা কোন পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া জাগে তার সঙ্গে আমাদের প্রতিক্রিয়ার 'সাদৃশ্য' নয়; সেটা হচ্ছে তার 'অ-সাদৃশ্য', এবং সে আসদৃশ্যটা এই যে, এখন আমরা অতীতত্বের (pastness) একটা অনুভূতি পাচ্ছি, যা আমরা শুরুতে পাইনি। এটা সম্ভব নয় যে, কোন ডিকটাফোনে আপনি "আমি তোমাকে ভালবাসি" গানটা গাইবেন, এবং পাঁচদিন পর তাকে দিয়ে আপনি বলাবেন, "গত বুধবার আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম"; তথাপি, আমরা যখন স্মরণ করি তখন এ কাজটাই করি। যাই হোক, আমি মনে করি যে, স্মৃতির এ দিকটা সম্ভবতঃ, অনুষঙ্গ যখন মস্তিষ্কগত, তখন অনুষঙ্গজাত প্রতিক্রিয়ার কোন দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত : আমি এও মনে করি যে, যে গুণগত পার্থক্য, সব সময় না হলেও, সচরাচর মানসচিত্র ও সংবেদনের মধ্যে থাকে তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ আছে। মনে হয় যে, এসব ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়াকে কতকগুলো নির্দিষ্ট উপায়ে প্রত্যক্ষভাবে জাগানো যেতো, সংবেদনের মাধ্যমে জাগানো প্রতিক্রিয়া সচরাচর তার থেকে ভিন্ন। এটা বেশী অস্পষ্ট, এবং যখন তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় তখন তার সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে আমরা তাকে 'কাল্পনিক' বলি। কোন এক শ্রেণীর ক্ষেত্রগুলোতে, আমরা জানতে পারি যে, আমরা যদি চাই তাহলে একে আমরা 'বাস্তব' (real) করতে পারি; দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে সব দৃশ্যবস্তু আমরা স্পর্শ করতে পারি তাদের দ্বারা উৎপন্ন স্পর্শগত মানসচিত্রগুলোর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এ জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে মানসচিত্রটাকে আমরা বস্তুটার সঙ্গে যুক্ত করি, এবং এর 'কাল্পনিক' চরিত্রটা নজরে পড়ে না। এগুলো হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্র যেখানে অনুষঙ্গটার উৎস হচ্ছে প্রকৃতির অন্তর্গত কোন বস্তু-বিন্যাস (collocation), আমাদের কোন দৈবঘটিত অভিজ্ঞতা নয়। তবে অন্য ক্ষেত্রগুলোতে, আমরা যদি চিন্তা করে দেখি তাহলে, আমরা সম্পূর্ণ স্পষ্টরূপে জানতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন অবস্থার উপর অনুষঙ্গটা নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন এক জায়গায় আমরা হয়তো কখনও খুব চিত্তাকর্ষক কথোপকথনে রত থেকেছি, এবং তারপর সে জায়গায় উপস্থিত হলে প্রতিবারই এ কথোপকথনের কথা চিন্তা করি।

কিন্তু আমরা জানি যে, কথোপকথনটা যে জায়গায় ঘটেছিলো আমরা যখন সেখানে ফিরে যাই তখন প্রকৃতপক্ষে সেটা আর ঘটে না। এ রকম কোন ক্ষেত্রে, বর্তমানে সংবেদনযোগ্য সত্য হিসাবে ঘটনাটার স্বরূপ এবং কেবল অনুষঙ্গ দ্বারা পুনরোত্থিত হিসাবে ঘটনাটার স্বরূপ, এ দু'টোর অন্তর্নিহিত পার্থক্যটা আমরা লক্ষ্য করি। আমি মনে করি যে, আমাদের অতীতত্বের অনুভূতির সঙ্গে এ পার্থক্যের সংযোগ আছে। অবশ্য, যে পার্থক্যটা আমরা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করতে পারি সেটা আমাদের বর্তমান স্মৃতি এবং বর্তমান সংবেদনযোগ্য সত্যসমূহের মধ্যবর্তী পার্থক্য, আমাদের বর্তমান স্মৃতি এবং অতীত কথোপকথনের পার্থক্য নয়। এ পার্থক্য এবং আমাদের স্মরণটাকে বর্তমানের মধ্যে স্থাপন করলে বর্তমান সত্যগুলোর সঙ্গে আমাদের স্মরণের যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয় সে অসামঞ্জস্য—এ দু'টোর যোগফল সম্ভবতঃ আমাদের স্মৃতিগুলোকে অতীতের প্রতি আরোপ করার (referring) একটা কারণ। কিন্তু আমি দ্বিধার সঙ্গেই এ ইঙ্গিত দিচ্ছি; এবং কল্পনাকে পরীক্ষা করার পর আমরা যেমন দেখবো, এটা সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না, যদিও এর একটা অংশ সত্য হতে পারে।

কতকগুলো সত্য আছে যাদের মধ্যে উপরোক্ত মতটাকে সমর্থন করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। স্বপ্নের মধ্যে যখন আমাদের বিচারশক্তি নিস্ক্রিয়, তখন অতীত ঘটনাগুলো যে প্রকৃতপক্ষে ঘটছে, এ উপলব্ধির বশবর্তী হয়ে আমরা ঘটনাগুলোকে পুনরায় নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারি; এবং, অতীতের প্রতি স্মৃতির ব্যঞ্জনা অবশ্যই এমন একটা বিষয় যার মধ্যে কতকটা উন্নততর (advanced) ধরনের একটা মানসক্রিয়া রয়েছে। ফলতঃ কখনও কখনও আমাদের এ উপলব্ধি ঘটে যে, এখন যা ঘটছে তা সত্যি-সত্যি অতীতে ঘটেছিলো; এটা একটা অতি পরিচিত এবং বহু-আলোচিত অধ্যাস (illusion)। এটা বিশেষতঃ তখন ঘটে যখন আমরা ভেতরের কোন সংগ্রাম বা হৃদয়াবেগের মধ্যে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকি, যার ফলে বাইরের ঘটনাবলী কেবল অস্পষ্টভাবে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করে। আমি মনে করি যে, এসব অবস্থায় সংবেদনের ধর্ম মানসচিত্রের ধর্মের কাছাকাছি চলে যায়, এবং এটাই হচ্ছে এ অধ্যাসের উৎস।

এ ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে অতীতত্বের অনুভূতিটা বাস্তবিকই জটিল। অনুষঙ্গ থেকে কিছু-একটার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে সংবেদনযোগ্য ঘটনা থেকে তা স্পষ্টরূপে পৃথক। সুতরাং আমরা মনে করি না যে, এই কিছু-একটা এখন ঘটছে; এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চয়তা পেতে পারি এ সত্য থেকে যে, এখন যা ঘটছে তার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য নেই। তাহলে হয় আমরা সেই কিছু-একটাকে অতীতের উপর আরোপ (refer) করতে পারি, যে ক্ষেত্রে আমরা পাই একটা স্মৃতি, যদিও সে স্মৃতি যে একান্তই নির্ভুল হবে তা নয়; নয়তো এই কিছু-একটাকে আমরা নিছক কাল্পনিক বলে ধরতে পারি, যে ক্ষেত্রে আমরা সেই জিনিস পাই যাকে আমরা বিশুদ্ধ কল্পনা বলে মনে করি। কেন আমরা কখনও একটা করি এবং কখনও অন্যটা, সে অনুসন্ধান বাকী রয়ে গেছে, যার সূত্র ধরে আমরা চলে আসি কল্পনার আলোচনায়। আমি মনে করি, আমরা দেখতে পাব যে, স্মৃতি কল্পনার চেয়ে অধিকতর মৌলিক, এবং কল্পনা যা দিয়ে তৈরী সে কেবল বিভিন্ন তারিখের জড়-করা স্মৃতি। কিন্তু এ মতবাদ সমর্থন করতে হলে প্রয়োজন হবে, প্রথমে, কল্পনার একটা বিশ্লেষণ, এবং তারপর, এ বিশ্লেষণের আলোকে, স্মৃতি সম্পর্কিত আমাদের মতবাদকে আরও সুনির্দিষ্ট করার প্রচেষ্টা।

শব্দটা থেকে মনে হতে পারতো যে, কল্পনা মানসচিত্রের সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে (essentially) সম্পর্কিত; কিন্তু আসলে তা নয়। সন্দেহ নেই যে, আমরা যখন কল্পনা করি তখন প্রায়শই, এমন কি সচরাচর, মানসচিত্র উপস্থিত থাকে, কিন্তু তা না থাকলেও চলে। কোন লোক আপনা থেকেই (improvise) যে সঙ্গীত তৈরী করতে যাচ্ছে, পূর্বে কোন মানসচিত্র না পেয়েই সে পিয়ানোর উপর তার সুর তুলতে পারে; কোন কবিতাকে প্রথমে নিজের মাথার ভেতর তৈরী না করেই একজন কবি তা লিখে ফেলতে পারেন। কথা বলার মধ্যে এক শব্দ আরেক শব্দের ইঙ্গিত দেয়, এবং যথেষ্ট শাব্দিক অনুষঙ্গবিশিষ্ট একজন লোক বেশ কিছু সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে তাদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। চিন্তা না করে কথা বলার শিল্পটা বিশেষভাবে সভার বক্তৃতাকারীদের জন্য আবশ্যক, যাঁদেরকে একবার আরম্ভ করে ফেলার পর চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়, এবং যাঁরা শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে যেরূপ আচরণ করেন ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত জীবনেও সেরূপ আচরণ করার অভ্যাস

করেন। তথাপি যে সব উক্তি তারা করেন, স্বীকার করতে হবে যে, সেগুলো প্রায়ই কল্পনাপ্রসূত। সুতরাং, কল্পনার সারবস্তুটা (essence) মানসচিত্রের মধ্যে অবস্থান করে না।

আমি বলবো যে, কল্পনার সারবস্তুর মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসের অভাব এবং সেই সঙ্গে জানা উপাদানগুলোর একটা অভিনব সম্মেলন। কোন স্মৃতি যখন নির্ভুল হয়, তখন তার মধ্যে উপাদানের সম্মেলনটা অভিনব নয়; এবং, নির্ভুল হোক বা না হোক, সেখানে বিশ্বাস থাকে।[১] আমি বলছি যে কল্পনায় "জানা উপাদানগুলোর একটা অভিনব সম্মেলন" থাকে, কারণ কোন কিছুই যদি অভিনব না হয় তাহলে আমরা পাই স্মৃতির দৃষ্টান্ত, এবং যদি উপাদানগুলো অথবা তাদের দু'একটা অভিনব হয় তাহলে আমরা পাই প্রত্যক্ষণের দৃষ্টান্ত। এই শেষের কথাটা আমি বলছি এজন্য যে, আমি হিউমের এ নীতিটা গ্রহণ করি যে, পূর্ববর্তী "সংবেদন" (impression) ব্যতিরেকে কোন "ধারণা" নেই। আমি এটা বুঝাই না যে, যে ক্ষেত্রে অমূর্ত ধারণা নিয়ে কথা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রেও এটাকে [নীতিটাকে] অন্ধভাবে এবং পণ্ডিতজনের মতো প্রয়োগ করতে হবে। এরূপ মনে করা আমার উচিত হবে না যে, স্ট্যাচু অভ লিবার্টি না দেখা পর্যন্ত কারও মনে স্বাধীনতার ধারণা জন্মাতে পারে না। বরং নীতিটা মানসচিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি নিশ্চয়ই মনে করি না যে, কোন মানসচিত্রের মধ্যে এমন কোন উপাদান থাকতে পারে যা, মানসচিত্রের বিশেষ প্রকৃতিগতভাবে, কোন পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষণের কোন উপাদানেরই সদৃশ নয়।

মানসচিত্র সংবেদনের 'অনুলিপি' (copy), এ মতবাদ প্রসঙ্গে হিউম নিজের জন্যে একটা অনাবশ্যক বিপদ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ধরা যাক কোন ব্যক্তি, যেসব বিভিন্ন রঙের মাত্রা (shade) দিয়ে বর্ণালী গঠিত, কেবল একটা মাত্রা ছাড়া তাদের সবগুলোকেই দেখেছে। আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে, ধরা যাক সে কখনও কোন নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র পরিসরের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট আলোক দেখে নি, কিন্তু আর সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট আলোক দেখেছে। যে মাত্রা সে কখনও দেখে নি, সে কি তার কোন
গড়তে পারবে? হিউম মনে করেন যে, সে পারবে, যদিও

১. অর্থাৎ, বিশ্বাস স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। (অনুবাদক)

নীতিটার সঙ্গে একথার সংগতি নেই। আমি বলবো যে, মানসচিত্র সকল ক্ষেত্রেই সংবেদনের কম-বেশী অস্পষ্ট অনুলিপি (copies), যে কারণে কোন মানসচিত্রকে সামান্য পার্থক্যবিশিষ্ট কতকগুলো বিভিন্ন সংবেদনের যে-কোন একটার অনুলিপি বলে মনে করা যায়। হিউমের প্রশ্নটার জন্য একটা পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্ত পেতে হলে আমাদের ধরে নেওয়া দরকার যে, বর্ণালীর একটা ডোরা (band) লোকটি দেখেনি—ধরা যাক গোটা হলুদ রঙটাই। ধরে নেওয়া যায় যে, তখন সে অস্পষ্টতার দরুন এমন কতকগুলো মানসচিত্র গঠন করতে পারবে যেগুলো কমলা-হলুদে প্রযোজ্য, এবং এমন আরও কতকগুলো যেগুলো সবুজ-হলুদে প্রযোজ্য; কিন্তু এমন একটাও সে গঠন করতে পারবে না যা কমলা ও সবুজের মাঝামাঝি কোন হলুদে প্রযোজ্য। এটা হচ্ছে এমন একটা অবাস্তব ধাঁধার দৃষ্টান্ত যা উৎপন্ন হয়েছে অস্পষ্টতার কথা ভুলে যাওয়ার দরুন। নিম্নলিখিত গভীর সমস্যাটার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে: আগে কেশ ছিল, এমন একজন লোক এখন কেশহীন; সে তার কেশ হারিয়েছে একটি একটি করে; সুতরাং এমন একটা চুল অবশ্যই ছিল যার থেকে এ পার্থক্যটা দেখা দিয়েছে, যেটা থাকাকালে সে কেশহীন ছিল না, কিন্তু যেটা হারাবার পর সে কেশহীন হয়ে গেল। 'কেশহীনতা' অবশ্যই একটা অস্পষ্ট ধারণা; এবং যে ভাবে মানসচিত্র মূলাদর্শের অনুলিপি হয় তার সম্পর্কে আমরা যখন কথা বলছি, তখন 'অনুলিপি হওয়া'ও (copying) তাই।

কল্পনায় কি কারণে আমরা কোন-একভাবে উপাদানগুলোকে একত্র করি? প্রথমে মূর্ত দৃষ্টান্তের কথা চিন্তা করা যাক। আপনি পড়লেন যে, সম্প্রতি আপনি যে পথে ভ্রমণ করেছেন সে পথে কোন একটা জাহাজ ডুবে গেছে; "আমি ডুবে যেতে পারতাম," এ চিন্তাটা জাগাবার জন্যে অতি সামান্য কল্পনাই প্রয়োজন। এখানে যা ঘটছে তা অতি স্পষ্ট: আপনি স্বয়ং এবং জাহাজ-ডুবি, এই উভয়ের সঙ্গে পথটা অনুষক্ত (associated) এবং আপনি কেবল মধ্যপদটা[১] সরিয়ে দিচ্ছেন। উপরে যে ক্রিয়াটার অতি সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, সাহিত্য রচনাশক্তি অনেকাংশে তা একটা সম্প্রসারিত রূপ। যেমন ধরুন:

[১] অর্থাৎ, যে পথে জাহাজটা চলেছে সে পথটা। (অনুবাদক)

আমাদের গতকল্যগুলো বোকাদের জন্য আলোকিত করেছে
ধূলিময় মৃত্যুর পথ। নিবে যাও, নিবে যাও, ক্ষুদ্র মোমবাতি!
জীবনটা কেবলই এক চলমান ছায়া, এক হতভাগ্য অভিনেতা
মঞ্চের উপর যে সদর্পে চলাফেরা করে, নড়েচড়ে,
এবং তারপর আর তার কণ্ঠ শোনা যায় না। এ যেন
নির্বোধের বলা একটা গল্প, শব্দ আর উত্তেজনায় পূর্ণ,
সম্পূর্ণ অর্থহীন।

যে সব অনুষঙ্গ সেক্সপিয়ারকে এ লাইনগুলো চিন্তা করতে প্রযোজিত করেছিল তাদের সবগুলো ব্যাখ্যা করার দাবী আমি করছি না, কিন্তু অল্প কয়েকগুলো অতি স্পষ্ট। "ধূলিময় মৃত্যু"-র ইঙ্গিতটা এসেছে *Genesis*, ৩য়, ১৯ থেকে: "কারণ তুমি ধূলি, এবং ধূলিতেই তুমি ফিরে যাবে।" "আলো ধরে নির্বোধদের পথ দেখানো" বলার পর "মোমবাতি", এবং তার থেকে সেই পথ ধরে মোমবাতি দ্বারা আলোকিত কোন "চলিষ্ণু ছায়া"র কথা চিন্তা করা স্বাভাবিক। ছায়া থেকে অভিনেতায় যাওয়া ছিল শেক্সপিয়ারের মনের মতো একটা সুপ্রতিষ্ঠিত অনুষঙ্গ; এভাবে Midsummer Night's Dream-এ অভিনেতাদের সম্পর্কে তিনি বলেন: "যারাই হচ্ছে এ শ্রেণীর মধ্যে সর্বোত্তম, এবং সর্বনিকৃষ্টও তার চেয়ে খারাপ নয়, কল্পনা যদি তাদের সংশোধন করে দেয়।" "নিকৃষ্ট অভিনেতা" থেকে "নির্বোধের বলা কাহিনী"-তে যাওয়া থিয়েটার-ম্যানেজারের পক্ষে কঠিন পদক্ষেপ নয়; এবং সন্দেহ নেই যে, যেসব গল্প তাদের "কিছুই না বোঝানো" সত্ত্বেও তাঁকে শুনতে হয়েছিল, 'শব্দ ও উগ্র আবেগ" প্রায় সময়ই তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা যদি শেক্সপিয়ার সম্পর্কে আরও বেশী জানতাম তাহলে এ রকম করে তাঁর সম্পর্কে আমরা আরও বেশী ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

সুতরাং মনে হয় যে, অসাধারণ কল্পনাশক্তি[১] প্রধানতঃ সেই সব অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল যেগুলো সচরাচর ঘটে না, এবং যাদের একটা আবেগিক মূল্য আছে এই কারণে যে, তাদের ঘিরে একটা নিয়মিত (uniform) আবেগময় ভাব আছে। মৃত্যুর পক্ষে অনেক বিশেষণই উপযুক্ত: ম্যাকবেথের মেজাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন মেজাজে একে বলা যায় "মহৎ, পরাক্রান্ত

১. **Imaginative gifts.**

ও প্রবল।" মৃত্যু-শুল্কের (Death-Duties) কথা চিন্তা করে রাজস্ব বিভাগের কোন চ্যান্সেলার "লাভজনক মৃত্যু"-র কথা বলতে ইচ্ছুক হতে পারেন; তথাপি, ভ'নের (Vaughan) মত তিনি "প্রিয় সুন্দর মৃত্যু"-র কথা বলবেন না। শেক্সপিয়ারও এভাবে মৃত্যু সম্পর্কে বলতেন না, কারণ মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল পেগানধর্মী (Pagan); তিনি "সেই চাষাড়ে মৃত্যু"-র কথা বলেন; সুতরাং কোন লোকের শাব্দিক অনুষঙ্গের মধ্যে তার আবেগিক প্রতিক্রিয়ার চাবিকাঠি পাওয়া যেতে পারে, কারণ প্রায়ই তার মনের মধ্যে দু'টো শব্দ যার দ্বারা যুক্ত হয় সেটা এই যে, তারা সাদৃশ্যপূর্ণ আবেগ জাগায়।

কল্পনার সঙ্গে বিশ্বাসের যে অভাব যুক্ত থাকে তা কতকটা সূক্ষ্ম চিন্তার ফল; নিদ্রায় এবং প্রচণ্ড আবেগজাত উত্তেজনায় তাকে পাওয়া যায় না। তামাশাচ্ছলে বালক-বালিকারা ভয়ের জিনিস আবিষ্কার করে এবং তারপর সেগুলোতে বিশ্বাস করতে শুরু করে। বিশ্বাস না করে কোন ধারণা পোষণ করা হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যার মধ্যে মানসিক চাপ থাকে, এবং যার জন্য বুদ্ধিগত উন্নতির একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছানো আবশ্যক। মনে করা যেতে পারে যে, এখন পর্যন্ত স্বপ্নের মধ্যে যে রকম, প্রথমে সে রকম ভাবে সর্বক্ষেত্রেই কল্পনার মধ্যে বিশ্বাস থাকতো। এখনকার মতো 'বিশ্বাস'-এর সংজ্ঞা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তার একটা মানদণ্ড (criterion) হচ্ছে কাজের উপর তার প্রভাব। যদি আমি বলি, "ধরা যাক আপনার সামনের দরজার বাইরে একটা বাঘ আছে," তাহলে আপনি অস্থির হবেন না; কিন্তু আমি যদি বিশ্বাস উৎপাদন করার মতো করে বলি, "আপনার সামনের দরজার বাইরে একটা বাঘ আছে," তাহলে আপনি বাড়ীতে থেকে যাবেন, যদিও তার ফলে আপনার অফিসে যাওয়ার ট্রেন ধরতে আপনি অপারগ হন। আমি যখন বলি যে, উন্নত আকারের কল্পনায় বিশ্বাসের অভাব থাকে তখন আমি যা বুঝাই, এটা তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর আদিম (primitive) রূপগুলোর ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। এবং যে সভ্য, বয়স্ক ব্যক্তি অন্ধকার রাতে গীর্জা-প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমন-কি তার মধ্যেও ভয়ের অনুভূতি জাগতে পারে, যদি তার কল্পনা পরিচালিত হয় ভূত-প্রেতের দিকে।

কল্পনা যখন বিশ্বাসে পর্যবসিত হয় তখন সচরাচর তা অতীত সম্পর্কে কোন বিশ্বাসে পরিণত হয় না। সাধারণতঃ কল্পিত বস্তুটাকে আমরা বর্তমানের

মধ্যে স্থাপন করি, কিন্তু সেখানে নয় যেখানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাকে প্রত্যক্ষ করা যেত। আমরা যদি তাকে অতীতের মধ্যে স্থাপন করি, তাহলে তার কারণটা এই যে, অতীতের মধ্যে আমাদের জন্য কিছু পরিমাণে বড় রকমের সাংবেগিক তাৎপর্য আছে। যে ব্যক্তিকে আমরা ভালবাসি সে যদি বিপদাপন্ন হয়, এবং সে বিপদমুক্ত হয়েছে কিনা তা যদি আমরা না জানি, তাহলে তার মৃত্যুর কল্পনা থেকে আমরা এ বিশ্বাসে পৌঁছতে পারি যে, সে নিহত হয়েছে। এবং কল্পনা প্রায়ই আমাদেরকে এ রকম বিশ্বাস করতে প্রযোজিত করে যে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এ সব দৃষ্টান্তের মধ্যে যে জিনিসটা সাধারণ সেটা হচ্ছে আবেগমূলক আগ্রহ (emotional interest): এর দরুন প্রথমে আমরা একটা ঘটনা কল্পনা করি এবং তারপর আমরা অবস্থা অনুযায়ী এ চিন্তায় এসে পৌঁছি যে, সেটা ঘটেছে, ঘটছে, অথবা ঘটবে। আশা এবং ভয়ের মধ্যে এ কার্যফলটা সমভাবেই উপস্থিত; ইচ্ছা-পূরণ এবং ভীতি-পূরণ[1] সমভাবেই স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের উৎস। বহুতর বিশ্বাসের এ রকমের একটা উৎস আছে; কিন্তু, মনোবিশ্লেষণ সত্ত্বেও,[2] অনেকগুলোর ভিত্তিটা এর চেয়েও যুক্তিসঙ্গত। আমি বিশ্বাস করি যে, কলম্বাস প্রথমে মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন ১৪৯২-তে, যদিও আমার পক্ষে ১৪৯১ অথবা ১৪৯৩ সমভাবেই উপযুক্ত হতো। আমি আবিষ্কার করতে পারি না যে, এ বিশ্বাসের মধ্যে, অথবা সেমিপ্যালাটিন্‌স্ক (semipalatinsk) যে মধ্য এশিয়ায় এ বিশ্বাসের মধ্যে কোন আবেগিক উপাদান আছে। আমাদের সব বিশ্বাসই অযৌক্তিক, আজকাল সম্ভবতঃ এ মতটা কতক পরিমাণে অতিরঞ্জিত (overdone), যদিও যেসব মত এর দ্বারা স্থানচ্যুত হয়েছে তাদের চেয়ে এটা সত্যের অনেক বেশী কাছাকাছি।

এখন আমাদেরকে স্মৃতির প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হবে। কল্পনার মত যথার্থ স্মৃতির মধ্যে অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানের কোন পুনর্বিন্যাস নেই; বরঞ্চ এসব উপাদান যে প্যাটার্ন অনুসারে ঘটেছিলো, এর উচিৎ তাদেরকে সে অনুসারে পুনরুদ্ধার করা। স্মৃতি এবং কল্পনার মধ্যে এ-ই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য; আমরা দেখেছি যে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে কল্পনা বলে প্রতীয়মান

১. Wish-fulfilment and dread-fulfilment.

২. অর্থাৎ, মনোবিশ্লেষণ আমাদের যাই শেখাক না কেন। (অনুবাদক)

না হলেও আসলে তাই—বিশ্বাস, এমনকি অতীতের প্রতি ইঙ্গিত সম্পন্ন বিশ্বাসও তার মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারে। তার ফলে অতীতের প্রতি ইঙ্গিতের মধ্যে কি আছে তা এখনও আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে, যেহেতু কল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করার আগে সাময়িকভাবে যে মত প্রস্তাব করা হয়েছিলো তা অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

একটা সম্ভাব্য মত আছে, যাকে ডঃ ব্রড, স্মৃতির উপর লেখা তাঁর যে অধ্যায়ের কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সে অধ্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ না করলেও তার প্রস্তাব করেছেন (suggest)। এ মত অনুসারে, যাকে 'অপ্রকৃত বর্তমান'[1]—অর্থাৎ, কালের এমন একটা সংক্ষিপ্ত অংশ যার সমস্তটা জুড়ে যেসব ঘটনা ঘটে তাদের সবগুলোকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়—বলা হয়, তার সীমার মধ্যে যে কালিক অনুক্রম প্রত্যক্ষ করা যায় তার থেকে আমাদের আরম্ভ করতে হবে। (শীঘ্রই আমি এ প্রসঙ্গে ফিরে আসবো)। উদাহরণস্বরূপ, একটা দ্রুত চলনকে[2] আপনি অখণ্ডভাবে দেখতে পারেন; আপনি কেবল এটা জানেন যে, বস্তুটা প্রথমে এক জায়গায় ছিল এবং তারপর অন্য জায়গায়। কোন হাতঘড়ির (watch) সেকেণ্ডের কাঁটার চলন আপনি দেখতে পারেন, কিন্তু ঘণ্টার কাঁটা অথবা মিনিটের কাঁটাটার পারেন না। এ অর্থে আপনি যখন কোন চলন দেখেন, তখন আপনি জানেন যে, তার এক অংশ অন্য অংশের পূর্বে ঘটেছে। এভাবেই আপনি 'পূর্ববর্তী'র (earlier) ধারণা অর্জন করেন, এবং 'অতীত' দ্বারা আপনি বোঝাতে পারেন 'এর পূর্ববর্তী', যেখানে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটছে তা হচ্ছে 'এটা' (this)। এ হচ্ছে যৌক্তিক দিক থেকে সম্ভাব্য একটা মতবাদ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে বিশ্বাস করা কতকটা কঠিন মনে হয়। তবে এর চেয়ে সহজ কোন মতবাদের কথা আমি জানি না, এবং সেহেতু এর চেয়ে ভাল কিছু পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে সাময়িকভাবে একে আমি গ্রহণ করবো।

যে সব সংযোগের মাধ্যমে স্মৃতির সবচেয়ে উন্নত রূপগুলো তাদের চেয়ে কম জটিল রকমের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাদের কথা বিবেচনা করলে সেটা স্মৃতিকে বোঝার দিক থেকে সহায়ক হয়। যথার্থ স্মরণ

১. Specious present. ২. Quick movement.

(recollection) একটা পর্যায়-ক্রমের[১] সর্বশেষ প্রান্তে দেখা দেয়। আমি সে প্রক্রিয়ার পাঁচটা পর্যায়কে পৃথক করে দেখাবো, যার ফলে ক্রমিক উন্নতি অনুসারে স্মৃতি হয়ে দাঁড়ায় ষষ্ঠ পর্যায়। পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

১। **মানসচিত্র**—আমরা যেমন দেখেছি, মানসচিত্রগুলো, অন্ততঃ তাদের অপেক্ষাকৃত সরল অংশগুলোতে, প্রকৃতপক্ষে অল্প-বিস্তর অস্পষ্টভাবে অতীত সংবেদনের প্রতিরূপ (copy) হিসাবে দেখা দেয়, এমন-কি যখন তারা সেটা করে বলে কেউ জানে না। মানসচিত্রগুলো এই অর্থে 'স্মৃতিক' ঘটনা যে, যে সব উদ্দীপক পূর্বে তাদের মূলাদর্শের সঙ্গে অনুষক্ত হয়েছে সেই-সব উদ্দীপকের দ্বারা তারা উদ্রিক্ত হয়, যে-কারণে তাদের সংঘটন অনুষঙ্গ নিয়ম অনুসারে অতীত অভিজ্ঞতারই একটা ফল। কিন্তু স্পষ্টতঃই, যে মানসচিত্র প্রকৃতপক্ষে কোন অতীত ঘটনার প্রতিরূপ, প্রতিরূপ হিসাবে 'অনুভূত' না হলে তা কোন স্মৃতিরূপে দেখা দেয় না।

২। **পরিচয়**—আমরা যে অনুভূতিকে 'পরিচয়' (familiarity) বলি, মানসচিত্র ও প্রত্যক্ষণ আমাদের কাছে আসতে পারে অল্পবিস্তর সেই অনুভূতি-সহ, এবং শব্দ অথবা অন্যান্য দেহ-সঞ্চালনও তাই করতে পারে। যে সুর আপনি আগে শুনেছেন, আপনি যখন মানসচিত্রের সাহায্যে অথবা প্রকৃতপক্ষে গেয়ে তাকে স্মরণ করেন, তখন আপনার কাছে যা আসছে তার অংশবিশেষকে আপনি পরিচিত বলে এবং অংশবিশেষকে অপরিচিত বলে অনুভব করতে পারেন। এর ফলে আপনি ধারণা করতে পারেন যে, পরিচিত অংশটা আপনি নির্ভুলভাবে স্মরণ করেছেন এবং অপরিচিত অংশটা ভ্রান্ত রকমে ; কিন্তু এ ধারণা (judgment) পরবর্তী এক পর্যায়ের অন্তর্গত।

৩। **অভ্যাস-স্মৃতি**[২]—৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। লোকে বলে যে, কোন কবিতার যদি তারা নির্ভুল পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাহলে তারা সেটাকে স্মরণ করছে। কিন্তু এর মধ্যে যে অনিবার্যভাবেই কোন অতীত ঘটনার স্মৃতি উপস্থিত তা নয় ; কখন এবং কোথায় আপনি কবিতাটি পড়েছিলেন তা হয়তো আপনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। এ ধরনের স্মৃতি অভ্যাস মাত্র, এবং সারতঃ এ হচ্ছে হাঁটতে শেখার

১. Series of stages.

২. Habit-memory.

কথা স্মরণ করতে ব্যর্থ হয়েও হাঁটতে জানার মতো। সঠিক অর্থে একে স্মৃতি বলা উচিৎ হয় না।

৪। **পুনরাভিজ্ঞান**[১]—এর দু'টো রূপ আছে। (ক) আপনি যখন কোন কুকুর দেখেন তখন, আপনি যে ইতিপূর্বে কুকুর দেখেছিলেন, এমন কোন দৃষ্টান্ত স্মরণ না করে—এবং এ রকম দৃষ্টান্ত যে ঘটেছে, এমনকি তাও চিন্তা না করে—আপনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলেন "ওই একটা কুকুর"। এর মধ্যে অতীত সম্পর্কিত কোন জ্ঞান নেই; সারতঃ এটা কেবল একটা অনুষঙ্গমূলক অভ্যাস মাত্র। (খ) আপনি জানতে পারেন "আমি এটাকে আগে দেখেছিলাম," যদিও আপনি জানেন না কখন অথবা কোথায়, এবং কোন-ভাবেই পূর্ববর্তী ঘটনাটা স্মরণ করতে পারেন না। এ রকম কোন ক্ষেত্রে অতীত সম্পর্কে জ্ঞান আছে, কিন্তু তা অত্যন্ত সামান্য। আপনি যখন চিন্তা করেন (judge): "আমি 'এটা' আগে দেখেছিলাম," তখন 'এটা' শব্দটা অবশ্যই অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হবে, কারণ আপনি এখন যা দেখছেন আগে ঠিক তা দেখেননি, বরং এমন কিছু দেখেছিলেন যা অনেকটা এর মতো। সুতরাং আপনি কেবল এটুকু জানছেন যে, কোন অতীত সময়ে আপনি কিছু-একটা দেখেছিলেন যা, আপনি এখন যা দেখছেন, অনেকটা তার মতো। অতীত সম্পর্কে যে ন্যূনতম জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ঘটে থাকে, তার সম্পর্কে এই কথা।

৫। **তাৎক্ষণিক স্মৃতি**[২]।—এখন আমি সংবেদন ও সত্যিকার স্মৃতির মাঝামাঝি একটা এলাকায় আসছি; যাকে কখনও কখনও 'তাৎক্ষণিক স্মৃতি' বলা হয় তার এলাকায়। কোন ইন্দ্রিয় যখন উদ্দীপিত হয় তখন, উদ্দীপকের বিরতি ঘটার পর, তৎক্ষণাৎ তার অনুদ্দীপিত অবস্থায় ফিরে যায় না; পিয়ানোর তারের মতো, অল্প সময়ের জন্য সেটা (বলতে গেলে) কম্পিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন একটা বিদ্যুত-ঝলক দেখেন, তখন আপনার সংবেদনটা যতই সংক্ষিপ্ত হোক না কেন, পদার্থিক ঘটনা হিসাবে বিদ্যুত-চমকের (lightning) চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ সেটা টিকে থাকে। একটা সময় আছে যখন একটা সংবেদন ম্লান হয়ে আসতে থাকে:

১. Recognition.
২. Immediate memory.

তখন একে বলা হয় 'বিলীয়মান' (acoleuthic) সংবেদন। এ সত্যটার জন্যই আপনি অখণ্ডভাবে কোন আন্দোলন দেখতে পারেন। ইতিপূর্বে আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, আপনি ঘড়ির মিনিটের কাঁটাকে নড়তে দেখতে পারেন না, কিন্তু সেকেণ্ডের কাঁটাকে নড়তে দেখতে পারেন। এর কারণটা এই যে, কোন দৃষ্টিগত সংবেদনের ম্লান হয়ে আসার পক্ষে যে অল্প সময়ের দরকার তার মধ্যেই সেটা [সেকেণ্ডের কাঁটা] এমন কয়েকটা জায়গায় অবস্থান করে যাদের পার্থক্যটা বোঝা যায়, যার ফলে কার্যতঃ এক মুহূর্তের মধ্যে আপনি সেটাকে কয়েক জায়গায় দেখতে পান। তবে, ম্লান-হয়ে-আসা (fading) সংবেদনগুলোকে নতুন (fresh) সংবেদনগুলো থেকে পৃথক মনে হয়, এবং সেজন্যে যে বিভিন্ন অবস্থানগুলো সংবেদনের মধ্যে উপস্থিত সেগুলোকে ম্লান হয়ে আসার মাত্রা অনুসারে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানো হয়, এবং আপনি একটা প্রক্রিয়া হিসাবে গতি প্রত্যক্ষ করেন। কোন কথিত বাক্য শোনায় ক্ষেত্রেও ঠিক একথাগুলো প্রযোজ্য।

সুতরাং যে-কোন ক্ষণে আপনার সংবেদনের মধ্যে যা উপস্থিত তা কেবল একটা মুহূর্ত (instant) নয়, বরং তা একটা সংক্ষিপ্ত সসীম সময়; এই সংক্ষিপ্ত সসীম সময়কে বলা হয় 'অপ্রকৃত বর্তমান'।[১] বিলীয়মানতার (fading) অনুভূত মাত্রার সাহায্যে আপনি অপ্রকৃত বর্তমানের মধ্যে পূর্ব-বর্তী এবং পরবর্তীর পার্থক্য করতে পারেন, এবং এভাবে সত্যিকার স্মৃতির প্রয়োজন ছাড়াই কালিক অনুক্রমের অভিজ্ঞতা আপনার হতে পারে। আপনি যদি আমাকে দ্রুতগতিতে আমার বাহু বাম থেকে ডান দিকে নড়াতে দেখেন তাহলে আপনার যে অভিজ্ঞতা হয় সেটা, আপনি যদি এখন সে বাহুকে ডান দিকে দেখতেন এবং স্মরণ করতেন যে অল্প সময় আগে আপনি তাকে বাম দিকে দেখেছিলেন, তাহলে আপনার যে অভিজ্ঞতা হতো তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পার্থক্যটা এই যে, দ্রুত স্থান পরিবর্তনের মধ্যে সমস্তটাই অপ্রকৃত বর্তমানের মধ্যে পড়ে, যার ফলে গোটা প্রক্রিয়াটাই সংবেদনযোগ্য হয়। যে জিনিস তখনও সংবেদনযোগ্য, অব্যবহিত অতীতের অন্তর্গত কিছু-একটা হিসাবে তার জ্ঞানকে বলা হয় 'তাৎক্ষণিক স্মৃতি'। কালিক প্রক্রিয়ার যে

১. Specious present.

অনুভূতি আমাদের হয় তার প্রসঙ্গে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, কিন্তু সত্যিকার স্মৃতির কোন রূপ হিসাবে একে গণ্য করা যায় না।

৬। **সত্যিকার স্মরণ।**[১]—কথাটাকে সুনির্দিষ্ট করার জন্যে আমরা ধরে নেব যে, আমি আজ সকালে প্রাতরাশ হিসাবে কি খেয়েছিলাম তা আমি স্মরণ করছি। এ ঘটনা সম্পর্কে দু'টো প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে :

(ক) এখন আমি যখন স্মরণ করছি তখন কি ঘটছে ? (খ) স্মৃত ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার সম্বন্ধ কি ?

(ক) এখন যা ঘটছে সে সম্বন্ধে বলা যায় যে, আমার স্মরণের মধ্যে হয় মানসচিত্র নয়তো শব্দ থাকতে পারে; পরবর্তী ক্ষেত্রে শব্দগুলো স্বয়ং নিছক কল্পিত হতে পারে। আমি সেই ক্ষেত্রটাকে নেব যে ক্ষেত্রে শব্দ ছাড়াই মানসচিত্র আছে, যেটা অবশ্যই বেশী আদিম, যেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি না যে, শব্দ না থাকলে স্মৃতি অসম্ভব হতো।

প্রথম কথাটাকে এত সুস্পষ্ট মনে হয় যে, বহু প্রখ্যাত দার্শনিক যদি অন্য রকম চিন্তা না করতেন তাহলে এটা উল্লেখ করতেই আমি লজ্জাবোধ করতাম। কথাটা এই : এখন আর যা-ই ঘটতে থাকুক না কেন, স্মৃত ঘটনাটা ঘটছে 'না'। স্মৃতি সম্পর্কে প্রায়ই এভাবে কথা বলা হয় যেন তার মধ্যে স্মৃত অতীতটা বাস্তবিকই চলতে থাকে; উদাহরণস্বরূপ, বার্গসঁ বর্তমানের মধ্যে অতীতের ঢুকে পড়ার (interpenetration) কথা বলেন : এটা পৌরাণিক কাহিনী মাত্র; আমি যখন স্মরণ করি তখন যে ঘটনাটা ঘটে, স্মৃত ঘটনা থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেসব লোক অনাহারে আছে, তাদের সর্বশেষ আহারের কথা তারা স্মরণ করতে পারে, কিন্তু সেই স্মরণ থেকে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। আমরা যখন স্মরণ করি তখন সেখানে অতীতের কোন রহস্যময় উদবর্তন (survival) নেই; আছে কেবল অতীত ঘটনার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নতুন একটা ঘটনা। এই সম্বন্ধটা কি, শীঘ্রই আমরা তা আলোচনা করবো।

একথা সম্পুর্ণ পরিষ্কার যে, মানসচিত্রগুলো যখন কোন অতীত ঘটনার যথাযথ প্রতিরূপ, এমনকি তখনও স্মরণের পক্ষে তারা পর্যাপ্ত নয়। স্বপ্নে

১. True recollection.

কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে; কেউ যখন স্বপ্ন দেখছে তখন সে কোন অতীত ঘটনা স্মরণ করছে বলে মনে হয় না, বরং সে একটা নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়। সঠিক অর্থে, অতীতের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ কোন বিশ্বাস যদি আমাদের না থাকে তাহলে বলা যায় না যে আমরা স্মরণ করছি। স্বপ্নের মানসচিত্রগুলোর মতো যে সব মানসচিত্রকে সংবেদনের মতো মনে হয়, তাদের দ্বারা কোন স্মৃতি গড়ে ওঠে না। একটা অনুভূতি অবশ্যই থাকবে, যার ফলে মানসচিত্র-গুলোকে আমরা কোন অতীত মূলাদর্শে আরোপ করি। সম্ভবতঃ আমাদেরকে সেটা করতে প্রযোজিত করার পক্ষে পরিচয়ই যথেষ্ট। এবং সম্ভবতঃ কোন কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করা এবং তাকে সঠিক মতো স্মরণ করছি না বলে অনুভব করা—এ অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাও তার মধ্যে পাওয়া যায়। কোন জটিল মানসচিত্রের কতকগুলো অংশ অন্য অংশগুলোর চেয়ে বেশী পরিচিত মনে হতে পারে, এবং তখন অন্যগুলোর চেয়ে পরিচিত অংশগুলোর অভ্রান্ততা সম্পর্কে আমরা অধিকতর নিশ্চিত বোধ করি। কোন অতীত ঘটনার যে মানসচিত্র আমরা গঠন করছি তা ভ্রান্ত—এ প্রত্যয়ের মধ্যে এ ব্যঞ্জনা রয়েছে বলে 'মনে হতে' পারে যে, আমরা নিশ্চয়ই মানসচিত্রের সাহায্য ছাড়া অন্য-ভাবে অতীতকে জানছি; কিন্তু আমি মনে করি না যে, এ সিদ্ধান্তটার পক্ষে বাস্তবিকই যথেষ্ট প্রমাণ আছে, কারণ এ অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যার জন্য মানস চিত্রের পরিচয়ের মাত্রাভেদই যথেষ্ট।

(খ) স্মৃত ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ঘটনাটার সম্বন্ধটা কি? সঠিকভাবে যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে বিভিন্ন মানসচিত্রের মধ্যে সেই রকম গুণগত সাদৃশ্য থাকবে, যে সাদৃশ্য তাদের মূলাদর্শের সঙ্গে মানসচিত্রের থাকতে পারে, এবং তাদের কাঠামো এবং সম্বন্ধগুলো তাদের মূলাদর্শের কাঠামো ও সম্বন্ধ থেকে অভিন্ন হবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আপনি স্মরণ করতে চান, কোন একটা কামরায় ফায়ার-প্লেস থেকে তাকালে জানালাটা দরজার ডান দিকে অথবা বাম দিকে থাকে কিনা। কামরাটার মানসচিত্র আপনি লক্ষ্য করতে পারেন, যে মানসচিত্রে রয়েছে (আরও কিছুর সঙ্গে) দরজাটার একটা মানসচিত্র এবং জানালাটার একটা মানসচিত্র, এবং (আপনার স্মরণক্রিয়াটা যদি অভ্রান্ত হয়) এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে সেই একই সম্বন্ধ, আপনি যখন

বাস্তবিকই কামরাটা দেখছেন তখন তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধটা থাকে। যে ধরনের বিশ্বাসে অতীতের প্রতি ইংগিত থাকে, স্মৃতির অবস্থান এই জটিল মানসচিত্রের সঙ্গে সে-জাতীয় একটা বিশ্বাসকে সংযুক্ত করার মধ্যে; এবং স্মৃতির অভ্রান্ততা হচ্ছে জটিল মানসচিত্রটা এবং কোন-একটা পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষণের মধ্যবর্তী গুণগত সাদৃশ্য ও কাঠামোগত অভিন্নতা।

স্মৃতির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে দুটো কথা বলার আছে। অখণ্ডভাবে বিবেচনা করলে, স্মৃতি জ্ঞানের স্বতন্ত্র (independent) উৎসগুলোর অন্যতম; অর্থাৎ, স্মৃতির মাধ্যমে আমরা যে সব জিনিস জানি, সম্পূর্ণভাবে অন্য উপায়ে জানা বিষয় থেকে পাওয়া কোন যুক্তির সাহায্যে আমরা সে সব জিনিসে পৌঁছতে পারি না। কিন্তু কোন স্বতন্ত্র (single) স্মৃতিই একা দাঁড়াতে বাধ্য নয়, কারণ স্মৃতির সমষ্টির উপর নির্ভরশীল অতীত সম্পর্কিত একটা জ্ঞান-তন্ত্রের[১] সঙ্গে সে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় অথবা হয় না। যখন স্মরণকৃত বিষয়টা জনসাধারণের এক বা একাধিক প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ের[২] মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন প্রত্যক্ষ হয়, তখন অন্য লোকের কাছ থেকে তার সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। এমন-কি সেটা যখন ব্যক্তিগত (private) হয়, তখনও অন্য প্রমাণ দ্বারা তা সমর্থিত হতে পারে। আপনি স্মরণ করতে পারেন যে, গতকাল আপনি দাঁতব্যথায় ভুগেছিলেন এবং আজ আপনি দন্তচিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন; আপনার ডায়েরীতে লেখা কোন কিছুর দ্বারা পরবর্তী সত্যটা সমর্থিত হতে পারে। এই সব-ক'টা মিলে একটা সমন্বিত সমগ্রের সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকটাতে অপরটার সম্ভাব্যতা বেড়ে যায়। কাজেই, যদিও সামগ্রিকভাবে স্মৃতির সত্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, তথাপি কোন বিশেষ স্মৃতির সত্যতা আমরা পরীক্ষা করতে পারি। সামগ্রিকভাবে আমরা স্মৃতির সত্যতা পরীক্ষা করতে পারি না, একথা বলার অর্থ স্মৃতিকে সন্দেহ করার পক্ষে কোন কারণ দেখানো নয়, বরং কেবল এটুকু বলা যে, এটা জ্ঞানের এমন একটা স্বতন্ত্র উৎস, অন্যান্য উৎস যার স্থান পূরণ করতে পারে না। আমরা জানি যে, আমাদের স্মৃতি ভ্রমশীল, কিন্তু পরখ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করার পর, মোটের উপর তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ আমাদের থাকে না।

১. System of knowledge.
২. Public.

মনে হয় যে, বিশেষ স্মরণক্রিয়াগুলোর কার্য-কারণ (causation) সম্পূর্ণভাবে অনুষঙ্গের ব্যাপার। বর্তমানের কোন-কিছু অনেকাংশে অতীতের কোন-কিছুর সদৃশ হয়, এবং মানসচিত্র বা শব্দের আকারে অতীত ঘটনার প্রসঙ্গটাকে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে; এ প্রসঙ্গটার উপর যখন মনোযোগ পড়ে তখন আমরা বিশ্বাস করি যে, এটা [অতীত ঘটনাটা] অতীতে ঘটেছিলো, এবং কেবল মানসচিত্ররূপে ঘটেনি, আর তখন আমরা পাই একটা স্মরণক্রিয়া।

স্মৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কঠিন সমস্যা আছে যেগুলো আমি আলোচনা করিনি; কারণ তাদের যে গুরুত্ব (interest) সেটা শুদ্ধ অর্থে যত-না দার্শনিক তার চেয়ে বেশী মনোবৈজ্ঞানিক। জ্ঞানের একটা উৎস হিসাবেই স্মৃতির সঙ্গে দার্শনিকের বিশেষ সম্পর্ক।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

প্রত্যক্ষণের অন্তর্দার্শনিক বিশ্লেষণ

ইতিমধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকেও। বর্তমান অধ্যায়ে এর সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করতে হবে আত্ম-নিরীক্ষণের (self-observation) দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং আমাদের লক্ষ্য হবে, আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি (perceive) তখন আমাদের ভেতরকার ঘটনাটার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব ততটুকু আবিষ্কার করা। মানসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কতকগুলো গতানুগতিক মতবাদ নিয়ে আমি শুরু করবো, এবং সেগুলো থেকে আমি সেই-সব মতবাদে চলে যাব, আমি যেগুলোর পক্ষাবলম্বন করতে চাই। 'মন' ও 'জড়'[১]—এ শব্দ দুটোকে, সাধারণ লোক এবং দার্শনিকেরা, উভয়েই ব্যবহার করেন চাতুর্যের সঙ্গে, সংজ্ঞা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা না করে। এর জন্য বহুলাংশে দোষারোপ করতে হয় দার্শনিকদেরকে। আমার নিজের অনুভূতিটা এই যে, এক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা (line) নেই, আছে বরং একটা মাত্রাগত পার্থক্য; একটা ঝিনুক (oyster) মানুষের চেয়ে কম মানসিক, কিন্তু সম্পূর্ণ অ-মানসিক নয়। এবং আমি মনে করি যে, 'সামঞ্জস্যপূর্ণ' অথবা 'সামঞ্জস্যহীন'-এর মতো, 'মানসিক' এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা তার স্বধর্মবলে কোন স্বতন্ত্র সত্তায় থাকতে পারে না, থাকতে পারে কেবল কোন একটা সত্তা-তন্ত্রে।[২] কিন্তু এ মতটাকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করার আগে আমি কতকগুলো মতবাদের উপর কিছু সময় ব্যয় করতে চাই, যেগুলো অতীতে প্রচলিত ছিল।

পরম্পরাগতভাবে, কোনকিছুর অস্তিত্ব জানার দুটো উপায় আছে; একটা হচ্ছে ইন্দ্রিয় দ্বারা, অপরটা হচ্ছে, যাকে 'অন্তর্দর্শন' (introspection) বলা হয় অথবা কাণ্ট যাকে 'আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়' বলেছিলেন তার দ্বারা। বলা

১. 'Mind' and 'matter'.

২. System of entities.

হয়ে থাকে যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে-সব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি, অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনাবলী আমরা জানি। অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে যে-সব ঘটনা জানা যায়, পরম্পরাগতভাবে তাদেরকে বলা হয় 'মানসিক,' এবং অন্তর্নিহিত প্রকৃতির দিক থেকে তাদের সদৃশ অন্য যে-কোন ঘটনাও তাই।

পরম্পরাগতভাবে, মানসিক ঘটনাগুলো প্রধানতঃ তিন রকমের, যাদেরকে বলা হয় জানা, ইচ্ছা করা, এবং অনুভব করা।[১] এ প্রসঙ্গে 'অনুভূতি'র অর্থ সুখ এবং অসুখ[২]—আমরা 'সুখ এবং যন্ত্রণা (pain)' বলছি না কারণ 'যন্ত্রণা' একটা দ্ব্যর্থক শব্দ: এর দ্বারা কোন যন্ত্রণাময় সংবেদন বোঝানো যেতে পারে, যেমন, আপনি যখন বলেন "আমার দাঁতে একটা যন্ত্রনা আছে," অথবা এর দ্বারা বোঝানো যেতে পারে সংবেদনটার যন্ত্রণাদায়ক বৈশিষ্ট্য। মোটামুটিভাবে, সুখ হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্য যার ফলে আপনি চান যে, কোন-একটা অভিজ্ঞতা চলতে থাকুক, এবং অসুখ হচ্ছে সেই বিপরীত বৈশিষ্ট্য যার ফলে আপনি চান যে, কোন-একটা অভিজ্ঞতা শেষ হোক। যাই হোক, এখনকার মতো আমার উদ্দেশ্য অনুভূতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা নয়।

অন্য দু'রকমের মানসিক ঘটনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তাদের দ্বারা যা বোঝানো হয় তার বর্ণনা দেওয়ার পক্ষে 'জানা' এবং 'ইচ্ছা করা'-কে অতিরিক্ত সংকীর্ণ বলে মনে করা হয়। দার্শনিকেরা কেবল জ্ঞান নয়, ভ্রান্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চান, এবং যে ধরনের জ্ঞান বিশ্বাসের মধ্যে প্রকাশিত কেবল তাকে নয়, প্রত্যক্ষণের মধ্যে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকেও। জ্ঞান অথবা ভ্রান্তি হিসাবে বর্ণনা করা সম্ভব, এমন যে-কোন জিনিস বোঝাবার জন্যই 'অবগতি' (cognition) অথবা 'অবগতিমূলক অবস্থা' (cognitive state) শব্দটা ব্যবহার করা হয়; আপাতঃদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষণ এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিশুদ্ধ সংবেদন অধিকতর বিতর্ক-সাপেক্ষ।

---

১. **Knowing, willing and feeling.**

২. **Pleasure and unpleasure.**

আবার, 'ইচ্ছা করা' খুব সংকীর্ণ একটা পদ। এমন একটা পদ আবশ্যক যার মধ্যে বাসনা ও বিরাগ[১] অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং সাধারণভাবে সেইসব মানসিক অবস্থাও যেগুলো কোন ক্রিয়া সম্পাদনে প্রযোজনা দেয়। এদের সবগুলোকেই 'অভিলাষ' (conation) শিরোনামের আওতার মধ্যে আনা যায়, এবং এই পারিভাষিক পদটা এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে।

গোঁড়া মতবাদটায়, অবগতি এবং অভিলাষ উভয়ের মধ্যেই কোন 'বিষয়ে'র (object) দিকে পরিচালিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যটা আছে। আপনি যা প্রত্যক্ষ করেন বা বিশ্বাস করেন, আপনি যা কামনা করেন বা ইচ্ছা করেন, তা আপনার মনের অবস্থা থেকে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপঃ আপনি স্মরণ করেন কোন একটা অতীত ঘটনা, কিন্তু স্মরণটা ঘটে এখন; সুতরাং আপনি যা স্মরণ করেন, আপনার স্মরণ করাটা তার থেকে ভিন্ন একটা ঘটনা। আপনি আপনার বাহুটা নড়াবেন, কিন্তু নড়ানোটা একটা দৈহিক (physical) ঘটনা এবং সেজন্যে আপনার অভিলাষ থেকে সেটা স্পষ্টতঃই ভিন্ন। বিষয়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধকে বহু মনোবিজ্ঞানী মনের অপরিহার্য (essential) বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছেন—প্রধানতঃ ব্রেণ্টানো এবং মাইনঙ[২] নামক দু'জন অস্ট্রিয়াবাসী। কখনও কখনও অনুভূতিরও একটা বিষয় আছে বলে মনে করা হয়ঃ অভিমত দেওয়া হয় যে, আমরা সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হই কোন কিছু-'তে'(at)। তবে এ মত কখনই সাধারণভাবে গৃহীত হয়নি; পক্ষান্তরে, অবগতি ও অভিলাষ বিষয়ের দিকে পরিচালিত হয় বলে যে অভিমত রয়েছে তাকে গোঁড়া বলে মনে করা যেতে পারে।

এটা অনস্বীকার্য যে, কোন এক অর্থে, বিষয়ের দিকে পরিচালিত হওয়ার এ বৈশিষ্ট্যটা অবগতি ও অভিলাষের একটা ধর্ম (property), কিন্তু এ ধর্মটার যথার্থ বিশ্লেষণ সম্পর্কে প্রচুর মতভেদের অবকাশ আছে। আমি মনে করি যে, এ বিশ্লেষণে হাত না দেওয়া পর্যন্ত 'মানসিক' শব্দটাকে বোঝার আশা আমরা করতে পারি না, এবং সেজন্য আমি সে বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হবো। আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো অবগতির মধ্যে, আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের দিক থেকে যা অভিলাষের (conation) চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

১. **Desire and aversion.**
২. **Brentano ও Meinong.**

অবগতি সম্পর্কে বলতে গেলে, যদিও দার্শনিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা দিয়েছে তথাপি আমি মনে করি যে, সাম্প্রতিক কালের পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ দার্শনিকই নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি গ্রহণ করতে রাজী হতেন।

অবগতি বিভিন্ন প্রকারের। গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হিসাবে, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, প্রত্যয় (conception), এবং প্রত্যয়মূলক বিশ্বাসের কথাই বলা যাক। প্রত্যক্ষণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাধারণ চেতনা (awareness): একটা টেবিল দেখা, পিয়ানো শোনা, ইত্যাদি। স্মৃতি হচ্ছে কোন অতীত ঘটনার চেতনা, যখন এ চেতনাটা প্রত্যক্ষ—অনুমিত অথবা সাক্ষ্য থেকে গৃহীত নয়। প্রত্যয় গঠনের প্রকৃতি নির্ণয় করা আরও কঠিন। এর দ্বারা যা বোঝানো হয় তার প্রতি ইঙ্গিত করার অন্যতম উপায় হিসাবে বলা যায় যে, আমরা তখনই 'প্রত্যয় গঠন করি' (conceive) যখন আমরা কোন অমূর্ত শব্দের অর্থ বুঝি, অথবা যা প্রকৃতপক্ষে শব্দটার অর্থ তার সম্পর্কে চিন্তা করি। যদি আপনি একটা তুষার-খণ্ড দেখেন, অথবা মানসচিত্রের সাহায্যে তাকে স্মরণ করেন, তখন আপনি কোন প্রত্যয় (concept)[1] পাচ্ছেন না; কিন্তু আপনি যখন শুভ্রতা সম্পর্কে চিন্তা করেন, তখন একটা প্রত্যয় পাচ্ছেন। অনুরূপভাবে, যদি কতকগুলো মুদ্রা দেখে তাদের সকলের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে আপনি গোলত্বের কথা চিন্তা করেন তখন আপনি একটা প্রত্যয় পাচ্ছেন। এরকম ক্ষেত্রে, আপনার চিন্তার বিষয়টা একটা 'সাবিক' (universal) অথবা একটা প্লেটোধর্মী ধারণা। প্রত্যেক বাক্যে অন্ততঃ একটা শব্দ থাকবে যা একটা প্রত্যয় প্রকাশ করে, এবং সেজন্য শব্দে প্রকাশযোগ্য প্রত্যেক বিশ্বাসের মধ্যে প্রত্যয় আছে।

অবগতিমূলক মনোভাবের এসব প্রকারের প্রত্যেকটির মধ্যে তার নিজস্ব সমস্যাবলী রয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের কাজ প্রত্যক্ষণ নিয়ে। অন্তর্দার্শনিক (introspective) এবং কারণিক, উভয় দিক থেকেই এর সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে; এখন আমাদেরকে যে আলোচনায় হাত দিতে হবে তা অন্তর্দার্শনিক।

যে অভিজ্ঞতাকে 'টেবিল দেখা' বলা হয় সে অভিজ্ঞতা যখন আপনার তখন আপনার চিন্তাশূন্য অবধারণ এবং, আপনার অভিজ্ঞতার প্রকৃতি

[1] অর্থাৎ, সাধারণ ধারণা (general idea)। (অনুবাদক)

সম্পর্কে সতর্ক পরীক্ষায় যা ধরা পড়ে, তার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আপনি মনে করেন যে, টেবিলটা আয়তাকার, কিন্তু আপনার দৃষ্টিক্ষেত্রে রঙের ছাপটা (patch) আয়তক্ষেত্র নয়; আপনি যখন আঁকতে শেখেন তখন টেবিলটা যেভাবে প্রতীয়মান হয় তাই আপনাকে আঁকতে হয়, সেটা যেভাবে প্রতীয়মান হয় বলে প্রতীয়মান হয়[১] সেটা নয়। স্পর্শগত সংবেদনের মানসচিত্র আপনার আছে; আপনি যদি টেবিলটাকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করতেন এবং সেটা একটা দৃষ্টিগত অধ্যাস (illusion) বলে ধরা পড়তো তাহলে আপনি বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেতেন। কোন এক মাত্রা-বিশিষ্ট স্থায়িত্ব আর ওজনও আপনি আশা করেন। আপনি যদি টেবিলটা তুলতে যেতেন তাহলে, টেবিলটা যে রকম দেখায়, তার চেয়ে সে যদি অনেক বেশী হাল্কা হতো, তাহলে আপনি দেখতেন যে আপনার পেশীগুলো ঠিকভাবে অভিযোজিত হচ্ছে না। সংবেদনটার মধ্যে না হলেও প্রত্যক্ষণটার মধ্যে এ উপাদানগুলোর সবকটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রত্যক্ষণের বিপরীতে 'সংবেদন' অল্পবিস্তর প্রাকল্পিক (hypothetical)। একে প্রত্যক্ষণের সারাংশ বলে মনে করা হয়, এবং এটা সম্পূর্ণভাবে উদ্দীপক এবং ইন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে নয়। যখন আপনি চিন্তা করেন যে, টেবিলটা আয়তাকার তখন অতীত অভিজ্ঞতাই আপনাকে তা করতে সক্ষম ও বাধ্য করে; আপনি যদি অন্ধ হয়ে জন্মাতেন এবং এইমাত্র আপনার উপর অস্ত্রচিকিৎসা করা হতো, তাহলে আপনি এ চিন্তা করতে পারতেন না। কঠিনতা, ইত্যাদির প্রত্যাশাও আপনার মধ্যে জাগতো না। কিন্তু এর কোন কিছুই অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায় না। অন্তর্দার্শনিক (introspective) দৃষ্টিকোণ থেকে, যে সব উপাদান কেবল উদ্দীপক থেকে পাওয়া যায় সেগুলো এবং অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা বেশ কঠিন কাজ। লোকে মনে করে যে, অতীত অভিজ্ঞতায় মস্তিষ্ক পরিবর্তিত হয়, এবং তার ফলে উদ্দীপক-জাত মানসিক ঘটনা পরিবর্তিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষণের বিপরীত হিসাবে সংবেদনের ধারণা প্রত্যক্ষণের কারণগত পর্যবেক্ষণের (causal study) অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্দার্শনিক পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

---

১. 'as it really seems and not as it seems to seem.'

তবে এইখানে একটা পার্থক্য করতে হয়। নিছক আত্ম-নিরীক্ষণের মাধ্যমে আপনি আবিষ্কার করতে পারেন যে, দৃষ্টিগত বস্তুসমূহের সহগামী হয়ে স্পর্শের একটা প্রত্যাশা বা মানসচিত্র থাকে, এবং, অনুরূপভাবে, অন্ধকারে আপনি যদি কোন বস্তু স্পর্শ করেন তাহলে সম্ভবতঃ তার ফলে আপনি তার একটা দৃষ্টিগত মানসচিত্র গঠন করবেন। এখানে, মানসচিত্র-গুলো সচরাচর ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ ফলাফল থেকে ভিন্ন 'মনে হয়' (feel), এ সত্যের সূত্র ধরে আপনি কতক পরিমাণে প্রত্যক্ষণের বিশ্লেষণে এসে পৌঁছাতে পারেন। পক্ষান্তরে, অন্তর্দর্শন যতই করা হোক না কেন, কেবল তার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় স্থানিকা[১] জাতীয় জিনিসগুলো আবিষ্কৃত হবে না। অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে, একই ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত উপাদানের সাহায্যে কোন সংবেদনের শূন্যস্থান পূরণ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত অনুষঙ্গবদ্ধ মানসচিত্রগুলোর দ্বারা সেই শূন্যস্থান পূরণের চেয়ে অনেক কম আবিষ্কারযোগ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যদিও কেবল অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষণের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাবের অংশবিশেষ আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তথাপি, আরেকটা অংশ আছে যা আমরা এভাবে আবিষ্কার করতে পারি না।

অন্তর্দার্শনিক মনোভঙ্গির মধ্যে আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ এটা সুস্পষ্ট যে, যে-কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে আমাদের মনের আধেয়গুলো (contents) অত্যন্ত জটিল। আমাদের স্বাভাবিক জাগ্রত জীবনের সর্বত্র আমরা সর্বদাই দেখছি, শুনছি এবং স্পর্শ করছি, কখনও কখনও ঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণ করছি, সর্বদাই রকমারি শারীরিক সংবেদন পাচ্ছি, সর্বদাই সুখদায়ক অথবা অসুখ-দায়ক (সচরাচর উভয়ই) অনুভূতি পাচ্ছি, সর্বদাই বাসনা ও বিরাগ জন্মাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এদের সবগুলো সম্পর্কে সচেতন নই, কিন্তু সঠিক দিকে আমাদের মনোযোগ ফিরিয়ে এনে আমরা এগুলোর যে-কোন একটা সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। এ মুহূর্তে আমি "অচেতন মানসিক অবস্থা" সম্পর্কে আলোচনা করছি না, কারণ, স্পষ্টতঃই এগুলোকে জানা যায় কেবল কার্যকারণ সম্বন্ধের মাধ্যমেই; এবং এখন আমরা বিবেচনা করছি যা অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে জানা যায়। এমন যে-কোন সংখ্যক প্রত্যক্ষণ থাকতে পারে

১. Blind spot.

যেগুলোকে অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে জানা যায় না; এ মুহূর্তে আমাদের বক্তব্যটা এই যে, যে-কোন এক সময়ে যেগুলোকে অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায় সেগুলো বহু-সংখ্যক এবং বহু রকমের।

ঠিক এখন আমি মনোযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে ইচ্ছা করছি না; আমি কেবল এই দেখাতে চাচ্ছি যে, এর মাধ্যমে আমরা অমূর্তায়ণের (abstraction) প্রথম ধাপগুলোতে প্রবেশ করতে পারি। সব রকমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মধ্য থেকে আমরা অল্প কতকগুলো বেছে নিতে পারি, অমূর্তায়ণ প্রক্রিয়ায় যেগুলো একটা অপরিহার্য প্রাথমিক পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ, যে রঙিন প্যাটার্নটাকে আমরা দেখছি, মনোযোগের সাহায্যে আমরা তার পার্থক্য ধরতে পারবো, এবং অন্যান্য যেসব জিনিস আমরা দেখি তাদের থেকে, এবং যেসব মানসচিত্র এবং ইন্দ্রিয় ও চিন্তার অন্যান্য বিষয় যুগপৎ ঘটতে পারে, তাদের থেকে তাকে আলাদা করতে পারবো। সরলতার খাতিরে ধরা যাক, ত্রিভুজের মত করে আমরা একটা কালো এবং সাদা প্যাটার্নকে পৃথক করছি। এ প্যাটার্নের মধ্যে আমরা এছাড়াও বাহু ও কোণের মধ্যে এবং অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি—অবশ্য বাহুগুলো গাণিতিক রেখা নয়, কোণগুলোও গাণিতিক বিন্দু নয়।

এখন আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আসছি, যার উপর মন ও জড় সম্পর্কিত আমাদের মতামত বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রশ্নটা এই ঃ

"একটা ত্রিভুজ আছে" এবং "আমি একটা ত্রিভুজ দেখছি," এই যুক্তি-বাক্যের মধ্যে কি পার্থক্য?

যে-কোন উক্তির পক্ষে যতটুকু নিশ্চিত হওয়া সম্ভব, উভয় উক্তিই (statements) ততটুকু নিশ্চিত মনে হয়—অন্ততঃ যদি তাদের একটা সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এরকম ক্ষেত্রে সর্বদাই যেমন হয়, কিছু-একটা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কিন্তু কি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—এই কিছু-একটা, যার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত, উপরোক্ত দুই উক্তিতে সেটা বাস্তবিক ভিন্ন কিনা, অথবা যে পরিপার্শ্ব সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, তাদের পার্থক্যটা কেবল তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কিনা। অধিকাংশ দার্শনিকের মতে, যে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত তার

মধ্যে একটা পার্থক্য আছে; মাক, জেম্‌স, ডিউই,[১] মার্কিন বাস্তববাদীরা এবং আমি মনে করি যে, পার্থক্যটা রয়েছে অনিশ্চিত প্রসঙ্গটার মধ্যে। এ প্রশ্নটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

"আমি একটা ত্রিভুজ দেখছি" এবং "একটা ত্রিভুজ আছে," এই দুই উক্তির নির্দেশনাগুলো (suggestions) স্পষ্টতঃই ভিন্ন। প্রথমটাতে আমার জীবনের একটা ঘটনা উক্ত হয়েছে, এবং আমার উপর তার সম্ভাব্য কার্যফলগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে তার মধ্যে। দ্বিতীয়টার লক্ষ্য হচ্ছে জগতের মধ্যবর্তী এমন একটা ঘটনা উল্লেখ করা (stating), যাকে অন্য লোকের দ্বারা সমপরিমাণে আবিষ্কারযোগ্য বলে মনে করা হয়। আপনি বলতে পারতেন "একটা ত্রিভুজ আছে," যদি তাকে আপনি এক মুহূর্ত আগে দেখে থাকতেন এবং এখন আপনার চোখ বন্ধ থাকতো; এ ক্ষেত্রে আপনি বলতেন না, "আমি একটা ত্রিভুজ দেখছি।" পক্ষান্তরে, কখনও কখনও অজীর্ণতা অথবা অবসাধের প্রভাবে লোকে ছোট ছোট কাল বিন্দু বাতাসে ভেসে বেড়াতে দেখে; এরকম অবস্থায় আপনি বলতেন, "আমি একটা কাল বিন্দু দেখছি," কিন্তু "একটা বিন্দু আছে" বলতেন না। এ দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, আপনি যখন বলেন, "একটা কালো বিন্দু আছে" তখন আপনি যে উক্তি করেন সেটা আপনি যখন বলেন, "আমি একটা কালো বিন্দু দেখছি," তখনকার চেয়ে বেশী জোরালো। অন্য ক্ষেত্রটায়, আপনি যখন এই কারণে "একটা ত্রিভুজ আছে" বলেন যে, আপনি এক মুহূর্ত আগে তাকে দেখেছিলেন, যদিও এখন দেখছেন না, তখন আপনি পাচ্ছেন তিনটা পর্যায়ঃ প্রথমে স্মৃতি থেকে, "আমি একটা ত্রিভুজ দেখেছিলাম," এ যুক্তিবাক্য সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়তা পান, এবং তারপর আপনি চলে যান "একটা ত্রিভুজ ছিল"-তে, এবং তার আরও পরে "একটা ত্রিভুজ আছে, কারণ তাকে ধ্বংস করার মতো কোন কিছু যে এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে তা হতে পারে না"-তে। এখানে স্পষ্টতঃই আমরা তাৎক্ষণিক নিশ্চয়তার (immediate certainty) অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি।

সুতরাং, এটা পরিষ্কার মনে হয় যে, আমরা যে সত্য সম্পর্কে তাৎক্ষণিক-ভাবে নিশ্চিত, আমাদের দুই উক্তির মধ্যে যেটা সেই সত্য প্রকাশের সবচেয়ে

১, Mach, James, Dewey.

কাছাকাছি আসে সেটা হচ্ছে "আমি একটা ত্রিভুজ দেখছি," কারণ অন্যটার মধ্যে রয়েছে প্রকাশ্য (public) কিছু-একটার অনুমান, এবং এভাবে সেটা নিছক উপাত্তের বাইরে চলে যায়। একথার মধ্যে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, আমরা যখন এমন একটা কালো বিন্দু দেখি যাকে আমরা চোখের পীড়ায় আরোপ করি এবং সেজন্যে মনে করি যে, অন্যকেউ সেটা দেখতে পারে না, তখন আমাদের বলা উচিত নয় "একটা কালো বিন্দু আছে।" সুতরাং "আমি একটা ত্রিভুজ দেখছি"-র উপর আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা যাক, এবং নিজেদের জিজ্ঞেস করা যাক, এর সম্পূর্ণটাকে অথবা কেবল একটা অংশকে একটা প্রাথমিক নিশ্চয়তা হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, 'আমি' এবং 'দেখি', উভয়ই এমন শব্দ যা আমাদেরকে, ক্ষণস্থায়ী ঘটনাটার[১] মধ্যে যা প্রকাশিত, তার বাইরে নিয়ে যায়। শুরুতে 'আমি'-কেই ধরা যাক। এটা এমন একটা শব্দ যার অর্থ স্পষ্টতঃই স্মৃতি ও প্রত্যাশার উপর নির্ভরশীল। 'আমি'-তে বোঝায় সেই ব্যক্তি যার মধ্যে কতকগুলো স্মৃত অভিজ্ঞতা ঘটেছে, এবং যার মধ্যে ভবিষ্যতে কতকগুলো অভিজ্ঞতা ঘটবে বলে প্রত্যাশা আছে। আমরা বলতে পারতাম "আমি এখন একটা ত্রিভুজ দেখছি এবং এক মুহূর্ত আগে আমি একটা বর্গক্ষেত্র দেখেছিলাম।" এ বাক্যে, তার দুটো প্রয়োগের (occurrences) মধ্যে 'আমি' শব্দটার ঠিক একই অর্থ, এবং সেহেতু স্পষ্টতঃই তার অর্থটা স্মৃতির উপর নির্ভরশীল। এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিভুজ দেখার মুহূর্তে দেখার ক্রিয়াটা আপনার জ্ঞানে যে অবদান রাখে তার কাছে পৌঁছানো। কাজেই, যেহেতু 'আমি' শব্দটা আপনাকে এ অবদানের বাইরে নিয়ে যায়, সুতরাং ত্রিভুজ দেখা থেকে আপনার জ্ঞানের সঙ্গে যা এসে যুক্ত হয় তার একটা নির্ভুল শাব্দিক প্রকাশ যদি আমরা পেতে চাই তাহলে এ শব্দটাকে আমাদের কেটে বাদ দিতে হবে। আমরা বলবো "একটা ত্রিভুজ দৃষ্ট হচ্ছে"।[২] আর যাই হোক, আমরা যা দেখছি, এ উক্তিটা তার এক ধাপ বেশী কাছাকাছি।

কিন্তু এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে 'দৃষ্ট' (seen) শব্দটা নিয়ে। সাধারণ প্রয়োগে, এটা একটা কারণিক শব্দ এবং এর মধ্যে রয়েছে চোখের

১. অর্থাৎ, ত্রিভুজ দেখার ঘটনা। (অনুবাদক)
২. "A triangle is being seen."

উপর নির্ভরশীল একটা-কিছুর ইঙ্গিত। এ অর্থে, স্পষ্টতঃই এর মধ্যে আছে কিছু পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা; নবজাত শিশু জানে না যে, সে যা দেখে তা নির্ভর করে চোখের উপর। তবে আমরা এটাকে বাদ দিতে পারি। স্পষ্টতঃই দৃষ্টির সব বস্তুর মধ্যে একটা সাধারণ গুণ আছে, স্পর্শ অথবা শ্রুতির কোন বস্তুর মধ্যে যা নেই; দৃষ্টিগত একটা বস্তু শ্রুতিগত একটা বস্তু থেকে ভিন্ন, ইত্যাদি। "একটা ত্রিভুজ দৃষ্ট হচ্ছে," একথার পরিবর্তে আমাদের বলা উচিৎ "একটা দৃষ্টিগত ত্রিভুজ আছে"। অবশ্য 'দৃষ্টিগত' এবং 'ত্রিভুজ' শব্দের অর্থ দুটো কেবল অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শেখা যায়, কিন্তু যৌক্তিকভাবে তারা [অর্থ দুটো] অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল নয়। এমন একটা জীব কল্পনা করা যায় যে জন্ম মুহূর্তেই শব্দ দুটো জানে; এ রকম একটা জীব তার উপাত্তকে, "একটা দৃষ্টিগত ত্রিভুজ আছে"—এ শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারতো। আর যাই হোক, যে সমস্যাগুলো থেকে যাচ্ছে সেগুলো প্রত্যয় (concept) সংক্রান্ত অনুসন্ধানের অন্তর্গত; সুতরাং এখনকার মতো সেগুলোকে আমরা উপেক্ষা করবো।

এখন, ইংরেজীতে 'there is' শব্দ দু'টো দ্ব্যর্থক। "একটা ত্রিভুজ আছে" বলে অতীতে আমি যখন তাদের ব্যবহার করেছিলাম তখন 'voila' অথবা 'da ist'-এর অর্থে আমি তাদের বুঝিয়েছিলাম। এখন আমি তাদের বোঝাচ্ছি 'il y a' অথবা 'es giebt'-এর অর্থে। যা বোঝানো হচ্ছে, "একটা দৃষ্টিগত ত্রিভুজের অস্তিত্ব আছে"[১] বলে কেউ তা প্রকাশ করতে পারতো, কিন্তু 'exist' শব্দটার বহু রকমের পরাতাত্ত্বিক জ্যাতার্থ আছে যেগুলো আমি এড়াতে চাই। সম্ভবতঃ 'occurs' বলাই সর্বোত্তম।[২]

এখন আমরা এমন কিছু-একটাতে এসে পৌঁছেছি যা আপনার প্রত্যক্ষণ নির্ভুল হলে যেমন সত্য, ভ্রান্ত (illusory) হলেও ঠিক তেমনি সত্য। আপনি যদি বলেন "একটা দৃষ্টিগত কালো বিন্দু ঘটছে" (occurring),

---

১. "A visual triangle exists."

'Exists' শব্দটা বস্তুর ক্ষেত্রে, এবং 'occurs' শব্দটা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসেল বস্তুকে বাদ দিয়ে ঘটনার সাহায্যেই জগতের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বলে এ কথা বলছেন। (অনুবাদক)

তাহলে আপনি সত্য বলছেন, যদি আপনার দৃষ্টিক্ষেত্রে তেমন একটা বিন্দু থাকে। অন্যেরা এটা দেখতে পারতো, অথবা একে স্পর্শ করা যেত, অথবা পদার্থবিদ্যার অর্থে জড় দিয়ে এটা তৈরী,—এ ইংগিতগুলো (suggestions) আমরা বাদ দিয়েছি। যখন সাধারণ কথাবার্তায় কেউ বলে "একটা কালো বিন্দু আছে" তখন এ ইঙ্গিতগুলোর সব কটাই উপস্থিত; 'দৃষ্টিগত' শব্দটি যোগ করে এবং 'there is'-এর জায়গায় 'is occurring' প্রতিস্থাপিত করে সেগুলোকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দৃষ্টিগত উপাত্ত থেকে পাওয়া আপনার জ্ঞানের সঙ্গে যা যোগ করা হয় তার মধ্যে যা সংশয়াতীত এবং অন্তর্নিহিত (intrinsic), এ সব উপায়ে আমরা তার কাছে এসে পৌঁছেছি।

এখন আবার নিজেদেরকে আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে: যা তাৎক্ষণিক এবং অন্তর্নিহিত তার সীমার ভেতরে, কোন দৃষ্টিগত উপাত্তের সংঘটন এবং তার অবগতির মধ্যে এখনও কোন পার্থক্য আছে কি? তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, "একটি দৃষ্টিগত কালো বিন্দু ঘটছে" বলা ছাড়াও "একটা দৃষ্টিগত কালো বিন্দু জ্ঞাত হচ্ছে"[১] আমরা বলতে পারি কি? আমার মনে হয়, পারি না। আমরা যখন বলি যে, এটা জ্ঞাত হচ্ছে, তখন আমার মনে হয় যে, আমরা এই বুঝাই যে, এটা কোন অভিজ্ঞতার অংশ অর্থাৎ একে স্মরণ করা যায়, অথবা, এ আমাদের অভ্যাসের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে, অথবা, সাধারণভাবে, আমরা যেগুলোকে 'স্মৃতিক' কার্যফল বলি সেগুলো এর থাকতে পারে। এর সব কিছুই আমাদেরকে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার বাইরে তার কার্যকারণ সম্বন্ধের জগতে নিয়ে যায়। এরকম চিন্তা করার কোন কারণ আমি দেখি না যে, ঘটনাটার নিজের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের (subject and object) কোন দ্বিত্ব আছে; অথবা 'জ্ঞান'-এর কোন দৃষ্টান্ত হিসাবে এর বর্ণনা দেওয়া যায়। এর ফলে, স্মৃতির মাধ্যমে এবং এ রকম উপাত্তের সাধারণ অনুবন্ধের (correlates) সচেতন বা অচেতন অনুমানের মাধ্যমে, এর থেকে জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এ নিজে কোন জ্ঞান নয়, এবং কোন দ্বিত্বও এর মধ্যে নেই। উপাত্তটা সমভাবেই পদার্থবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞানের একটা উপাত্ত; এটা এ দু'টোর একটা মিলন বিন্দু। এটা

১ **"A visual black dot is cognised."**

মানসিকও নয়, পদার্থিকও নয়, ঠিক যেমন একটা স্বতন্ত্র নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো নয়, আবার পূর্বগামিতা অনুসারেও সাজানো নয়; কিন্তু এটা, মানসিক এবং পদার্থিক, এই উভয় জগতেরই কাঁচামালের অংশ। এটাই হচ্ছে সেই মতবাদ যাকে বলা হয় 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ' (neutral-monism), এবং একেই আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।

বিংশতিতম অধ্যায়

চৈতন্য ?

উইলিয়াম জেমস্ যখন "'চৈতন্য' আছে কি?" নামক তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে দুনিয়াকে চমকিত করে দিয়েছিলেন, তখন থেকে তেইশ বছর পার হয়ে গেছে। এ প্রবন্ধটা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, 'Essays in Radical Empiricism' নামক গ্রন্থে, এবং সেখানে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, "জগতে কেবল একটা মাত্র মৌলিক বস্তু বা উপাদান আছে" এবং 'চৈতন্য' (consciousness) শব্দটা একটা ক্রিয়ার প্রতীক, কোন সত্তার নয়। তিনি মনে করেন যে, কতকগুলো চিন্তা (thoughts) আছে যেগুলো 'জানা'-র কাজ করে, কিন্তু জড় বস্তুগুলো যে উপাদান (stuff) দিয়ে তৈরী, চিন্তাগুলো তার থেকে কোন ভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী নয়। এভাবে তিনি, যাকে নিরপেক্ষ একত্ববাদ (neutral monism) বলা হয় এবং অধিকাংশ মার্কিন বাস্তববাদী যার প্রচার করেন, তার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমান গ্রন্থে এ মতটাই সমর্থন করা হবে। এ অধ্যায়ে, নিজেদের আমরা জিজ্ঞেস করবো, বিশেষ এক ধরনের উপাদান অর্থে এমন কিছু আছে কিনা যাকে আমরা চৈতন্য বলতে পারি, অথবা উইলিয়াম জেমসের সঙ্গে আমরা এই বলে একমত হতে পারি কিনা যে, জগৎকে আমরা যেমন জানি সে হিসাবে তার উপাদানের মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ দ্বিত্ব (inner duplicity) নেই, এবং একে, জানা এবং যা জানা হয়, এই দু'ভাগে পৃথক করার মধ্যে কোন মৌলিক দ্বিবিধত্ব প্রতিফলিত নয়।

"চৈতন্য" শব্দটা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা এর সঙ্গে দু'টো নিতান্ত ভিন্ন অর্থ যুক্ত করেন। একদিকে বলা হয় যে, আমরা কোন কিছুর সম্বন্ধে সচেতন (conscious of); এ অর্থে 'চৈতন্য' একটা সম্বন্ধ। অপরদিকে, 'চৈতন্য'-কে মানসিক ঘটনাবলীর একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে মনে করা যেতে পারে, যার অবস্থান অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের মধ্যে নয়। প্রথম মতটাকেই প্রথমে নেওয়া যাক; যেহেতু এর আলোচনার মধ্যে আমরা দ্বিতীয় মতটা বর্জন করার কারণ খুঁজে পাব।

যে সম্বন্ধটাকে আমরা কোন কিছু সম্পর্কে 'সচেতন' হওয়া বলি সেটা কি? একজন সজাগ ব্যক্তি এবং একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য, তার কথাই ধরা যাক। পূর্ববর্তী ব্যক্তি এমন-সব নানা রকমের উদ্দীপকের উপর প্রতিক্রিয়া করেন যেগুলোর উপর পরবর্তী ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া করেন না; সেজন্য আমরা বলি যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পরিপার্শ্বের মধ্যে যা ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতন নন। কিন্তু যদি ঘুমন্ত ব্যক্তি কোন একভাবে—যেমন, আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে—প্রতিক্রিয়া করেন, তাহলে সে রকম প্রতিক্রিয়া, সাধারণতঃ যাকে 'জ্ঞান' অথবা 'সচেতনতা' (awareness) বলা হয়, তার আওতায় পড়ে না; আমাদের বলা উচিৎ যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি 'অচেতনভাবে' মুখ ফিরিয়েছিলেন। তিনি যদি যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ হয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলেন—উদাহরণস্বরূপ, উপদ্রবকারীকে নাম ধরে সম্বোধন করেন—তাহলে আমরা তাকে সচেতন বলে বিবেচনা করি। যদি আমরা দেখি যে পরের দিন ভোরে তিনি ঘটনাটা স্মরণ করছেন তাহলেও আমরা তাই করি। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান কোন উদ্দীপকের উত্তরে যে-কোন এবং প্রত্যেক দেহ-সঞ্চালনকেই 'চৈতন্যে'র প্রমাণ বলে মনে করে না। আমার মতে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কাণ্ডজ্ঞান কতক রকমের প্রতিবেদনকে উদ্দীপকটার দ্বারা সংঘটিত কোন মানসিক প্রক্রিয়ার প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করে, এবং মনে করে যে, 'চৈতন্য'-টা আছে অনুমিত 'মানসিক' ঘটনাটার মধ্যে।

তবে কখনও কখনও—যেমন সংবেশন (hypnotism) এবং ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটার (sleep walking) মধ্যে—যেখানে 'চৈতন্যে'র অনেক সাধারণ লক্ষণ-গুলো উপস্থিত, এমন-কি সেখানেও লোকে তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না। এর কতকগুলো কারণ আছে। তাদের একটা হচ্ছে পরবর্তী সময়ে স্মরণ করতে না পারা; আরেকটা হচ্ছে, যা করা হচ্ছে তার মধ্যে বুদ্ধির অভাব। কোন সংবেশনগ্রস্ত রোগীকে আপনি যদি কালি পান করতে দেন এই বলে যে সেটা পোর্ট ওয়াইন (port wine), এবং সে যদি পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে তা পান করে, তাহলে আপনি বলেন যে, সে 'সচেতন' নয়, কারণ সেই বীভৎস স্বাদটার উপর সে স্বাভাবিকভাবে প্রতিক্রিয়া করে না। সে যাই হোক, এটা বললে আরো ভালো হতো মনে হয় যে, সে সংবেশনকারী এবং তাঁর আদেশগুলো সম্পর্কে সচেতন, যদিও সে অন্য সেইসব জিনিস

সম্পর্কে সচেতন নয় যেগুলো সম্পর্কে সে স্বাভাবিক অবস্থায় সচেতন হতো। আর পরবর্তীকালীন স্মৃতির অভাব খুবই বিপদজনক (difficult) একটা মানদণ্ড, যেহেতু আমরা এমন অনেক জিনিস স্বাভাবিক অবস্থায় ভুলে যাই যেগুলো আমাদের জীবনে ঘটেছে, এবং ঘুমে-হাঁটা লোকের (sleep-walker) বিস্মৃতির মধ্যে কেবল অসাধারণ একটা সম্পূর্ণতা আছে। স্পষ্টতঃই এটা একটা মাত্রাগত ব্যাপার। সারা রাত মাতাল অবস্থায় ছিল, এমন লোকের মনে পর দিন সকালে যেসব স্মৃতি জাগবে তাদের কথা ভাবা যাক। অপরাহ্নের পরবর্তী প্রহরগুলোর কথা যখন সে মনে করে (reviews) তখন স্মৃতিগুলো ক্রমে অস্পষ্ট (vague) থেকে অস্পষ্টতর হয়ে ওঠে, কিন্তু এমন কোন স্পষ্ট রেখা নেই যেখানে হঠাৎ করে স্মৃতিগুলো বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, স্মৃতি যদি একটা মাপকাঠি (test) হয়, তাহলে চৈতন্য অবশ্যই একটা মাত্রাগত ব্যাপার। আমি মনে করি যে, এখানেও আবার কাণ্ডজ্ঞান—আলোচ্য ক্রিয়াগুলোর সংঘটন-কালে কতকগুলো 'মানসিক' প্রক্রিয়া ছিল—এটা প্রতিপাদন করার জন্য কিছু পরিমাণ স্মৃতি প্রমাণ হিসাবে অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, ঘুমন্ত অবস্থার ক্রিয়াগুলোতে 'মন' নেই বলে মনে করে, এবং এ-দিক থেকে কতকগুলো অস্বাভাবিক অবস্থার ক্রিয়াগুলোকে ঘুমন্ত অবস্থার ক্রিয়াগুলোর সদৃশ বলে ধরে নেয়।

এর থেকে বোঝা যায় যে, 'চৈতন্য' দ্বারা সাধারণতঃ কি বোঝানো হয় তা যদি আমরা আবিষ্কার করতে চাই, তাহলে নিজেদেরকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে 'মানসিক' ঘটনা বলতে কি বোঝানো হয়। তবে, প্রত্যেক মানসিক ঘটনা এর মধ্যে আসে না। যেগুলোর মধ্যে কোন 'বস্তু'র (object) সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, কেবল সেগুলোই আলোচনার মধ্যে পড়ে। সুখদায়ক ঘুম-ঘুম ভাবের অনুভূতিকে সাধারণতঃ 'মানসিক' বলে মনে করা হবে, কিন্তু তার মধ্যে কোন 'বস্তু'র 'চৈতন্য' নেই। 'বস্তুর' সঙ্গে ধরে নেওয়া বিশেষ (peculiar) সম্বন্ধটাকেই আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা নিতে পারি একটা সাধারণ প্রত্যক্ষণ-ক্রিয়াকে। ধরা যাক যে, আমি একটা টেবিল দেখছি, এবং আমি সুনিশ্চিত যে, টেবিলটা আমার বাইরে, যদিও একে আমার দেখাটা একটা 'মানসিক' ঘটনা যা আমার ভেতরে। এ রকম কোন ক্ষেত্রে আমি টেবিলটা সম্পর্কে

'সচেতন'—অন্ততঃ কাণ্ডজ্ঞান তাই বলবে। এবং যেহেতু কোনকিছু না দেখে আমি দেখতে পারি না, কাজেই কোন 'বস্তু'-র সঙ্গে সম্পর্কটা দেখার একেবারে সারাংশের অন্তর্ভুক্ত। বলা হতে পারে যে, বস্তুর সঙ্গে সেই একই অপরিহার্য সম্পর্কটা প্রত্যেক রকমের চৈতন্যেরই বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু আমরা যখন এ মতটাকে আরও মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করতে শুরু করি, তখন হরেক রকমের সমস্যা দেখা দেয়। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, পদার্থবিদ্যা থেকে প্রাপ্ত কারণসমূহের দরুন, একটা পদার্থিক জিনিস হিসাবে টেবিল নিজে আমাদের প্রত্যক্ষণের বস্তু (object) রূপে বিবেচিত হতে পারে না, যদি বস্তুটা ছাড়া প্রত্যক্ষণের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়। উপযুক্ত অবস্থায়, কোন টেবিল না থাকলেও আমরা একই প্রত্যক্ষণ পাব। বস্তুতঃ মস্তিষ্কের বাইরে কোন ঘটনা নেই যাকে, আমরা যখনই 'একটা টেবিল দেখি' তখনই 'থাকতে হবে'। একে একটা উদ্ভট কথা বলে মনে হয় যে, আমরা যখন মনে করি যে আমরা একটা টেবিল দেখছি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা মস্তিষ্কের ভেতরকার একটা গতি (motion) দেখছি। সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে এসে পড়ছি যে, কোন প্রত্যক্ষণ-ক্রিয়ার অস্তিত্বের পক্ষে যে 'বস্তু'টা অপরিহার্য সেটা ঠিক প্রত্যক্ষণের মতই 'মানসিক'। বস্তুতঃ, মতবাদটা এই যে, 'প্রত্যক্ষ করা' নামক মানসিক ঘটনাটার নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষক এবং প্রত্যক্ষিতের মধ্যবর্তী একটা সম্বন্ধ আছে, যে সম্বন্ধের উভয় দিকই সমপরিমাণে 'মানসিক'।

সে যাই হোক, আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি তখন যা ঘটে তার মধ্যে অপরিহার্যভাবে একটা সম্বন্ধসূচক বৈশিষ্ট্য আছে—এরকম মনে করার এখন আর কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। এরকম চিন্তা করার আদি কারণটা ছিল এই সরল বাস্তববাদী মত যে, আমরা বাস্তব (actual) টেবিলটা দেখি। আমরা যা দেখি তা যদি আমাদের দেখার (seeing) মতই মানসিক হয়, তাহলে আর দু'টোর মধ্যে পার্থক্য করা কেন? আমরা যে রঙিন প্যাটার্নটা দেখি তা 'বাইরে' আছে বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু আসলে তা নয়; এটা আমাদের মাথার মধ্যে, যদি আমরা পদার্থিক দেশের[১] কথা বলি। সত্য বটে

[১] Physical space.

যে, আমরা যখন 'একটা টেবিল দেখি' তখন রঙিন প্যাটার্নের চেয়েও অধিক কিছু ঘটে। সেখানে আছে স্পর্শগত প্রত্যাশা অথবা মানসচিত্র : সম্ভবতঃ সেখানে আছে একটা বাহ্য বস্তুতে বিশ্বাস ; এবং তারপর সেখানে থাকতে পারে স্মৃতি অথবা অন্যান্য 'স্মৃতিক' কার্যফল। উপরোক্ত মতবাদে প্রত্যক্ষণ ক্রিয়ার 'বিষয়ী'-দিক ('subject' side) বলে যাকে ধরা হয়েছিল, এর সবকিছুকে সে দিক বলে মনে করা যায়, এবং মতবাদটাতে যাকে 'বিষয়'-দিক ('object' side) বলে ধরা হয়েছিল, রঙিন প্যাটার্নটা তাই। কিন্তু 'মানসিক' হওয়ার দিক থেকে, উভয় দিক একই স্তরের। এবং দুই দিকের মধ্যবর্তী সম্বন্ধটা এ রকম নয় যে, একটার অস্তিত্ব থেকে যৌক্তিকভাবে আরেকটার অস্তিত্বের দাবী ওঠে ; পক্ষান্তরে দুই দিকের মধ্যবর্তী সম্বন্ধটা অভিজ্ঞতা ও অনুষঙ্গ নিয়মের উপর নির্ভরশীল বলে সেটা কারণিক।

একথা যদি সঠিক হয় তাহলে, কাণ্ডজ্ঞানের ভাষায়, আমরা যখন একটা টেবিল সম্পর্কে সচেতন তখন প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে সেটা অল্প-বিস্তর নিম্নরূপ। প্রথমে, দেহের বাইরে আছে একটা পদার্থিক প্রক্রিয়া, যার থেকে উৎপন্ন হচ্ছে চোখের উপকার একটা উদ্দীপক যা কোন বাস্তব পদার্থিক টেবিল না থাকলে কদাচিৎ ঘটে (কখনও যে ঘটে না তা নয়)। তারপর আছে চোখ, স্নায়ু এবং মস্তিকের মধ্যে একটা প্রক্রিয়া, এবং শেষ পর্যায়ে আছে একটা রঙিন প্যাটার্ন। অনুষঙ্গ নিয়মের মাধ্যমে এই রঙিন প্যাটার্ন থেকে স্পর্শগত ও অন্যান্য প্রত্যাশা ও মানসচিত্রের উদ্ভব ঘটে ; এ ছাড়া, সম্ভবতঃ উদ্ভব ঘটে স্মৃতি এবং অন্যান্য অভ্যাসেরও। কিন্তু এই গোটা অনুক্রমের মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিস তৈরী দেশ-কালের মধ্যবর্তী কার্যকারণিকভাবে অবিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা-শৃঙ্খল দিয়ে, এবং আমাদের এটা বলার কোন কারণ নেই যে, আমাদের ভেতরকার ঘটনাগুলো আমাদের বাইরে অবস্থিত ঘটনাগুলো থেকে খুব বেশী (so very) ভিন্ন—এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই অজ্ঞ থাকবো, কারণ বহিঃস্থ ঘটনাগুলোকে কেবল তাদের সেইসব অমূর্ত গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর দিক থেকে জানা যায়, যেগুলো থেকে বোঝা যায় না এই ঘটনাগুলো 'চিন্তা'র (thoughts) সদৃশ অথবা বিসদৃশ কিনা।

এর থেকে বোঝা যায় যে, কোন বিশেষ (peculiar) রকমের সম্বন্ধ হিসাবে, অথবা, কতকগুলো ঘটনায় আছে কিন্তু অন্যগুলোতে নেই, এমন

কোন অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'চৈতন্য'কে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। 'মানসিক' ঘটনাগুলো সাধারণতঃ সম্বন্ধধর্মী নয়, এবং আমাদের বাইরের ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের এমন যথেষ্ট জ্ঞান নেই যে আমরা বলতে পারি, 'মানসিক' ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্য থেকে এর কোন পার্থক্য আছে কি নেই। কিন্তু যে কারণে আমরা কোন এক ঘটনাশ্রেণীকে 'মানসিক' বলি এবং অন্যান্য ঘটনা থেকে তাদের পৃথক করি, সেটা হচ্ছে আনুষঙ্গিক পুনরাবৃত্তির[১] সঙ্গে সংবেদনশীলতার সংযুক্তি। এ সংযুক্তি যত বেশী স্পষ্ট হয়, সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো তত বেশী 'মানসিক'; কাজেই মানসিকতা একটা মাত্রাগত ব্যাপার।

সে যাই হোক, আরেকটা বিষয় আছে, এ প্রসঙ্গে যার আলোচনা হওয়া দরকার, এবং সেটা হচ্ছে 'আত্ম-চৈতন্য', (self-consciousness) অথবা আমাদের নিজেদের 'মানসিক' ঘটনাবলীর চেতনা। ডেকার্টের "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি"—প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার সুযোগ আমরা পেয়েছি। কিন্তু 'চৈতন্য' প্রসঙ্গে আমি নূতনভাবে এ প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

কোন সাধারণ লোক যখন কোন দার্শনিকের সাক্ষাতে 'একটা টেবিল দেখে', তখন যে সব যুক্তি বার বার আমরা সামনে তুলে ধরেছি সেগুলোর সাহায্যে তাকে দিয়ে স্বীকার করানো যাবে যে, তার নিজের বাইরে কোন কিছুর সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা সে পেতে পারে না। কিন্তু সে যদি বুদ্ধিভ্রষ্ট না হয় অথবা রেগে না যায়, তাহলে সে এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকবে যে, রঙিন প্যাটার্ন একটা আছে, যা তার[২] মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু [তথাপি] যার অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় না। যুক্তিবিদ্যা অথবা পদার্থবিদ্যা থেকে এমন কোন যুক্তি পাওয়া যাবে না, যা দেখাতে চাইবে যে, এ বিষয়ে সে ভ্রান্ত; সুতরাং তার প্রত্যয়টাকে (conviction) বিসর্জন দেওয়ার কোন কারণ নেই। অষ্টম অধ্যায়ের জ্ঞান সম্পর্কিত যুক্তি থেকে দেখা গিয়েছিল যে, কার্যকারণ নিয়মাবলী সম্পর্কে পদার্থবিদদের সাধারণ অভিমতগুলো যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে, বস্তু থেকে প্রতিক্রিয়া-ব্যাপী কার্যকারণ শৃঙ্খল হ্রাস করা হলে

১. Associative reproduction. ২. অর্থাৎ, লোকটির। (অনুবাদক)

আমাদের জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত হয়, এবং এ দু'টো[১] যদি দেশ-কালের মধ্যে একই স্থানে থাকে, অথবা অন্ততঃ কাছাকাছি থাকে, তাহলেই কেবল জ্ঞান সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং আমরা আশা করবো যে, আমাদের মাথার ভেতর যা ঘটে, নিশ্চয়তার সর্বোচ্চ মাত্রা আছে তারই মধ্যে; এবং ঠিক এটাই আমরা পাই যখন, আমরা একটা টেবিল দেখছি বলে মনে করার সময় যে রঙিন প্যাটার্ন থাকে, তার মতো আমাদের নিজেদের 'মানসিক ঘটনাবলী আমরা জানি।

সুতরাং, 'মানসিক' শব্দটাকে রক্ষা করার জন্য যদি আমরা ব্যগ্র হই, তাহলে 'মানসিক' ঘটনাকে আমরা সেই ঘটনা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, যাকে সর্বোচ্চ মাত্রার নিশ্চয়তার সঙ্গে জানা যায়, কারণ, পদার্থিক দেশ-কালে, ঘটনাটা এবং তাকে জানাটা পাশাপাশি (contiguous) থাকে। কাজেই মস্তিষ্কসম্পন্ন মাথার ভেতরে যেসব ঘটনা ঘটে, তাদের ব্যাপারে 'মানসিক' ঘটনাগুলো নিশ্চিত হবে। তাদের 'সবগুলোই' মস্তিষ্কের ভেতরে সংঘটিত ঘটনা হবে না, বরং কেবল সেই জাতীয় ঘটনা হবে, যেগুলো থেকে সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় যাকে 'জ্ঞান' বলা যায়।

তবে এখনও কতকগুলো জটিল সমস্যা আছে, যেগুলোর সম্পর্কে, এখন পর্যন্ত, কোন সুনির্দিষ্ট (ditinitive) উত্তর দেওয়া যায় না। আমরা যখন আমাদের নিজের কোন চিন্তাকে 'জানি' (know), তখন কি ঘটে? এবং চিন্তাটাকে আমরা কি অন্য কিছুর চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানি? আমরা যেমন দেখেছি, বাহ্য ঘটনাবলীর জ্ঞান গড়ে ওঠে তাদের সাক্ষাতে যে সংবেদনশীলতা দেখা দেয় তা-ই দিয়ে; কতকগুলো অমূর্ত কাঠামোগত দিক ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে তাদের [ঘটনাবলীর] সদৃশ কোনকিছু মনের ভেতরে বা মনের সামনে পাওয়ার মধ্যে সে জ্ঞান থাকে না। আমাদের নিজের মন সম্পর্কিত জ্ঞান কি একই রকম অমূর্ত ও অপ্রত্যক্ষ? অথবা আমরা সাধারণতঃ জ্ঞানকে যা বলে কল্পনা করি, তার সঙ্গেই কি এর সাদৃশ্য বেশী?

প্রথমে এ প্রশ্নটা নেওয়া যাক: আমরা আমাদের নিজের কোন চিন্তাকে যখন 'জানি' তখন কি ঘটে? অষ্টম অধ্যায়ে 'জানা'র (knowing) যে

১. অর্থাৎ, বস্তু (object) ও প্রতিক্রিয়া। (অনুবাদক)

সংজ্ঞা আমরা গ্রহণ করেছিলাম সেটা ধরে নিয়ে আমরা বলবো : আমরা আমাদের নিজের কোন চিন্তাকে তখন 'জানি' যখন আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরকার কোন ঘটনা থেকে এমন একটা বৈশিষ্ট্যগত (characteristic) তক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা ঘটনাটা ঘটার বেলায় উপস্থিত, কিন্তু অন্য সময় নয়। অর্থে, যখনই আমরা বলি, "আমি একটা টেবিল দেখছি", তখন আমরা টা চিন্তাকে জানছি, যেহেতু কেবল আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরকার কোন নাই এরকম একটা উক্তির (এ উক্তিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে) অপরিবর্তনীয় গ হতে পারে। আমরা 'চিন্তা করতে' পারি যে, আমরা একটা টেবিলকে নছি, কিন্তু সেটা ভুল।

সুতরাং অন্তর্দার্শনিক এবং অন্য জ্ঞানের মধ্যবর্তী পার্থক্যটা কেবল মাদের অভিপ্রায় এবং নিশ্চয়তার মাত্রার মধ্যে।[1] আমরা যখন বলি, আমি একটা টেবিল দেখছি," তখন কোন বাহ্য বস্তু জানা আমাদের অভিপ্রায় তে পারে, কিন্তু তাহলে আমরা ভুল করতে পারি; তবে, আমরা কৃতপক্ষে একটা দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষের ঘটনাকে (occurrence) জানছি। একই টনাকে আমরা যখন, "কোন একটা রঙিন প্যাটার্ন ঘটছে", এ কথাগুলোর হায্যে বর্ণনা করি, তখন আমরা আমাদের অভিপ্রায় পরিবর্তিত করেছি বং অভ্রান্ত হওয়ার নিশ্চয়তাও আমাদের অনেক বেশী। কাজেই আমাদের তিক্রিয়া যখন অন্তর্দার্শনিক জ্ঞান দেয় এবং যখন সে অন্য কোন রকমের জ্ঞান দয়, তখন এ দু'টোর মাঝখানকার গোটা পার্থক্যটা হচ্ছে ভ্রান্তির একটা ম্ভাব্য উৎসকে বাদ দেওয়া।

এখন আমি এ প্রশ্নে আসছি : আমরা কি অন্য কিছুর চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে আমাদের নিজের চিন্তাগুলোকে জানি? এটা এমন একটা প্রশ্ন যাকে ন সুস্পষ্ট রূপ (precision) দেওয়া কঠিন; এর মধ্যে এমন কিছুর বর্ণনা ছে যাকে লোকে একটা সমস্যা বলে 'অনুভব' করে, কিন্তু সমস্যাটা যে ক কি তা বলতে পারে না। তবে, কতকগুলো কথা বলা যেতে পারে যগুলো থেকে, আমাদের ধারণাগুলো যদিই-বা পরিষ্কার না হয়, আমাদের অনুভূতিগুলো হতে পারে।

[1] 'Only in our intention and in the degree of certainty'.

ধরা যাক, আপনার শ্রবণশক্তির পরীক্ষা হিসাবে, আপনাকে অনুরোধ করা হলো কোন একজন লোকে যা-কিছু বলে তারই পুনরাবৃত্তি করতে। তিনি বলেন "কেমন আছেন?" এবং আপনি তার পুনরাবৃত্তি করেন, "কেমন আছেন?" এটা আপনার জ্ঞান-প্রতিক্রিয়া,[১] এবং নিজেকে আপনি কথা বলতে শোনেন। আপনি বুঝতে পারেন যে, আপনি কথা বলার সময় যা শোনেন তা, অন্য লোকটি কথা বলার সময় আপনি যা শোনেন, তার নিকট-সদৃশ। এর ফলে আপনি অনুভব করেন যে, আপনি যা শুনেছিলেন, আপনার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তার যথাযথ পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ ক্ষেত্রে, আপনার জ্ঞান-প্রতিক্রিয়া এমন একটা ঘটনার কারণ যা, আপনি যে ঘটনাটাকে জানছেন, তার নিকট-সদৃশ। এ ছাড়া, সরল বাস্তববাদ দৃঢ়ভাবে আমাদের মধ্যে শিকড় গাড়ার দরুন আমরা মনে করি যে, আমরা যা বলেছিলাম, এবং কথা বলার সময় আমরা যা শুনেছিলাম, এ দুটো একই। এটা অবশ্য একটা অধ্যাস, যেহেতু কথা বলা এবং নিজেকে কথা বলতে শোনার মধ্যে একটা জটিল (elaborate) পদার্থিক এবং শরীরবৃত্তীয় কার্যকারণ-শৃঙ্খল এসে পড়ে; তৎসত্ত্বেও এ অধ্যাস থেকে এরকম কোন ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান যে খুবই গভীর (intimate), সে প্রত্যয় জোরদার হয়। এবং বস্তুতঃ, যে ঘটনাটা আমরা জানছি ঠিক সেটা কিংবা অন্ততঃ তার নিতান্ত সদৃশ কোন ঘটনা যখন আমাদের জ্ঞান-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পুনরুৎপাদিত হয়, তখন এ জ্ঞান যতটুকু গভীর হওয়ার আশা করা যেতে পারে ততটুকু গভীর হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা সত্য 'হতে পারে', কিন্তু কোনরূপ (any) নিশ্চয়তার সঙ্গে আমরা কেবল এই জানতে পারি যে, যখন জ্ঞাত বিষয়টা একটা প্রত্যক্ষ (percept) তখন এটা সত্য। এর থেকে বোঝা যায়, কেন আমাদের সবচেয়ে সন্দেহাতীত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত, অন্যান্য মানসিক ঘটনা অথবা বাহ্য জগতের ঘটনাবলী সম্পর্কিত নয়। কোন শব্দের উত্তরে আমরা প্রতিক্রিয়া করতে পারি তার অনুরূপ একটা শব্দ উৎপন্ন করে, এবং আমরা যদি যথেষ্ট চালাক হই তাহলে, আমরা যা দেখি, অনেকটা তার মতো একটা-কিছুর চিত্রাংকন করতে পারি। কিন্তু কোন সুখের জ্ঞান আমরা প্রকাশ করতে পারি

১. Knowledge reaction.

না আমাদের জন্যে তার খুবই সদৃশ অন্য একটা সুখ সৃষ্টি করে, অথবা কোন বাসনার জ্ঞানও প্রকাশ করতে পারি না অনুরূপ একটা বাসনা সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রত্যক্ষগুলোকে জানা হয় বাহ্য জগৎ অথবা আমাদের নিজ মনের ভেতরকার যে-কোন কিছু থেকে অধিকতর সঠিকতা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে।

এ অধ্যায়ে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি সেটা এই যে, 'চৈতন্য' সম্পর্কে উইলিয়াম জেম্‌সের মতামতগুলো অভ্রান্ত। বিষয়ী ও বিষয়, অথবা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যবর্তী বিরোধের মধ্যে যে ধরনের সম্বন্ধধর্মী বৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জনা ছিল, কোন মানসিক ঘটনার নিজস্ব অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে সে রকম কিছুই নেই। তা সত্ত্বেও 'মানসিক' ঘটনাবলীকে অন্যান্য ঘটনা থেকে আমরা আলাদা করতে পারি, এবং আমরা সবচেয়ে সন্দেহাতীত জ্ঞান পাই কোন এক শ্রেণীর মানসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে। ৮ম অধ্যায়ে আমরা জ্ঞানের যে আচরণবাদী সংজ্ঞা দিয়েছিলাম তাকে তার যৌক্তিক পরিণতি (logical conclusion) পর্যন্ত অনুসরণ করে আমরা এ ফলাফলে এসে পৌঁছেছি। যে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে (originally) আমরা সে সংজ্ঞায় পৌঁছে-ছিলাম তাকে আমাদের অনেকখানি পরিবর্তন করতে হয়েছে, এবং পরিবর্তনটা আমাদের উপর জোর করে চাপিয়েছে পদার্থবিত্থার সেই জ্ঞান যা, কাণ্ডজ্ঞানগত বাস্তববাদ থেকে যাত্রা শুরু করে, প্রত্যক্ষণের কার্যকারণ মতবাদের[১] মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞান সম্পর্কে সেই ধারণায় পৌঁছেছে যে ধারণা অবশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর মতো পদার্থবিদরা প্রথমে যে ধারণা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশী বিষয়ীগত। কিন্তু আমি দেখতে পারছি না এ পরিণতি থেকে আদৌ কিভাবে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

১. Causal theory of perception.

একবিংশতিতম অধ্যায়

আবেগ, বাসনা ও ইচ্ছা

এ পর্যন্ত, ভেতরের দিক থেকে মানুষ সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধানে, আমরা কেবল জ্ঞানের দিকটাই বিবেচনা করেছি, যে দিকটা বস্তুতঃ দর্শনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন আমাদেরকে মানব প্রকৃতির অন্যান্য দিক-গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে। আমরা যদি তাদের সম্পর্কে জ্ঞানের দিকটার চেয়ে বেশী সংক্ষেপে আলোচনা করি তাহলে তার কারণ এই নয় যে, তারা কম গুরুত্বপূর্ণ; কারণটা বরং এই যে, তাদের গুরুত্বটা ব্যবহারিক এবং আমাদের কাজটা তাত্ত্বিক। আবেগ নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

নালীবিহীন গ্রন্থিগুলোর ভূমিকা আবিষ্কারের ফলে আবেগ সম্পর্কিত মতবাদের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ক্যাননের (Cannon) 'Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage' নামে একটা বই যার বক্তব্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে, যদিও তার গুরুত্বের মাত্রার চেয়ে সে প্রচার বেশী হয় নি। মনে হয় যে, আবেগের অত্যাবশ্যক শরীরবৃত্তীয় শর্তগুলো হচ্ছে গ্রন্থিগুলো থেকে রক্তের মধ্যে কয়েক রকমের ক্ষরণ। কিছু লোকের বক্তব্য হচ্ছে—এসব ক্ষরণের সঙ্গে অনুবন্ধযুক্ত শরীরবৃত্তীয় পরিবর্তন-গুলো 'নিজেরাই' (are) আবেগ। আমি মনে করি যে, কিছু সতর্কতার সঙ্গে এ মতটাকে গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেকেই জানে যে, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিগুলো থেকে অ্যাড্রেনিনিন ক্ষরিত হয়, যার থেকে উৎপন্ন হয় ভয় অথবা ক্রোধের দৈহিক লক্ষণগুলো। কোন এক সময়, স্থানীয়ভাবে চেতনানাশক ঔষধ দিতে গিয়ে আমার দন্ত চিকিৎসক বেশ অনেক পরিমাণে এ বস্তুটা আমার রক্তে ইনজেকশনযোগে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আমি পাণ্ডুর হয়ে গেলাম আর কাঁপতে লাগলাম, এবং আমার হৃদকম্পন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল; বইটাতে যে রকম হওয়া উচিৎ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেইভাবে ভয়ের দৈহিক লক্ষণগুলো উপস্থিত ছিল, কিন্তু আমার কাছে এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল যে, আমি প্রকৃতপক্ষে ভয় অনুভব করছিলাম না। আমাকে

মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছে, এমন কোন স্বেচ্ছাচারী শাসকের (tyrant) সাক্ষাতে আমার মধ্যে সেই একই দৈহিক লক্ষণগুলো উপস্থিত থাকতো, কিন্তু অতিরিক্ত আরও কিছু থাকতো যা আমার দন্ত চিকিৎসকের চেয়ারে উপবিষ্ট থাকা-কালে অনুপস্থিত ছিল। পার্থক্যটা ছিল জ্ঞানের দিকটাতে: আমি ভয় অনুভব করিনি কারণ আমি জানতাম যে, ভয় পাওয়ার মত কিছুই উপস্থিত ছিল না। স্বাভাবিক জীবনে, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিগুলো উদ্দীপ্ত হয় ভয়ানক বা ক্রোধোদ্দীপক কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণ থেকে; কাজেই ইতিমধ্যেই জ্ঞানমূলক একটা উপাদান সেখানে উপস্থিত। যে বস্তুটার দ্বারা গ্রন্থিগুলো উদ্দীপ্ত হয়েছে, ভয় অথবা ক্রোধটা তার সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং আবেগটা পূর্ণ মূর্তিতে দেখা দেয়। কিন্তু অ্যাড্রিনিন যখন কৃত্রিম উপায়ে ঢুকানো হয় তখন এই জ্ঞানগত উপাদানটা অনুপস্থিত, এবং আবেগটা পুরোপুরি জাগতে পারে না। সম্ভবতঃ ঘুমের মধ্যে যদি সেটা প্রবেশ করানো হতো তাহলে তার থেকে একটা ভয়ংকর স্বপ্ন উৎপন্ন হতো, যার মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টার কল্পনা থেকে আসতো একটা ভয়ের বস্তু। প্রাণী ও অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের ক্ষেত্রে জাগ্রতাবস্থায় সেই একই ব্যাপার ঘটতে পারতো। কিন্তু গড়পড়তা যুক্তিবুদ্ধি (rationality)-সম্পন্ন কোন প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে আবেগটার পূর্ণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এই জ্ঞান থেকে যে, ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই। ভয় ও ক্রোধ উভয়ই সক্রিয় আবেগ, যার জন্য কোন বস্তুর প্রতি কোন-এক রকমের আচরণের আবশ্যকতা আছে; যখন স্পষ্টতঃই এ আচরণের প্রয়োজন দেখা না দেয় তখন পূর্ণভাবে আবেগ দুটোর কোনটাই অনুভব করা সম্ভব নয়।

তবে বিষাদের (melancholy) মতো অন্যান্য আরও আবেগ আছে যাদের ক্ষেত্রে কোন বস্তুর আবশ্যকতা নেই। মনে হয় যে, উপযুক্ত ক্ষরণরস ঢুকিয়ে এগুলোকে তাদের পূর্ণমাত্রায় জাগিয়ে তোলা সম্ভব। অসুস্থ যকৃতের দরুন বিষাদ উৎপন্ন হতে পারে, যার উৎসের জ্ঞান লাভের ফলে তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। যে-সব আবেগে কোন বস্তুর (object) আবশ্যকতা নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন উপযুক্ত কর্মধারার প্রয়োজন হয় না।

আবেগগুলোকে 'সাপেক্ষীকরণে'র (conditioning) আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, যার ফলে যেসব উদ্দীপক তাদেরকে জাগিয়ে তোলে, অভিজ্ঞতার ফলে তাদের বৈচিত্র্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। ডঃ ওয়াটসন অল্পবয়স্ক শিশুদের

মধ্যে ভয়ের দু'টো মাত্র মৌলিক উদ্দীপক খুঁজে পেয়েছেন—তারা হচ্ছে উচ্চ শব্দ,[১] এবং অবলম্বনের অভাব; কিন্তু এদের যে-কোন একটার সঙ্গে অনুষক্ত কোনকিছু ভীতিপ্রদক হয়ে উঠতে পারে।

কোন উদ্দীপকের উত্তরে আমাদের অখণ্ড প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন আবেগিক উপাদানকে পৃথক করা একটা অল্প-বিস্তর কৃত্রিম ব্যাপার। সন্দেহ নেই যে, একটা নির্দিষ্ট শরীরবৃত্তীয় সহগ[২] আছে, অর্থাৎ কোন গ্রন্থির উদ্দীপনা; কিন্তু, উদাহরণস্বরূপ, ভয়ের মধ্যে কোন বস্তুর প্রতি এক ধরনের ক্রিয়া আছে, যে ধরনের ক্রিয়ার পক্ষে অ্যাড্রেনিনের ক্ষরণ সহায়ক। তবে কোন নির্দিষ্ট আবেগিক আমেজবিশিষ্ট কতকগুলো দৃষ্টান্তের (occasion) মধ্যে সাধারণ একটা-কিছু আছে; তারা যে অনুষঙ্গবদ্ধ, এ সত্য থেকে সেটা বোঝা যায়। কোন আবেগ যখন আমরা প্রবলভাবে অনুভব করছি, তখন অন্যান্য যে সময়গুলোতে আমাদের মধ্যে সে ধরনের অনুভূতি জেগেছিল তাদের কথা চিন্তা করার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে জাগে। আবেগিক সাদৃশ্য-ভিত্তিক অনুষঙ্গ বহু কবিতার একটা বৈশিষ্ট্য। এর থেকে বোঝা যায় কি জন্য, আমাদের রক্ত যদি সচরাচর ভয়ের সঙ্গে অনুষক্ত কোন অবস্থায় থাকে এবং আমাদের বিচারশক্তি যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে খুব সম্ভবতঃ ভয়ের কোন-একটা কারণ আমরা এত সুস্পষ্টভাবে কল্পনা করবো যে, আমরা বিশ্বাস করবো যে, সেটা বাস্তবিকই উপস্থিত:

রাত্রিবেলায়, কোন ভয়ের জিনিস কল্পনা করলে,
একটা ঝোপকে ভল্লুক বলে মনে করা কত সহজ।

কিন্তু কোন যুক্তিবান মানুষ যদি মাতাল অথবা ঘুম-ঘুম অবস্থায় না থাকে, তাহলে তার মধ্যে অন্যান্য অনুষঙ্গগুলো এত প্রবল থাকবে যে, এই কল্পিত ভয়গুলো জাগবে না। এ জন্যই অ্যাড্রেনিনের প্রভাবে ভয়ের দৈহিক লক্ষণগুলো প্রদর্শন করা সম্ভব,আবেগটাকে প্রকৃতপক্ষে অনুভব না করেই।

আবেগগুলোর জন্যই জীবন চিত্তাকর্ষক হয়, এবং আমরা তার গুরুত্ব অনুভব করি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, তারাই হচ্ছে মানবাস্তিত্বের সবচেয়ে মূল্যবান

১. Loud noises.

২. Physiological concommitant.

উপাদান। কিন্তু আমরা যখন জগৎটাকে বোঝার চেষ্টা করছি—দর্শনে যেমন করি—তখন তাদেরকে বরং একটা বাধা স্বরূপ মনে হয়। তারা অযৌক্তিক মতামতের জন্ম দেয়, কারণ বাহ্য জগতের বস্তু-বিন্যাসের সঙ্গে আবেগিক অনুষঙ্গগুলোর সামঞ্জস্য থাকে কদাচিৎ। তারা আছে বলে আমরা জগৎটাকে দেখি আমাদের মেজাজের আয়নায়—আয়নাটার অবস্থা অনুযায়ী কখনও উজ্জ্বল কখনও ম্লান অবস্থায়। কৌতুহলের একমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া বৌদ্ধিক জীবনের পক্ষে আবেগগুলো মোটামুটি একটা বাধাস্বরূপ; যদিও সম্ভবতঃ আবেগের প্রতি বিশেষ (considerable) সংবেদনশীলতার সঙ্গে, সার্থক চিন্তার জন্যে প্রাণশক্তির (vigour) যে মাত্রা আবশ্যক, তার একটা অনুবন্ধ আছে। এ গ্রন্থে আবেগ সম্পর্কে আমি যদি নিতান্ত অল্প কথা বলি তাহলে তার কারণ এই নয় যে আমি তাদের মানবিক গুরুত্বের অবমূল্যায়ন করছি; তার কারণটা বরং এই যে, আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি সেটা ব্যবহারিক নয়, তাত্ত্বিক: জগৎকে বোঝা, তাকে বদলানো নয়। এবং যেসব উদ্দেশ্যের জন্য আমরা কাজ করবো তারা যদি আবেগ দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহলেও তাদের বাস্তবায়নের জন্য শক্তি পাই আমরা জ্ঞান থেকে। এমনকি ব্যবহারিক থেকেও, মানুষের শক্তিসামর্থ্যের আওতায় পড়ে এমন আর যেকোন কিছু থেকে জ্ঞানের উন্নতি বেশী উপকারী।

এখন আমি 'বাসনা'র (desire) প্রসঙ্গটাতে আসছি, ৩য় অধ্যায়ে আমরা আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যার আলোচনা করেছিলাম। অন্তর্দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু যোগ করার আছে কিনা, এখন আমি তাই জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আবার আমাদের স্মরণ করা দরকার যে, উদ্দীপক থেকে প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত যে একক প্রতিক্রিয়াটা রয়েছে তার ভেতরে উপাদানগুলোকে পৃথক করার মধ্যে কিছুটা কৃত্রিমতা আছে। যখনই কোন উদ্দীপক থেকে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তখন আমরা প্রতিক্রিয়াটাকে উদ্দীপকের কার্যফল হিসাবে, অথবা অন্যান্য আরও কার্যফলের কারণ হিসাবে, বিবেচনা করতে পারি। আমরা যখন জ্ঞানের কথা ভাবছি তখন আগেরটাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াটাকে বিবেচনা করার স্বাভাবিক ধারা; দ্বিতীয়টা স্বাভাবিক ধারা তখন যখন আমরা বাসনা অথবা ইচ্ছার কথা ভাবছি। বাসনার মধ্যে, আমাদের নিজেদের ভেতরে

অথবা আমাদের পরিপার্শ্বের ভেতরে অথবা উভয়ের ভেতরে আমরা কিছু-একটার পরিবর্তন ঘটাতে চাই। প্রশ্নটা হচ্ছেঃ বাসনা সম্পর্কে অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা কি আবিষ্কার করতে পারি?

জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি বিশুদ্ধ আচরণবাদী ব্যাখ্যাটা কার্যকারণের দিক থেকে অন্তর্দার্শনিক ব্যাখ্যার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার প্রয়োগ ক্ষেত্রেও অনেক বেশী বিস্তৃততর। তৃতীয় অধ্যায়ে বাসনা আচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। সেই হিসাবে তার আরম্ভটা বিবর্তনধারার অত্যন্ত নীচু স্তর থেকে; এবং, এমন-কি মানুষের মধ্যেও, বহু-সংখ্যক দৃষ্টান্তের মধ্যে যা আবিষ্কার করা যায়, আচরণের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই বাসনা তার সবখানি। ফ্রয়েডীয় 'অবচেতন' (unconscious) বাসনাগুলো থেকে যে সূত্র পাওয়া যায়, কিছু-সংখ্যক ক্রিয়ার কারণিক ব্যাখ্যা হিসাবে তার উপকারিতা আছে, কিন্তু আচরণের ধারা হিসাবে ছাড়া এ বাসনাগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে, কতকগুলো বাসনা সচেতন এবং প্রকাশ্য। এই শেষেরগুলোতে অতিরিক্ত ঠিক কোন্ জিনিসটা আছে, যা অন্যগুলোতে নেই?

একটা বাঁধাধরা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক—যেমন, ডেমসথিনিস একজন বড় বক্তা হবার ইচ্ছা করছেন। এ বাসনা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, এবং সে অনুসারে স্বেচ্ছায় তাঁর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। শুরুতেই, কেউ এর মধ্যে কেবল এমন-সব কাজ করার একটা নিছক আচরণবাদী প্রবণতা কল্পনা করতে পারেন, যেগুলো তাঁর সঙ্গীসাথীদের মনে দাগ কাটবে বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কার্যতঃ এটা মানব চরিত্রের একটা সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য, বালক-বালিকাদের মধ্যে যার একটা অতি সরল প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তারপর আসে লক্ষ্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা, ঠিক গোলকধাঁধার ভেতরকার ইঁদুরের প্রচেষ্টার মতোই; ভ্রান্ত গতি-পরিবর্তন, যার ফলে বিদ্রূপের পাত্র হতে হয়; সঠিক গতি-পরিবর্তন, যার ফলে প্রশংসার পনিরে ছোটখাটো ঠোকর মারা যায়। যে আত্ম-নিরীক্ষণের রূপ তখন পর্যন্ত আচরণবাদী, তা আমাদেরকে এই সূত্রে (formula) এনে উপস্থিত করতে পারেঃ আমি প্রশংসিত হতে চাই। এ পর্যায়ে বাসনাটা 'সচেতন' হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ে উপনীত হবার পর ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির সমস্যায় জ্ঞানকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

অনুষঙ্গের ফল-স্বরূপ উপায়ও কাম্য হয়ে ওঠে। এবং সেজন্য ডেমসথিনিস নিজেকে বক্তা হিসাবে কঠিন প্রশিক্ষণের অধীনে আনবার সিদ্ধান্ত নেন, যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাকেই সর্বোত্তম পন্থা বলে মনে হয়। নিছক সংবেদনশীলতা থেকে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভের সঙ্গে এই গোটা কার্যধারার (development) ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে; বস্তুতঃ এটা সেই একই বিবর্তনের একটা অংশ। কোন অবস্থার উপর আমাদের অখণ্ড প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আমরা একটা ঘটনাকে জ্ঞান হিসাবে এবং অন্য একটাকে বাসনা হিসাবে আলাদা করতে পারি না; প্রতিক্রিয়াটার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য হিসাবে জ্ঞান এবং বাসনা এই উভয় দিকই আছে, কিন্তু পৃথকভাবে তাদের অস্তিত্ব নেই।

প্রকাশ্য সচেতন বাসনায় সর্বদাই একটা লক্ষ্যবস্তু (object) আছে, ঠিক যেমন প্রকাশ্য সচেতন প্রত্যক্ষণে আছে; আমরা কামনা করি কোন ঘটনা অথবা কোন অবস্থা।[১] কিন্তু যে আদিম অবস্থা (condition) থেকে প্রকাশ্য বাসনা বিবর্তিত হয় তার ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। আমরা কেবল এমন একটা অবস্থা[২] দেখতে পাই, যার সম্পর্কে বলা যায় যে, তার মধ্যে আছে যন্ত্রণা (discomfort) এবং—ভিন্ন একটা অবস্থায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, অথবা অবসাদ এসে হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত, অথবা অন্য কোন আসক্তি থেকে চিত্ত-বিক্ষেপ না ঘটা পর্যন্ত নানা রকমের ক্রিয়াকর্ম। এ ক্রিয়াকর্ম এ রকম হবে যে, অতীতে প্রাসঙ্গিক ধরনের কোন অভিজ্ঞতা যদি ঘটে থাকে, তাহলে তাদের ফলস্বরূপ তাড়াতাড়ি নতুন অবস্থাটায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। প্রকাশ্য সচেতন বাসনার স্তরে যখন আমরা পৌঁছি, তখন মনে হয় আমরা যেন কোন-একটা লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে স্তর পর্যন্ত আমরা কেবল পেছন দিক থেকে ধাক্কা খাচ্ছি। শিক্ষণ থেকে এবং, প্রয়োজনীয় সময়টা অতিরিক্ত দীর্ঘ না হলে লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টা যে চলতে থাকবে, এ সত্যটা থেকে যেসব ফলাফল পাওয়া যায়, লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা বলে তাদের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যায়। বাসনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন রকমের অনুভূতি; এবং, ক্ষুধার মতো সুপরিচিত বাসনা-গুলোর বেলায়, যার দ্বারা ক্ষুধাটার নিবৃত্তি ঘটবে বলে আমরা জানি তার

১. State of affairs.

২. অর্থাৎ, আদিম পর্যায়ে বাসনা এ-রকম একটা অবস্থা যে, ...। (অনুবাদক)

সঙ্গে এ অনুভূতিগুলো অনুষক্ত হয়ে যায়। কিন্তু অনেকেই বাসনাকে যে রকম একটা 'মূলতঃ' সম্বন্ধধর্মী ঘটনা বলে মনে করেন, তেমন কোন ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করার পক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রের চেয়ে বাসনার ক্ষেত্রে আমি অধিক কোন কারণ দেখছি না। আমি বলবো যে, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি আর অনুষঙ্গই বাসনার মধ্যে লক্ষ্যবস্তুর যোগান দেয়, এবং প্রারম্ভিক পর্যায়ে এ লক্ষ্যবস্তু-গুলো (objects) হচ্ছে কতক রকমের ক্রিয়া সম্পাদনের অন্ধ প্রবণতা।

এখন অবশিষ্ট রইলো 'ইচ্ছা' (will) সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা। একটা অর্থ আছে, যে অর্থে ইচ্ছা একটা নিরীক্ষণযোগ্য ব্যাপার (phenomena), এবং অরেকটা অর্থ আছে যে অর্থে ইচ্ছা একটা পরাতাত্ত্বিক কুসংস্কার। সন্দেহ নেই যে, আমি বলতে পারি "তিরিশ সেকেণ্ড আমি আমার দম বন্ধ করে রাখবো," এবং তা করতে অগ্রসর হতে পারি; আমি বলতে পারি "আমি আমেরিকা যাবো," এবং তা করতে অগ্রসর হতে পারি; ইত্যাদি। এ অর্থে, ইচ্ছা একটা নিরীক্ষণযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু আমার মতে, একটা বৃত্তি (faculty) হিসাবে, একটা পৃথকীযোগ্য ঘটনা হিসাবে, ইচ্ছা একটা বিভ্রান্তি (delusion)। কথাটা পরিষ্কার করার জন্য, নিরীক্ষণযোগ্য ব্যাপারটা পরীক্ষা করা আবশ্যক হবে।

খুব অল্প-বয়স্ক শিশুদের এমন কিছু নেই, যার নাম দেওয়া যায় 'ইচ্ছা'। প্রথম দিকে তাদের নড়াচড়াগুলো হচ্ছে প্রতিবর্ত, এবং প্রথম যেখানে সেগুলো আর প্রতিবর্ত থাকে না, সেখানে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়মের সাহায্যে তাদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তবে শিশু যখন হাত ও পায়ের আঙুল নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে তখন লোকে একটা-কিছু লক্ষ্য করে যা অনেকটা ইচ্ছার মতো। এ প্রতি-ক্রিয়াটা লক্ষ্য করার সময় এটা পরিষ্কার মনে হয় যে, অনৈচ্ছিক দেহ-সঞ্চালনের কিছু অভিজ্ঞতা হবার পর শিশু আবিষ্কার করে কি ক'রে প্রথমে একটা সঞ্চা-লনের কথা ভাবতে হয় এবং পরে সঞ্চালনটা করতে হয়, এবং এটাও পরিষ্কার মনে হয় যে, এ আবিষ্কারটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আমরা জানি যে, বয়স্ক জীবনে সেটাই স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চালন যেটা উৎপন্ন করার আগে আমরা তার কথা চিন্তা করি। স্পষ্টতঃই, কোন সঞ্চালন অতীতে কখনও না ঘটিয়ে আমরা তার কথা ভাবতে পারি না; সুতরাং কোন সঞ্চালন আগে অনৈচ্ছিক না হয়ে ঐচ্ছিক হতে পারে না। আমি মনে করি যে, উইলিয়াম জেম্‌স্ যেমন ইঙ্গিত

দিয়েছিলেন, কোন ঐচ্ছিক সঞ্চালন হচ্ছে কেবল সেই সঞ্চালন, যার আগে ঘটে তার চিন্তাটা, এবং তার চিন্তাটা তার কারণের একটা অপরিহার্য অংশ।

একথা আমি যখন বলি, তখন 'চিন্তন' (thinking) কি দিয়ে তৈরী, সে বিষয়ে আমি কোন বিশেষ মত অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি না। ডঃ ওয়াটসন যেমন বলেন, এ সম্পূর্ণভাবে তৈরী হতে পারে কেবল কথা বলা (talking) দ্বারা; অথবা এর মধ্যে আরও কিছু থাকতে পারে। সেটা এখন ভাবার বিষয় নয়। ভাবার বিষয়টা হচ্ছে—যে দর্শনই লোকে অবলম্বন করুক না কেন, এমন একটা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটে, সাধারণ লোকে যাকে 'ভোরে ওঠার কথা চিন্তা করা," অথবা অন্য যে কোন দৈহিক সঞ্চালনের "কথা চিন্তা করা' ('thinking of') বলে বর্ণনা করে। এ ঘটনার বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন, 'ইচ্ছা'র প্রতি আরোপ্য যে-কোন সঞ্চালনের কারণের এটা একটা অপরিহার্য অংশ।

এ কথা অবশ্যই সত্য যে, কোন সঞ্চালন না ঘটিয়েও তার কথা আমরা ভাবতে পারি। বিশ্বাস না করে কোন ব্যাপার (state of affairs) কল্পনা করার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে; প্রত্যেকটাই বরং একটা সূক্ষ্ম ও পরবর্তী-কালীন উন্নয়নের ফল। যখন আমরা এক সঙ্গে কয়েকটা জিনিসের কথা ভাবি, এবং তাদের একটা আরেকটার উপর হস্তক্ষেপ করে, কেবল তখনই এদের প্রত্যেকটি ঘটবে। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি যে, যখনই আমরা কোন সম্ভাব্য সঞ্চলনের কথা চিন্তা করি, তখন সেটা সম্পাদন করার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে জাগে, এবং আমরা যদি আদৌ তা থেকে বিরত থাকি তো তার কারণটা কেবল বিপরীত প্রবণতা সম্পন্ন কোন চিন্তা অথবা অন্য কোন অবস্থা।

এ যদি সত্য হয় তো ইচ্ছার প্রসঙ্গে আদৌ রহস্যময় কিছু নেই। সঞ্চালন সম্পর্কে 'চিন্তা করা'টা যে-কিছুর দ্বারাই তৈরী হোক না কেন,[১] সেটা নিশ্চয় সঞ্চালনের নিজের সঙ্গে অনুষক্ত; সুতরাং শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার সাধারণ নিয়ম-বলে আমরা আশা করবো যে, সঞ্চালনের চিন্তার মধ্যে সঞ্চালনটা ঘটানোর একটা প্রবণতা থাকবে। আমি বলবো যে, এই হচ্ছে ইচ্ছার সারবস্তু।

১. **Whatever may constitute "thinking of" a movement.**

ইচ্ছার (volition) জোরালো দৃষ্টান্তগুলো, যেগুলোতে আমরা কিছু সময় চিন্তা করার পর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছি, কেবল পরস্পর-বিরোধী শক্তির দৃষ্টান্ত মাত্র। যে জায়গায় আপনি যাওয়ার কথা চিন্তা করছেন, তার সঙ্গে আপনার সুখদায়ক এবং অসুখদায়ক, এই উভয় রকমের অনুষঙ্গ থাকতে পারে ; এর ফলে আপনি দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে পারেন, এ অনুষঙ্গগুলোর কোন একটা অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত। ইচ্ছার মধ্যে এর চেয়ে বেশী কিছু থাকতে পারে, কিন্তু আছে যে তা বিশ্বাস করার কোন উপযুক্ত কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

নীতিবিদ্যা

পরম্পরাগত ভাবে নীতিবিদ্যা দর্শনেরই একটা বিভাগ, এবং সেই কারণে আমি তার আলোচনা করছি। আমি নিজে মনে করি না যে, একে দর্শনের আওতাভুক্ত করা উচিত, কিন্তু বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যে সময় লাগবে সেটা প্রমাণ করতেও সেই সময়ই লাগবে, অথচ সেটা হবে কম চিত্তাকর্ষক।

অস্থায়ীভাবে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায় যে, যেসব সাধারণ সূত্র আচরণের নীতিমালা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে, নীতিবিদ্যা সেগুলোরই সমষ্টি। কোন বিশেষ অবস্থায় কোন ব্যক্তির কিভাবে আচরণ (act) করা উচিত, সে কথা বলা নীতিবিদ্যার কাজ নয়; সেটা হচ্ছে প্রায়োগিক নীতি-বিদ্যার (casuistry) এলাকা। জেস্যুইটদের উপর প্রটেস্ট্যাণ্ট এবং জেনসেন-বাদীদের (Jansenists) আক্রমণের ফলে 'casuistry' শব্দটা মন্দ তাৎপর্য অর্জন করেছে। কিন্তু এর পুরাতন এবং সঠিক অর্থে, এতে সম্পূর্ণ বৈধ একটা বিদ্যা (study) বোঝায়। যেমন, এ প্রশ্নটা ধরুন: কোন্ অবস্থায় একটা মিথ্যা কথা বলা সঙ্গত? কোনরূপ চিন্তা না করেই কিছু লোকে বলবে: কখনও নয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে এ উত্তরের পক্ষে তর্ক করা যায় না। প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, কোন নরহত্যাকারী পাগল যদি হত্যা করার উদ্দেশ্যে কোন লোকের পেছনে ধাওয়া করে, এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি তাকে চলে যেতে দেখেছেন কিনা, তাহলে আপনার উচিত মিথ্যা কথা বলা। স্বীকার করা হয় যে, মিথ্যা কথা বলা যুদ্ধকলার একটা বৈধ শাখা; এও স্বীকার করা হয় যে, কনফেশনালের (confessional) গোপন কথাগুলো রক্ষা করার জন্য পাদ্রীরা, এবং তাঁদের রোগীদের পেশাগত আস্থা রক্ষা করার জন্য ডাক্তারেরা মিথ্যা কথা বলতে পারেন। এ সব প্রশ্ন পুরাতন অর্থে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার অন্তর্গত, এবং এটা সুস্পষ্ট যে, প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করার এবং উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু নীতিশাস্ত্রকে যে অর্থে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে অর্থে প্রশ্নগুলো এ বিদ্যার অন্তর্গত নয়।

"তুমি চুরি করবে না"—আচরণের এ জাতীয় বাস্তব নীতিমালায় পৌঁছানো নীতিবিদ্যার কাজ নয়, এটা হচ্ছে নীতিশিক্ষার (morals) অঞ্চল। এ ধরনের নীতিমালা যে ভিত্তি থেকে অনুমান করা যেতে পারে, নীতিবিদ্যার কাছ থেকে সেই ভিত্তি প্রত্যাশা করা হয়। সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বয়স, জাতি এবং ধর্মমত (creed) অনুসারে নীতিশিক্ষার নিয়মগুলো এত ভিন্ন যে, যাঁরা কখনও ভ্রমণ বা নৃতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন নি তাঁরা সেটা কদাচিৎ বুঝতে পারেন। এমন কি, একটা সমজাতীয় সম্প্রদায়ের[১] মধ্যেও মতের পার্থক্য দেখা দেয়। কোন লোকের কি উচিত তার স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যা করা ? চার্চ বলেন, না—আইন বলে, না—এবং কাণ্ডজ্ঞান বলে, না ; তথাপি বহু লোকে বলবে হ্যাঁ, এবং অনেক সময় জুরীরাও দণ্ড দিতে (condemn) রাজী হন না। এই সব সন্দেহজনক ক্ষেত্রগুলো তখন দেখা দেয় যখন কোন নৈতিক নিয়মের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু নীতিবিদ্যার কাজ এমন কিছু নিয়ে যা নৈতিক নিয়মাবলীর[২] চেয়ে বেশী সাধারণ এবং কম পরিবর্তন-সাপেক্ষ। সত্য বটে যে, কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে, যে নীতি (ethic) থেকে সেই সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলীতে পৌঁছা যায় না, তাকে নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করা হয়। এর থেকে অবশ্য এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, এরকম কোন নীতি বাস্তবিকই মিথ্যা, কারণ সে সম্প্রদায়ের নৈতিক নিয়মগুলো অবাঞ্ছনীয় হতে পারে। মস্তক-শিকারীদের (head-hunters) কতকগুলো উপজাতি মনে করে যে, বিবাহ-সভায় তার নিজের দ্বারা নিহত কোন ব্যক্তির মাথা নিয়ে আসতে না পারা পর্যন্ত কোন ব্যক্তির বিবাহ করা উচিত নয়। এ নৈতিক নিয়ম সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তোলে, মনে করা হয় যে, তারা স্বেচ্ছাচারিতাকে উৎসাহ দিচ্ছে এবং পৌরুষের মান অবনত করছে। তা সত্ত্বেও, কোন নীতির কাছে আমাদের এ দাবী করা উচিত হবে না যে, সে মস্তক শিকারীদের নৈতিক নিয়মগুলোকে সঙ্গত বলে দেখাবে।

সম্ভবতঃ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যখন বলে, "আপনার 'উচিত' এই-এই করা" অথবা "আমার উচিত এই-এই করা", তখন কি বোঝানো হয় তা জিজ্ঞাসা করা।

---

১. Homogeneous community.
২. Moral rules.

লতঃ, এ জীবন কোন বাক্যের মধ্যে একটা আবেগিক আধেয় আছে; এর র্থ, "এটাই হচ্ছে সেই কাজ যার প্রতি আমি অনুমোদনের আবেগ অনুভব রি।" কিন্তু আমরা বিষয়টাকে সেখানেই ছেড়ে দিতে চাই না; আমরা মন একটা-কিছু বের করতে চাই, যা কোন ব্যক্তিগত আবেগের চেয়েও বেশী বষয়গত, প্রণালীবদ্ধ (systematic) ও অপরিবর্তনীয়। নীতি শিক্ষক বলেন: আপনার উচিত এই-এই ধরনের কাজগুলো অনুমোদন করা।" তাঁর মতের ক্ষে সাধারণতঃ তিনি যুক্তি দেন, এবং আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ক কি রকমের যুক্তি দেওয়া সম্ভব। এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি অতি প্রাচীন একটা ভিত্তির উপর। সক্রেটিসের কাজ ছিল প্রধানতঃ নীতিবিদ্যা নিয়েই; প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল উভয়েই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন; তাঁদের সময়ের পূর্বেই কনফিউসিয়াস ও বুদ্ধের প্রত্যেকেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রায় সম্পূর্ণভাবে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে, যদিও বুদ্ধের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদের[১] উদ্ভব ঘটেছিলো। নীতিবিদ্যার উপর প্রাচীনকালের ব্যক্তিদের মতামত (বলতে পারেন) পদার্থবিজ্ঞানের উপর তাঁদের মতামতের চেয়ে বেশী অনুধাবনযোগ্য; এখন পর্যন্ত বিষয়টা ঠিক যুক্তিচিন্তার উপযোগী বলে প্রমাণিত হয় নি, এবং আমরা গর্ব করতে পারি না যে, আধুনিকেরা তাঁদের পূর্ববর্তীদেরকে সেকেলে করে ফেলেছেন।

ঐতিহাসিকভাবে, প্রথমে সদগুণ (virtue) ছিল কোন প্রাধিকারের প্রতি আনুগত্য, সেটা দেবতাদেরই (gods) হোক, সরকারেরই হোক, অথবা দেশাচারেরই হোক। প্রাধিকারকে যারা অমান্য করতো তাদের শাস্তি ছিল অতি স্পষ্ট। এটা এখন পর্যন্ত হেগেলের মত, যাঁর চোখে সদগুণ হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। তবে এ মতবাদের বিভিন্ন রূপ আছে, এবং তাদের বিরুদ্ধে আপত্তিও বিভিন্ন। এর অপেক্ষাকৃত আদিম রূপে, মতবাদটা এ বিষয়ে সচেতন নয় যে, সদগুণ কিসে তৈরী সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রাধিকারের বিভিন্ন মত, এবং সেজন্য মতবাদ-দাতা যে সম্প্রদায়ে বাস করেন তার প্রচলিত নীতিকেই এ মত সার্বজনীন করে তোলে। যখন দেখা যায় যে, অন্যান্য কালে এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে ভিন্ন দেশাচার রয়েছে, তখন সেগুলোকে ঘৃণচ লে নিন্দা করা হয়। এ মতটাই প্রথমে বিবেচনা করা যাক।

১. Theological doctrine.

এখন যে মতটা আমাদের পরীক্ষা করতে হচ্ছে সেটা এই যে, আচরণের কতকগুলো নিয়ম আছে—যেমন, ডেক্যালগ[১]—যেগুলো সকল অবস্থায় সদগুণকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে ব্যক্তি সবগুলো নিয়ম পালন করে সে সম্পূর্ণ পুণ্যবান (virtous); যে ব্যক্তি তা করতে ব্যর্থ হয়, তার ব্যর্থতার পৌণ-পুণিকতার মাত্রানুসারে সে পাপিষ্ঠ (wicked)। নীতিবিদ্যার ভিত্তি হিসাবে এর বিরুদ্ধে কয়েকটা আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, নিয়মগুলো কদাচিৎ মানবাচরণের সমগ্র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যেমন, আমাদের স্বর্ণ-মান (gold standard) গ্রহণ করা উচিৎ কিনা, সেটা দেখাবার মত ডেক্যালগে কিছুই নেই। কাজেই যাঁরা এ মত পোষণ করেন তাঁরা মনে করেন যে, কতকগুলো প্রশ্ন 'নৈতিক সমস্যা' (moral issues), এবং অন্যগুলো এ প্রকৃতির নয়। কার্যতঃ, তার অর্থ হচ্ছে 'নৈতিক সমস্যাগুলো'-র বেলায় ফলাফলের কথা না ভেবে আমাদের কোন-এক ভাবে কাজ করা উচিত, যদিও অন্য বিষয়গুলোর বেলায় আমাদের বিবেচনা করা উচিত কোন্ পন্থা থেকে সবচেয়ে বেশী কল্যাণ পাওয়া যাবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমরা দু'টো ভিন্ন নৈতিক মতবাদে (ethical systems) এসে পৌঁছি, যাদের একটাতে নীতিমালা (code) সবাক, অন্যটাতে নির্বাক। দার্শনিকের কাছে এ অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

এ রকম একটা মতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটার ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রথমটা থেকে। আমরা সবাই অনুভব করি যে, কিছু ফলাফল বাঞ্ছনীয়, এবং অন্যগুলো অবাঞ্ছনীয়; কিন্তু আচরণের যে নীতিমালায় অবস্থা (circumstances) সম্পর্কে কোন বিবেচনা করা হয় না, কখনও কখনও তার থেকে এমন ফলাফল পাওয়া যাবে যাকে আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি, এবং কখনও কখনও এমন ফলাফল যাকে আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি। উদাহরণস্বরূপ "তুমি হত্যা করবে না"—এই হিতোপদেশটা নেওয়া যাক। সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই মনে করেন যে, রাষ্ট্র যখন কোন ব্যক্তিকে আদেশ দেয় তখন এ হিতোপদেশ প্রযোজ্য হয় না; অন্যান্য কারণের মধ্যে এ-ও একটা কারণ যে জন্য সম্প্রতি স্কুলগুলোতে ডেক্যালগ শিক্ষাদানের অনুমতি দিতে নিউইয়র্ক স্কুল বোর্ড অস্বীকার করেছিলো।

১. বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের দশটি আদেশবাণী (decalogue)। (অনুবাদক)

তৃতীয় আপত্তিটা এই যে, জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, নৈতিক নিয়মগুলো জানা হয় কিভাবে। ঐতিহাসিকভাবে, এর সাধারণ (usual) উত্তরটা হচ্ছে, তাদের জানা হয়ে থাকে প্রত্যাদেশ এবং ঐতিহ্যের মাধ্যমে। কিন্তু এগুলো দর্শন-বহির্ভূত জ্ঞানের উৎস। দার্শনিক এটা লক্ষ্য না করে পারেন না যে, প্রত্যাদেশ অনেক হয়েছে এবং একটা বাদ দিয়ে আরেকটাকে তিনি কি জন্য গ্রহণ করবেন তা স্পষ্ট নয়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক লোকের কাছে বিবেক একটা ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশ, এবং নিয়মিতভাবে সে তাকে বলে দেয় কোন্‌টা ঠিক এবং কোন্‌টা বেঠিক। এ মতের বেলায় সমস্যাটা এই যে, যুগ থেকে যুগে বিবেকের পরিবর্তন ঘটে। আজকাল অধিকাংশ লোকই কোন লোককে তাদের সঙ্গে পরাতাত্ত্বিক ব্যাপারে মতানৈক্যের দরুন জীবন্ত পুড়িয়ে মারাকে অনুচিত মনে করে, কিন্তু অতীতে, সঠিক পরাতত্ত্বের স্বার্থে একাজ করা হলে তাকে খুবই প্রশংসাজনক (meritorious) মনে করা হতো। নৈতিক ধারণাবলীর ইতিহাস যিনি অধ্যয়ন করেছেন তিনি বিবেককে সর্ব ক্ষেত্রেই নির্ভুল বলে মনে করতে পরেন না। কাজেই আমাদেরকে আচরণের এক প্রস্থ নীতিমালার সাহায্যে সদগুণের (virtue) সংজ্ঞা দেওয়ার প্রচেষ্টা বর্জন করতে হয়।

তবে, সদগুণ যে প্রাধিকারের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে আছে—এ মতের আরেকটা রূপ আছে। একে বলা যেতে পারে 'প্রশাসকের নীতি'।[১] একজন লোক ঘটনাক্রমে যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, কোন রোমান অথবা ইঙ্গ-ভারতীয় প্রো-কনসাল (pro-consul) সদগুণকে সংজ্ঞায়িত করবেন সেই সম্প্রদায়ের নৈতিক বিধিমালার প্রতি আনুগত্য হিসাবে। নৈতিক বিধিমালা-গুলোতে[২] বিভিন্নতা যাই থাক না কেন, কোন লোকের উচিত তার নিজের সময় আর স্থান ও ধর্মমতের নীতিমালার প্রতি সর্বদাই অনুগত থাকা। উদাহরণস্বরূপ, বহু-বিবাহ প্রথা পালন করার জন্য কোন মোহাম্মদীয়কে[৩] দুষ্ট বলে মনে করা হবে না, কিন্তু কোন মোহাম্মদীয় দেশে বাস করলেও কোন ইংরেজকে তা মনে করা হবে। এ মতে সামাজিক সঙ্গতি সদগুণের সারবস্তু

১. "the administrator's ethic."
২. Moral codes.
৩. Mohammedan.

হয়ে দাঁড়ায়; অথবা, হেগেলের বেলায় যে রকম, এ মতানুসারে সদগুণকে ধরা হয় সরকারের প্রতি আনুগত্য হিসাবে। এ জাতীয় মতবাদগুলোর সমস্যা হচ্ছে, এগুলোতে প্রাধিকারের প্রতি কোন নৈতিক বিধেয় প্রয়োগ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়: কোন দেশাচার ভাল অথবা সরকার মন্দ, এ উক্তির মধ্যে কোন অর্থ আমরা খুঁজে পেতে পারি না। স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গ এবং তাদের অনুগত ক্রীতদাসদের (willing slaves) ক্ষেত্রে এ মত উপযোগী; কোন প্রগতিশীল গণতন্ত্রে এ টিকতে পারে না।

সঠিক মতবাদের আরেকটু কাছাকাছি আসা যায়, যদি আমরা সঠিক আচরণকে সংজ্ঞায়িত করি অভিপ্রায় (motive) অথবা মনের অবস্থার সাহায্যে। এ মতবাদ অনুসারে, যে সব কাজের প্রেরণা কতকগুলো আবেগ থেকে আসে সেগুলো ভালো, এবং যেগুলোর প্রেরণা আসে অন্য কতকগুলো আবেগ থেকে সেগুলো মন্দ। মরমীবাদীরা (mystics) এ মত পোষণ করেন, এবং সেজন্য আইনের খুঁটিনাটির প্রতি তাঁরা এক ধরনের ঘৃণা পোষণ করেন। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, মনে করা যায় যে, যেসব কাজের প্রেরণা আসে প্রেম থেকে সেগুলো ভালো, এবং যেগুলোর প্রেরণা আসে ঘৃণা থেকে সেগুলো মন্দ। কার্যতঃ এ মতকে আমি সঠিক বলে মনে করি; কিন্তু দার্শনিকভাবে আমি একে আরও মৌলিক কিছু-একটা থেকে অনুমেয় বলে মনে করি।

এ পর্যন্ত আমরা যেসব মতবাদ বিবেচনা করেছি সেগুলো, যেসব মতবাদে আচরণের ন্যায্যতা অথবা অন্যায্যতা তার ফলাফল দিয়েই বিবেচিত হয়, সে সব মতবাদের বিপরীত। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে উপযোগবাদী (utilitarian) দর্শন, যার মতে সুখই হচ্ছে মঙ্গল (the good), এবং আমাদের এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে জগতের মধ্যে অসুখের তুলনায় সুখের পরিমাণ সর্বাধিক হতে পারে। আমি নিজে সুখকে মঙ্গলের যথার্থ সংজ্ঞা বলে মনে করবো না, কিন্তু আমি স্বীকার করবো যে, আচরণের বিচার হওয়া উচিত তার ফলাফলের সাহায্যে। অবশ্য আমার কথার অর্থ এই নয় যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ব্যবহারিক সংকটের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত চিন্তা করে আচরণের বিভিন্ন পন্থার ফলাফল নির্ধারণে সচেষ্ট হওয়া, কারণ সেটা করতে গেলে প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের হিসাব শেষ করার আগেই

কাজ করার সুযোগটা চলে যেত। তবে আমি অবশ্যই এটা বোঝাচ্ছি যে, যে পরিমাণে গৃহীত নৈতিক বিধিমালা শিক্ষাক্ষেত্রে শেখানো হয় এবং জনমত কিংবা অপরাধ-আইনে তার প্রকাশ ঘটে, সেই পরিমাণে প্রতি যুগে (generation) সাবধানতার সঙ্গে তাকে পরীক্ষা করা উচিত, যাতে বোঝা যায় বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যগুলো অর্জনের দিক থেকে সে বিধিমালা তখন পর্যন্ত উপযুক্ত কিনা, এবং যদি তা না হয়, তাহলে কোন্ কোন্ দিক থেকে তার সংশোধন হওয়া দরকার। সংক্ষেপে, আইনের নীতিমালার মতো নৈতিক নীতিমালারও উচিত জনহিতকে সর্বদাই তার লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধান করা। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে জনহিত (public good) কিসে থাকে।

এ মতানুসারে, 'সঠিক আচরণ' কোন স্বনির্ভর (autonomous) ধারণা নয়, বরং তার অর্থ "বাঞ্ছনীয় ফলাফল উৎপন্ন করার জন্যে পরিকল্পিত আচরণ।" বলা যায় যে, এমনভাবে কাজ করা সঠিক হবে যাতে জনসাধারণ সুখী ও বুদ্ধিমান হয়, এবং এমনভাবে কাজ করা বেঠিক হবে যাতে তারা অসুখী ও নির্বোধ হয়। নিজেদেরকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে আমরা কিভাবে আবিষ্কার করতে পারি, সঠিক আচরণের লক্ষ্যগুলো কি দিয়ে তৈরী।

একটা মত আছে—উদাহরণস্বরূপ, ডঃ জি. ই. ম্যুর[১] তার প্রবক্তা—যে, 'মঙ্গল' এমন একটা ধারণা যার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, এবং যে ধরনের জিনিসগুলো তাদের নিজের গুণেই ভালো, তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতাপূর্বভাবে আমরা কতকগুলো সাধারণ যুক্তিবাক্য জানি। ডঃ ম্যুরের মতানুসারে, সুখ, জ্ঞান, সৌন্দর্যের উপলব্ধি, ইত্যাদি জাতীয় জিনিসগুলো ভালো বলে পরিচিত; এ-ও জানা আছে যে, আমাদের এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে ভালো জিনিসের সৃষ্টি হয় এবং মন্দ জিনিস বাধা প্রাপ্ত হয়। ইতিপূর্বে আমি নিজে এ মত পোষণ করতাম, কিন্তু অংশতঃ স্যাণ্টায়ানা (Santayana) সাহেবের 'Winds of Doctrine'-এর দরুন আমি সেটা বর্জন করেছি। আমি এখন মনে করি যে, ভালো ও মন্দ বাসনা থেকে উৎপন্ন। আমি কেবল

১. G. E. Moore.

এটা বোঝাচ্ছি না যে, যা কাম্য তাই মঙ্গল, কারণ মানুষের বাসনাগুলোর মধ্যে বিরোধ বাধে, এবং আমার মতে 'মঙ্গল' প্রধানতঃ একটা সামাজিক ধারণা যার লক্ষ্য হচ্ছে এ বিরোধ থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ খুঁজে পাওয়া। তবে, এ বিরোধ কেবল বিভিন্ন লোকের বাসনার মধ্যে নয়; বরং বিভিন্ন সময়ে অথবা একই সময়ে একই লোকের সামঞ্জস্যহীন বাসনাগুলোর মধ্যে এ বিরোধ দেখা দিতে পারে—এমনকি সে যদি রবিনসন ক্রুসোর মত নিঃসঙ্গও হয়। বাসনার দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত চিন্তা থেকে 'মঙ্গলে'র ধারণাটা কিভাবে বেরিয়ে আসে, সেটা দেখা যাক।

রবিনসন ক্রুসো নিয়ে আমরা আরম্ভ করবো। তার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে—যেমন, অবসাদ আর ক্ষুধার মধ্যে, বিশেষতঃ এক সময়ের অবসাদ আর অন্য সময়ের পূর্বজ্ঞাত (foreseen) ক্ষুধার মধ্যে। অন্য কোন সময়ের প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানোর উদ্দেশ্যে ক্লান্ত অবস্থায় কাজ করার জন্য তার যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, যাকে নৈতিক প্রচেষ্টা বলা হয়, সে প্রচেষ্টার সব বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে আছে: যে লোকের মধ্যে সে প্রচেষ্টা আছে, আমরা তাকে সেই প্রচেষ্টাবিহীন লোকের চেয়ে ভালো মনে করি, এবং সে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। কোন কারণে, এ রকম জিনিসকে নীতি বলা হয় না, বলা হয় 'মনোবল' (morale); তবে পার্থক্যটা আমার কাছে অবাস্তব মনে হয়। রবিনসন ক্রুসোকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, তার অনেক বাসনা আছে, যাদের প্রত্যেকটি এক সময়ের চেয়ে অন্য সময়ে বেশী শক্তিশালী, এবং, সে যদি সর্বদাই যে বাসনাটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করে, তাহলে যেগুলো চরম পর্যায়ে অধিকতর শক্তিশালী সেগুলোকে সে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এ পর্যন্ত ব্যাপারটার সঙ্গে কেবল বুদ্ধিই জড়িত; কিন্তু মনে করা যেতে পারে যে, বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে, একটা সুসমঞ্জস জীবনের জন্যে কামনা বেড়ে যেতে থাকে, অর্থাৎ সেই জীবনের জন্যে, যার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্ধ-স্থায়ী বাসনাগুলো কাজের উপর প্রভুত্ব করে। আবার: সুসমঞ্জস জীবনের বাসনা ছাড়াও, কতকগুলো বাসনা থেকে অন্য কতকগুলো বাসনার চেয়ে সামঞ্জস্য উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বেশী। উদাহরণস্বরূপ, যে-ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক কৌতূহল থেকে পাওয়া যায় মৃদু অস্পষ্ট তৃপ্তি, সে-ক্ষেত্রে ভেষজ (drugs)

থেকে পাওয়া যায় হর্ষোচ্ছ্বাস, যার পরে আসে হতাশা। যদি অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমরা রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে এসে পৌঁছি এবং তাকে উদ্ভিদবিদ্যা পড়তে দেখি, তাহলে তার সম্পর্কে, তার হুইস্কির শেষ বোতলটার উপর তাকে মাতাল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখার চেয়ে, আরও ভাল ধারণা আমরা পোষণ করবো। এর সমস্তটাই নীতিশিক্ষার (morals) অন্তর্গত, যদিও এটা সম্পূর্ণভাবে আত্মকেন্দ্রিক (self-regarding)।

আমরা যখন সমাজবদ্ধ মানুষের কথা চিন্তা করতে বসি, তখন নৈতিক প্রশ্নগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও জটিল হয়ে ওঠে, কারণ একই ব্যক্তির বাসনাগুলোর আভ্যন্তরীণ বিরোধ মীমাংসা করার চেয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বাসনাগুলোর বিরোধ মীমাংসা করা বেশী কঠিন কাজ। এখানে কতকগুলো পার্থক্য লক্ষ্য করতে হয়। প্রথমে রয়েছে, যে নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ[১] এমন একটা কোন্দলের কথা চিন্তা করছে (contemplating) যে ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই, সেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকোণ এবং কোন্দলকারীদের নিজেদের দৃষ্টিকোণের মধ্যবর্তী পার্থক্যটা। তারপর আছে—লোকে যা 'করুক' বলে আমরা ইচ্ছা করি, এবং আবেগ ও বাসনা হিসাবে তারা যা 'অনুভব করুক' বলে আমরা ইচ্ছা করি, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পার্থক্যটা।

সর্বত্রই কর্তৃপক্ষের মতটা হচ্ছে—যেসব কোন্দলের মধ্যে সে কোন পক্ষ নয় সেগুলো অবাঞ্ছিত, কিন্তু যেসব কোন্দলে সে একটা পক্ষ তাদের ভেতরে সদগুণ রয়েছে কর্তৃপক্ষের বিজয়কে এগিয়ে নেওয়ার মধ্যে। পরবর্তী দিকটাতে, সে কাজ করছে কোন কর্তৃপক্ষ হিসাবে নয়, বরং কেবল কতিপয় কলহপ্রিয় ব্যক্তির একটা সমষ্টি হিসাবে, যারা নিজেদের মধ্যে কলহ করার চেয়ে বাইরের লোকদের সঙ্গে কলহ করা বেশী লাভজনক বলে মনে করে; সুতরাং কর্তৃপক্ষের এ দিকটা আমরা এড়িয়ে যাব, এবং কেবল যখন সে নিরপেক্ষ তার তখনকার কাজ বিবেচনা করবো। এ ক্ষেত্রে, সে চায় যারা কলহ আরম্ভ করে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে অথবা কখনও কখনও উভয় পক্ষকে শাস্তি দিয়ে কলহকে বাধা দিতে। মঁসিয়ার হুক (Monsieur Huc)—সেই জেসুইট মিশনারী যিনি প্রায় আশি বছর আগে তাঁর চীন, তাতারস্থান এবং তিব্বত

১. Neutral authority.

ভ্রমণের এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিখেছিলেন—এক ম্যানডারিনের[১] সঙ্গে তাঁর যে আমোদজনক কথোপকথন হয়েছিল তার বর্ণনা দেন। ম'সিয়ার হুক মন্তব্য করেছিলেন যে, চীনা ন্যায় বিচার দীর্ঘসূত্রী, ব্যয়বহুল, এবং দুর্নীতিপূর্ণ। ম্যানডারিন ব্যাখ্যাস্বরূপে বললেন যে, সম্রাটের এক আজ্ঞা অনুসারে ন্যায় বিচারকে সে রকম করা হয়েছিল, এবং সে আজ্ঞার মর্মার্থ এই ছিল যে, স্বর্গপুত্রের[২] প্রজারা অত্যন্ত মামলাবাজ হয়ে পড়েছে এবং এ অভ্যাস তাদেরকে বর্জন করতে বাধ্য করা অত্যাবশ্যক। তারপর সে অনুজ্ঞাতে ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের (judges) কাছে ইঙ্গিত দেওয়া হলো যে, মোকদ্দমার সংখ্যা কমানোর উপায় হিসাবে উপরোক্ত ত্রুটিগুলো বাঞ্ছনীয়। দেখা গেল যে, এ দিক থেকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্রাটের হুকুমগুলো পালিত হয়েছিলো—অন্য কতকগুলো দিকের চেয়ে বেশী করে।

আভ্যন্তরীণ কোন্দল-প্রবণতাকে বাধা দেওয়ার জন্য সামাজিক (public) কর্তৃপক্ষ অন্য যে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করেন, সেটা হচ্ছে দলীয় মনোভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশপ্রেম, ইত্যাদি সৃষ্টি করা—অর্থাৎ যে দলের উপর তারা প্রভুত্ব করে তার বাইরের লোকদের উপর কলহ করার প্রবণতাগুলোকে কেন্দ্রীভূত করা। স্পষ্টতঃই এ জাতীয় পদ্ধতি পক্ষপাতমূলক এবং বাহ্যিক; কোন বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের যদি কখনও জন্ম হয় তাহলে তার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ-রকম কোন কর্তৃপক্ষকে সামঞ্জস্য সৃষ্টির এর চেয়েও ভাল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে; বর্তমানে নাগরিকদের কাছে কিছু-সংখ্যক কর্তৃপক্ষের আনুগত্যের যে দাবী, এর দাবী হবে তার চেয়েও উচ্চমাত্রার।

কোন্দলকারীদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কি বলতে পারি? এটা অবশ্য সুস্পষ্ট যে, দু'জন ব্যক্তির বাসনাগুলোর মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দেয় তখনকার চেয়ে, সেগুলো যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন সন্তোষের মোট পরিমাণ বেশী হবে, কিন্তু যে-সব লোক বস্তুতঃ পরস্পরকে ঘৃণা করে তাদের ক্ষেত্রে এ যুক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। কেউ যুক্তি দিতে পারে যে, যে

১. Mandarin—চীনা রাজকর্মচারী।

২. Son of Heaven.

পরাজিত হতে যাচ্ছে তার পক্ষে হার স্বীকার করাই ভাল হবে, কিন্তু প্রত্যেকেই চিন্তা করবে যে, সে নিজেই বিজয়ী হতে যাচ্ছে। কেউ যুক্তি দিতে পারে যে, ঘৃণার চেয়ে প্রেম থেকে বেশী সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু হুকুম দিয়ে কাউকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যায় না, এবং আন্তরিকতাহীন প্রেম থেকে কোন সন্তোষ পাওয়া যায় না। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটাও সব সময় সত্য নয় যে, ঘৃণার চেয়ে প্রেমই বেশী সুখ আনে। যুদ্ধের সময়ে এবং তার অব্যবহিত পরে, যারা তখনও জার্মানবাসীদেরকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতো তাদের চেয়ে, যারা তাদেরকে ঘৃণা করতো তারা অধিকতর সুখী ছিল, যেহেতু তারা অনুভব করছিলো যে, যা করা হচ্ছিলো তাতে একটা শুভ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি যে, নীতিমালার কতকগুলো দিক (departments) —সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো—মনের উপর মুদ্রিত করা যায় কেবলমাত্র কোন নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে, কোন ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। সে জন্যেই আমি বলেছিলাম যে, নীতিবিদ্যা মূলতঃ সামাজিক।

আমার মনে হয়, কোন নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের মনোভাব হবে এই: মানুষ কামনা করে হরেক রকমের জিনিস, এবং স্বতন্ত্রভাবে সব কামনাই তাদের অন্তর্নিহিত ধর্মের দিক থেকে (in themselves) একই স্তরের, অর্থাৎ কোন একটার সন্তুষ্টি বিধান বাদ দিয়ে অন্য একটার সন্তুষ্টি বিধানকে অধিকতর পছন্দ করার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমরা যখন কোন স্বতন্ত্র বাসনার কথা চিন্তা না করে বরং একটা বাসনা-সমষ্টির কথা চিন্তা করি, তখন এ পার্থক্যটা দেখা দেয় যে, কখনও কখনও কোন সমষ্টির অন্তর্গত সব বাসনারই সন্তোষ বিধান করা যায়, অথচ অন্য ক্ষেত্রগুলোতে সেই সমষ্টির অন্তর্গত কতকগুলো বাসনার সন্তোষ বিধান অন্যগুলোর সন্তোষ বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ক ও খ যদি পরস্পরকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে উভয়েই যা চায় তা পেতে পারে; কিন্তু তারা যদি পরস্পরকে হত্যা করতে চায় তবে, তারা কিলকেনী বিড়াল (Kilkenny cats) না হলে, বড়জোর তাদের একজন সফলকাম হতে পারে। সুতরাং বাসনার পূর্ববর্তী জোড়াটা সামাজিক দিক থেকে পরবর্তীটার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। এখন, আমাদের বাসনাগুলোর সৃষ্টি হয় তিনটি উপাদান থেকে: সহজাত মানসিক অবস্থা, শিক্ষা, এবং বর্তমান

অবস্থা।[১] জ্ঞানের অভাবের দরুন, বর্তমানে প্রথম উপাদানটা নিয়ে আলোচনা করা কঠিন। তৃতীয়টাকে ক্রিয়াশীল করে তোলে অপরাধ আইন, আর্থিক অভিপ্রায় এবং সামাজিক প্রশংসা ও নিন্দা, যে-সব কারণে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির পক্ষে সেই সম্প্রদায়ের ভেতরকার প্রভাবশালী দলের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে কাজ করা লাভজনক। কিন্তু এটা করা হয় বাহ্যিক উপায়ে, শুভ কামনার জন্ম দিয়ে নয়, বরং লোভ আর ভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং এই আশা করে যে, ভয়েরই জয় হবে। যথার্থ অত্যাবশ্যক (vital) পদ্ধতিটা হচ্ছে শিক্ষা, সেই বৃহৎ অর্থে যে অর্থে প্রথম কয়েক বছর ধ'রে দেহের যত্ন এবং অভ্যাস-গঠন তার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের বাসনাগুলোকে এমন ভাবে পরিবর্তিত করা যায় যে, তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সামাজিকভাবে কাজ করবে। অপরাধ আইনের মাধ্যমে কোন মানুষের বাসনাগুলোকে আমরা যেভাবে খর্ব করি, সেভাবে খর্ব করা এত হিতকর (satisfactory) নয় যে, তার ফলে সে মানুষ সামাজিক দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ উদ্রেককারী বাসনা যথার্থভাবে অনুভব করবে।

এ প্রসঙ্গ ধরে আমি চলে আসছি আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়টাতে, অর্থাৎ, অনুভব করা এবং কাজ করার পার্থক্যটাতে। সন্দেহ নেই যে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষ যা করে তা-ই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কিন্তু কোন মানুষের যদি সঠিক বাসনাগুলো না থাকে তাহলে বিরোধমুক্তভাবে তাকে দিয়ে সঠিক কাজগুলো করানো সম্ভব নয়। এবং সঠিক বাসনাগুলো কেবল তাদের [বাসনাগুলোর] প্রশংসা ক'রে এবং তাদের পেতে ইচ্ছা ক'রে উৎপন্ন করা যায় না; নীতিশিক্ষার কৌশলটা উৎসাহ দান (exhortation) অথবা 'প্রকাশ্য' নৈতিক উপদেশ দানের কৌশল নয়।

যে নীতিতে (ethic) আমরা এসে পৌঁছেছি, এখন আমরা অমূর্ত ভাষায় তার বিবরণ দিতে পারি। মূলতঃ, আমরা যখন কোন জিনিস কামনা করি তখন তাকে আমরা 'ভালো' (good) বলি, এবং যখন কোন বস্তু থেকে আমরা বিরূপভাব নিয়ে সরে যেতে চাই তখন তাকে আমরা বলি 'মন্দ' (bad)। কিন্তু আমাদের বাসনাগুলোর চেয়ে আমাদের শব্দ-প্রয়োগের

১. Native disposition, education and present circumstances.

রীতি বেশী স্থির, এবং সেজন্যে ঘাস যেমন কখনও কখনও হলুদ দেখালেও সর্বদাই আমরা তাকে সবুজ বলি, ঠিক তেমনি আমরা একটা জিনিসকে তখনও ভালো বলে যাব যখন আমরা তাকে আর বাস্তবিকভাবে কামনা করছি না। এবং 'ভালো' শব্দটার প্রশংসামূলক অনুষঙ্গগুলো থেকে এমন একটা বাসনা উৎপন্ন হতে পারে যা অন্য অবস্থায় উৎপন্ন হতো না: আমরা ক্যাভিয়ার (caviare) খেতে ইচ্ছা করতে পারি কেবল এজন্যে যে, আমাদের বলা হয়েছে এটা ভালো। এছাড়া শব্দের ব্যবহার সামাজিক, এবং সেজন্যে অসাধারণ (rare) অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় আমরা কোন-একটা জিনিসকে ভালো বলতে শিখি, যদি যেসব লোকের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করি তাদের অধিকাংশও সেটাকে ভালো বলতে ইচ্ছুক হয়। এই ভাবে 'ভালো' সেই-সব জিনিসে প্রযোজ্য হয়ে পড়ে, যেগুলোকে একটা গোটা সামাজিক দল (social group) কামনা করে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, যে জগতে বিভিন্ন ব্যক্তির বাসনাগুলোর মধ্যে বিরোধ বাধে সে জগতের চেয়ে, যে জগতে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে সে জগতেই বেশী মঙ্গল থাকা সম্ভব। কাজেই চরম নৈতিক বিধিটা হওয়া উচিত: "এই ভাবে কাজ করুন যেন সামঞ্জস্যহীন বাসনা উৎপন্ন না হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাসনা উৎপন্ন হয়।" যেখানেই মানুষের প্রভাব তার নিজের মধ্যে, তার পরিবারে, তার নগরে, তার দেশে এবং, যদি সে জগৎটাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে, তাহলে এমন-কি সমগ্র জগতের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, সেখানেই এ বিধি প্রযোজ্য হবে।

এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য থাকবে দু'টো প্রধান পদ্ধতি: প্রথমে, এমন-সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যাদের প্রভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের স্বার্থের মধ্যে যথাসম্ভব অল্প বিরোধ দেখা দেবে ; দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-সমষ্টিকে এমন ভাবে শিক্ষিত করতে হবে যে, তাদের বাসনাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এবং তাদের প্রতিবেশিগণের বাসনাসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। প্রথম পদ্ধতিটা সম্পর্কে আমি আর কিছু বলবো না, যেহেতু যে প্রশ্নগুলো ওঠে সেগুলো রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির অন্তর্গত। দ্বিতীয়টার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ সময়টা হচ্ছে শৈশবের গঠনমূলক সময়টা, যে সময়ে থাকা উচিত স্বাস্থ্য, সুখ, স্বাধীনতা এবং সেই রকম কঠিন সাফল্য অর্জনের সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আত্ম-শৃঙ্খলার বৃদ্ধি, যে সাফল্য উপকারী অথচ পরিবেশের

উপর কর্তৃত্ব অর্জনের প্রবণতার সন্তোষ-বিধানে সক্ষম। শক্তির বাসনা, যা অধিকাংশ লোকের মধ্যে আছে এবং সবচেয়ে শক্তিশালী লোকের মধ্যে প্রবলতম, লোকের উপর ক্ষমতা অর্জনের দিকে পরিচালিত না হয়ে বরং বস্তুর উপর ক্ষমতা অর্জনের দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত।

এটা পরিষ্কার যে, সুসমঞ্জস বাসনাই যদি আমাদের অন্বেষণ করা উচিত হয়, তাহলে ঘৃণার চেয়ে প্রেম বেশী ভালো, যেহেতু দু'জন লোক যখন পরস্পরকে ভালবাসে তখন তাদের উভয়কেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব, কিন্তু যখন তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে তখন বড়জোর তাদের একজনে কাম্য বস্তুটা অর্জন করতে পারে। এটাও সুস্পষ্ট যে, জ্ঞান অর্জনের বাসনাকে উৎসাহিত করা দরকার, যেহেতু যে জ্ঞান মানুষ অর্জন করে তা অন্য কারুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অর্জন করা হয় না; কিন্তু (যেমন) প্রকাণ্ড ভূসম্পত্তির কামনা কেবল এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠের ক্ষেত্রে পরিতৃপ্ত হতে পারে। অন্য লোকের উপর ক্ষমতা অর্জনের বাসনা দ্বন্দ্বের একটা শক্তিশালী উৎস, এবং সেজন্যে একে নিরুৎসাহিত করা দরকার; সঠিক রকমের শিক্ষার মাধ্যমে যে-সব জিনিস গড়ে তোলা উচিত, অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা তাদের অন্যতম। ব্যক্তিগত সাফল্য (achievement) অর্জনের প্রবণতা ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত শিল্প-সৃষ্টি অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা হিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, ইত্যাদি জিনিসের ক্ষেত্রে—এক কথায়, যে-সব কাজ-কর্ম অধিকারধর্মী (possessive) না হয়ে বরং সৃষ্টি-ধর্মী সেসব কাজের ক্ষেত্রে। যেখানে মানুষের বাসনা-সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, জ্ঞান সেখানে নিশ্চিত অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে (যেমন, যুদ্ধকে আরও মারাত্মক করার পথ দেখিয়ে); জ্ঞান থেকে কেবল ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে সেই জগতে যেখানে মানুষের বাসনা-সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, কারণ তাদের সাধারণ বাসনাগুলো কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সেটা দেখাবার একটা প্রবণতা আছে তার মধ্যে।

একটি-মাত্র শব্দগুচ্ছের মধ্যে সিদ্ধান্তটাকে সংক্ষেপ করে ফেলা যেতে পারে: 'উত্তম জীবন হচ্ছে সেই জীবন যার প্রেরণা আসে প্রেম থেকে এবং যার পথ-নির্দেশ আসে জ্ঞান থেকে।'[১]

---

১. তুলনীয়: বর্তমান গ্রন্থকারের What I belive – To-day and Tomorrow সিরিজ।

চতুর্থ খণ্ড

বিশ্ব

THE UNIVERSE

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

অতীতের কিছু বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদ

এ পর্যন্ত, আমাদের আলোচনাগুলো খুব বেশী পরিমাণে হয়েছে মানুষের প্রসঙ্গেই, কিন্তু মানুষ তার নিজ গুরুত্ববলে দর্শনের সত্যিকার বিষয়বস্তু নয়। দর্শনের যা আলোচ্য বিষয়, সে হচ্ছে অখণ্ড বিশ্ব; মানুষকে নিয়ে আলোচনা করার দাবী ওঠে কেবল সেই যন্ত্র (instrument) হিসাবে যার সাহায্যে আমরা জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি। এবং সেজন্যই পূর্ববর্তী অধ্যায়-গুলোতে আমাদের আলোচনা মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে প্রধানতঃ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম জীব হিসাবে, ইচ্ছা বা আবেগের কেন্দ্র হিসাবে নয়; যতক্ষণ আমরা জগৎ যে পরিমাণে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে কেবল সেই পরিমাণে জগতের ব্যাপারে আগ্রহী, ততক্ষণ আমরা দর্শনের পক্ষে উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় (mood) নই; দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রয়োজন জগতের নিজের খাতিরেই জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ। কিন্তু যেহেতু আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা জগৎকে জানি (apprehend), এবং আমাদের বুদ্ধির সাহায্যে তার সম্পর্কে চিন্তা করি, সুতরাং যে চিত্র আমরা পাই তা যে ব্যক্তিগত মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে আসে, তার দ্বারা সে রঞ্জিত না হয়ে পারে না। ফলতঃ এ মাধ্যমের, অর্থাৎ নিজেদের, সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে; এবং আমাদের লক্ষ্য হবে, জগৎ সম্পর্কিত আমাদের চিত্রটার মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদান আমাদের দেওয়া এবং কোন্ কোন্ উপাদানকে আমরা বহিঃস্থ সত্যের (fact) প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি তা আবিষ্কার করা, যদি সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে জ্ঞান (cognition) নিয়ে সন্ধান চালানো হয়েছে একটা বাহ্য নিরীক্ষণযোগ্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে, এবং যেভাবে তা অন্তর্দর্শনের কাছে প্রতীয়মান হয়, সেই হিসাবেও। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলোতে, যে যন্ত্রটা আমাদের ব্যবহার করতে হয় তার প্রকৃতির কথা মনে রেখে, আমরা দেখতে চাইবো জগৎ সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি। আমি মনে করি না যে,

অতীতের অনেক দার্শনিক যতটুকু জানতে পারি বলে মনে করেছেন ততটুকু আমরা জানতে পারি, কিন্তু তাদের মতবাদগুলোর (systems) একটা রূপরেখা আমাদের মনে রাখাকে আমি লাভজনক বলে মনে করি। সেজন্যে পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর কতকগুলো নমুনা-সূচক দার্শনিক সংগঠনের[১] বিবরণ দিয়ে আমি শুরু করবো।

সাধারণতঃ মনে করা হয়েছে যে, আধুনিক দর্শনের সূচনা হয়েছিল ডেকার্ট (Descartes) থেকে, যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে। ইতিমধ্যেই, ১৬শ অধ্যায়ে, আমরা তাঁর "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি"—এ যুক্তিটা বিবেচনা করেছি, কিন্তু এখন আমরা কতকটা আরো সাধারণ ভাবে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করবো। তিনি দু'টো আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, একটা পরাতত্ত্বে, আরেকটা জ্ঞানতত্ত্বে। পরাতত্ত্বে তিনি মন এবং জড় অথবা আত্মা এবং দেহের পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন ; জ্ঞানতত্ত্বে তিনি হেতু বাক্যের সমালোচনামূলক পরীক্ষার কথা প্রচার করেছিলেন। এ আন্দোলন দু'টোর ভিন্ন ইতিহাস ছিল, যাদের প্রত্যেকটাই কৌতূহলোদ্দীপক (interesting)। ডেকার্টের সময়ে গতিবিজ্ঞান দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করেছিলো এবং তা থেকে এটা দেখা যাচ্ছিল বলে মনে হয়েছিলো যে, পর্যাপ্ত উপাত্ত দেওয়া থাকলে জড়ের গতিবিধি গাণিতিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। যেহেতু জড়ের গতিবিধির মধ্যে আমাদের দৈহিক ক্রিয়াগুলো, এমন কি কথা বলা এবং লেখাও অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তার ফলে মানুষের আচণের একটা জড়বাদী মতবাদ অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল। তবে অধিকাংশ দার্শনিকের কাছে এ ফলটা ছিল অরুচিকর, এবং সেজন্যে এড়ানোর নানা পথ তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। ডেকার্ট স্বয়ং মনে করেছিলেন যে, ইচ্ছার পক্ষে কতকগুলো দৈহিক (physical) কার্যফল ঘটানো সম্ভব। তিনি ভেবেছিলেন যে, মস্তিষ্কের ভেতরে 'জীবাত্মা' (animal spirit) নামে একজাতীয় জলীয় পদার্থ আছে, এবং ইচ্ছার পক্ষে এর গতিবেগের উপর না হলেও এর গতির উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। এইভাবে, কাণ্ডজ্ঞানে ইচ্ছাকে যে-ভাবে কার্যকর বলে মনে করা হয়, সে-ভাবে

১. Philosophical constructions.

একে কার্যকর বলে মনে করতে তিনি তখন পর্যন্ত সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দর্শনের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে এ মত মোটেই ভালভাবে খাপ খায়নি। তিনি মনে করেছিলেন যে, পরম দ্রব্য[১] অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়াও মন ও জড় বলে দু'টো সৃষ্ট দ্রব্য আছে, মনের সারবস্তু হচ্ছে চিন্তা এবং জড়ের সারবস্তু হচ্ছে বিস্তার। তিনি এই দ্রব্য দু'টোকে এত ভিন্ন করে তুলেছিলেন যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার অর্থ বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছিলো, এবং তাঁর অনুসারীরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, জড়ের উপর মনের অথবা মনের উপর জড়ের কখনও কোন ক্রিয়া ঘটে না।

এই পরিণতির পেছনে প্রেষণা ছিল নানাবিধ; সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণাটা ছিল ডেকার্টে'র অব্যবহিত পরবর্তীকালে পদার্থ বিদ্যার উন্নতি। 'ভরবেগের নিত্যতা'[২] নামে একটা নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছিলো। এ নিয়ম অনুসারে, জড়পিণ্ডের কোন তন্ত্রের[৩] মধ্যে যদি কোন-এক রকমের গতি থাকে, এবং সেটা যদি বাইরের প্রভাব মুক্ত হয়, তাহলে যে-কোন দিকে গতির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। এর থেকে দেখা গেল যে, 'জীবাত্মা'র উপর ইচ্ছার যে জাতীয় ক্রিয়ার কথা ডেকার্ট চিন্তা করেছিলেন, সেটা গতি বিজ্ঞানের সূত্রাবলীর বিপরীত। এর থেকে এটা অনুমান করা যায় বলে মনে হয়েছিল যে, জড়ের উপর মন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, এবং অনুমান করা হয়েছিল যে, মনের উপর জড় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যেহেতু দু'টোকে সহ-সমান (co-equal) দ্রব্য বলে ধরা হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল যে, প্রত্যেকটাই তার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে তার নিজের পথ ধরে চলে। আমরা যখন আমাদের বাহু নড়াতে ইচ্ছা করি তখন যে সেটা নড়ে, এবং দু'টো সম্পূর্ণ সঠিক ঘড়ি যে পরস্পরের উপর কোন-ভাবে ক্রিয়া না করা সত্ত্বেও একই মুহূর্তে ঘণ্টা বাজায়, এ দু'টো সত্যকে সদৃশ বলে মনে করা হয়েছিল। মানসিক ঘটনাবলীর অনুক্রম এবং পদার্থিক ঘটনাবলীর অনুক্রম ছিল সমান্তরাল, যাদের একটা চলছে আরেকটার সঙ্গে সমগতিতে; সুতরাং, তাদের পারস্পরিক নির্ভরশূন্যতা সত্ত্বেও, তারা একই সঙ্গে ঘটে চলছে।

---

১. **Supreme substance.**
২. **Conservation of momentum.**
৩. **System of bodies.**

স্পিনোজা মন ও জড় নামক দু'টো স্বতন্ত্র দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এ সহচারকে (parallelism) কম রহস্যময় করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, কেবল একটামাত্র দ্রব্য আছে, চিন্তা ও বিস্তার যার গুণ। কিন্তু তথাপি, এ দু'টো গুণের অন্তর্গত ঘটনাবলী কি জন্যে সমান্তরালভাবে ঘটে চলবে তার কোন উপযুক্ত কারণ দেখা গেল না। বহু দিক থেকে স্পিনোজা সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বরং নীতিশাস্ত্রীয় (ethical), পরাতাত্ত্বিক নয়। সুতরাং তাঁর সমসাময়িক লোকেরা মনে করেছিলেন যে, তিনি একজন গভীর প্রজ্ঞাবান পরাতাত্ত্বিক, তবে খুব দুষ্ট লোক।

মন ও দেহের পারস্পরিক ক্রিয়ার অসম্ভাব্যতার ধারণাটা আমাদের সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। এখন পর্যন্ত লোকে 'দেহ-মন সহচার'-এর[১] কথা শোনে, যার মতে মস্তিষ্কের প্রতিটি অবস্থার অনুরূপভাবে মনের একটা অবস্থা আছে, এবং বিপরীতক্রমেও তাই, কিন্তু তাদের কোনটা অন্যটার উপর ক্রিয়া করে না। যদিও এই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক ডেকার্টের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তথাপি তাঁর কাছ থেকেই সেটা পাওয়া। এর উৎস আছে কয়েকটা—ধর্মীয়, পরাতাত্ত্বিক, এবং বৈজ্ঞানিক ; কিন্তু একে সত্য বলে মনে করার আদৌ কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

প্রথমে, গতানুগতিক পদার্থবিদ্যার অনমনীয় নিয়ন্ত্রণবাদের কথা ধরা যাক, যাকে এড়িয়ে চলার কথা ছিল। স্পিনোজা সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এরকম কোন পদ্ধতির সাহায্যে একে এড়ানো সম্ভব নয়, এবং সেজন্যে পদার্থিক জগতের মতো মানসিক (psychical) জগতেও তিনি নিয়ন্ত্রণবাদ গ্রহণ করেছিলেন। আমরা যা কিছু 'বলি' তাই যদি পদার্থিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে আমরা যখন মিথ্যা কথা বলি কেবল তখনই আমাদের চিন্তাগুলো স্বাধীন : যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা চিন্তা করি তা বলি, ততক্ষণ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা থেকে আমাদের চিন্তাগুলোকেও অনুমান করা যায়। আমি যে দর্শনের প্রবক্তা, কয়েক উপায়ে সে দর্শন এ ফলাফল এড়িয়ে যেতে পারে। প্রথমতঃ, কার্যকারণের মধ্যে কোন

১- Psychophysical parallelism.

'বাধ্যবাধকতা' (compulsion) নেই, আছে কেবল একটা অনুক্রমের নিয়ম: যদি পদার্থিক এবং মানসিক ঘটনাগুলো সমান্তরালভাবে চলে, তাহলে তাদের একটাকে সমযুক্তি বলে আরেকটার কারণ বলে মনে করা যেতে পারে, এবং তাদেরকে কার্যকারণের দিক থেকে স্বতন্ত্র (independent) বলার কোন অর্থ নেই। সুতরাং যে সুখদায়ক ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে কার্টেজীয় দ্বৈতবাদ[১] গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলো তার মধ্যে নেই। দ্বিতীয়তঃ বিগত কয়েক শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা থেকে আধুনিক পদার্থবিদ্যা কম নিয়ন্ত্রণবাদী হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি না কি কারণে একটা তেজস্ক্রিয় পরমাণু বিস্ফোরিত হয়, অথবা একটা ইলেকট্রন বৃহত্তর কক্ষপথ থেকে ক্ষুদ্রতর কক্ষপথে লাফিয়ে পড়ে। এসব বিষয়ে আমরা জানি কেবল পরিসংখ্যানগত গড়।

এর পর, যে মতানুসারে মন ও জড় সম্পূর্ণ অসম (disparate), তার কথা ভাবা যাক। ইতিমধ্যেই আমরা এর সমালোচনা করেছি। এ দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণার উপর যে, জড় সম্পর্কে আমরা [বস্তুতঃ] যা জানি তার চেয়েও আমরা অনেক বেশী জানি, এবং বিশেষতঃ এই বিশ্বাসের উপর যে, পদার্থবিদ্যার দেশকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার দেশের সঙ্গে অভিন্ন করা যায়। লাইবনিজের (Leibniz) মধ্যে এ বিশ্বাসটা অনুপস্থিত ছিল; তবে তিনি কখনও সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন নি তাঁর নিজের মতটা কি ছিল। কাণ্টের মধ্যে এ বিশ্বাস অনুপস্থিত নয়; তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার দেশ বিষয়ীগত এবং অনুমান করেছিলেন যে, পদার্থবিদ্যার দেশ বিষয়ীগত। কাণ্টের পরে, আইনস্টাইন ও মিন্‌কাউসকির (Minkowski) পূর্ব পর্যন্ত দেশ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কেউ চিন্তা করেছিলেন বলে মনে হয় না। পদার্থিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশের ভিন্নতা (separation)-কে যুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হতে দিলে, তার থেকে মন ও জড় সম্পর্কে পরম্পরাগত মতগুলোর ভিত্তিহীনতা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সুতরাং যদিও ডেকার্টের দর্শনের এ অংশটা পদার্থবিদ্যার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল, তথাপি পরাতাত্ত্বিক দিক থেকে একে বিপথ-গামিতা বলে মনে করতে হবে।

১. Cartesian dualism.

ডেকার্টের দর্শনের অন্য অংশটা, অর্থাৎ পদ্ধতিগত সংশয় এবং তার ফলে জ্ঞানতত্ত্বের উপর জোর দেওয়াটা, এর চেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হয়েছে। দার্শনিক মনোভঙ্গির সূচনা হচ্ছে এ উপলব্ধি যে, আমরা যতটুকু জানি বলে মনে করি ততটুকু জানি না, এবং এ বিষয়ে ডেকার্টে'র অবদান স্মরণীয়। আমরা দেখেছি যে, যা-কিছু তাঁর পক্ষে সন্দেহ করা সম্ভব ছিল তাকেই তিনি সন্দেহ করতে লেগে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর নিজের অস্তিত্বে সন্দেহ করা সম্ভব ছিল না, যে-জন্য তিনি সেটাকে তার গঠনমূলক মতবাদের[১] যাত্রাবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, জগতে সব-চেয়ে নিশ্চিত সত্য হচ্ছে "আমি চিন্তা করি"। এটা ছিল দুর্ভাগ্যজনক, কারণ এর থেকে আধুনিক দর্শনে একটা বিষয়ীমুখী (subjective) প্রবণতা এসে পড়ে। বস্তুতঃ, 'আমি'কে মনে হয় একটা ঘটনা-শৃঙ্খলের মত, যার মধ্যে প্রতিটি ঘটনাই স্বতন্ত্রভাবে সমগ্রের চেয়ে বেশী নিশ্চিত। এবং 'চিন্তা করি' (think) শব্দটাকে ডেকার্ট অসংজ্ঞেয় বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু আসলে এতে বোঝায় ঘটনার মধ্যবর্তী কতকগুলো জটিল সম্বন্ধ। কখন একটা ঘটনা একটা 'চিন্তা' (thought)? এমন কোন অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে কি, যার ফলে এটা একটা চিন্তায় পরিণত হয়? ডেকার্ট বলবেন হাঁ, এবং অধিকাংশ দার্শনিকও তাই বলবেন। আমি বলবো, না। উদাহরণস্বরূপ, একটা দৃষ্টিগত এবং একটা শ্রুতিগত সংবেদনের কথা ভাবা যাক। ডেকার্টের অর্থে উভয়ই 'চিন্তা', কিন্তু তাদের মধ্যে সাধারণ কি আছে? দু'টো দৃষ্টিগত সংবেদনের মধ্যে 'বাস্তবিকই' একটা অসংজ্ঞেয় সাধারণ গুণ আছে, অর্থাৎ সেইটা যার দরুন তারা দৃষ্টিগত। দু'টো শ্রুতিগত সংবেদনের বেলায়ও তাই। কিন্তু, আমার যদি ভুল না হয় তো একটা দৃষ্টিগত ও একটা শ্রুতিগত সংবেদনের মধ্যে সাধারণ হিসাবে কোন অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য (property) নেই, আছে কেবল অনুমান ব্যতিরেকে 'জ্ঞাত' হবার একটা শক্তি। একথা বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তারা কোন এক ধরনের ঘটনার স্মৃতিগত কারণ, যাকে বলা হয় অবগতি (cognition), এবং তাছাড়া, যে অবগতির তারা জন্ম দেয় তার সঙ্গে একটা আকারগত সাদৃশ্য তাদের আছে। সুতরাং,

১. Constructive system.

সাধারণ (general) "আমি চিন্তা করি"-কে আমাদের ভিত্তি হিসাবে না নিয়ে আমাদের নেওয়া উচিৎ সেই বিশেষ ঘটনাগুলোকে, অনুমান ব্যতিরেকে যাদের জানা হয় এবং সংবেদনগুলো (অথবা বরং বলা যায় 'প্রত্যক্ষণগুলো') যাদের অন্তর্গত। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, সমপরিমাণ যৌক্তিকতার সঙ্গেই এ ঘটনাগুলোকে পদার্থিক এবং মানসিক বলে মনে করা যায়: তারা পদার্থিক কার্যকারণ-শৃঙ্খলের অংশ, এবং তাদের রয়েছে স্মৃতিগত কার্যফল যেগুলোকে বলা হয় অবগতি। পূর্ববর্তী সত্যটার দরুন আমরা তাদেরকে বলি পদার্থিক, দ্বিতীয়টার দরুন মানসিক, এবং উভয় ক্ষেত্রেই কথাটা অভ্রান্ত। বিশেষ ঘটনাগুলোই নিশ্চিত, ডেকার্ট যে "আমি জানি"-কে তাঁর দর্শনের ভিত্তি করেছিলেন সেটা নয়। চরম নিশ্চয়তাগুলোকে 'বিষয়ীগত' মনে করা ঠিক নয়; মনে করা যেতে পারে কেবল এই অর্থে যে, দেশ ও কালের যে অংশে আমাদের দেহ আছে—এবং আমি বলবো, আমাদের মনও আছে—তারা হচ্ছে দেশ-কালের সেই অংশের ঘটনা।

কার্টেজীয় ধরনের পরাতত্ত্বে একটা নতুন আবর্তন এনেছিলেন লাইবনিজ (১৬৪৬—১৭১৬), যিনি ডেকার্টের মতই, গণিত ও দর্শন, উভয় ক্ষেত্রেই সবিশেষ খ্যাত ছিলেন। স্পিনোজা মনে করেছিলেন যে, কেবল একটামাত্র দ্রব্য আছে, এবং ডেকার্টের গোঁড়া অনুসারীরা মনে করেছিলেন যে, ঈশ্বর ছাড়াও দু'টো দ্রব্য আছে—লাইবনিজ এ মত প্রত্যাখান করেন। মন ও জড়ের দ্বৈততাও তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন, এবং মনে করেছিলেন যে, দ্রব্য হচ্ছে অসংখ্য—যাদের সকলেই অল্প-বিস্তর মানসিক এবং কোনটাতেই বিন্দুমাত্র জড়ত্ব নেই। তিনি মনে করেছিলেন যে, প্রত্যেক দ্রব্যই অমর, এবং কোন দু'টো দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া নেই। এই শেষের মতটা মন ও জড়ের কার্টেজীয় স্বাতন্ত্র্য থেকে গৃহীত। ডেকার্টপন্থীদের[১] দুই দ্রব্যের মধ্যে যে সহচার বিরাজমান ছিল, তাঁর বিরাট-সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রেও তিনি সে বিশ্বাস প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর দ্রব্যগুলোকে তিনি বলেছিলেন 'মনাদ' (monads),[২] এবং মনে করেছিলেন যে, প্রত্যেক মনাদই জগৎকে

১. Cartesians.

২. 'Monad' ল্যাটিন্ শব্দ। এর অর্থ—সরল, অবিভাজ্য সত্তা। (অনুবাদক)

প্রতিফলিত করে, এবং যেসব পথ ধরে অন্য প্রতিটি মনাদ বিকশিত হচ্ছে, সর্ব বিষয়ে তাদের সঙ্গে মিলে সেও বিকশিত হচ্ছে। একজন মানুষের আত্মা বা মন একটা স্বতন্ত্র (single) মনাদ, এবং তার দেহ কতকগুলো মনাদের সমষ্টি, যাদের প্রতিটি কতক পরিমাণে, কিন্তু যে মনাদ তার আত্মা তার চেয়ে কম পরিমাণে, মানসিক। নিকৃষ্টতর মনাদগুলো বিশ্বকে উন্নততর মনাদগুলোর চেয়ে অধিক বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিফলিত করে, কিন্তু এমন-কি সবচেয়ে উন্নত (superior) মনাদগুলোর প্রত্যক্ষণের মধ্যেও কিছু পরিমাণ বিশৃঙ্খলা আছে। প্রত্যেক মনাদ বিশ্বকে প্রতিফলিত করে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং দৃষ্টিকোণগুলোর মধ্যবর্তী পার্থক্যের তুলনা করা হয় পরিপ্রেক্ষিতের পার্থক্যের সঙ্গে। 'জড়' হচ্ছে কতকগুলো মনাদকে বিশৃঙ্খলভাবে প্রত্যক্ষ করা; যদি আমরা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করতাম তাহলে দেখতাম যে, জড় বলে কিছুই নেই।

লাইবনিজের মতবাদের বড়ো বড়ো গুণ ও বড়ো বড়ো দোষ ছিল। 'জড়' যে অ-জড় কিছু একটাকে বিশৃঙ্খল ভাবে প্রত্যক্ষ করা, এ মতবাদ তাঁর পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে পাওয়া যে-কোন কিছুর চেয়ে উন্নততর। অর্ধ সচেতনভাবে হলেও, পদার্থিক এবং প্রত্যক্ষণিক দেশের পার্থক্যের ধারণা তাঁর ছিল: প্রত্যেক মনাদে জগতের যে ছবি ধরা পড়ে তার মধ্যে দেশ আছে, এবং 'দৃষ্টিকোণসমূহে'-র সমবায় বা প্যাটার্নটাও আছে তার মধ্যে। আমি যাকে 'পদার্থিক দেশ' বলেছি তার সঙ্গে পরবর্তীটার, এবং 'প্রত্যক্ষণিক দেশ'-এর সঙ্গে পূর্ববর্তীটার মিল রয়েছে। নিউটনের বিপরীতক্রমে লাইবনিজ মনে করেছিলেন যে, দেশ ও কাল কেবল সম্বন্ধ দিয়ে তৈরী—আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে যে মত চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছে। তাঁর মতবাদের দুর্বল স্থান হচ্ছে তিনি যাকে বলেছিলেন 'পূর্বস্থাপিত সমন্বয়',[১] যার দরুন, মনাদগুলো 'জানালাবিহীন' হওয়া এবং কখনও পরস্পরের উপর ক্রিয়া না করা সত্ত্বেও, সকলে (বলতে গেলে) পরস্পরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। লাইবনিজের মতে, প্রত্যক্ষণ প্রত্যক্ষিত বস্তুর কোন কার্যফল নয়; বরং সেটা প্রত্যক্ষণকারী মনাদের ভেতরকার একটা পরিবর্তন যা প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে যা ঘটছে, তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলছে। মন ও জড় পারস্পরিকভাবে

১. Pre-established harmony.

স্বতন্ত্র, এই পূর্ববর্তী কার্টেজীয় মতবাদটা না থাকলে এ মত কখনও আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হতো না; এবং, তাঁর[১] বিশ্বাস অনুসারে, লাইবনিজ নিজে যদি অন্য সমস্ত সৃষ্ট জিনিস থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতেন, তাহলে তাঁর নিজেকে ছাড়া অন্য কোনকিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কি উপযুক্ত কারণ তাঁর থাকতো সেটা পরিষ্কার বোঝা যায় না, যেহেতু, তাঁর নিজের মতানুসারেই, অন্য সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও তাঁর অভিজ্ঞতাগুলো অপরিবর্তিত থেকে যেত। বস্তুতঃ, এ সম্ভাবনা তিনি খণ্ডন করতে পেরেছিলেন কেবল কতকগুলো ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা (consideration) নিয়ে এসে, যেগুলো, বৈধ হোক বা না হোক, দর্শনে অপাংক্তেয়। এই কারণে তাঁর মতামতগুলো যতই চাতুর্যপূর্ণ হোক না কেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে সেগুলো গৃহীত হয়নি, যদিও জার্মানীতে সেগুলো পরিবর্তিত আকারে কান্টের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ডেকার্ট, স্পিনোজা এবং লাইবনিজের মতবাদগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, অর্থাৎ তাদের সব কটিই 'দ্রব্য'-এর (substance) ক্যাটেগরির উপর নির্ভরশীল। কাণ্ডজ্ঞানের মধ্যে 'বস্তু'-র (thing) যে ধারণা, এই সাধারণ ধারণাটার উদ্ভব ঘটেছে তার থেকে। একটা 'দ্রব্য' হচ্ছে সেই জিনিস যার গুণ আছে, এবং যাকে সাধারণতঃ অবিনশ্বর বলে ধরা হয়, যদিও তার কারণটা বোঝা দুষ্কর। পরাতাত্ত্বিকদের উপর এর প্রভাব পড়েছিল অংশতঃ এই কারণে যে, জড় ও আত্মা উভয়কেই অমর বলে মনে করা হয়েছিল এবং অংশতঃ এইজন্য যে, ব্যাকরণ থেকে গৃহীত কতকগুলো ধারণা বাস্তব সত্তার (reality) ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আমরা বলি "পিটার দৌড়াচ্ছে", "পিটার কথা বলছে", "পিটার খাচ্ছে", ইত্যাদি। আমরা মনে করি যে, পিটার বলে একটা সত্তা (entity) আছে যে এই কাজগুলো করছে, এবং এগুলো করার জন্যে কোন-একজন না থাকলে এদের কোনটাই করা সম্ভব হতো না, কিন্তু পিটার স্বচ্ছন্দে এদের কোনটাই না করতে পারতো। তেমনিভাবে পিটারের প্রতি আমরা গুণ আরোপ করি: আমরা বলি সে প্রাজ্ঞ ও দীর্ঘ এবং তার চুল স্বর্ণাভ, ইত্যাদি। আমরা মনে করি যে, এ গুণগুলো নিজেরা শূন্যের (void) মধ্যে থাকতে পারে না, পারে কেবল

১. স্বয়ং লাইবনিজের। (অনুবাদক)

তখনই যখন তাদের ধারণ করার মত একজন কর্তা (subject) আছে; কিন্তু এমনকি পিটার যদি নির্বোধ ও খাটো হতো এবং তার চুলে রঙ লাগাতো, তাহলেও সে পিটার থেকে যেত। কাজেই যে পিটারকে একটি 'দ্রব্য' বলে মনে করা হয়, তার গুণ এবং অবস্থানগুলোর তুলনায় সে স্বয়ং-নির্ভর, এবং সর্ব রকমের পরিবর্তনের মধ্যে সে তার দ্রব্যগত অভিন্নতা রক্ষা করে। অনুরূপভাবে মনে করা হয় (অথবা সাম্প্রতিক কালের আগে পর্যন্ত বরং মনে করা হতো) যে, জড় জগতে একটা পরমাণু সমগ্রকাল ধরে তার নিজের অভিন্নতা রক্ষা করে চলে, সে যে ভাবেই চলুক না কেন এবং অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে যে ভাবেই সে যুক্ত হোক না কেন। 'গতি'-র যে ধারণার উপর সমস্ত পদার্থবিদ্যা নির্ভরশীল বলে মনে হতো, তার সঠিক অর্থে সে ধারণা প্রযোজ্য ছিল কেবল এমন একটা দ্রব্যে যে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে তার দৈশিক সম্বন্ধগুলো পরিবর্তন করার মধ্যেও তার নিজের অভিন্নতা রক্ষা করে; এভাবেই পরাতত্ত্বের চেয়েও পদার্থবিদ্যার উপর 'দ্রব্য' দৃঢ়তর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এতদসত্ত্বেও, আধুনিক পদার্থবিদ্যা অথবা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পক্ষে যে-কোন ভাবে উপযুক্ত কোন দর্শন যদি আমরা পেতে চাই তাহলে, আর যাই হোক না কেন, স্থায়িত্বসূচক কোন অর্থে 'দ্রব্য'-এর ধারণাটাকে আমাদের চিন্তা থেকে বাইরে সরিয়ে রাখতে হবে। আপেক্ষিকতাবাদ এবং পরমাণুর কাঠামো সম্পর্কিত হাইজেনবার্গ-শ্রডিংগার মতবাদগুলো, এই উভয় ক্ষেত্রে আধুনিক পদার্থবিদ্যা 'জড়'-কে একটা ঘটনাতন্ত্রে[১] পর্যবসিত করেছে, যে ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটি অতি অল্প সময় ধরে টিকে থাকে। লণ্ডন অথবা নিউইয়র্কের জনসংখ্যাকে একটা একক সত্তা হিসাবে গণ্য করলে সেটা যে রকম ভ্রান্ত হতো, একটা ইলেকট্রন বা প্রোটনকে একটা একক সত্তা হিসাবে গণ্য করাও তেমনি ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এবং একইভাবে, মনোবিজ্ঞানে, একটা মৌলিক (ultimate) ধারণা হিসাবে 'অহম' (Ego) অন্তর্হিত হয়ে পড়েছে, এবং ব্যক্তিত্বের ঐক্য হয়ে পড়েছে একটা ঘটনানুক্রমের মধ্যবর্তী বিশেষ এক ধরনের কার্যকারণ-শৃঙ্খল। এ দিক থেকে, পরাতত্ত্বের পথ-নির্দেশক হিসাবে

১. System of events.

ব্যাকরণ এবং সাধারণ ভাষাকে মন্দ বলে দেখানো হয়েছে। দর্শনের উপর পদবিন্যাসের প্রভাব দেখিয়ে একটা বড় গ্রন্থ রচনা করা যেতো : এমন একটা গ্রন্থে গ্রন্থকার বিশদভাবে দেখাতে পারতেন ইউরোপীয় চিন্তায়, আরো বিশেষ ভাবে 'দ্রব্যে'-র এ ব্যাপারটাতে, বাক্যের উদ্দেশ্য-বিধেয় কাঠামোর প্রভাব। এবং এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যে-সব কারণের দরুন দ্রব্য বর্জিত হয় সেই একই কারণের দরুন চূড়ান্ত অর্থে বৈধ ধারণা হিসাবে বস্তু এবং ব্যক্তিও বর্জিত হয়। আমি বলি "আমি আমার টেবিলের পাশে বসি", কিন্তু আমার বলা উচিত : "একটা ঘটনাশৃঙ্খল আছে যার ঘটনাগুলো কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা সেইভাবে যুক্ত, যেভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে ঘটনার অনুক্রমটা দিয়ে 'ব্যক্তি' বলে কথিত জিনিসটা তৈরী হয় ; আরও একটা ঘটনা-শৃঙ্খল আছে যা কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা ভিন্নভাবে যুক্ত, এবং 'টেবিল' শব্দটা দ্বারা যে ধরনের দৈশিক সংগঠন (configuration) বোঝানো হয় সেই সংগঠনবিশিষ্ট ; এবং পূর্ববর্তী ঘটনাশৃঙ্খলের একটা ঘটনা পরবর্তী শৃঙ্খলের আরেকটা ঘটনার সঙ্গে কোন একটা দৈশিক সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত।" আমি সেটা বলি না, যেহেতু জীবন নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু আমি যদি সত্যিকার দার্শনিক হতাম তাহলে সেটাই আমার বলা উচিত হতো। অন্যান্য কারণ ছাড়াও, 'দ্রব্যে'-র ধারণাটার অনুপযুক্ততার দরুন আমরা ডেকার্ট, স্পিনোজা এবং লাইবনিজের দর্শনকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে করতাম। অবশ্য এ তিনটার সবগুলোতেই অনেক-কিছু আছে যা 'দ্রব্যে'-র উপর নির্ভরশীল নয়, এবং তার মূল্য এখনও আছে ; কিন্তু 'দ্রব্য' থেকে এসেছিল কাঠামোটা এবং যুক্তিটার অনেকখানি, এবং সেজন্য তার থেকে এসে একটা মারাত্মক ত্রুটি এ তিনটা সুমহৎ মতবাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলো।

এখন আমি আসছি লক, বার্কলি এবং হিউম, এ তিনজন বৃটিশ দার্শনিকের কাছে—এঁরা যথাক্রমে ইংলিশ, আইরিশ ও স্কচ। সম্ভবতঃ দেশপ্রেমজাত পক্ষপাতিত্ব অথবা জাতীয় মেজাজের সংক্রমণের দরুন, তাঁদের উপমহাদেশীয় অগ্রবর্তীদের দর্শনের চেয়ে এ তিনজনের লেখার মধ্যে আমি অধিক পরিমাণে এমন জিনিস পাচ্ছি যা আমি গ্রহণ করতে পারি, এবং যাকে আমি এখনও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তাঁদের সংগঠনগুলোর মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা কম, তাঁদের যুক্তিগুলো অধিকতর বিশদ, এবং তাঁদের পদ্ধতিগুলো অধিকতর

অভিজ্ঞতামূলক; এসব বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁদের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। অপর দিকে, বার্কলি না হলেও, লক এবং হিউম অতিরিক্ত একচেটে ভাবে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে দর্শনের দিকে অগ্রসর হন, এবং জগতের চেয়ে বরং মানুষ নিয়ে গবেষণা করার জন্যেই তাঁরা উদ্বিগ্ন।

লক ছিলেন নিউটনের সমসাময়িক এবং বন্ধু; নিউটনের 'Principia' যখন প্রকাশিত হয়, তাঁর 'An Essay Concerning Human Understanding' নামক মহাগ্রন্থ প্রায় ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রকাশিত হয়। তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন প্রচুর, তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী যেটুকু করার কথা বস্তুতঃ তার চেয়েও বেশী; এবং তাঁর প্রভাব কেবল দার্শনিক ছিল না, বরং সমপরিমাণেই সেটা ছিল রাজনৈতিক আর সামাজিক। অষ্টাদশ শতকের উদারনৈতিকতার স্রষ্টাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম: গণতন্ত্র, ধর্মীয় সহনশীলতা, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বাধীনতা, শিক্ষাগত প্রগতি, সব কিছুই তাঁর কাছে বহুলাংশে ঋণী। ১৬৮৮-র ইংরেজ বিপ্লবে[১] তাঁর ধারণাগুলো প্রতিফলিত; তাঁর শিক্ষা থেকে এক শতাব্দীর মধ্যে যা জন্মেছিল তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৬-র মার্কিন বিপ্লব এবং ১৭৮৯-র ফরাসী বিপ্লবে। এবং এই সব ক'টি আন্দোলনে, দর্শন ও রাজনীতি হাত ধরাধরি করে চলেছিল। সুতরাং লকের ধারণা-গুলোর ব্যবহারিক সাফল্য হয়েছে অসাধারণ।

এসব জেনে কেউ যখন স্বয়ং লকের রচনা পড়তে[২] আসে, তখন একটা হতাশার ভাবকে বাধা দেওয়া কঠিন। তিনি সংবেদনশীল, কৃতবিদ্য, সূক্ষ্ম, কিন্তু অননুপ্রাণিত এবং (আধুনিকদের কাছে) অননুপ্রেরক। স্মরণ রাখা দরকার যে, এক শতাব্দী ব্যাপী ধর্মযুদ্ধ এবং প্রচ্ছন্নতাবাদের (obscurantism) সঙ্গে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর তাঁর সমসাময়িকেরা কাণ্ডজ্ঞানের মধ্যে সঞ্জীবনীর সন্ধান পান। লক 'সহজাত ধারণা'-র[৩] মতবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে-ছিলেন, যে মতবাদ অনুসারে কেবল কতকগুলো জিনিস আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখি, কিন্তু আমাদের অমূর্ত জ্ঞান আমরা পাই আমাদের সহজাত

১. English Revolution.
২. 'to read Locke himself.'
৩. Innate ideas.

সংগঠনের দৌলতে। তিনি মনে করেছিলেন যে, জন্ম মুহূর্তে মন একটা মোমের ফলক, পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতা যার উপর লেখে। সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে তাঁর বিরোধীদের চেয়ে তিনি ছিলেন অধিকতর অভ্রান্ত, যদিও যে-সব শব্দযোগে বিতর্কটা চলেছিল, কোন আধুনিক সেগুলো প্রয়োগ করতে পারতেন না। আমাদের বলা উচিত যে, মানুষের সহজাত যন্ত্রোপকরণ[১] গঠিত বরং কতকগুলো 'অনুবর্ত' (reflexes) দিয়ে, 'ধারণা' দিয়ে নয় ; এও বলা উচিত যে, আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের গ্রন্থি এবং আমাদের পেশীগুলো এমন ধরনের প্রতিবেদনের জন্ম দেয় যেগুলোতে, বাইরের উদ্দীপক যে রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, আমাদের নিজস্ব সংগঠনক্রিয়াও সে রকম একটা ভূমিকা পালন করে। সম্ভবতঃ, লকের বিপক্ষদল 'সহজাত' বলতে যা বুঝিয়েছিলেন, আমাদের জ্ঞান-প্রতিবেদনগুলোর[২] মধ্যবর্তী যে উপাদানটা আমাদের নিজস্ব দৈহিক সংগঠন-ক্রিয়ার অনুরূপ, তার মধ্যে সেটা প্রতিস্থাপিত বলে মনে করা যায়। কিন্তু, এর প্রতি আমাদের মধ্যে যে-সব অনুভূতি জাগে তাদের বেলায়, তাতে সেটা সঠিকভাবে প্রতিস্থাপিত হয় না। 'সহজাত' ধারণাগুলো ছিল গর্বের বিষয় ; বিশুদ্ধ গণিত, প্রাকৃত ধর্মতত্ত্ব, এবং নীতি-বিদ্যাকে তারা দখল করে বসেছিল। কিন্তু হাঁচি অথবা কাশি দেওয়া নিয়ে কেউ গর্ব বোধ করে না। এবং লক যখন বিস্তারিতভাবে দেখাতে চেয়েছিলেন কিভাবে আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জন্মে, তখন তিনি অনেক অনাবশ্যক আবর্জনার হাত থেকে দর্শনকে মুক্ত করছিলেন, যদিই-বা তাঁর নিজস্ব মতামতগুলো এখন আমাদের পক্ষে গ্রহণ করার মতো সম্পূর্ণ উপযুক্ত না হয়।

লক তাঁর নিজের সূত্রগুলোকে ব্যবহার করেছিলেন কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ; বার্কলি ও হিউম উভয়ই সেগুলোকে ঠেলে দিয়েছিলেন কূটাভাস-ধর্মী (paradoxical) সিদ্ধান্তের দিকে। আমার মতে, বার্কলির দর্শন তার উপযুক্ত মনোযোগ ও সম্মান আকর্ষণ করেনি—আমি যে সে দর্শনের সঙ্গে একমত তা নয়, কিন্তু আমি তাকে কৌশলপূর্ণ বলে মনে করি, এবং প্রায়ই তাকে খণ্ডন করা যেমন কঠিন বলে মনে করা হয় তার চেয়েও

১. Innate apparatus.
২. Knowledge-responses.

কঠিন বলে মনে করি। প্রত্যেকেই জানে যে, বার্কলি জড়ের বাস্তবতা অস্বীকার করেছিলেন, এবং বলেছিলেন যে, সব কিছুই মানসিক। পূর্ববর্তী বিষয়টাতে আমি তাঁর সঙ্গে একমত, যদিও তাঁর নিজস্ব কারণগুলির জন্য নয়; পরবর্তী বিষয়টাতে, আমি মনে করি যে, তাঁর যুক্তি ভ্রান্ত এবং তাঁর সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে মিথ্যা না হলেও অসম্ভাব্য। সে যাই হোক, আমার নিজস্ব মতামত আমি ব্যক্ত করবো পরবর্তী এক অধ্যায়ে, এবং বার্কলির যুক্তির মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

বার্কলি বলেছিলেন যে, আপনি যখন, উদাহরণস্বরূপ, "একটা গাছ দেখেন," তখন আপনি প্রকৃত পক্ষে যা ঘটছে বলে 'জানেন' তার সবটুকুই আপনার মধ্যে, এবং মানসিক। লক যেমন ইতিমধ্যেই যুক্তি-সহকারে দাবী করেছিলেন, যে রঙটা আপনি দেখেন সেটা পদার্থিক জগতের মধ্যে নেই, সেটা বরং আপনার উপর সংঘটিত একটা কার্য (effect) যা লকের মতানুসারে একটা পদার্থিক উদ্দীপক থেকে উৎপন্ন। লক বলেছিলেন যে, প্রত্যক্ষিত বস্তুর বিশুদ্ধ দৈশিক ধর্মগুলো বাস্তবিকই বস্তুর মধ্যে আছে, কিন্তু রং, কোমলতা, শব্দ, ইত্যাকার জিনিসগুলো আমাদের ভেতরস্থিত কার্যফল। বার্কলি আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রত্যক্ষিত বস্তুর দৈশিক ধর্মগুলো কোন ব্যতিক্রম নয়।[১] সুতরাং প্রত্যক্ষিত বস্তু সম্পূর্ণভাবে 'মানসিক' উপাদান দিয়ে তৈরী, এবং মানসিক নয় এমন কোন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তিনি স্বীকার করতে চাননি যে, একটা গাছের দিকে আমরা যখন তাকাই না তখন তার আর অস্তিত্ব থাকে না; কাজেই তিনি বলেছিলেন যে, গাছটা তার স্থায়িত্ব অর্জন করে ঈশ্বরের মনের ভেতরকার একটা ধারণা হওয়ার মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও এ একটা 'ধারণা' মাত্র, কিন্তু এমন ধারণা নয় যার অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষণের দৈব ঘটনার (accidents) উপর নির্ভরশীল।

বার্কলির মতের বিরুদ্ধে সত্যিকার আপত্তিটা পরাতাত্ত্বিক নয়, সেটা বরং পদার্থবিদ্যিক। আলোক ও শব্দ তাদের উৎস থেকে প্রত্যক্ষক পর্যন্ত ভ্রমণ করতে সময় নেয়, এবং এটা অবশ্যই মনে করতে হবে যে, যে পথ ধরে তারা

১. অর্থাৎ, বস্তুর সব গুণই আমাদের ভেতরস্থিত কার্যফল—এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। (অনুবাদক)

ভ্রমণ করে তার মধ্যে কিছু-একটা ঘটছে। মনে হয় যে, পথের মধ্যে যা ঘটছে তা 'মানসিক' নয়, কারণ আমরা দেখেছি যে, 'মানসিক' ঘটনা সেইগুলো যাদের এমন বিশেষ ধরনের স্মৃতিগত কার্যফল আছে যেগুলো জীবন্ত তন্তুর (living tissue) সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং, যদিও বার্কলির পক্ষে একথা বলা সঠিক হয়েছে যে, তাৎক্ষণিকভাবে আমরা যে-সব ঘটনা জানি সেগুলো মানসিক, তথাপি এটা খুবই সম্ভব যে, জীবন্ত দেহ-বিহীন স্থানগুলোতে যে-সব ঘটনা আমরা অনুমান করি তাদের প্রসঙ্গে তিনি ভ্রান্ত। তবে, এ কথা বলতে গিয়ে, পরবর্তী কোন-এক অধ্যায়ে পূর্ণতর আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আমরা পূর্বাভাস দিচ্ছি। মূলতঃ লক ও বার্কলির যাত্রাবিন্দুর সঙ্গে মৌলিক সাদৃশ্য-বিশিষ্ট একটা যাত্রাবিন্দু থেকে শুরু করে হিউম এমন সংশয়বাদী কতকগুলো সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান, যেগুলোকে পরবর্তী দার্শনিকেরা এড়িয়ে চলেছেন। অহম্-এর (self) অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেছিলেন, আরোহের বৈধতা সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, এবং আমাদের নিজস্ব মানসিক প্রক্রিয়াগুলো ছাড়া অন্য কিছুতে কার্যকারণ নিয়মগুলো প্রয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়ে সংশয় বোধ করেছিলেন। যে নিতান্ত অল্প-সংখ্যক দার্শনিক কোন সুনিশ্চিত (positive) সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যাপারে আগ্রহী নন, তিনি তাঁদের একজন। আমি মনে করি যে, সাধারণ নিশ্চয়তাগুলো অনুভব করতে অস্বীকার করার পক্ষে তাঁর যে কারণগুলো রয়েছে, বহুল পরিমাণে তাদের বৈধতা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অহম্ (self) প্রসঙ্গে, তাঁর অভ্রান্ততা প্রায় সুনিশ্চিত। ইতিমধ্যেই আমরা যুক্তি দিয়েছি যে, একজন ব্যক্তি কোন একক সত্তা নয়, বরং সে এমন কতকগুলো ঘটনার পরম্পরা যেগুলো বিশেষ ধরনের কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। আরোহ প্রসঙ্গে প্রশ্নটা খুবই জটিল, এবং পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। কার্যকারণ নিয়মগুলোর সম্পর্কে বলা যায় যে, আমরা যেমন পরে দেখবো, প্রশ্নটা আরোহের প্রশ্ন থেকে অভিন্ন। উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই হিউমের সন্দেহগুলোকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

লক, বার্কলি ও হিউমের বিরুদ্ধে সাধারণ আধুনিক সমালোচনাটা এই যে, তাঁরা অতিরিক্ত 'পরমাণুবাদী' (unduly atomistic) ছিলেন। মনকে

তাঁরা মনে করেছিলেন কতকগুলো 'ধারণা'-র সমষ্টি বলে, যাদের প্রত্যেকটি একটি বিলিয়ার্ড বলের মত কঠিন ও স্বতন্ত্র। অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন অথবা অখণ্ড প্রক্রিয়ার ধারণা তাঁদের ছিল না; তাঁদের কারণিক এককগুলো ছিল অতিরিক্ত ক্ষুদ্র। গেস্টাল মনোবিজ্ঞান এবং বাক্য প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আমরা যেমন দেখেছি, কারণিক এককটা প্রায়ই এমন একটা সংগঠন (configuration) যাকে তার স্বাতন্ত্র্যসূচক কারণিক ধর্মগুলোকে না হারিয়ে ভেঙ্গে ফেলা যায় না। এ অর্থে একথা সত্য যে, ঐতিহ্যগত বৃটিশ দর্শন অতিরিক্ত পরমাণুবাদী ছিল। কিন্তু অন্য এক অর্থে আমি একে সত্য বলে মনে করি না, এবং আমার মতে আধুনিক দর্শনের অনেকখানি এ বিষয়ে একটা অস্পষ্টতার মধ্যে রয়েছে। যদিও কোন একটা সংগঠনকে তার উপাদানগুলোতে ভেঙ্গে ফেললে সে তার 'কারণিক' ধর্মগুলো হারিয়ে ফেলতে পারে, তথাপি কতকগুলো সম্বন্ধ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এই উপাদানগুলো দিয়েই সে তৈরী; 'পরমাণু'-তে বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা মনে করা না হয় যে, সমগ্রের কারণগত কার্যকারিতা স্বতন্ত্র পরমাণুগুলোর স্বতন্ত্র কার্যফলের যোগফল। আমি এ মত পোষণ করি বলেই, আমি যে দর্শনের প্রবক্তা তাকে আমি বলি "যৌক্তিক পরমাণুবাদ" (logical atomism)। এটুকু পর্যন্ত, আমি লক, বার্কলি ও হিউমকে তাঁদের আধুনিক সমালোচকদের তুলনায় অভ্রান্ত বলে মনে করি। কিন্তু এ বিষয়টাও পরবর্তী এক অধ্যায়ে আবার আলোচনা করা হবে।

হিউম কারণের ধারণার যে সমালোচনা করেছিলেন তার ফলেই কাণ্ট তাঁর নতুন পথের সন্ধান পেলেন। কাণ্টের দর্শন জটিল এবং অস্পষ্ট, এবং তিনি কি বুঝিয়েছিলেন সে বিষয়ে এখনও দার্শনিকেরা বিতর্কমান। যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হন না, তাঁর সমর্থকেরা মনে করেন যে, তাঁরা তাঁকে ভুল বুঝেছেন; সেজন্যে পাঠককে আমি অবশ্যই সতর্ক করে দেব যে, নীচে যা বলা হচ্ছে তা, তিনি যা বুঝিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমার মত, এবং [কাণ্ট সম্পর্কে] সর্বসম্মত কোন মত নেই।

কাণ্ট মনে করেছিলেন যে, আমাদের মানসিক কাঠামোর[১] দৌলতে, ইন্দ্রিয়-সংবেদনের কাঁচামালের উপর আমরা কাজ করি কতকগুলো 'ক্যাটেগরি'র সাহায্যে এবং তাকে দেশ ও কালের মধ্যে বিন্যস্ত করি। ক্যাটেগরিগুলো

১. Mental constitution.

এবং দেশ-কালিক বিন্যাস, উভয়ই আমরা[1] সরবরাহ করি, এবং জগৎকে আমরা যেভাবে জানি সেইভাবে ছাড়া জগতের মধ্যে তারা নেই। কিন্তু যেহেতু আমাদের মানসিক কাঠামো একটা নিয়ত উপাত্ত[2], কাজেই 'জ্ঞাত রূপে' সকল অবভাসই হবে দেশ-কালিক এবং ক্যাটেগরিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরবর্তীগুলোর[3] মধ্যে 'কারণ' হচ্ছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই জগতের নিজস্ব রূপের মধ্যে 'কারণ' যদি নাও থাকে (যে বিষয়ে নৈতিকতার খাতিরে কাণ্ট স্ব-বিরোধী হয়েছিলেন), তথাপি অবভাসগুলোর, অর্থাৎ আমাদের কাছে প্রতীয়মান বস্তুসমূহের, জন্য কারণ হিসাবে সর্বদাই অন্যান্য অবভাস থাকবে। এবং যদিও বাস্তব (real) জগতে কোন সময় নেই, তথাপি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হিসাবে বস্তুগুলোর কতকগুলো আগে ঘটবে এবং কতকগুলো পরে। আবার, দেশ আমরা সরবরাহ করি, এবং সেজন্যে বাইরের জগৎ পর্যবেক্ষণ না করে 'অভিজ্ঞতাপূর্বভাবে' (a priori) আমরা জ্যামিতির জ্ঞান পেতে পারি। কাণ্ট মনে করেছিলেন যে, ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে সত্য, যদিও তাকে কেবল যুক্তিবিন্যার সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব নয় এজন্য যে, আত্ম-বিরোধিতা ছাড়াই ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলোকে অস্বীকার করা যায়।

জ্যামিতি সম্পর্কিত এ প্রশ্নের প্রসঙ্গেই প্রথম কাণ্টের মতবাদের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখা গেল যে, ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করার কোন কারণ আমাদের নেই। আইনস্টাইনের পর থেকে একে সম্পূর্ণ সত্য নয় বলে মনে করার সুনিশ্চিত কারণ আমাদের আছে। মনে হয় যে, ভূগোল যে রকম অভিজ্ঞতানির্ভর, জ্যামিতিও ঠিক তেমনি। পশ্চিম গোলার্ধে কি পরিমাণ স্থল আছে তা যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে আমরা যে পরিমাণে পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করি, যদি আমরা জানতে চাই কোন ত্রিভুজের কোণগুলোর সমষ্টি দুই সমকোণ কিনা তাহলেও ঠিক সেই পরিমাণে আমরা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করি।

১. এখানে 'আমরা' শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ। (অনুবাদক)

২. Constant datum.

৩. অর্থাৎ, ক্যাটেগরিগুলোর মধ্যে। (অনুবাদক)

ক্যাটেগরিগুলোর ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম বড় বড় সমস্যা (difficulties) আছে। উদাহরণস্বরূপ, 'কারণ'-এর কথা বলা যাক। আমরা বিদ্যুতের চমকানি দেখি, এবং তারপর বজ্রের আওয়াজ শুনি; অবভাস হিসাবে আমাদের দেখা ও শোনা, কারণ এবং কার্য হিসাবে সংযুক্ত। কিন্তু 'কারণ'-এর বিষয়ীগত হওয়াকে যদি আমাদের আন্তরিকভাবে নিতে হয়—তাহলে আমরা অবশ্যই মনে করবো না যে, আমাদের দেখার অথবা আমাদের শোনার একটা বহিঃস্থ কারণ আছে। সে ক্ষেত্রে এরূপ মনে করার কোন কারণ আমাদের নেই যে, আমাদের নিজেদের বাইরে কোন কিছু আছে। শুধু তাই নয়, আরও কিছু: কাণ্টের মতে, আমরা যখন দেখি তখন 'প্রকৃত পক্ষে' যা ঘটে এবং অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি, এ দুটো অভিন্ন নয়; প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তা এমন কিছু-একটা যার কোন তারিখ নেই, দেশের মধ্যে যার কোন অবস্থান নেই, যার কারণ নেই এবং কার্য নেই। কাজেই বাইরের জগৎকে আমরা যে রকম জানি আমাদের নিজেদেরকে আমরা তার চেয়ে ভাল করে জানি না। দেশ ও কাল এবং ক্যাটেগরিগুলো একটা অধ্যাস-মরীচিকা[১] এনে মাঝখানে দাঁড় করায়, যার মধ্যে কোন জায়গাতেই পথ করা যায় না। হিউমের সংশয়বাদের উত্তর হিসাবে একে কতক পরিমাণে একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। এবং পরবর্তী কালে Critique of Practical Reason-এ কাণ্ট নিজে তাঁর নিজের কল্প-প্রাসাদের অনেকখানি বিধ্বস্ত করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, 'বাস্তব' জগৎটাতে অন্ততঃ নীতিবিদ্যার বৈধতা অবশ্যই থাকবে। তবে সচরাচর তাঁর অনুসারীরা তাঁর দর্শনের এ অংশটাকে অগ্রাহ্য করেন অথবা ত্রুটি স্বীকার-সহ (apologetically) একে যথাসম্ভব অল্প করে দেখান।

কি পরিমাণে আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং কি পরিমাণে তা অভিজ্ঞতা-নির্ভর, কাণ্টের হাতে এই পুরাতন দার্শনিক বিতর্কে এক নতুন দিক-পরিবর্তন ঘটে। কাণ্ট স্বীকার করেছিলেন যে, অভিজ্ঞতা ছাড়া আমরা কিছুই জানতে পারি না, এবং আমরা যা জানি তা কেবল অভিজ্ঞতার গণ্ডির ভেতরেই বৈধ। কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে, আমাদের জ্ঞানের সাধারণ

[১] Mirage of illusion.

কাঠামোটা এ অর্থে অভিজ্ঞতাপূর্ব যে, অভিজ্ঞতার বিশেষ সত্যগুলোর মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয় না; বরং এর মধ্যে রয়েছে সেই শর্তগুলো, যেগুলোর সঙ্গে অবভাসসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে যদি তাদেরকে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হতে হয়। তাঁর কালের পূর্বে, উপমহাদেশীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রবণতা ছিল প্রায় প্রত্যেক জিনিসকে অভিজ্ঞতাপূর্ব বলে মনে করার, যেক্ষেত্রে বৃটিশ দার্শনিকেরা প্রায় প্রত্যেক জিনিসকে আভিজ্ঞাতিক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই মনে করেছিলেন যে, অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে, যা অভিজ্ঞতাপূর্ব তাকে যুক্তিবিস্তার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়, যদিও কাণ্ট মনে করেছিলেন যে গণিত অভিজ্ঞতাপূর্ব কিন্তু তথাপি 'সংশ্লেষণাত্মক' (synthetic), অর্থাৎ যুক্তিবিস্তার সাহায্যে প্রমাণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে জ্যামিতির দ্বারা তিনি ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিলেন। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে যখন সত্য বলে ধরা হয়, তখন তা 'সংশ্লেষণাত্মক' কিন্তু অভিজ্ঞতাপূর্ব নয়; যখন তাকে হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমানের ব্যাপার বলে মনে করা হয় তখন তা অভিজ্ঞতাপূর্ব কিন্তু 'সংশ্লেষণাত্মক' নয়। প্রকৌশলীরা বাস্তব (actual) জগতের যে জ্যামিতির প্রয়োজন বোধ করেন তা আভিজ্ঞাতিক; বিশুদ্ধ গণিতের যে জ্যামিতি স্বতঃসিদ্ধগুলোর সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে না বরং কেবল তাদের ব্যঞ্জনাগুলো (implication) তুলে ধরে, তা বিশুদ্ধ যুক্তিবিস্তার একটা অনুশীলন।

তবে বলা উচিত যে, এ গ্রন্থে যে বিশ্লেষণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে জ্ঞানের নির্ভুল বিশ্লেষণের আদৌ যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, তাহলে অভিজ্ঞতাবাদী ও অভিজ্ঞতাপূর্ববাদীদের মধ্যবর্তী সমুদয় বিতর্কটা অল্প-বিস্তর অবাস্তব হয়ে ওঠে। সমস্ত বিশ্বাস 'উৎপন্ন' (caused) হয় বাহ্য উদ্দীপক থেকে; যখন তারা উদ্দীপকগুলোর মতই বিশেষ (particular) তখন তারা এ রকম যে, কোন অভিজ্ঞতাবাদী তাদেরকে অভিজ্ঞতার দ্বারা 'প্রমাণিত' বলে মনে করতে পারে, কিন্তু যখন তারা আরও সাধারণ (general) তখন সমস্যা দেখা দেয়। একজন বিদেশী ইংল্যাণ্ডে এসে শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁরা তাকে এই সাধারণ সিদ্ধান্তে নিয়ে যান যে, সব ইংরেজই অশিষ্ট; কিন্তু কয়েক মিনিট পর বকশিশ পাবার আশায় মুটে এ আরোহটাকে উল্টে দেয়। সুতরাং কখনও কখনও কোন নির্দিষ্ট (given) বিশ্বাস উৎপন্ন

হবে একটা ঘটনা থেকে, এবং বিধ্বস্ত হবে আরেকটা ঘটনার ফলে। কোন মানুষের জীবনের যে ঘটনাগুলোর প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসটার উপর পড়ে তাদের সবগুলো থেকেই যদি বিশ্বাসটা উৎপন্ন হয়, তাহলে তিনি সেটাকে সত্য বলে গণ্য করেন। একটা বিশ্বাস যত সাধারণ হয়, তত অধিক-সংখ্যক ঘটনা তার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, এবং সেজন্য তার পক্ষে এরূপ হওয়া আরও কঠিন যে, একজন লোক তাকে দীর্ঘদিন সত্য বলে মনে করবে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, যেসব বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতাপূর্ব বলে মনে করা হয়, সেগুলো পরবর্তী ঘটনাগুলোর দ্বারা বেশ সহজেই বিপর্যস্ত হতে পারতো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বরং দৃঢ়মূল হয়। অন্যত্রের মত এখানেও আমরা এই মতে এসে পৌঁছাচ্ছি যে, কান্টের সময় থেকে ধীবিদ্যাকে যত মৌলিক বলে মনে করা হয়েছে, তা তত মৌলিক নয়।

আরেকটা ঐতিহ্যগত বিতর্ক আছে যার আলোচনা আমি করতে চাই, অর্থাৎ একত্ববাদী আর বহুত্ববাদীদের বিতর্ক। বিশ্বটা কি এক, না বহু? যদি বহু হয় তাহলে কি রকম ঘনিষ্ঠভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত? একত্ববাদী মতটা বহু পুরাতন: পার্মেনাইডিসে (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী)[১] এটা ইতিমধ্যেই পূর্ণাবয়ব। স্পিনোজা, হেগেল এবং ব্র্যাডলীতে এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। পক্ষান্তরে, বহুত্ববাদী মতটা দেখা যায় হেরাক্লাইটাস[২] পরমাণুবাদীগণ, লাইবনিজ, এবং বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে। সুনির্দিষ্টতার খাতিরে, ব্র্যাডলীর মধ্যে একত্ববাদী মতটা যে মূর্তিতে দেখা যায় তাই বিবেচনা করা যাক। ব্র্যাডলী প্রধানতঃ হেগেলের একজন অনুসারী। তিনি মনে করেন যে, প্রত্যেক অবধারণই হচ্ছে সমগ্র সত্তায় (reality) একটা বিধেয় আরোপ করা; সমগ্রটাই প্রত্যেক অবধারণের উদ্দেশ্য (subject)। ধরা যাক আপনি এই বলে শুরু করলেন: "টমির মাথায় ঠাণ্ডা লেগেছে।" এটা সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কিত একটা উক্তি বলে 'প্রতীয়মান' না হতে পারে, কিন্তু ব্র্যাডলীর মতে এটা তাই। লৌকিক ভাষায় তাঁর যুক্তিটাকে ব্যক্ত করতে গেলে তাঁর অনুসারীরা বিরক্তি প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু আমাকে যদি তা করতে দেওয়া হয় তাহলে আমি অনেকটা এইভাবে তা করবো: প্রথমে, টমি

১. **Parmenides,**
২. **Heraclitus.**

কে? সে একজন ব্যক্তি যার একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, এবং সেই প্রকৃতি-বলে সে অন্যসব ব্যক্তি থেকে পৃথক; অনেক বিষয়ে অন্যান্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু সকল বিষয়ে নয়, যার ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তার সবগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বোঝাতে পারছেন না টমি কে। কিন্তু আপনি যখন সেটা করার চেষ্টা করেন তখন আপনি টমির বাইরে চলে যান: তার স্বরূপ নির্ধারিত হচ্ছে পরিপার্শ্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধগুলোর দ্বারা। সে স্নেহশীল কিংবা অবাধ্য অথবা তৃষ্ণার্ত, কোলাহল-প্রিয় অথবা শান্ত, ইত্যাদি; এসব বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্যান্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। আপনি যদি তার বাইরে কোন কিছু উল্লেখ না করে টমিকে সংজ্ঞায়িত করতে চান তো আপনি দেখবেন যে, সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব; সুতরাং সে কোন স্বয়ংনির্ভর সত্তা নয়, বরং জগতের একটা অবাস্তব (un-substantial) অংশ। এমন-কি তার চেয়েও বেশী সুস্পষ্টভাবে তার নাক ও সর্দির বেলায় সেই একই কথা প্রযোজ্য। কি ভাবে আপনি জানেন যে তার সর্দি লেগেছে? কারণ কোন এক ধরনের জড় পদার্থ তার নাক থেকে তার রুমালে যায়, যে ব্যাপারটা সে ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব না থাকলে সম্ভব হতো না। কিন্তু এখন, টমি এবং তার নাক আর সর্দির সংজ্ঞা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনি যখন তার পরিপার্শ্বকে বিবেচনার মধ্যে আনছেন, তখন আপনি দেখছেন যে, তার অব্যবহিত পরিপার্শ্বকে[১] আপনি সংজ্ঞায়িত করতে পারেন না তার[২] পরিপার্শ্বকে বিবেচনার মধ্যে না এনে, এবং এইভাবে শেষ পর্যায়ে আপনি সমস্ত জগৎকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য। কাজেই টমির সর্দি প্রকৃতপক্ষে জগতেরই একটা বৈশিষ্ট্য, যেহেতু জগতের চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন-কিছু এত বাস্তব নয় যে তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।

আরো অমূর্ত আকারে যুক্তিটাকে আমরা উল্লেখ করতে পারি। জগতের অংশ স্বরূপ প্রত্যেক জিনিসই, অংশতঃ, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ-গুলো দিয়ে তৈরী, কিন্তু সম্বন্ধগুলো বাস্তব হতে পারে না। সম্বন্ধের বিরুদ্ধে ব্র্যাডলীর যুক্তিটা নিম্নরূপ। প্রথমে, তিনি যুক্তি দেন যে, যদি সম্বন্ধ থাকে তাহলে

১. Immediate environment.

২. অর্থাৎ, সেই পরিপার্শ্বের। (অনুবাদক)

এমন গুণাবলী অবশ্যই থাকবে যাদের মধ্যে সে সম্বন্ধগুলো অবস্থান করবে যুক্তিটার এ অংশটাতে আমাদের বেশী সময় কাটাবার প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি অগ্রসর হন এভাবে ঃ

"অপরদিকে, গুণগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধটা কিভাবে দাঁড়াতে পারে সেটা বোধগম্য নয়। গুণগুলোর কাছে এ যদি কিছুই না হয়, তাহলে তারা আদৌ সম্বন্ধযুক্ত নয়, এবং যদি তাই হয় তাহলে, আমরা আগে যেমন দেখেছি, তারা আর গুণ নয়, এবং তাদের সম্বন্ধটা অবাস্তব। কিন্তু তাদের কাছে একে যদি কিছু-একটা হতে হয় তাহলে স্পষ্টতঃই নতুন একটা সংযোগকারী সম্বন্ধের প্রয়োজন হবে আমাদের। কারণ এটা খুব সম্ভব নয় যে, সম্বন্ধটা তার পদগুলোর একটার অথবা উভয়েরই বিশেষণ মাত্র হবে ; কিংবা, অন্ততঃ, এ আকারে কথাটা অসমর্থনীয় মনে হয়। এবং যদি, নিজে কিছু একটা হয়ে, পদগুলোর সঙ্গে এটা স্বয়ং কোন সম্বন্ধ রক্ষা না করে তাহলে সে কোন্ বোধগম্য উপায়ে তাদের কাছে কিছু একটা হতে সক্ষম হবে? কিন্তু এখানে আবার আমরা মুহূর্তের মধ্যে একটা হতাশাজনক প্রক্রিয়ার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি, যেহেতু আমরা বাধ্য হচ্ছি নতুন নতুন সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে, এবং এর কোন শেষ নেই। সংযোগগুলো (links) সংযোগ দ্বারা যুক্ত হয়, এবং সংযোগের এ বন্ধন একটা সংযোগ যার নিজেরও দুটো প্রান্তভাগ আছে ; এবং পুরাতন সংযোগটার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য এদের প্রত্যেকের নতুন একটা সংযোগের প্রয়োজন হয়। কিভাবে সম্বন্ধটা তার গুণগুলোর সঙ্গে দাঁড়াতে পারে সেটা খুঁজে বের করাই হচ্ছে এ সমস্যা, এবং সমস্যা অসমাধানযোগ্য।"[১]

দুর্বোধ্য কলাকৌশল ব্যবহার করে সঠিকভাবে এ যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু সেসব এখানে স্থানোপযোগী হবে না। তবে, আমার কাছে যা মৌলিক ভ্রান্তি বলে মনে হয় সেটা আমি নির্দেশ করবো। ব্র্যাডলীর ধারণায় একটা সম্বন্ধ এমন একটা জিনিস যা ঠিক তার পদগুলোর মতই সত্তাধর্মী (substantial), এবং মূল প্রকৃতির দিক থেকে শ্রেণীগতভাবে ভিন্ন নয়। সংযোগ-সহ শৃঙ্খলের উপমাটা দেখে আমাদের সন্দিগ্ধ

১. ব্র্যাডলীর Appearance and Reality, পৃঃ ২৭-২৮ থেকে গৃহীত। (অনুবাদক)

হওয়া উচিত, যেহেতু এটা যদি বৈধ হয় তাহলে স্পষ্টভাবে এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, শৃঙ্খলগুলো অসম্ভব, কিন্তু তথাপি সত্য (fact) হিসাবে তাদের অস্তিত্ব আছে। তাঁর যুক্তির মধ্যে এমন একটা শব্দ নেই যা জড় (physical) শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না। আনুক্রমিক সংযোগগুলো যুক্ত হয় একটা দৈশিক সম্বন্ধের দ্বারা, অন্য একটা সংযোগ দ্বারা নয়। আমি মনে করি যে, অবচেতনভাবে, ব্র্যাডলী বিপথে চালিত হয়েছিলেন একটা অবস্থার দ্বারা, পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে যার উল্লেখ করেছি,—অর্থাৎ এই সত্যটার দ্বারা যে, কোন একটা সম্বন্ধের জন্য ব্যবহৃত 'শব্দটি' তার পদগুলোর জন্য ব্যবহৃত 'শব্দগুলোর' মতই সত্তাধর্মী। ধরা যাক, ক এবং খ দু'টো ঘটনা, এবং ক ঘটে খ-এর আগে। "ক খ-এর আগে ঘটে," এ যুক্তিবাক্যে 'আগে ঘটে' (precedes) শব্দটা, 'ক' এবং 'খ,' ঠিক এ শব্দ দুটোর মতই সত্তাধর্মী। ভাষার মধ্যে ক এবং খ, এ 'দু'টো' ঘটনার মধ্যবর্তী সম্বন্ধটা উপস্থাপিত হয় 'ক,' 'আগে ঘটে,' এবং 'খ,' এই 'তিনটি' শব্দের কালিক অথবা দেশগত ক্রমের মাধ্যমে। কিন্তু এ ক্রমটা (order) একটা প্রকৃত সম্বন্ধ, কোন সম্বন্ধের স্থলে ব্যবহৃত একটা শব্দ নয়। ব্র্যাডলীর পশ্চাদগামী যুক্তিধারায় (regress) প্রথম পদক্ষেপটা প্রকৃত পক্ষে গ্রহণ করতে হবে কোন-একটা সম্বন্ধকে শাব্দিকভাবে প্রকাশ করাতে, এবং কোন-একটা সম্বন্ধের জন্য ব্যবহৃত শব্দটাকে যুক্ত করতে হবে তার পদগুলোর জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলোর সঙ্গে। কিন্তু এটা একটা ভাষাগত সত্য, পরাতাত্ত্বিক সত্য নয়, এবং পশ্চাদগামী যুক্তি-ধারাটাকে আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই।

এ কথাটা যোগ করা উচিত যে, ব্র্যাডলী নিজেই যেমন দেখতে পান, তাঁর সমস্যাগুলো নতুনভাবে দেখা দেয় যখন তিনি সত্তার (Reality) প্রতি কোন বৈশিষ্ট্য আরোপ করার সময় উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখা দেয় সেই সম্বন্ধ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন, এবং সে-জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হন যে, কোন সত্যই সম্পূর্ণ সত্য নয়। অত্যন্ত অমূর্ত একটা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ রকমের একটা সিদ্ধান্ত থেকে সন্দেহ করা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে, যুক্তিটার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে।

বহুত্ববাদ বিজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের মত (veiw), এবং সেজন্য এর বিরোধী যুক্তিগুলো যদি চূড়ান্ত (conclusive) না হয় তাহলে একে গ্রহণ করা উচিত।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমার এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই সত্য মত, এবং একত্ববাদ এসেছে মরমীবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত একটা ত্রুটিপূর্ণ যুক্তিবিন্যা থেকে। হেগেল ও তাঁর অনুসারীদের দর্শনে এ যুক্তিবিন্যার আধিপত্য; বার্গসঁর মতবাদেরও এটাই হচ্ছে মৌলিক ভিত্তি, যদিও তাঁর লেখায় কদাচিৎ এর উল্লেখ আছে। একে যখন বর্জন করা হয়, তখন অতীতের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরাতাত্ত্বিক মতবাদগুলো যে অসম্ভব তা ধরা পড়ে।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়

সত্য ও মিথ্যা

কতকগুলো কারণে সত্য ও মিথ্যার প্রশ্নটা অনাবশ্যক রহস্যজালে আচ্ছাদিত হয়েছে। প্রথমতঃ, লোকে ভাবতে চায় যে, তাদের বিশ্বাসগুলোর মধ্যে মিথ্যার চেয়ে সত্য হওয়ার প্রবণতাটাই বেশী, এবং সেজন্য তারা এমন একটা মতবাদ খোঁজে যাতে দেখা যাবে যে, সত্যই স্বাভাবিক (normal) এবং মিথ্যা অল্পবিস্তর দৈবিক (accidental)। দ্বিতীয়তঃ, 'বিশ্বাস' অথবা 'অবধারণ' দ্বারা লোকে যা বোঝায়, সে সম্বন্ধেও তাদের ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট, যদিও তারা মনে করে যে, বিশ্বাস অথবা অবধারণগুলোই হচ্ছে সেইসব জিনিস যাদের প্রতি 'সত্য' অথবা 'মিথ্যা'[১] বিধেয়গুলো প্রযোজ্য। তৃতীয়তঃ, 'truth'-কে একটা জমকালো অর্থে মস্ত একটা T-সহ ব্যবহার করার প্রবণতা রয়েছে—সম্ভ্রান্ত এবং চমৎকার ও অর্চনাযোগ্য কিছু-একটা হিসাবে। এর ফলে লোকের মানসিক অবস্থা এরকম হয় যে, তারা চিন্তা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। কিন্তু Hamlet-এ গোর-খোদকেরা যে-রকম মাথার খুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলো, ঠিক তেমনিভাবে যুক্তিবিদেরা পরিচিত হন সত্যের সঙ্গে। "সামান্য কাজের লোকেরা সূক্ষ্মতর বোধের অধিকারী," বলেন হ্যামলেট। সুতরাং সত্যের সামনে ভক্তিমিশ্রিত ভয় (awe) যুক্তিবিদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না।

আমাদের বর্তমান বিষয়বস্তুর মধ্যে দু'টো প্রশ্ন রয়েছে: (১) সেই জিনিসগুলো কি-কি যেগুলোতে 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' বিধেয় দুটো প্রযোজ্য? (২) সেগুলোর মধ্যে যে জিনিসগুলো সত্য এবং যেগুলো মিথ্যা, তাদের মধ্যে পার্থক্যটা কি? এ প্রশ্নগুলোর প্রথমটা নিয়ে আমরা আরম্ভ করবো।

আপাতদৃষ্টিতে 'সত্য' ও 'মিথ্যা' প্রযোজ্য হয় উক্তিতে (statements), সেগুলো মৌখিক হোক বা লিখিত হোক। সম্প্রসারিত অর্থে মনে করা হয় যে, উক্তিগুলোতে যেসব বিশ্বাস প্রকাশিত হয় সেগুলোতে, এবং বিশ্বাস

১. 'True' or 'false'.

অথবা অবিশ্বাস না করে যেসব প্রকল্প চিন্তা করা হয় সেগুলোতেও তারা প্রযোজ্য। কিন্তু প্রথমে উক্তির সত্যতা ও মিথ্যাত্ব সম্পর্কে ভেবে দেখা যাক, এবং অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভর না করে আচরণবাদীদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়ার আমাদের যে রীতি, সে রীতিই অনুসরণ করা যাক। শব্দের অর্থের কথা আমরা ইতিপূর্বে বিবেচনা করেছি ; এখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে বাক্যের কথা। অবশ্য একটিমাত্র শব্দ অথবা একটা চোখ-টিপুনির (wink) দ্বারা একটা বাক্য গড়ে উঠতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ একটা বাক্যের মধ্যে থাকে কয়েকটা শব্দ। সেক্ষেত্রে এর একটা অর্থ থাকে, যা পৃথক শব্দগুলোর অর্থ এবং তাদের বিন্যাসের ফলশ্রুতি।[১] যে বাক্যের কোন অর্থ নেই সেটা সত্য বা মিথ্যা নয় ; কাজেই কোন এক ধরনের অর্থের বাহক হিসাবে কেবল বাক্যেরই সত্যতা অথবা মিথ্যাত্ব থাকবে। সুতরাং বাক্যের অর্থ কি তা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

একটা অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধরা যাক, আপনি একটা টাইম-টেবিল খুললেন এবং দেখতে পেলেন যে সেখানে লেখা আছে, একটা যাত্রীবাহী গাড়ী সকাল দশটায় এডিনবরার উদ্দেশ্যে কিংস-ক্রস (King's Cross) ছেড়ে যায়। এ উক্তিটার অর্থ কি ? এর জটিলতার কথা ভাবলে আমি শিউরে উঠি। আমাকে যদি যথাযথভাবে বিষয়টাকে ব্যক্ত করতে হতো তাহলে বর্তমান গ্রন্থের শেষ অবধি আমি আর-কিছুর দিকে নজর দিতে পারতাম না, এবং তা সত্ত্বেও বিষয়টার কেবলমাত্র প্রান্তভাগটুকু স্পর্শ করতে পারতাম। প্রথমে সামাজিক দিকটার কথা বলা যাক : এঞ্জিনচালক ও স্টোকার (stoker) ছাড়া আর কারো ট্রেনযোগে ভ্রমণ করা অত্যাবশ্যক নয় ; যদিও এটা অত্যাবশ্যক যে, অন্যেরা যদি কতকগুলো শর্ত পূরণ করে তাহলে তাদের পক্ষে ভ্রমণ 'করতে পারা' উচিত। ট্রেনটার পক্ষে এডিনবরা পৌঁছা অত্যাবশ্যক নয় : যদি রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে অথবা যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায় তাহলেও উক্তিটা সত্য থেকে যায়। কিন্তু এটা অপরিহার্য যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চাইবেন যে, সেটা এডিনবরায় পৌঁছুক। এর পর পদার্থিক (physical) দিকটার কথা ভাবা যাক : ট্রেনটা যে ঠিক দশটায়

১. "...a function of the meanings of the separate words and their order."

যাত্রা করবে সেটা অত্যাবশ্যক নয়, অথবা সেটা এমন-কি সম্ভবও নয়; কেউ হয়তো বলতে পারে যে, এর নির্দিষ্ট সময়ের দশ সেকেণ্ডের বেশী আগে অথবা পঞ্চাশ সেকেণ্ডের বেশী পরে এর যাত্রা করা চলবে না, কিন্তু এ সীমা-রেখাগুলো কড়াকড়িভাবে টানা যায় না। যে সব দেশে অসময়ানুবর্তিতা একটা সাধারণ ব্যাপার সেখানে এ সীমারেখাগুলো হবে বিস্তৃততর। এর পর আমাদের বিবেচনা করতে হবে 'যাত্রা করা' দ্বারা আমরা কি বোঝাই, যাকে অণুকলন (infinitesimal calculus) না শেখা পর্যন্ত কেউ সংজ্ঞায়িত করতে পারবে না। তারপর আমরা বিবেচনা করবো 'কিংস-ক্রস' এবং 'এডিনবরা'-র সংজ্ঞা, যে পদ দু'টোর উভয়ই অল্পবিস্তর অস্পষ্ট (vague) । এরপর আমাদের বিবেচনা করতে হবে 'রেলগাড়ী' (train) দ্বারা কি বোঝায়। এখানে প্রথমেই দেখা দেবে জটিল আইনগত প্রশ্ন; 'রেলগাড়ী' চালানোর ব্যাপারে কি করলে রেলওয়ে কোম্পানীর পক্ষে তার দায়িত্ব পালন করা হয়? এর পর রয়েছে জড়ের গঠন সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী, যেহেতু একটা রেলগাড়ী স্পষ্টতঃই একখণ্ড জড়; এছাড়াও অবশ্য রয়েছে কিংসক্রসে গ্রীনিচ সময় পরিমাপ করার পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশ্ন। উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশেরই সম্বন্ধ স্বতন্ত্র শব্দের অর্থের সঙ্গে, গোটা বাক্যের অর্থের সঙ্গে নয়। একথা অতি-স্পষ্ট যে কোন সাধারণ লোক (ordinary mortal) যখন এ শব্দগুলো ব্যবহার করে তখন সে এ ধরনের জটিলতা দ্বারা পীড়িত হয় না: তার কাছে কোন শব্দের অর্থ মোটেই সুনির্দিষ্ট (precise) নয়, এবং প্রান্তবর্তী দৃষ্টান্তগুলোকে সে বাদ দিতে চায় না। সুনির্দিষ্টতার অনু-সন্ধান থেকেই জটিলতার অবতারণা। আমরা মনে করি যে, 'মানুষ' শব্দটার সঙ্গে আমরা একটা অর্থ জুড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমরা জানি না পিথাক্যানথ্রোপাস ইরেকটাস-কে[১] অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ কিনা। এতটুকু পর্যন্ত শব্দটার অর্থ অস্পষ্ট।

জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলোরও অধিকতর নির্দিষ্ট এবং অধিকতর জটিল অর্থ দেখা দিতে থাকে; যেসব অপেক্ষাকৃত কম জটিল উপাদান (constituents) আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো প্রকাশ করার জন্য নতুন

---

১. Pithecanthropus *Erectus*—পুরাতাত্ত্বিক মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসী মানুষের বানর-সদৃশ আদিপুরুষ। (অনুবাদক)

নতুন শব্দ সৃষ্টি করা হয়। শব্দ ব্যবহৃত হয় জগতের অন্তর্গত কোন কিছু বর্ণনা করার জন্য ; প্রথমে এ কাজটা সে করে অত্যন্ত খারাপভাবে, কিন্তু পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে তার উন্নতি ঘটে। এভাবেই স্বতন্ত্র শব্দগুলোতে জ্ঞান মূর্তিলাভ করে, যদিও তাদের মধ্যে কোন উক্তি (assertions) থাকে না।

কোন আদর্শ যৌক্তিক ভাষায় বিভিন্ন ধরনের শব্দ থাকবে। প্রথমে স্বকীয় নাম।[১] তবে বাস্তব ভাষায় এগুলোর কোন দৃষ্টান্ত নেই। যে শব্দগুলোকে স্বকীয় নাম 'বলা' হয় (called) তারা সেই-সব সমষ্টির (collections) বর্ণনা যেগুলোকে সবক্ষেত্রেই কোন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয় ; কাজেই 'পিটার' (Peter) সম্পর্কিত উক্তিগুলো প্রকৃত পক্ষে যা-কিছু 'পিটারীয়' (Peterish) তাদের বিষয়ে। কোন সত্যিকার স্বকীয় নাম পেতে হলে আমাদেরকে পেতে হবে একটা একক বিশেষ[২] অথবা এমন একটা বিশেষ-সমষ্টি যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে গণনার মাধ্যমে, কোন সাধারণ গুণের সাহায্যে নয়। যেহেতু বাস্তব বিশেষগুলোর জ্ঞান আমরা পেতে পারি না, সুতরাং সবচেয়ে উত্তম যে ভাষা আমরা গড়তে পারি তার মধ্যে আমাদের শব্দগুলোতে হয় বোঝায় (denote) কোন বিশেষণ নয়তো দুই বা ততোধিক পদের মধ্যবর্তী সম্বন্ধ। এ ছাড়াও কাঠামো নির্দেশক শব্দ আছে : যেমন, "ক খ এর চেয়ে বৃহত্তর"—এর মধ্যে 'হয়' এবং 'চেয়ে' শব্দ দু'টোর কোন আলাদা অর্থ নেই ; তারা কেবল 'বৃহত্তর' নামক সম্বন্ধটার 'দিক'-টা (sense) প্রকাশ করে, অর্থাৎ এটা দেখায় যে, সম্বন্ধটা খ থেকে ক-এ নয়, বরং ক থেকে খ-এর দিকে যাচ্ছে।

সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমরা এখনও সরলীকরণ করে চলেছি। সত্যিকার বিশেষণ ও সম্বন্ধের জন্য তাদের পদ হিসাবে প্রয়োজন হবে বিশেষের (particulars) ; 'নীল' এবং 'গোল'-এর মত যে ধরনের বিশেষণগুলোকে আমরা জানতে পারি সেগুলো বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং তারা কোন শহরের প্রতি প্রযুক্ত 'জনবহুল' নামক বিশেষণটার মত। "এ শহর জনবহুল" বলার অর্থ "এ শহরে অনেক লোক বাস করে।" যে

১. Proper names.

২. Single particular – যা সার্বিক (universal) নয়, এবং সংখ্যার দিক থেকে এক। (অনুবাদক)

বিশেষণ ও সম্বন্ধগুলোকে আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারি তাদের সকলের ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যা অনুরূপ একটা রূপান্তর দাবী করবে। অর্থাৎ বিশ্বের যে বিবরণ ব্যাকরণের দিক থেকে নির্ভুল, তার মধ্যে এমন কোন শব্দ থাকবে না যা আমরা বুঝতে পারি।

শব্দের অস্পষ্টতা এবং অযথার্থতাকে একদিকে সরিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করা যাক, কোন্ অবস্থায় আমরা সুনিশ্চিত বোধ করি যে, কোন একটা উক্তি সত্য বা মিথ্যা? একটা বর্তমান উক্তিকে সত্য বলে মনে করা হবে যদি, উদাহরণস্বরূপ, পুনরাভিজ্ঞান (recollection) অথবা প্রত্যক্ষণের সঙ্গে তার মিল থাকে; একটা অতীত উক্তিকে [সত্য বলে মনে করা হবে], যদি সে এমন-সব প্রত্যাশা জাগিয়ে থেকে থাকে যেগুলো এখন প্রমাণিত হয়েছে। আমি বলতে চাই না যে, এগুলোই একমাত্র কারণ (grounds) যার ভিত্তিতে আমরা কোন উক্তিকে সত্য বলে মনে করি; আমি বোঝাতে চাই যে, এগুলো সরল ও আদর্শস্বরূপ, এবং পরীক্ষার উপযুক্ত। যদি আপনি বলেন "আজ সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল," তাহলে আমি স্মরণ করতে পারি যে, বৃষ্টি হচ্ছিল অথবা হচ্ছিল না। কেউ সম্ভবতঃ বলতে পারে যে, 'আজ সকাল' শব্দগুলো, আমার ক্ষেত্রে, 'বৃষ্টি হচ্ছিল' (raining) শব্দগুলোর সঙ্গে অথবা 'বৃষ্টি হচ্ছিল না' শব্দগুলোর সঙ্গে অনুষক্ত। এ দুটোর মধ্যে যেটা ঘটে, সে অনুসারে আমি আপনার উক্তিকে সত্য বা মিথ্যা বলে বিচার করি। যদি আমার এই দুই অনুষঙ্গের কোনটাই না থাকে তাহলে আমি আমার উক্তিকে সত্য বা মিথ্যা বলে বিচার করি না, যদি-না অনুমান করার মত মালমসলা আমার হাতে থাকে; তবে (and) আমি এখন পর্যন্ত অনুমান নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। যখন আমি বাতিগুলোকে উজ্জ্বলভাবে জলতে দেখি, তখন যদি আপনি বলেন "বাতিগুলো নিভে গেছে," তাহলে আমি সিদ্ধান্ত করি যে, আপনি ভুল বলছেন, যেহেতু "বাতিগুলো উজ্জ্বলভাবে জলছে," এ শব্দগুলোর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষণটা অনুষক্ত। আপনি যদি বলেন, "এক মিনিটের মধ্যে বাতিগুলো নিভে যাবে," তাহলে আপনি অতি পরিচিত এক ধরনের মানসিক চাপের (tension) সৃষ্টি করেন যাকে বলা হয় 'প্রত্যাশা,' এবং কিছু সময় পর আপনি এই অবধারণের জন্ম দেন যে, আপনি ভুল বলেছিলেন (যদি বাতিগুলো নিভে না যায়)। অতীত, বর্তমান, অথবা

ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত উক্তির সত্যতা অথবা মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এগুলো হচ্ছে সাধারণ 'প্রত্যক্ষ' (direct) পন্থা।

কোন উক্তি গ্রহণ বা বর্জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলোর[১] মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। প্রয়োগবাদ (pragmatism) কেবল অপ্রত্যক্ষ কারণগুলো বিবেচনা করে। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, এ মতবাদে কোন উক্তিকে মিথ্যা বলে মনে করা হয় যখন সেটাকে গ্রহণ করার ফলাফল দুর্ভাগ্য-জনক। কিন্তু এ বিষয়টা অনুমানের এলাকায় পড়ে। আমি আপনাকে স্টেশনের পথ জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে ভুল বলেন, এবং আমি গাড়ী ধরতে অপারগ হই ; তখন আমি 'অনুমান' করি যে, আপনি আমাকে ভুল বলেছিলেন। কিন্তু আমি যখন বাতিগুলোকে উজ্জ্বলভাবে জলতে দেখছি তখন যদি আপনি বলেন "বাতিগুলো নিভে গেছে," আমি তাহলে অনুমান ছাড়াই আপনার উক্তি প্রত্যাখান করি। এ ক্ষেত্রে, আমার বর্তমান পরিবেশের (circumstances) মধ্যবর্তী কিছু-একটা এমন কতকগুলো শব্দের সঙ্গে অনুষক্ত যেগুলো আপনার শব্দগুলো থেকে ভিন্ন, এবং সেইভাবে ভিন্ন যার মধ্যে অসংগতি আছে বলে আমি মনে করতে শিখেছি। আমি মনে করি যে, মিথ্যাত্বের চূড়ান্ত পরখ (test) 'কখনই' কোন বিশ্বাসের ফলাফলের স্বরূপ নয় ; পরখটা বরং শব্দ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা স্মৃত সত্যের[২] মধ্যবর্তী অনুষঙ্গ। একটা বিশ্বাস 'প্রতিপাদিত' (verified) হয় তখন, যখন এমন একটা অবস্থার উৎপত্তি হয় যার থেকে সে বিশ্বাস প্রসঙ্গে প্রত্যাশার একটা অনুভূতি পাওয়া যায়, এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তখন যখন সে অনুভূতিটা বিস্ময়ের। কিন্তু এটা কেবল সেই-সব বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলোর প্রতিপাদন অথবা খণ্ডনের জন্য কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ঘটনার[৩] জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যে বিশ্বাস কোন অবস্থার উপর একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া—যেমন, যখন আপনি একটা দৌড়-প্রতিযোগিতা শুরু হবার জন্য অপেক্ষা করছেন এবং একটু পরেই বলেন 'ঐ চললো'[৪] —তার ক্ষেত্রে প্রতিপাদনের কোন প্রয়োজন নেই,

১. "direct and indirect grounds."
২. "the association between words and sensible or remembered facts."
৩. "future contingency."
৪. "They're off."

বরং সে অন্যান্য বিশ্বাস প্রতিপাদন করে। এবং, এমন-কি যেখানে কোন বিশ্বাসের নিশ্চিতায়ণ ভবিষ্যতের গর্ভে, সেখানেও বিশ্বাসটার সত্যতা যার দ্বারা নিশ্চিতায়িত হয় সেটা ফলাফলের সুখদায়কতা নয়, সেট তার প্রত্যাশিততা (expectedness)।

আমি মনে করি যে, গতানুগতিক মনোবিজ্ঞানে 'বিশ্বাস'-কে (belief) যে এক ধরনের ঘটনা বলে মনে করা হয়, সেটা ভুল। যে ধরনের বিশ্বাসের মধ্যে প্রত্যাশা থাকে, সেটা থেকে সেই ধরনের বিশ্বাস ভিন্ন যা কেবল স্মৃতি অথবা প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল। কোন টাইম-টেবিলে আপনি যখন দেখতে পান যে, দশটায় একটা ট্রেন কিংস্ক্রস ছাড়ে তখন, এ উক্তিটা যে টাইম-টেবিলে রয়েছে, আপনার সে বিশ্বাস ভবিষ্যৎ নিশ্চিতায়ণের জন্যে অপেক্ষা করে না, কিন্তু ট্রেন সম্পর্কিত আপনার বিশ্বাস তা করে: আপনি কিংস্ক্রসে গিয়ে ট্রেনটাকে রওনা হতে দেখতে পারেন। কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একটা বিশ্বাস পুনরাভিজ্ঞান, অথবা প্রত্যক্ষণ, অথবা প্রত্যাশা হতে পারে: যে ঘটনা আপনি দেখেন নি এবং দেখার আশাও করেন না—যেমন, রুবিকন (Rubicon) পার হওয়ায় রত সিজার, অথবা হাউজ অব লর্ডসের বাতিলকরণ—তার বিশ্বাসটা এদের কোন একটাও না হতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় বিশ্বাসের মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই অনুমান থাকে। এ পর্যায়ে আমি যৌক্তিক অথবা গাণিতিক বিশ্বাসগুলোর কথা বিবেচনা করছি না, যাদের কতক-গুলোকে, 'এক অর্থে', অবশ্যই অনুমান-বিযুক্ত হতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমরা দেখতে পাব, যে অর্থে স্মৃতি ও প্রত্যক্ষণ অনুমান-বিযুক্ত তার থেকে এ অর্থটা ভিন্ন।

আমি বলবো যে, সংকীর্ণ অর্থে, একটা বিশ্বাস এমন একটা শব্দ-বিন্যাস (form of words) যা কয়েক রকমের আবেগের মধ্যে কোন-এক রকমের কোন-এক আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত। (পরবর্তী সময়ে একটা ব্যাপকতর অর্থ আমি দেব।) বিশ্বাসটার মধ্যে থাকতে পারে কোন একটা স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, প্রত্যাশা, অথবা বিশ্বাসকারীর অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত কিছু-একটা, এবং সে অনুসারে আবেগটা বিভিন্ন হতে পারে। এ ছাড়া, শব্দ-বিন্যাস অপরিহার্য নয়। যেখানে আবেগটা উপস্থিত থেকে পরিপার্শ্বের কোন একটা দিক-প্রসঙ্গে কোন একটা ক্রিয়ার জন্ম দেয়, সেখানে একটা বিশ্বাস আছে বলা যায়।

যে-কোন রকমের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই, তার মৌলিক পরখটা হচ্ছে এই যে, তার ফলে কোন বাস্তব ঘটনা থেকে প্রত্যাশার ভাব অথবা তার উল্টোটার সৃষ্টি হয়। আবেগ কি, সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা আমি এখন করছি না। ডঃ ওয়াটসন আবেগের একটা আচরণবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা গ্রহণ করলে আমি 'বিশ্বাস'-এর যে সংজ্ঞা দিচ্ছি তা সম্পূর্ণ আচরণবাদী হয়ে পড়ে। সংজ্ঞাটাকে আমি এমনভাবে দাঁড় করিয়েছি যে, অন্তর্দর্শনের প্রশ্নটার কোন মীমাংসা তার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে না।

সত্য এবং মিথ্যার বিষয়বস্তুটাকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়ঃ

ক. **আকারিক তত্ত্ব**—যেসব শব্দে একটা বাক্য গঠিত তাদের অর্থ দেওয়া থাকলে, কিসের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হয় বাক্যটা সত্য অথবা মিথ্যা।

খ. **কারণিক তত্ত্ব**—সত্য ও মিথ্যার মধ্যে (ক) তাদের কারণের দ্বারা, (খ) তাদের কার্যফল দ্বারা আমরা পার্থক্য করতে পারি কি?

গ. **ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাদান**—উক্তি হচ্ছে একটা সামাজিক ঘটনা, বিশ্বাস হচ্ছে ব্যক্তিগত কিছু-একটা। কিভাবে আমরা বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিতে পারি, এবং যখন সেটা শব্দ দ্বারা গঠিত নয় তখন সেটা কি?

ঘ. **সামঞ্জস্য এবং সত্য**[১]—বিশ্বাস অথবা উক্তির বস্তু থেকে বেরিয়ে এসে আমরা কি অন্য এমন-কিছুতে এসে পৌঁছাতে পারি যার থেকে দেখা যায় যে, তারা সত্য, কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? অন্য কথায়, যুক্তিবাক্য (proposition) এবং ফ্যাক্টের (fact)[২] মধ্যে কি ধরনের সম্বন্ধ সম্ভব?

এ প্রশ্নগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করা খুবই কঠিন কাজ। আকারিক তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রথম প্রশ্নটা আমাদেরকে ফ্যাক্টের সঙ্গে যুক্তিবাক্যের সম্বন্ধ বিষয়ক চতুর্থ প্রশ্নটায় নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, "ব্রুটাস সিজারকে হত্যা করেছিলেন" সত্য এজন্য যে, কোন একটা ফ্যাক্ট আছে; কি ফ্যাক্ট? এই ফ্যাক্ট যে, ব্রুটাস সিজারকে হত্যা করেছিলেন। এর ফলে আমরা শাব্দিক জগতেই থেকে যাচ্ছি, এবং এর থেকে বাইরে এসে এমন কোন অ-শাব্দিক ফ্যাক্টের জগতে যেতে পারছি না যার সাহায্যে শাব্দিক উক্তিগুলোকে প্রতিপাদিত করা

১. ক, খ, গ ও ঘ-এর মূল শিরোনাম, যথাক্রমে: Formal Theory; Causal Theory; Individual and Social Element; Consistency and Truth. (অনুবাদক)

২. আমার জানা মতে, fact-এর সমার্থক কোন 'সঠিক' পারিভাষিক বাংলা শব্দ নেই। (অনুবাদক)

যায়। এর ফলে দেখা দেয় আমাদের চতুর্থ সমস্যাটা। কিন্তু এর থেকে কার্য সম্পর্কিত আমাদের দ্বিতীয় সমস্যাটায় চলে যাই, যেহেতু স্বাভাবিকভাবে এখানেই আমরা অন্বেষণ করবো যুক্তিবাক্য এবং ফ্যাক্টের মধ্যবর্তী মৌলিক (vital) সম্পর্কটা। এবং এখানে, আবার, আমাদেরকে সত্যভাবে চিন্তা করা এবং সত্যভাবে কথা বলার মধ্যেও পার্থক্য করতে হবে। প্রথমটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, দ্বিতীয়টা একটা সামাজিক ব্যাপার। সুতরাং আমাদের সব ক'টি সমস্যাই পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ।

আমি আরম্ভ করবো গ, অর্থাৎ বিশ্বাস ও উক্তির মধ্যবর্তী পার্থক্য নিয়ে। 'উক্তি' (statement) দ্বারা আমি বোঝাই এমন একটা শব্দ-বিন্যাস[১] যা উচ্চারিত অথবা লিখিত হয় অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা শ্রুত অথবা পঠিত হবার উদ্দেশ্যে, এবং যা কোন প্রশ্ন, আবেগসূচক উক্তি,[২] অথবা আদেশ নয়, বরং তেমন কিছু-একটা যাকে আমরা assertion[৩] বলবো। কোন্ কোন্ ধরনের শব্দ-বিন্যাস assertion, সে প্রশ্নটা বৈয়াকরণের প্রশ্ন এবং ভাষাভেদে সেটা ভিন্ন। কিন্তু সম্ভবতঃ আমরা বরং তার চেয়ে কিছু বেশী বলতে পারি। সে যাই হোক, একটা assertion ও একটা আদেশসূচক উক্তির[৪] পার্থক্য সুনির্দিষ্ট নয়। ইংল্যাণ্ডে, বিজ্ঞপ্তিতে লেখা থাকে "আগন্তুকদেরকে ঘাসের উপর না হাঁটতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।" আমেরিকায়, সেক্ষেত্রে বলা হয় "দূরে থাকুন! আপনাকে বলা হচ্ছে।"[৫] কার্যফলের দিক থেকে এ দু'টোর একই অর্থ: তথাপি ইংরেজী বিজ্ঞপ্তিটাতে নিছক একটা উক্তিমাত্র আছে, যে-ক্ষেত্রে আমেরিকান বিজ্ঞপ্তিতে রয়েছে একটা আদেশ এবং তারপরে একটা উক্তি যা অবশ্যই মিথ্যা হবে যদি একের বেশী ব্যক্তি তা পড়ে। যে পরিমাণে অন্য লোকের আচরণের উপর প্রভাব ফেলার জন্য উক্তি

১. Form of words.
২. Interjections.
৩. Assertion-এর বাংলা তরজমা করা হয় 'নিশ্চিত উক্তি'। কিন্তু দার্শনিক আলোচনায়, চূড়ান্ত পর্যায়ে, এ তরজমা মূল্যহীন। এ ছাড়া, বর্তমান ক্ষেত্রে এ তরজমায় চক্রক দোষও ঘটে যায়। সুতরাং এখানে মূল ইংরেজী শব্দটাই থেকে গেল। তবে ক্ষেত্রভেদে 'নিশ্চিত উক্তি' গ্রহণ করা যেতে পারে। (অনুবাদক)
৪. Imperative.
৫. "Keep off! This means you."

করা হয়, সেই পরিমাণে উক্তিগুলো আদেশ অথবা অনুরোধের প্রকৃতি ধারণ করে। তবে তাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে কোন একটা 'বিশ্বাস' উৎপন্ন ক'রে, যে বিশ্বাসটা বক্তার মনে থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে। সে যাই হোক, তারা প্রায়ই কোন একটা বিশ্বাস 'প্রকাশ করে (express), অন্যের উপর [তার] ফলাফলের কথা চিন্তা না ক'রে। কাজেই উক্তিকে এই বলে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, এ এমন একটা শব্দ-বিন্যাস যা হয় একটা বিশ্বাস প্রকাশ করে নয়তো একটা বিশ্বাস উৎপন্ন করতে চায়। সুতরাং পরবর্তী ধাপে আমরা অবশ্যই 'বিশ্বাস'-এর সংজ্ঞা দেবো।

'বিশ্বাস' এমন একটা শব্দ যাকে আমরা বিষয়টাকে কার্যকারণের দিক থেকে দেখলে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করবো, বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করবো। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কারণিক দৃষ্টিকোণটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কতকগুলো উপায়ে বিশ্বাস আমাদের কাজের উপর প্রভাব ফেলে; এসব উপায়ে যা আমাদের কাজের উপর প্রভাব ফেলে তাকে বিশ্বাস বলা যায়, যদিও বিশ্লেষণের দিক থেকে সাধারণভাবে যাকে বিশ্বাস বলা হতো তার সঙ্গে এর বড়-একটা সাদৃশ্য নেই। সুতরাং আমরা বিশ্বাস সম্পর্কিত আমাদের পূর্ববর্তী সংজ্ঞার পরিসর বাড়িয়ে দিতে পারি। একজন লোকের কথা চিন্তা করুন, যিনি তার বন্ধু যে বাড়ীতে বাস করতেন সেখানে যান, এবং বন্ধু অন্যত্র চলে গিয়েছে দেখে বলেন: "আমি 'ভেবেছিলাম' সে এখনও এখানে বাস করছে," যদিও কোনরূপ চিন্তা না করে কেবল অভ্যাসবশেই তিনি ও-কাজটা করেছিলেন। যদি কারণিক-ভাবে আমরা শব্দ ব্যবহার করতে চাই, তাহলে আমাদের বলা উচিত যে, এ লোকটির মধ্যে একটা 'বিশ্বাস' ছিল, এবং তার ফলে 'বিশ্বাস' হবে কেবল কোন ক্রিয়া-পরম্পরার (string of actions) একটা বৈশিষ্ট্য মাত্র। আমাদের বলতে হবে: কোন ব্যক্তি প নামক একটা যুক্তিবাক্য 'বিশ্বাস করে,' যদি—যখনই সে এমন কোন ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখে যার ক্ষেত্রে প প্রাসঙ্গিক, তখনই সে এমন ভাবে কাজ করে যে, ফলাফলটা অর্জন করা যাবে যদি প সত্য হয়, কিন্তু অন্যভাবে নয়। কখনও কখনও এর থেকে সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়া যায়, কখনও কখনও যায় না। আপনি যখন কোন টেলিফোন

নম্বর ধরে কথা বলেন, তখন এটা পরিষ্কার যে, আপনি যে গ্রাহককে (subscriber) চান সে নম্বরটাকে তার নম্বর বলেই আপনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু আপনি শক্তির নিত্যতা অথবা ভাবী জীবনে বিশ্বাস করেন কি-না তা নির্ণয় করা আরও কঠিন কাজ। কতকগুলো প্রসঙ্গে আপনি কোন-একটা বিশ্বাস লালন করতে পারেন এবং অপরাপর প্রসঙ্গে নয়; কারণ তথাকথিত 'চিন্তার নিয়মাবলী' (Laws of Thought) অনুসারে আমরা চিন্তা করি না। গতানুগতিক মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য সকল ক্যাটেগরির মতই 'বিশ্বাস' এমন একটা ধারণা যাকে কোন সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায় না।

একথার সূত্র ধরে আমি চলে আসছি, কোন বিশ্বাসের সত্যতা অথবা মিথ্যাত্ব তার কারণ অথবা তার কার্যফল দ্বারা নির্ণয় করা যায় কিনা, সেই প্রশ্নে। তবে এখানে একটা প্রাথমিক সমস্যা রয়েছে। এইমাত্র আমি বললাম যে, ক প-তে বিশ্বাস করে[১] যদি সে এমন ভাবে কাজ করে যে, প যদি 'সত্য' হয় তাহলে তার উদ্দেশ্যগুলো সিদ্ধ হবে। সেজন্য আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, আমরা জানি 'সত্য' (truth) বলতে কি বোঝায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, আমরা জানি 'সত্য'-কে কোন শব্দবিন্যাসের প্রতি প্রয়োগ করলে তার দ্বারা কি বোঝায়। যুক্তিটা ছিল নিম্নরূপ: কোন ব্যক্তির কার্যাবলী নিরীক্ষণ করে আপনি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার বিশ্বাসগুলো অনুমান করেন, সে প্রক্রিয়া গ্রহমণ্ডলীর নিরীক্ষিত গতি-প্রকৃতি থেকে কেপলারের নিয়মগুলো আবিষ্কার করার প্রক্রিয়ার মতই জটিল (elaborate) হতে পারে। তার 'বিশ্বাসগুলো'কে "মনের অবস্থা"[২] বলে ধরা হয় না, ধরা হয় নিছক ক্রিয়া-পরম্পরার বৈশিষ্ট্য হিসাবে। নিরীক্ষণের মাধ্যমে যখন এ বিশ্বাসগুলো নিরূপিত হয় তখন তাদেরকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়; উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন "এ ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কিংস ক্রস থেকে সকাল ১০ টায় একটা ট্রেন আছে।" যে-সব শব্দের অর্থ জানা আছে সেগুলোর মাধ্যমে আপনি যখন একবার বিশ্বাসটাকে প্রকাশ করে ফেলেছেন, তখন আপনি সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন যেখানে

১ A believes P.
২ States of mind.

সূত্রবদ্ধ মতবাদগুলো (formal theories)[1] প্রয়োগ করা যায়। কোন জানা পদবিন্যাস (syntax) অনুসারে সাজানো জানা অর্থ-বিশিষ্ট শব্দমণ্ডলী সত্য বা মিথ্যা হয় কোন-একটা ফ্যাক্টের দৌলতে, এবং এই ফ্যাক্টের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা স্বতন্ত্র শব্দগুলোর অর্থ এবং পদবিন্যাসের নিয়মাবলী থেকে যৌক্তিকভাবে উৎপন্ন। এ জায়গায় যুক্তিবিদ্যা শক্তিমান।

দেখা যাবে যে, আমরা যা বলেছি সে অনুসারে সত্য প্রাথমিকভাবে কোন শব্দ-বিন্যাসের প্রতি প্রযোজ্য, এবং কেবল গৌণভাবে (derivatively) বিশ্বাসের প্রতি প্রযোজ্য। শব্দ-বিন্যাস একটা সামাজিক ব্যাপার, সেজন্য সত্যের মৌলিক রূপ অবশ্যই সামাজিক হবে। কোন শব্দ-বিন্যাস তখন সত্য যখন কোন ফ্যাক্টের সঙ্গে তার কোন-একটা সম্বন্ধ আছে। কোন ফ্যাক্টের সঙ্গে কোন্ সম্বন্ধ? আমি মনে করি যে, মৌলিক সম্বন্ধটা এই: কোন-একটা শব্দবিন্যাস সত্য হবে যদি, সেই ভাষার জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যখন নিজেকে সেই পরিবেশে দেখতে পায় যে পরিবেশের মধ্যে সেই শব্দগুলোতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো (features) বোঝায় সেগুলো রয়েছে—তখন সে সেই শব্দবিন্যাসের দিকে পরিচালিত হয়; এবং যদি এ বৈশিষ্ট্য-গুলো তার মধ্যে এমন-সব যথেষ্ট প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যার ফলে সে সেইসব বৈশিষ্ট্যবোধক শব্দগুলো ব্যবহার করে। কাজেই, "কিংস ক্রস থেকে সকাল ১০ টায় একটা ট্রেন ছাড়ে" সত্য, যদি কোন ব্যক্তিকে এ উক্তি করতে প্রযোজিত করা যায় যে, "এখন সকাল ১০টা, এ-ই হচ্ছে কিংস ক্রস এবং আমি একটা ট্রেনকে যাত্রা করতে দেখছি।" পরিপার্শ্ব শব্দের জন্ম দেয়, এবং সরাসরিভাবে পরিপার্শ্ব দ্বারা উৎপন্ন শব্দাবলী (যদি তারা উক্তি হয়) 'সত্য'। বিজ্ঞানে যাকে 'প্রতিপাদন' (verification) বলা হয় সে হচ্ছে নিজেকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করা যেখানে পূর্বে অন্য কারণে ব্যবহৃত শব্দাবলী সরাসরি পরিপার্শ্ব থেকে উৎপন্ন হয়। অবশ্য, এ ভিত্তিটা থাকার পর, অসংখ্য অপ্রত্যক্ষ উপায়ে উক্তি প্রতিপাদিত হয়; কিন্তু, আমার মতে, সবগুলোই এই প্রত্যক্ষ উপায়ের উপর নির্ভরশীল।

উপরোক্ত মতবাদটাকে নিতান্ত অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু অংশতঃ একে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলোর মধ্যে চতুর্থ

১. অর্থাৎ, ব্যাখ্যামূলক বিশেষ অভিমতের আকারপ্রাপ্ত মতবাদগুলো। (অনুবাদক)

প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া, অর্থাৎ, "যেসব ফ্যাক্ট শব্দগুলোকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, শব্দের বাইরে এসে তাদের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি কিভাবে ?" যুক্তিবিদ্যা শব্দের জগতে কারারুদ্ধ, সুতরাং স্পষ্টতই যুক্তিবিদ্যার ভেতরে আমরা এটা করতে পারি না ; আমরা এটা করতে পারি কেবল আমাদের অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ বিবেচনা করে, এবং এসব সম্বন্ধ যে পরিমাণে প্রাসঙ্গিক সেই পরিমাণে তারা কার্যকারণগত (causal) হওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমি মনে করি যে, উপরের মতবাদটা, তার বর্তমান চেহারায়, এত স্থূল যে, এটা সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না। আমাদেরকে প্রত্যাশিততার (expectedness) মত অন্যান্য আরও জিনিস ঢোকাতে হবে, যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যেসব পথের ইঙ্গিত দিয়েছি, সত্যতা বা মিথ্যাত্বের সংজ্ঞা সে রকমের কোন পথ ধরেই অন্বেষণ করতে হবে।

উপসংহারে আমি দুটো বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে চাই। প্রথমটার বিষয়বস্তু হচ্ছে আচরণবাদ ও যুক্তিবিদ্যার সম্ভাব্য সামঞ্জস্য-বিধান। একথা পরিষ্কার যে, আমাদেরকে যখন কোন সমস্যার সমাধান করতে হয়, তখন সর্বক্ষেত্রে আমরা ইঁদুরের মতো এলোপাতাড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে তার সমাধান করি না ; প্রায়ই আমরা তা সমাধান করি 'চিন্তা'র (thinking) সাহায্যে, অর্থাৎ, সেই প্রক্রিয়ার সাহায্যে যার মধ্যে আমরা প্রকাশ্যভাবে কোনরূপ নড়াচড়া করছি না। কোহ্‌লারের (Kohler) শিম্পাঞ্জীগুলোর বেলায়ও কখনও কখনও তাই ঘটে। এখন, শব্দগত চিন্তার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান করার সম্ভাবনার মধ্যে কি আছে ? যেসব বিভিন্ন উপায়ে আমরা শব্দগুলোকে পাশাপাশি সাজাই সেগুলো সম্পূর্ণ এলোমেলো random) নয়, বরং যে 'ধরনে'র শব্দগুচ্ছের মধ্যে আমাদের সমস্যার একটা সমাধান থাকার সম্ভাবনা আছে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞান দ্বারা সীমিত। পরিশেষে আমরা হঠাৎ করে এমন একটা শব্দগুচ্ছে এসে পড়ি, যার মধ্যে আমরা যা চাই তা আছে বলে মনে হয়। তখন আমরা এমন ধরনের একটা প্রকাশ্য ক্রিয়া করতে অগ্রসর হই, যার নির্দেশ পাওয়া যায় সেই শব্দগুচ্ছ থেকে ; যদি তা সফলকাম হয় তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এখন, এই প্রক্রিয়াটা বোধগম্য হয় কেবল যদি পদবিন্যাসের (syntax) নিয়মাবলী এবং

পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলীর মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকে—'পদবিন্যাস'-এর ব্যাকরণিক নয়, বরং মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে। আমি মনে করি যে, যুক্তিবিদ্যায় এবং সাধারণ দর্শনে এ যোগাযোগটাকে 'ধরে নেওয়া' (assumed) হয়; কিন্তু একে মনে করা উচিত এমন একটা সমস্যা হিসাবে, আচরণবাদী পদ্ধতির সাহায্যে যার সম্বন্ধে গবেষণা চালানোর আবশ্যক রয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার ব্যাপারে একটা ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া, এ প্রস্তাবের (suggestion) উপর আমি কোন জোর দিতে চাই না। কিন্তু আমি ভাবতে পারি না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত-না আচরণবাদী[১] পদবিন্যাস এবং পদার্থবিদ্যার মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সমস্যা সমাধানের পথে তিনি বেশী দূর অগ্রসর হয়েছেন। এটা ছাড়া 'চিন্তা'র কার্যকারিতা তাঁর সূত্রাবলীর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমার দ্বিতীয় চিন্তা সেইসব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে, যেগুলোকে ভাষার কাঠামো জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সম্ভাব্য জ্ঞানের পরিধির উপর আরোপ করে এরূপ মনে করার একটা প্রবণতা আমার মধ্যে আছে যে, ভাষা এবং বস্তু সমষ্টির মধ্যবর্তী সম্বন্ধ নিয়ে সরলভাবে চিন্তা করলে তার থেকে অল্প-বিস্তর সংশয়বাদ-ধর্মী সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ পরাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যেতে পারে একটা কথিত বাক্য গঠিত হয় কোন-একটা কালিক ঘটনানুক্রম দ্বারা; একটা লিখিত বাক্য হচ্ছে কতকগুলো জড়-খণ্ডের একটা দৈশিক অনুক্রম। কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ভাষার মধ্যে পদার্থিক জগতের ঘটনাপ্রবাহ প্রতি স্থাপিত (represent) হতে পারে; বস্তুতঃ পদার্থিক জগতের কাঠামোটাকে অধিকতর পরিচালনযোগ্য অবস্থায় রেখে ভাষা তার একটা মানচিত্র তৈরী করতে পারে, এবং সে তা পারে এজন্য যে, পদার্থিক ঘটনাবলী দিয়েই ভাষা তৈরী। কিন্তু মরমীবাদী (mystic) যে জগৎকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নেন তেমন কোন জগৎ থাকলে, ভাষা থেকে ভিন্ন তার একটা কাঠামো থাকতো এবং সেজন্য শব্দের মাধ্যমে তার কোন বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হতো না। এটা বেশ পরিষ্কার যে, শাব্দিক কোন কিছুতে এ প্রকল্প প্রমাণ অথবা খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

---

১. The behaviorist.

কার্যতঃ সকল দর্শনে সম্বন্ধ সম্পর্কে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করেছে তার অনেকখানির জন্যই এ সত্যটা দায়ী যে, সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয় সম্বন্ধের সাহায্যে নয়, বরং শব্দের সাহায্যে এবং সে শব্দগুলো অন্যান্য শব্দের মতই বস্তুধর্মী (substantial)। ফলতঃ, সম্বন্ধ সম্পর্কে চিন্তা করতে যেয়ে আমরা প্রতিনিয়ত সম্বন্ধের নিজের অবস্তুধর্মিতা এবং শব্দের বস্তুধর্মিতার মধ্যে ঘোরাফেরা করি। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ বজ্রের আগে আসে, এ সত্যটার কথাই ধরা যাক। আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে, যে ভাষায় সত্যটার কাঠামো অনেকটা সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয় সে ভাষার মাধ্যমে একে প্রকাশ করতে হলে আমাদেরকে কেবল এই বলতে হবেঃ "বিদ্যুৎ. বজ্র" (lightning, thunder); এখানে প্রথম শব্দটা যে দ্বিতীয়টার আগে আসছে তার অর্থ হচ্ছে, প্রথম শব্দটাতে যা বোঝায় তা দ্বিতীয় শব্দটাতে যা বোঝায় তার অগ্রবর্তী। কিন্তু কালিক অনুক্রমের[১] জন্য আমরা যদিও এ পদ্ধতি অবলম্বন করতাম, তথাপি অন্য-সব সম্বন্ধের জন্য শব্দের প্রয়োজন আমাদের থেকে যেত, কারণ তাদেরকেও আমরা যদি আমাদের শব্দাবলীর অনুক্রমের (order) সাহায্যে প্রতিগায়িত করতে চাইতাম তাহলে অসহনীয় দ্ব্যর্থকতা দেখা দিত। আমরা যখন বলি "বিদ্যুৎ বজ্রের আগে আসে," তখন তার নিজের অর্থের সঙ্গে 'আগে আসে' (precedes) কথাটার যে সম্বন্ধ সেটা—'বিদ্যুৎ' এবং বজ্র', এ শব্দ দু'টোর সঙ্গে তাদের অর্থের[২] যে সম্বন্ধ, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভিটগেনস্টাইন (Wittgenstein)[৩] বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তা এই যে, আমরা 'বিদ্যুৎ' শব্দটা এবং 'বজ্র' শব্দটার মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করি, অর্থাৎ তাদের মাঝখানে 'আগে আসে' (precedes) শব্দটা থাকার সম্বন্ধ। এভাবেই তিনি সম্বন্ধের সাহায্যে সম্বন্ধের প্রতিগায়ণ আবশ্যক করে তোলেন। কিন্তু এটা যদিও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হতে পারে, তথাপি কথাটা যথেষ্ট অদ্ভুত; এবং সেজন্য, লোকে যে মনে করেছে যে, 'বিদ্যুৎ' যে অর্থে কোন-এক ধরনের ঘটনা বোঝায় ঠিক সেই অর্থে 'আগে আসে' কোন একটা সম্বন্ধ বোঝায় এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নেই। সে যাই হোক, এ মতটা অবশ্যই ভ্রান্ত।

১. Temporal order.
২. অর্থাৎ, এ শব্দ দুটোর উদ্দিষ্ট বস্তুর।
৩. *Tractatus Logico-Philosophicus* (Kegan Paul).

আমি মনে করি যে, সচরাচর এ মতটা পোষণ করা হয়েছে অচেতনভাবে, এবং এর থেকে সম্বন্ধ সম্পর্কে এমন অনেক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে—যেমন, সেইসব বিশৃঙ্খলা যেগুলোর দরুন ব্র্যাডলী (Bradley) সম্বন্ধের নিন্দা করেছিলেন—এ মতটাকে দিনের আলোয় মেলে ধরলে যেগুলো আর টেকে না।

এর সব-কিছুর মধ্যেই, আমি বিবেচনা করছি ভাষার কাঠামো এবং জগতের কাঠামোর মধ্যবর্তী সম্বন্ধের প্রশ্নটা। একথা পরিষ্কার যে, ধাতুরূপ সম্পন্ন (inflected) ভাষায় যা বলা যায়, তার সবকিছু ধাতুরূপহীন ভাষায়ও বলা সম্ভব ; সুতরাং যা-কিছু ভাষার মাধ্যমে বলা যায় তা-ই ধাতুরূপশূন্য শব্দের কালিক অনুক্রমের মাধ্যমে বলা সম্ভব। এর থেকে শব্দের মাধ্যমে যা প্রকাশ করা সম্ভব তার উপর একটা সীমাবদ্ধতা এসে পড়ে। এটা খুবই সম্ভব যে, এমন-সব সত্য আছে যেগুলোকে এই সরল পরিকল্পের (schema) আওতার মধ্যে আনা যায় না ; যদি তাই হয় তাহলে তাদেরকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। ভাষার উপর আমাদের আস্থার কারণটা এই যে, পদার্থিক জগতের মধ্যবর্তী ঘটনাবলী দিয়ে ভাষা তৈরী, এবং সেজন্য পদার্থিক জগতের কাঠামোতে তারও অংশ আছে, এবং সেজন্য সেই কাঠামোকে সে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এমন কোন জগৎ যদি থাকে যা পদার্থিক নয়, অথবা দেশ-কালের মধ্যে নেই, তাহলে তার একটা কাঠামো থাকতে পারে যাকে প্রকাশ করার অথবা জানার আশা আমরা কখনও পোষণ করতে পারি না। এসব বিবেচনা থেকে আমরা কাণ্টীয় অভিজ্ঞতাপূর্বের (Kantian a priori) মত কিছু-একটাতে এসে পৌঁছতে পারি—মনের কাঠামো থেকে প্রাপ্ত হিসাবে নয়, বরং ভাষার কাঠামো, যা পদার্থিক জগতেরই কাঠামো, তার থেকে প্রাপ্ত হিসাবে। সম্ভবতঃ সেজন্যই আমরা পদার্থবিদ্যা এত বেশী জানি এবং অন্য সবকিছু জানি এত অল্প। যাই হোক, আমি মরমীবাদী ধ্যানের মধ্যে ঢুকে পড়েছি ; তবে এসব সম্ভাবনার কথা আমি ছেড়ে দেব, যেহেতু, বিষয়টার প্রকৃতিই এ রকম যে, তাদের সম্পর্কে কোন সত্য কথা 'বলা' (say) আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

অনুমানের বৈধতা

বিজ্ঞানের একটা সাধারণ রেওয়াজ হচ্ছে এমন কতকগুলো সত্যকে (facts) 'উপাত্ত' বলে মনে করা, যেগুলো থেকে রকমারি নিয়ম (laws) এবং আরও অন্যান্য সত্য 'অনুমান' করা হয়। সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম যে, যে-কোন যুক্তিবিদের মতবাদ অনুমানের 'অভ্যাস'টাকে (practice) যতদূর ব্যাপক হিসাবে দেখাতে পারে, সেটা তার চেয়েও অনেক বেশী ব্যাপক, এবং অনুমানের এ অভ্যাসটা অনুষঙ্গ বা 'শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া'-র নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমান অধ্যায়ে, আমি ভেবে দেখতে চাই যুক্তিবিদেরা এই প্রাথমিক রকমের অনুমান থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে কিসের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, এবং যুক্তিসম্পন্ন জীব হিসাবে অনুমান করা চালিয়ে যাওয়ার কি কি কারণ আমাদের আছে। কিন্তু প্রথমে 'উপাত্ত' দ্বারা কি বোঝানো উচিত, সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব একটা পরিষ্কার ধারণা নেওয়া যাক।

'উপাত্ত'-র ধারণাটাকে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট (absolute) করা সম্ভব নয়। তত্ত্বগতভাবে, এর দ্বারা বোঝানো উচিত এমন কিছু-একটা যা আমরা অনুমান ব্যতিরেকে জানি। কিন্তু এর পক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করার পূর্বে, 'জ্ঞান' এবং 'অনুমান' উভয়কেই আমাদের সংজ্ঞায়িত করতে হবে। উভয় পদ দু'টো নিয়েই পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের দিক থেকে, যে জ্ঞান শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে কেবল তার কথা বিবেচনা করলে বিষয়টা আমাদের পক্ষে সহজতর হয়। ২৪শ অধ্যায়ে, কোন শব্দ-বিন্যাস যাতে 'সত্য' হতে পারে তার জন্য যেসব শর্ত আবশ্যক সেগুলো আমরা বিবেচনা করেছিলাম; সুতরাং, আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যগুলোর দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, 'জ্ঞান'-এর অর্থ 'কোন সত্য শব্দ-বিন্যাসকে নিশ্চিতভাবে উক্ত করা"।[১] এ সংজ্ঞাটা সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত নয়, কারণ দৈবক্রমেও একটি লোক নির্ভুল উক্তি

১. "The assertion of a true form of words."

করতে পারে; কিন্তু আমরা এই জটিলতাটুকু উপেক্ষা করতে পারি। তাহলে আমরা নিম্নলিখিতভাবে 'উপাত্ত'-র সংজ্ঞা দিতে পারি: কোন 'উপাত্ত' সেই শব্দ-বিন্যাস যা কোন লোকে কোন উদ্দীপকের ফলস্বরূপ উচ্চারণ করে, কথা বলতে জানার মধ্যে যে শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া রয়েছে তার বাইরে আর কোন শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম ব্যবহার না ক'রে। তবে যে-সব শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের অভিযোজন (adjustments) অথবা নিছক সংবেদনশীলতার বৃদ্ধির মধ্যে নিহিত সেগুলোকে আমাদের অনুমোদন দিতে হবে। এগুলোর ফলে কেবল উপাত্তের প্রতি গ্রহণশীলতার উন্নতি হয়; এগুলোর মধ্যে এমন কিছুই নেই যাকে অনুমান বলা যেতে পারে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাটাকে যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে বাহ্য জগৎ সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের সমুদয় উপাত্ত অবশ্যই প্রত্যক্ষের (percepts) ধর্ম-বিশিষ্ট হবে। বাহ্য বস্তু-সমষ্টিতে আমাদের যে বিশ্বাস তা একটা শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া অর্জিত হয় জীবনের প্রথম মাসগুলোর মধ্যেই, এবং দার্শনিকের কর্তব্য হচ্ছে একে এমন একটা অনুমান বলে মনে করা, যার বৈধতা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখা দরকার। যৎসামান্য বিচারেই ধরা পড়ে যে, যৌক্তিকভাবে, অনুমানটা প্রতিপাদনধর্মী[১] নয়, বরং সেটা বড়জোর সম্ভাব্য (probable)। যৌক্তিকভাবে এটা 'অসম্ভব' নয় যে, আমার জীবনটা একটা দীর্ঘ স্বপ্ন, যার মধ্যে যেসব বস্তুকে আমি আমার বাইরে রয়েছে বলে বিশ্বাস করি সেগুলো কেবল আমার কল্পনা মাত্র। আমরা যদি এ মত প্রত্যাখান করি তাহলে আমাদেরকে সেটা করতে হবে কোন একটা আরোহী অথবা সাদৃশ্যমূলক অনুমানের ভিত্তিতে, যে অনুমান পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আমরা যেভাবে আচরণ করি অন্য লোককেও আমরা তার অনুরূপভাবে আচরণ করতে দেখি, এবং আমরা ধরে নিই যে, তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদ্দীপক রয়েছে। একটা রকেটকে যখন আমরা সশব্দে ফেটে যেতে দেখি, তখন সেই মুহূর্তে একটা গোটা জনতাকেও আমরা হয়তো 'ওহ্' বলতে শুনি, এবং এরূপ মনে করা স্বাভাবিক যে, জনতাও সেটা দেখেছিল। এ ধরনের যুক্তি কেবল যে জীবন্ত প্রাণীর (living organism) মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাও নয়। একটা ডিকটাফোনে

১. Demonstrative.

আমরা কথা বলতে পারি, এবং আমরা যা বলেছিলাম একে দিয়ে পরে তার পুনরাবৃত্তিও করাতে পারি ; এ বিষয়টাকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় যে, আমি যখন কথা বলছিলাম তখন ডিকটাফোনের উপরিভাগে কতকগুলো ঘটনা ঘটেছিলো, এবং আমার কানের বাইরে যে-সব ঘটনা ঘটেছিলো তাদের সঙ্গে এ ঘটনাগুলোর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। এ 'সম্ভাব্যতা' থেকে যায় যে, কোন ডিকটাফোন নেই এবং আমার কোন কান নেই এবং ঝকেটটাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোন জনতাও নেই ; এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে যা ঘটে তা কেবল আমার প্রত্যক্ষ-মাত্র 'হতে পারে'। কিন্তু, তাই যদি হয়, তাহলে কোন কার্যকারণ নিয়মে এসে পৌঁছানো কঠিন, এবং সাদৃশ্যভিত্তিক যুক্তিগুলোকে আমরা যে-রকম বিভ্রান্তিকর বলে মনে করতে চাই তারা তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্তিকর। বস্তুতঃ কাণ্ডজ্ঞানের জগতের মতো বিজ্ঞানের সমুদয় কাঠামোটাকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে তার জন্য প্রয়োজন আরোহ ও সাদৃশ্যানুমানের (analogy) প্রয়োগ। সুতরাং, বিজ্ঞানের জগৎকে অথবা আমাদের নিজস্ব স্বপ্নের বাইরে যে-কোন জগৎকে যদি আমাদের গ্রহণ করতে হয়, তাহলে যে ধরনের অনুমানগুলোকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার সেগুলো এই[১]—সেগুলো অবরোহ নয়।

আরোহের একটা সরল দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক, কার্যতঃ আমরা সকলেই যে আরোহটা সম্পাদন করেছি। ক্ষুধার্ত হলে, আমরা যে-সব জিনিস দেখি তাদের মধ্যে কতকগুলো খাই, এবং অন্যগুলোকে খাই না—বলা যেতে পারে যে, কোন এক রকমের দৃষ্টিগত এবং ঘ্রাণগত প্রতীয়মান রূপ থেকে আরোহী পদ্ধতিতে আমরা ভক্ষণীয়তা অনুমান করি। এ প্রক্রিয়ার ইতিহাসটা এই যে, কয়েকমাস বয়সের শিশুরা তাদেরকে না থামানো পর্যন্ত সব কিছুই মুখে পুরে ; কখনও কখনও তার ফলটা সুখদায়ক এবং কখনও কখনও অসুখদায়ক; পরবর্তীটার পুনরাবৃত্তি না করে তারা বরং পূর্ববর্তীটার পুনরাবৃত্তি করে। অর্থাৎ ঃ যদি দেখা যায় যে, দৃষ্টি ও ঘ্রাণের দিক থেকে কোন-এক রকমের চেহারা-বিশিষ্ট একটা জিনিস খেতে ভাল লাগে তখন নিতান্ত সদৃশ চেহারার অন্য জিনিসও খাওয়া হবে ; কিন্তু যখন খাওয়ার সময় দেখা যায় যে, কোন চেহারা (appearance) অপ্রীতিকর ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত, তখন পরবর্তী সময়ে তার

১. অর্থাৎ, সেগুলো আরোহ ও সাদৃশ্যানুমান। (অনুবাদক)

অনুরূপ কোন চেহারা দেখতে পেলে তা আর খাওয়া হয় না। প্রশ্নটা এই : আমাদের আচরণের সপক্ষে কি (what) যৌক্তিক সমর্থন রয়েছে ? আমাদের সমুদয় অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করা যায়, পাথরের চেয়ে বরং রুটি থেকে আমাদের পক্ষে অধিকতর পুষ্টিলাভের সম্ভাবনা রয়েছে কি ? কি জন্যে আমরা এরূপ চিন্তা করি তা দেখতে পাওয়া সহজ, কিন্তু দার্শনিক হিসাবে এ রকম চিন্তা করাকে আমরা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করতে পারি কি ?

এটা অবশ্য সুস্পষ্ট যে, কোন জিনিস যদি অন্য একটা জিনিসের চিহ্ন না হতো তাহলে বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবন উভয়ই অসম্ভব হয়ে পড়তো। আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে, পড়ার (reading) মধ্যে এ নিয়মটা (principle) সক্রিয়। লোকে মুদ্রিত শব্দগুলোকে চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করে, কিন্তু এ এ কাজটাকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করা যায় কেবল আরোহের মাধ্যমে। আমি এটা বোঝাচ্ছি না যে, অন্য লোকের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আরোহের প্রয়োজন রয়েছে, যদিও আমরা দেখেছি যে, সে কথাও সত্য। তার চেয়েও সরল কিছু-একটা আমি বোঝাচ্ছি। ধরা যাক, আপনি আপনার চুল কাটাতে চান, এবং রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আপনি বিজ্ঞপ্তি দেখতে পান "চুল কাটা, প্রথম তলা"। এ বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রথম তলায় নরসুন্দরের একটা দোকান থাকার কিয়ৎ পরিমাণ সম্ভাব্যতা যে প্রমাণিত হয়, সেটা কেবল আরোহের মাধ্যমেই আপনি 'প্রতিষ্ঠিত' করতে পারেন। আমি এটা বোঝাচ্ছি না যে, আপনি আরোহের সূত্রটা (principle) প্রয়োগ করছেন ; আমি বোঝাচ্ছি যে, সে অনুসারেই আপনি কাজ করছেন, এবং তার কাছেই আপনাকে আবেদন করতে হতো যদি-কিনা আপনার সঙ্গে এমন একজন দীর্ঘ-কেশ সংশয়বাদী দার্শনিক থাকতেন যিনি, উপরের তলায় যাওয়ার মধ্যে যে কোন সার্থকতা আছে সে বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত, সেখানে যেতে অস্বীকার করতেন।

আপাতদৃষ্টিতে, আরোহের সূত্রটা নিম্নরূপ : ধরা যাক দু'রকমের ঘটনা রয়েছে, ক ও খ (যেমন, বিদ্যুৎ আর বজ্র), এবং ধরা যাক এমন অনেক দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে যেগুলোতে ক-জাতীয় একটা ঘটনার অল্প পরেই খ-জাতীয় একটা ঘটনা ঘটেছে, এবং এর বিপরীত কোন দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। তখন হয় এ অনুক্রমের পর্যাপ্ত সংখ্যক দৃষ্টান্ত থেকে অথবা উপযুক্ত

রকমের অন্য কোন দৃষ্টান্ত থেকে এ সম্ভাব্যতা ক্রমে বেড়ে যাবে যে, সর্বক্ষেত্রেই ক-এর পরে খ আসে, এবং কালক্রমে এ সম্ভাব্যতাকে সীমাহীনভাবে নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে দেওয়া যেতে পারে যদি সঠিক রকমের সঠিক সংখ্যক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সূত্রটাকেই আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আরোহের বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলো সাধারণতঃ চায় বহু-সংখ্যক দৃষ্টান্তের জায়গায় সুনির্বাচিত দৃষ্টান্ত এনে বসাতে, এবং দৃষ্টান্তের সংখ্যাকে স্থূল লৌকিক আরোহের অঙ্গ হিসাবে উপস্থিত করতে। কিন্তু বস্তুতঃ লৌকিক আরোহ নির্ভর করে দৃষ্টান্তগুলোর আবেগজনিত আকর্ষণীয়তার (emotional interest) উপর, তাদের সংখ্যার উপর নয়। যে শিশু 'একবার' মোমবাতির শিখায় তার হাত পুড়িয়েছে সে একটা আরোহ প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে আরো বেশী সময় লাগে, যেহেতু প্রথমে তাদের মধ্যে কোন আবেগজনিত আকর্ষণীয়তা থাকে না। অনুশীলনের আদি-পর্যায়ে[১] অনুসৃত নীতিটা হচ্ছেঃ কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক অথবা সুখদায়ক কোন কিছুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে যা-কিছু ঘটে তাই হচ্ছে সেই চিত্তাকর্ষক ঘটনাটার একটা চিহ্ন। আবেগজাত আকর্ষণীয়তার তুলনায় সংখ্যার ভূমিকাটা গৌণ। সেটাই অন্যতম কারণ যে-জন্য যুক্তিপূর্ণ চিন্তা (rational thought) এত কঠিন।

যে-সব দৃষ্টান্তে ক খ-এর আগে ঘটে সেগুলো যদি ঠিকভাবে নির্বাচিত অথবা নিতান্ত বহু-সংখ্যক হয়, তাহলে তাদেরকে জানার ফলে—"খ সর্বদাই ক-এর সঙ্গে (অথবা তার পরে) ঘটে"—এ যুক্তিবাক্যটাকে যে সম্ভাব্য করে তোলা যায়, এটা দেখানোই হচ্ছে আরোহ সম্পর্কিত যৌক্তিক সমস্যা। আরোহের অন্যান্য পর্যালোচনার চেয়ে বহুগুণে উত্তম পর্যালোচনা রয়েছে কীন্স (Keynes) সাহেবের Treatise on Probability-তে। পরলোকগত জাঁ নিকড্-এর[২] *Le probleme logique de l'induction* নামে ডক্টর উপাধির জন্য লিখিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ[৩] আছে, আর. বি. ব্রেথওয়েট Mind-এর অক্টোবর ১৯২০ সংখ্যায় যার যোগ্য সমালোচনা করেছেন। যে ব্যক্তি এ তিনটা লেখা পড়বেন, তিনি আরোহ সম্পর্কে জানা বিষয়ের

১. In primitive practice

২. Jean Nicod.

৩. Doctor's thesis.

অধিকাংশই জেনে ফেলতে পারবেন। বিষয়টা প্রকৌশলধর্মী (technical) ও জটিল, এবং তার মধ্যে গণিতের অনেক-কিছু রয়েছে; কিন্তু আমি ফলাফলের সারাংশটুকু দিতে চেষ্টা করবো।

জে. এস. মিল সমস্যাটাকে যে অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন, আমি তাই নিয়ে শুরু করবো। আরোহের চারটা মূলনীতি (canons) তাঁর ছিল, যাদের সাহায্যে, উপযুক্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলে এবং কার্যকারণ নিয়মটাকে স্বীকার করে নিতে পারলে প্রমাণ করা যেত যে, ক ও খ কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত; অর্থাৎ, কার্যকারণ নিয়মটাকে ধরে নিলে, আরোহের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকে অবরোহে পর্যবসিত করা যেত। মোটামুটিভাবে পদ্ধতিটা এই: আমরা জানি যে, খ-এর অবশ্যই একটা কারণ থাকবে; কারণটা গ অথবা ঘ অথবা ঙ ইত্যাদি হতে পারে না, কারণ পরীক্ষণ অথবা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, এগুলো উপস্থিত অথচ খ ঘটছে না। অপরদিকে, আমরা কখনও দেখতে পাই না যে, ক আছে অথচ খ তার সঙ্গে (অথবা তার পরে) ঘটছে না। যদি ক এবং খ উভয়ই পরিমাপযোগ্য হয় তাহলে আমরা আরো দেখতে পারি যে, ক-এর মাত্রা যখন অপেক্ষাকৃত বেশী তখন খ-এর মাত্রাও অপেক্ষাকৃত বেশী। এ জাতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা ক ছাড়া অন্য সমুদয় সম্ভাব্য কারণগুলোকে বাদ দিই; সুতরাং, যেহেতু খ-এর একটা কারণ না থেকে পারে না, সে কারণটা অবশ্যই হবে ক। প্রকৃতপক্ষে এসব আদৌ আরোহ নয়; সত্যিকার আরোহ আসে কেবল কার্যকারণ নিয়ম প্রমাণের বেলায়। মিল মনে করেন যে, কেবল দৃষ্টান্ত গণনার মাধ্যমেই এ নিয়মটা প্রমাণিত: বিপুল সংখ্যক ঘটনার কথা আমরা জানি যেগুলোর কারণ রয়েছে, এবং এমন কোন ঘটনার কথা আমরা জানি না যাকে কারণবিহীন বলে দেখানো যায়; সুতরাং এটা খুবই সম্ভব যে, সকল ঘটনারই কারণ আছে। কার্যকারণ নিয়মের যে আকার মিল কল্পনা করেছিলেন, ঠিক সে আকার যে তার থাকতে পারে না, এ সত্যটাকে যদি আমরা বিবেচনার মধ্যে না আনি তাহলে এ সমস্যাটা আমাদের থেকে যায়: কেবল দৃষ্টান্তের সংখ্যা থেকে আরোহের একটা ভিত্তি পাওয়া যায় কি? যদি তা না হয়, তাহলে আর কোন ভিত্তি আছে কি? এ সমস্যাটা নিয়েই কীন্‌স্ সাহেব আলোচনা করেন।

কীন্‌স্ সাহেবের মতে, দৃষ্টান্তের সংখ্যা দ্বারা আরোহকে যে আরো সম্ভাব্য করে তোলা যায় তার কারণ কেবল তাদের সংখ্যা নয়, বরং কারণটা এই সম্ভাব্যতা যে, দৃষ্টান্তগুলো যদি নিতান্ত বহু-সংখ্যক হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া সাধারণ হিসাবে তাদের মধ্যে আর কিছুই উপস্থিত থাকবে না। ধরা যাক, আমরা দেখতে চাই ক-নামক একটা গুণ খ-নামক একটা গুণের সঙ্গে সর্বদাই অনুষক্ত কি না। এমন-সব দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই যেগুলোর ক্ষেত্রে একথা সত্য; কিন্তু এমন হতে পারে যে, আমাদের সমুদয় দৃষ্টান্তগুলোতে গ-নামক একটা গুণও উপস্থিত, এবং এই গ-ই খ-এর সঙ্গে অনুষক্ত। আমাদের দৃষ্টান্তগুলোকে আমরা যদি এমনভাবে নির্বাচন করতে পারি যে, ক আর গ নামক গুণ দু'টো ছাড়া আর কিছুই তাদের মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকবে না, তাহলে, ক যে সর্বদাই খ-এর সঙ্গে অনুষক্ত, এ ধারণা পোষণ করার পক্ষে আমরা তার চেয়েও ভাল একটা কারণ পাই। আমাদের দৃষ্টান্তগুলো যদি নিতান্ত বহু-সংখ্যক হয়, তাহলে, যদিও আমরা না 'জানি' (know) যে তাদের মধ্যে আর কোন সাধারণ গুণ নেই, তথাপি এ সম্ভাবনা খুবই বেড়ে যেতে পারে যে, কথাটা সত্য। কীন্‌স্ সাহেবের মতে, বহু-সংখ্যক দৃষ্টান্ত থাকার এ-ই হচ্ছে একমাত্র মূল্য।

কয়েকটা পারিভাষিক শব্দ বেশ কাজে লাগে। ধরা যাক, আরোহের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, এই সার্বিক উক্তিটার (generalisation) অনুকূলে কিয়ৎ পরিমাণ সম্ভাব্যতা রয়েছে: "যা-কিছুর F ধর্মটা আছে তার *f* ধর্মটাও আছে।" এই সার্বিক উক্তিটাকে আমরা বলবো *g*। ধরা যাক আমরা কিছু সংখ্যক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করেছি যেগুলোতে F এবং *f* একই সঙ্গে রয়েছে, এবং এর বিপরীত কোন দৃষ্টান্ত নজরে পড়েনি। এ দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে অন্যান্য সাধারণ ধর্ম থাকতে পারে; তাদের সাধারণ ধর্মগুলোর সমষ্টিকে বলা হয় 'সমুদয় সদর্থক সাদৃশ্য'[১] এবং তাদের 'জ্ঞাত' সাধারণ ধর্মগুলোর সমষ্টিকে বলা হয় 'জ্ঞাত সদর্থক সাদৃশ্য'।[২] যে সব ধর্ম সংশ্লিষ্ট সমুদয় দৃষ্টান্তের মধ্যে না থেকে কতকগুলোর মধ্যে উপস্থিত, তাদেরকে বলা হয় 'নঞর্থক

১. **Total positive analogy.**

২. **Known positive analogy.**

সাদৃশ্য' ঃ[১] তাদের সবগুলোতে মিলে হয় 'সমুদয় নঞর্থক সাদৃশ্য,'[২] যেগুলো জ্ঞাত তাদের সবকটিকে মিলে হয় জ্ঞাত নঞর্থক সাদৃশ্য।[৩] কোন আরোহকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা সদর্থক সাদৃশ্যকে যতদূর সম্ভব হ্রাস করতে চাই ; কীনস্ সাহেবের মতে, এ কারণেই বহু-সংখ্যক দৃষ্টান্ত উপকারী।

যে 'বিশুদ্ধ' আরোহে আমরা দৃষ্টান্তগুলো সাদৃশ্যের উপর কিভাবে কাজ করে তা না জেনে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টান্তের সংখ্যার উপর নির্ভর করি, তার সম্পর্কে উপসংহারে কীন্স্ সাহেব বলেন (পৃঃ ২৩৬) ঃ

"আমরা দেখিয়েছি যে, যদি দৃষ্টান্তগুলোর প্রতিটিকে সার্বিক সিদ্ধান্তটা (generalisation) থেকে অপরিহার্যভাবে অনুমান করা যায়, তাহলে প্রত্যেক অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত সার্বিক সিদ্ধান্তটার সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলোর জ্ঞান থেকে নিশ্চয়তার সঙ্গে নতুন দৃষ্টান্তকে পূর্বানুমান করা (predict) সম্ভব না হয়।… সুতরাং, নিয়ম (law) অথবা কার্য-কারণের ধারণার প্রতি কোন আবেদন না জানিয়েই, এই সাধারণ ধারণাটাকে আকারগতভাবে প্রমাণ করা হলো যে কোন সংশয়পূর্ণ সূত্রের প্রতিটি আনুক্রমিক পরখ তার শক্তি বৃদ্ধি করে। 'কিন্তু আমরা প্রমাণ করিনি' যে, এ সম্ভাব্যতার সীমা হিসাবে নিশ্চয়তার (certainty) দিকে এগিয়ে যায় ; অথবা, এমন-কি এটাও আমরা প্রমাণ করিনি যে, পরখ কিংবা দৃষ্টান্তের সংখ্যা অনির্দিষ্টভাবে বেড়ে যেতে থাকলে আমাদের সিদ্ধান্তটা আরো সম্ভাব্য হয়ে ওঠে।"

একথা অতি স্পষ্ট যে, আরোহ খুব উপকারে আসে না, যদি-না উপযুক্ত যত্ন সহকারে এর সিদ্ধান্তগুলোর মিথ্যা হওয়ার চেয়ে বরং সত্য হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা কীন্স্ সাহেবের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। দেখা গিয়েছে যে, আরোহ তার সীমা হিসাবে নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাবে যদি দু'টো শর্ত পূরণ করা হয় ঃ

১. Negative analogy.

২. Total negative analogy.

৩. Known negative analogy.

১. যদি সার্বিক সিদ্ধান্তটা মিথ্যা হয় তাহলে, যখন সেটাকে কিছু-সংখ্যক দৃষ্টান্তের মধ্যে সত্য বলে দেখা গেছে তখন এ দৃষ্টান্তগুলোর সংখ্যা যত বড়োই হোক না কেন, কোন নতুন দৃষ্টান্তে তার সত্য হওয়ার সম্ভাব্যতা একটা সসীম পরিমাণে নিশ্চয়তা থেকে ন্যূন হয়।

২. আমাদের সার্বিক সিদ্ধান্তটার অনুকূলে একটা সসীম অভিজ্ঞতাপূর্ব সম্ভাব্যতা থাকে।

কীন্‌স্ সাহেব এখানে 'সসীম'-কে (finite) ব্যবহার করছেন একটা বিশেষ অর্থে। তিনি মনে করেন যে, সব সম্ভাব্যতাই সংখ্যার দ্বারা পরিমাপ-যোগ্য নয়; একটা 'সসীম' সম্ভাব্যতা হচ্ছে সেই সম্ভাব্যতা যা সংখ্যার দ্বারা পরিমাপযোগ্য কোন সম্ভাব্যতাকে ছাড়িয়ে যায়, সে সম্ভাব্যতা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সার্বিক সিদ্ধান্তের একটা সসীম অভিজ্ঞতাপূর্ব সম্ভাব্যতা থাকে, যদি কোন মুদ্রাকে শতকোটি বার নিক্ষেপ করলেও প্রতিবারই তার মাথার দিকটা উপরে থাকার যে অসম্ভাব্যতা, ওই সিদ্ধান্তের অসম্ভাব্যতা তার চেয়ে কম হয়।

তবে অসুবিধাটা এই যে, কোন সার্বিক সিদ্ধান্তের অভিজ্ঞতাপূর্ব সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের কোন উপায় সহজে চোখে পড়ে না। এ সমস্যাটাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে কীন্‌স্ সাহেব একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রাকস্বীকার্যে (postulate) এসে পৌঁছেন, এবং, তাঁর মতে, সেটা যদি সত্য হয় তাহলে তার থেকে প্রয়োজনীয় সসীম অভিজ্ঞতাপূর্ব সম্ভাব্যতাটা পাওয়া যাবে। তাঁর প্রাকস্বীকার্যটাকে যে আকারে তিনি উপস্থিত করেন সে আকারে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়, তবে আমি প্রথমে তাঁর দেওয়া আকারটা বর্ণনা করবো এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটুকু উল্লেখ করবো তার পর।

কীন্‌স্ সাহেব মনে করেন যে, বস্তুর গুণগুলো পুঞ্জাকারে একসঙ্গে থাকে যার ফলে মোট-সংখ্যক গুণের চেয়ে 'স্বতন্ত্র' (independent) গুণগুলোর সংখ্যা অনেক ছোট। জৈবিক প্রজাতির উপমা ব্যবহার করে আমরা এ বিষয়টা চিন্তা করতে পারি: বিড়ালের কতকগুলো পার্থক্যসূচক (distinctive) গুণ আছে যেগুলো সকল বিড়ালের মধ্যেই দেখা যায়, কুকুরের অন্য কতকগুলো পার্থক্যসূচক গুণ আছে যেগুলো সকল কুকুরের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি

বলেন, আরোহী পদ্ধতিকে যুক্তিসিদ্ধ করা যায় যদি আমরা ধরে নিই যে, "ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী যে-সব বস্তুতে আমাদের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলো প্রযোজ্য, তাদের মধ্যে অসীম-সংখ্যক স্বতন্ত্র গুণ নেই; অন্যকথায়, তাদের বৈশিষ্ট্য-গুলোর সংখ্যা যতই বড় হোক না কেন, তারা অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধ-বিশিষ্ট পুঞ্জের মধ্যে এক সঙ্গে থাকে, যে পুঞ্জগুলোর সংখ্যা সসীম" (পৃঃ ২৫৬)। আবার (পৃ. ২৫৮): "সুতরাং, সাদৃশ্যানুমানের[1] যৌক্তিক ভিত্তি হিসাবে আমাদের এ ধরনের একটা পূর্বস্বীকৃতির[2] প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় যে, বিশ্বজগতে বৈচিত্রের পরিমাণ এমন ভাবে সীমিত যে, এমন কোন-একটা বস্তু নেই যা এত জটিল যে, তার গুণগুলো অসীম-সংখ্যক স্বতন্ত্র পুঞ্জে বিভক্ত হয়ে থাকে ··· অথবা যে-সব বস্তু সম্পর্কে আমরা সার্বিক সিদ্ধান্ত করি তাদের কোনটাই এ রকম জটিল নয়; অথবা অন্ততঃ, যদিও কতকগুলো বস্তুর মধ্যে অনন্ত জটিলতা থাকতে পারে তথাপি কখনও কখনও আমরা এই সসীম সম্ভাব্যতাটার সাক্ষাৎ পাই যে, যে-বস্তুটার সম্পর্কে আমরা সাধারণ সিদ্ধান্ত করতে চাই তার মধ্যে অনন্ত জটিলতা নেই।"

এই প্রাকস্বীকার্যটাকে বলা হয় "বৈচিত্রের সীমাবদ্ধতার সূত্র"। কীন্‌স্ সাহেব আবার দেখতে পান যে, পরিসংখ্যানের সাহায্যে কোন নিয়ম (laws) প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলে এর প্রয়োজন পড়ে; তাঁর কথাটা যদি ঠিক হয় তাহলে বিশুদ্ধ গণিতের বাইরে আমাদের সমুদয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। জাঁ নিকড[3] দেখিয়েছিলেন যে, এর মধ্যে ঠিক যথেষ্ট কড়াকড়ি নেই। কীন্‌স্ সাহেবের মতে, আমাদের প্রয়োজন এই সসীম সম্ভাব্যতাটা যে, উদ্দিষ্ট বস্তুটার কেবল-মাত্র সীমিত-সংখ্যক স্বতন্ত্র গুণ রয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই সীমিত সম্ভাব্যতা যে, এর স্বতন্ত্র গুণগুলোর সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট (assigned) সসীম সংখ্যার চেয়ে কম। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে, এটা নিতান্ত একটা ভিন্ন জিনিস। ধরা যাক এমন একটা সংখ্যা আছে যার সম্বন্ধে আমরা কেবল এই জানি যে এটা সসীম; এ অসম্ভাব্যতা অন্তহীন যে, সংখ্যাটা

১. Analogy.
২. Assumption.
৩. Jean Nicod.

এক মিলিয়ন, অথবা এক বিলিয়ন, অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম হবে, কারণ, এ রকম যে সংখ্যাই নিই না কেন. ক্ষুদ্রতর সংখ্যাগুলোর সংখ্যা সসীম এবং বৃহত্তর সংখ্যাগুলোর সংখ্যা অসীম। নিকডের মতানুসারে আমাদেরকে ধরে নিতে হয় যে, এমন একটা সসীম সংখ্যা n রয়েছে যে, আমাদের বস্তুটার স্বাধীন গুণগুলোর সংখ্যা যে n-এর চেয়ে কম হবে সে বিষয়ে সীমিত সম্ভাব্যতা রয়েছে। কীন্‌স্ সাহেবের পূর্বস্বীকৃতিটা কেবল এই যে, স্বতন্ত্র গুণগুলোর সংখ্যা সসীম—এর চেয়ে ওই পূর্বস্বীকৃতিটা অনেক বেশী জোরালো। আরোহকে যুক্তিসিদ্ধ করতে হলে এই অধিকতর জোরালো পূর্বস্বীকৃতিটারই প্রয়োজন।

এ সিদ্ধান্তটা (result) অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের ধারার সঙ্গে এটা সঙ্গতিপূর্ণ। এডিংটন (Eddington) দেখিয়েছেন যে, বিশ্বের মধ্যে এমন একটা সসীম সংখ্যা আছে যা মৌলিক, অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা। কোয়াণ্টাম মতবাদ অনুসারে মনে হতে পারে যে, ইলেক্‌ট্রনের সম্ভাব্য বিন্যাসগুলোর (arrangements) সংখ্যাটাও বেশ সসীম হতে পারে, যেহেতু তারা সকল সম্ভাব্য কক্ষপথে চলতে পারে না, কেবল সে-রকম কক্ষপথে পারে যার দরুন একটা পূর্ণ আবর্তনের ক্রিয়াকে কোয়াণ্টাম সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। এসব যদি সত্য হয় তাহলে বৈচিত্র্যের সীমাবদ্ধতার সূত্রটাও বেশ সত্য হতে পারে। তবে এভাবে আমাদের সূত্রের কোন প্রমাণ আমরা পেতে পারি না, কারণ পদার্থবিদ্যা আরোহকে কাজে লাগায়, এবং সেজন্য সূত্রটা যদি সত্য না হয় তাহলে পদার্থবিদ্যা অবৈধ। সাধারণভাবে আমরা যা বলতে পারি তা এই যে, সূত্রটা আত্ম-খণ্ডনকারী নয়, বরং পক্ষান্তরে তার থেকে এমন ফলফল পাওয়া যায় যা তাকে দৃঢ়-প্রমাণিত করে। এটুকু পর্যন্ত মনে করা যেতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের ধারা সূত্রটার সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বিজ্ঞানে সম্ভাব্যতার মৌলিক স্থান অনুধাবন করার গুরুত্ব রয়েছে। আরোহ ও সাদৃশ্যানুমান (analogy) থেকে, বড়জোর, কেবল সম্ভাব্যতা পাওয়া যায়। অনুমান-পদবাচ্য প্রত্যেক অনুমানই আরোহী, সুতরাং সমস্ত অনুমিত জ্ঞান বড়জোর সম্ভাব্য। সম্ভাব্যতা বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে মতানৈক্য

রয়েছে। কীন্‌স্ সাহেব একে একটা মূলগত যৌক্তিক ক্যাটেগরি বলে মনে করেন ঃ কতকগুলো হেতুবাক্য একটা সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত না করে অল্প-বিস্তর সম্ভাব্য করতে পারে। তাঁর মতে, সম্ভাব্যতা একটা হেতুবাক্য ও একটা সিদ্ধান্তের মধ্যবর্তী সম্পর্ক। কোন যুক্তিবাক্যের মধ্যে তার নিজস্ব গুণ-বলে সুনির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা থাকে না ; নিজ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, এ কেবল সত্য অথবা মিথ্যা। কিন্তু বিভিন্ন হেতুবাক্যের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে এর মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ সম্ভাব্যতা থাকে। যখন সংক্ষেপে আমরা কোন যুক্তিবাক্যের নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতার[১] কথা বলি তখন আমাদের সমুদয় প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে এর সম্ভাব্যতা বোঝাই। সম্ভাব্যতা-যুক্ত কোন যুক্তিবাক্যকে নিছক নিরীক্ষণের মাধ্যমে খণ্ডন করা যায় না ঃ অসম্ভাব্য জিনিস ঘটতে পারে এবং সম্ভাব্য জিনিস না-ও ঘটতে পারে। এ-ও সত্য নয় যে, কোন প্রদত্ত সাক্ষ্যের[২] ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সম্ভাব্যতার পরিমাপ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যখন পরবর্তী অতিরিক্ত সাক্ষ্য সম্ভাব্যতাটাকে পরিবর্তিত করে দেয়।

এ কারণে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরোহের সূত্রটাকে প্রমাণ অথবা অপ্রমাণ করা যায় না। আমরা বৈধভাবে প্রমাণ করতে পারি যে, এই-এই রকমের একটা সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্ভাব্যতা রয়েছে প্রচুর, কিন্তু (and) তথাপি এটা না-ও ঘটতে পারে। অবৈধভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, এটা সম্ভাব্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ঘটতে পারে। যা ঘটে তার ফলে কোন যুক্তিবাক্যের সম্ভাব্যতা পরিবর্তিত হয়, যেহেতু ঘটনাটা প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য ; কিন্তু পূর্বে-লভ্য সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল সম্ভাব্যতা কখনও তার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। কাজেই, কীন্‌স্ সাহেবের মতবাদ অনুসারে, সম্ভাব্যতার সমুদয় বিষয়টা সঠিক অর্থে অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori), অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল নয়।

তবে 'পৌনঃপুনিকতা মতবাদ' (frequency theory) নামে আরেকটা মতবাদ আছে যার মধ্যে সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব নয়, এবং নির্দিষ্ট

১. 'the probability'.
২. given evidence.

হেতুবাক্যের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে সম্ভাব্যতার যে পরিমাপ আমরা করি, অভিজ্ঞতালব্ধ সাক্ষ্য তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। এ মতবাদের স্থূল আকার অনুসারে, F গুণবিশিষ্ট কোন বস্তুর পক্ষে f গুণ থাকার সম্ভাব্যতা হচ্ছে উভয় গুণবিশিষ্ট বস্তুগুলো এবং F-গুণবিশিষ্ট সমুদয় বস্তুর অনুপাত মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, যে দেশে এক বিবাহ প্রচলিত সে রকম কোন দেশে কোন বিবাহিত লোকের পক্ষে পুরুষ জাতীয় হওয়ার সম্ভাব্যতা ঠিক অর্ধেক। তাঁর বইটা লেখার সময় এ মতবাদের যতগুলো রূপ প্রচলিত ছিল তাদের সব ক'টার বিরুদ্ধে কীন্‌স্ সাহেব জোরালো যুক্তি উপস্থিত করেছেন। তবে ১৯২৬-এর জানুয়ারীর Mind-এ "সম্ভাব্যতার ভিত্তিমালা"-র উপর আর. এইচ. নিসবেট (Nisbet)-এর একটা প্রবন্ধ আছে যার লক্ষ্য পৌনঃপুনিকতা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর যুক্তিগুলো চিত্তাকর্ষক এবং এটুকু দেখাবার পক্ষে যথেষ্ট যে, বিতর্কটা এখনও অমীমাংসিত, কিন্তু আমার মতে তাদেরকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলা যায় না। সে যাই হোক, লক্ষ্য করা দরকার যে, পৌনঃপুনিকতা মতবাদকে যদি রক্ষা করা যেত তাহলে সেটা কীন্‌স্ সাহেবের মতবাদের চেয়ে পছন্দসই হতো, কারণ সম্ভাব্যতাকে অসংজ্ঞেয় বলে মনে করার আবশ্যকতা তার মধ্যে থাকতো না, এবং যা প্রকৃতপক্ষে ঘটে সম্ভাব্যতাকে সে তার আরো অনেক ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসতো। কীন্‌স্ সাহেব সম্ভাব্যতা এবং ফ্যাক্ট-এর মধ্যে একটা অস্বস্তিকর ব্যবধান রেখে দেন, যে-জন্যে কোন যুক্তিসম্পন্ন লোক যে কেন সম্ভাব্যতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কাজ করবে তা মোটেই পরিষ্কার নয়। তা সত্ত্বেও পৌনঃপুনিকতা মতবাদের অসুবিধাগুলো এত বেশী যে, সুনিশ্চিতভাবে আমি এর পক্ষ সমর্থন করার সাহস পাই না। ইতিমধ্যে এই মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা যে মতই অবলম্বন করি না কেন, আলোচনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। এবং এ মতদ্বয়ের যে-কোনটাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, যে-সব আরোহী ও সাদৃশ্যমূলক অনুমানের উপর বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবন নির্ভরশীল, তাদেরকে বৈধতা দিতে হলে বৈচিত্র্যের সীমাবদ্ধতার নীতি সমভাবে আবশ্যক হবে।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

ঘটনা, জড় ও মন

জগতের মধ্যে প্রতিটি জিনিস 'ঘটনা' দিয়ে তৈরী; আমি অন্ততঃ এ-মত পোষণ করতে চাই। আমি যেমন বুঝি, একটা 'ঘটনা' হচ্ছে সেই জিনিস যার একটা ক্ষুদ্র সসীম স্থায়িত্ব এবং দেশের (space) মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সসীম বিস্তার আছে; অথবা, আপেক্ষিকবাদের আলোকে বলা যায়, এটা এমন একটা-কিছু যা দেশ-কালের একটা ক্ষুদ্র সসীম পরিমাণ জুড়ে থাকে। যদি এর অংশ থাকে তাহলে আমি বলবো, এই অংশগুলোও আবার ঘটনা; কখনও অংশগুলো, দেশে অথবা কালে অথবা দেশ-কালে, নিছক একটা বিন্দু কিংবা মুহূর্ত জুড়ে থাকে না। একটা ঘটনা যে দেশ-কালের একটা সসীম পরিমাণ জুড়ে থাকে, এ সত্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, এর মধ্যে অংশ রয়েছে। জড়কে যে রকম অভেদ্য মনে করা হয়, ঘটনাগুলো তেমন নয়; বিপরীতক্রমে, দেশ-কালের মধ্যে প্রতিটি ঘটনার প্রান্তভাগের উপর উপর্যুপরি-ভাবে থাকে অন্য ঘটনাগুলো। যে সব ঘটনার সঙ্গে আমরা পরিচিত তাদের কোন একটার মধ্যে সীমাহীন জটিলতা আছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই; পক্ষান্তরে, জগৎ সম্পর্কে যা-কিছু আমরা জানি তা এ-মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, প্রতিটি জটিল ঘটনার সসীম-সংখ্যক অংশ আছে। আমরা জানি না যে এটা সত্য, কিন্তু এটা এমন একটা প্রকল্প যাকে খণ্ডন করা যায় না, এবং অন্য যে-কোন সম্ভাব্য প্রকল্প থেকে এ অধিকতর সরল। সুতরাং, পরবর্তী আলোচনার মধ্যে একে আমি একটা সাময়িক প্রকল্প (working hypothesis) হিসাবে গ্রহণ করবো।

আমি যখন 'ঘটনা'-র কথা বলি তখন অপ্রচলিত কোন-কিছু আমি বোঝাই না। কোন একটা বিদ্যুৎ ঝলক দেখা একটা ঘটনা; তেমনি কোন চাকা ফাটার শব্দ শোনা, অথবা পচা ডিমের গন্ধ শোঁকা, অথবা কোন ব্যাঙের শীতলতা অনুভব করা। ২৫শ অধ্যায়ের অর্থে এই ঘটনাগুলো 'উপাত্ত' (data); কিন্তু, সেই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত সূত্রাবলী অনুসারে, আমরা অনুমান করি যে, এমন সব ঘটনা আছে যেগুলো উপাত্ত নয় এবং যেগুলো

আমাদের দেহ থেকে দূরে ঘটে। এদের কতকগুলো অন্য লোকের কাছে উপাত্ত, অন্যগুলো কারো কাছে উপাত্ত নয়। বিদ্যুৎ ঝলকটার ক্ষেত্রে রয়েছে এমন একটা বিদ্যুৎ-চৌম্বক আন্দোলন[১] যা সেই-সব ঘটনা দিয়ে তৈরী যেগুলো, যে-স্থানে বিদ্যুৎ ঝলকটা ঘটছে, সে-স্থান থেকে বাইরের দিকে সরে যায়; এবং দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর চোখে গিয়ে যখন সে আন্দোলনটা পৌঁছে তখন একটা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়, যে প্রত্যক্ষটা, বিদ্যুৎ ঝলকের স্থান এবং প্রত্যক্ষণকারীর দেহের অন্তর্বর্তী ঘটনাগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত। যে-সব ঘটনা প্রত্যক্ষ (percept) নয় সেগুলোকে যে-ক্ষেত্রেই অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, সে-সব ক্ষেত্রে সে অনুমানের যৌক্তিক হেতুবাক্যগুলো পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ থেকে। বিশেষ বিশেষ রঙ এবং শব্দ ইত্যাদি ঘটনা; জড় (inanimate) জগতে তাদের কারণিক পূর্বগগুলোও ঘটনা।

আমার প্রস্তাব অনুসারে আমরা যদি ধরে নিই যে, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে কেবল সসীম-সংখ্যক অংশ রয়েছে তাহলে প্রতিটি ঘটনা এমন সসীম-সংখ্যক ঘটনার দ্বারা তৈরী হবে যেগুলোর মধ্যে কোন অংশ নেই। এ ধরনের ঘটনাগুলোকে আমি বলবো 'ন্যূনতম ঘটনা' (minimal events)। তাদেরকে ধরে নিলে আমাদের আলোচনা সহজ হবে, কিন্তু সামান্য বাকচাতুরীর আশ্রয় নিলেই এ পূর্বধারণাকে বাদ দেওয়া যেত। সুতরাং পাঠক যেন একে পরবর্তী আলোচনার একটা অপরিহার্য অংশ বলে মনে না করেন।

একটা ন্যূনতম ঘটনা দেশ-কালের মধ্যে একটা সসীম অঞ্চল (finite region) দখল করে থাকে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য কেবল সময়ের কথা বলা যাক। সময়ের দিক থেকে আলোচ্য ঘটনাটা অন্য দুটো ঘটনার প্রতিটিকে উপর্যুপরিভাবে স্পর্শ (overlap) করতে পারে, যদিও এই অন্য ঘটনা দুটোর প্রথমটা সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয়টার আগে আসে; যেমন, পিয়ানোতে দুটো হ্রস্ব স্বর শোনার সময় আপনি বেহালায় একটা দীর্ঘ স্বর শুনতে পারেন। (এগুলো যে বাস্তবিকই ন্যূনতম ঘটনা সেরূপ মনে করার প্রয়োজন নেই; আমি কেবল যা বোঝানো হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত দিতে চাচ্ছি।) আমি মনে

১. Electromagnetic disturbance.

করি (assume) যে, প্রত্যেক ঘটনাই এমন-সব ঘটনার সমসাময়িক যেগুলো পরস্পরের সমসাময়িক নয়; প্রত্যেক ঘটনা একটা সীমাবদ্ধ কাল ধরে টিকে থাকে, এ কথার দ্বারা এটাই বোঝানো হয়, এবং পাঠক এ বিষয়ে সহজেই নিঃসংশয় হতে পারেন যদি তিনি স্মরণ করেন যে, সময় সম্পূর্ণ-ভাবে আপেক্ষিক। এক মুহূর্তের জন্য আমরা যদি পদার্থবিদ্যার জগৎ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিই, এবং নিজেদেরকে একজন (one) মানুষের অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি, তাহলে সহজেই আমরা তার জীবনের একটা 'মুহূর্ত'-এর (instant) সংজ্ঞা দিতে পারি। সেটা হবে একটা ঘটনাপুঞ্জ,[১] যার সব-ক'টি ঘটনাই তার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত, এবং এ ঘটনাগুলোর নিম্নলিখিত দু'টো গুণ রয়েছে: (১) ঘটনাগুলোর যে-কোন দু'টো উপর্যুপরি-ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করে, (২) পুঞ্জটার বাইরের কোন ঘটনাপুঞ্জের প্রতিটি সদস্যকে উপর্যুপরিভাবে স্পর্শ করে না। এর চেয়ে কিঞ্চিৎ জটিলতর কিন্তু মূলতঃ একই-রূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা দেশ কালের মধ্যবর্তী একটা বিন্দু-মুহূর্তকে[২] এই বলে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে, এটা এমন দু'টো গুণ বিশিষ্ট একটা ঘটনাপুঞ্জ যে গুণগুলো, একটি-মাত্র জীবনেতিহাসের (biography) মধ্যবর্তী 'মুহূর্ত'-কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে এইমাত্র যে গুণগুলো ব্যবহার করা হলো, তাদের সদৃশ।[৩] কাজেই যে 'বিন্দু' (অথবা বিন্দু-মুহূর্ত) গাণিতিকের পক্ষে আবশ্যক সেগুলো সরল নয়, বরং সেগুলো ঘটনার দ্বারা গঠিত এমন-সব কাঠামো যেগুলো গাণিতিকের সুবিধার্থে তৈরী। এমন অনেক 'বিন্দু' দেখা দেবে, কোন নির্দিষ্ট ন্যূনতম ঘটনা যার একটা অংশ (member); সে ঘটনা দেশ-কালের যে অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছে সেটা এ বিন্দুগুলোর সব-ক'টা দিয়ে তৈরী। দেশ-কাল বিন্দুর[৪] মতো দেশ-কাল বিন্যাসও[৫] ঘটনাসমূহের মধ্যবর্তী সম্বন্ধের ফল।

দেশ-কাল বিন্দুর মতো, একটা জড় খণ্ডকেও গঠন করতে হবে ঘটনা দিয়ে, কিন্তু সে সংগঠন তার চেয়ে বেশ জটিল, এবং শেষ পর্যন্ত, প্রকৃতপক্ষে

১. Group of events.
২. Point-instant.
৩. বর্তমান গ্রন্থকারের The Analysis of Matter, ২৮শ অধ্যায় দেখুন।
৪. Space-time points.
৫. Space-time order.

যা ঘটছে বলে পদার্থবিদরা মনে করেন, সেটা কেবল তার কাছাকাছি যেতে পারে। বর্তমানে, জড় সম্পর্কে কতকটা ভিন্ন রকমের দুটো মত আছে, যাদের একটা আণবিক সংগঠন সম্পর্কিত অনুসন্ধানের পক্ষে উপযোগী, এবং অপরটা উপযোগী মাধ্যাকর্ষণের একটা ব্যাখ্যা হিসেবে সাধারণ আপেক্ষিক-বাদের পক্ষে। আণবিক সংগঠনের পক্ষে উপযোগী মতটার নিজেরই দু'টো রূপ আছে, একটা হাইজেনবার্গ থেকে পাওয়া, অপরটা ন্ত-ব্রগলি ও শ্রডিংগারের[১] কাছ থেকে। সত্য বটে যে, এ রূপ দু'টো গাণিতিকভাবে সমতুল্য (equivalent), কিন্তু শব্দের দিক থেকে তারা নিতান্ত ভিন্ন। হাইজেনবার্গ একটা জড় খণ্ডকে মনে করেন এমন একটা কেন্দ্র হিসাবে যার থেকে বিকিরণ বহির্দিকে বেরিয়ে আসে; বিকিরণগুলো বাস্তবিকই ঘটে বলে মনে করা হয়, কিন্তু তাদের কেন্দ্রবর্তী জড় পর্যবসিত হয় নিছক একটা গাণিতিক রূপকথায় (fiction)। উদাহরণস্বরূপ, বিকিরণগুলো থেকে আলোর সৃষ্টি; তাদের সবগুলোই ঘটনাতন্ত্র[২] হিসাবে স্বীকৃত, 'দ্রব্য'-এর (substance) অবস্থা অথবা সম্বন্ধের মধ্যবর্তী পরিবর্তন হিসাবে নয়। ন্ত-ব্রগলি-শ্রডিংগার মতবাদে জড় তৈরী তরঙ্গগতি দিয়ে। এ তরঙ্গগতিগুলো সম্পর্কে তাদের গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া আর কিছুই পূর্ব-স্বীকৃত হিসেবে ধরে নেওয়া মতবাদটার পক্ষে আবশ্যক নয়, কিন্তু এটা অতি স্পষ্ট কথা যে, যেহেতু তাদেরকে জড়ের ব্যাখ্যা দিতে হয়, সুতরাং তারা যদি জড়ের গতি দিয়ে তৈরী হয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্য তারা সাধন করতে পারে না। কাজেই, এ মতবাদেও জড়কে আমাদের গঠন করতে হয় এমন ঘটনাতন্ত্র দিয়ে যেগুলো কেবল ঘটে মাত্র, কিন্তু জড় অথবা অন্য কিছুর 'প্রসঙ্গে' ঘটে না।[৩]

সাধারণ আপেক্ষিকবাদের ব্যাখ্যা অনুসারে মাধ্যাকর্ষণ পর্যবসিত হয় দেশ-কালের মধ্যবর্তী 'কুঞ্চন'-এ (crinkles)। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, দেশ-কাল ঘটনা দিয়ে তৈরী একটা তন্ত্র (system), এবং সেজন্য এর ভেতরকার 'কুঞ্চনগুলো'ও ঘটনা থেকে পাওয়া। যে স্থানে 'কুঞ্চন'-টা সবচেয়ে

১. De Broglie and Schrodinger.
২. System of events.
৩. 'Which just happen, and do not happen "to" matter or "to" anything else.'

বেশী কুঞ্চনময় সেখানে কোন 'বস্তু' (thing) আছে মনে করার কোন কারণ নেই। অতএব পদার্থবিদ্যার এ অংশেও জড় আর 'বস্তু' নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে ঘটনা দিয়ে তৈরী জটিল যৌক্তিক সংগঠনের (structures) মধ্যবর্তী সম্বন্ধগুলোর একটা গাণিতিক বৈশিষ্ট্য মাত্র।

পরম্পরাগতভাবে দ্রব্যের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তার স্থায়িত্ব (permanence), এবং জড় তার দ্রব্যত্ব হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও বেশ পরিমাণে এ বৈশিষ্ট্যটা বজায় রেখেছে। কিন্তু এখন তার স্থায়িত্ব কেবল সত্যিকার স্থায়িত্বের কাছাকাছি মাত্র, পূর্ণাঙ্গ নয়। মনে করা হয়ে থাকে যে, একটা ইলেক্‌ট্রন ও একটা প্রোটন মিলিত হতে এবং পরস্পরকে ধ্বংস করতে পারে; তারাগুলোর মধ্যে এটা প্রচুর পরিমাণে ঘটছে বলে মনে করা হয়।[১] এবং যখন একটা ইলেক্‌ট্রন বা প্রোটন স্থায়ী হয় তখনও তার স্থায়িত্ব, ইতিপূর্বে জড়ের প্রতি যে স্থায়িত্ব আরোপ করা হতো, তার থেকে ভিন্ন। সাগরের মধ্যে একটা তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত বেশী অথবা কম সময় ধরে চলতে থাকে: কর্ণওয়ালীয় (Cornish) সৈকতে যে তরঙ্গগুলোকে আমি আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে পড়তে দেখি সেগুলো হয়তো ব্রাজিল থেকে সমস্ত পথ অতিক্রম করে এসেছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, একটা 'বস্তু' (thing) আটলান্টিক পার হয়ে এসেছে; এর অর্থ কেবল এই যে, একটা পরিবর্তন-প্রক্রিয়া পথ অতিক্রম করে এসেছে। এবং ঠিক যেমন সাগরের মধ্যে একটা তরঙ্গ শেষ পর্যন্ত শিলাখণ্ডের উপরে এসে বিপদে পড়ে, তেমনি একটা ইলেক্‌ট্রন বা প্রোটন কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বিপদে পড়তে পারে।

এইভাবে সাম্প্রতিক পদার্থবিদ্যার ফলস্বরূপ খুব নিশ্চিতভাবেই জগতের মধ্যে 'জড়'-এর আসন নীচে নেমে এসেছে। আগে সে ছিল আমাদের সংবেদনসমূহের কারণ: ডঃ জনসন বার্কলির জড়ের অস্বীকৃতিকে 'অপ্রমাণ করেছিলেন' একটা প্রস্তরখণ্ডে লাথি মেরে। তিনি যদি জানতেন যে, তাঁর পা কখনোই পাথরটাকে স্পর্শ করেনি, এবং উভয়ই কেবল তরঙ্গ-গতির জটিল বিন্যাস (systems) মাত্র ছিল, তাহলে তাঁর খণ্ডন নিয়ে তিনি হয়তো তার চেয়ে কম সন্তুষ্ট হতেন। আমরা বলতে পারি না যে, 'জড়' আমাদের

১. এডিংটনের Stars and Atoms, পৃঃ ১০২ দেখুন।

সংবেদনের কারণ। আমরা বলতে পারি যে, যেসব ঘটনা আমাদের সংবেদনের কারণ সেগুলো সচরাচর সেই রকম পুঞ্জের (groups) অন্তর্ভুক্ত হয় যেগুলোকে পদার্থবিদেরা জড় (material) বলে মনে করেন; কিন্তু সেটা নিতান্ত ভিন্ন জিনিস। অভেদ্যতা ছিল জড়ের একটা সমুন্নত গুণ, এক ধরনের স্বাধীনতা ঘোষণা[১]; এখন জড়কে যে-ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, অভেদ্যতা কেবল তার একটা পুনরুক্তিমূলক ফলাফল[২] মাত্র। যে ঘটনা-গুলো জগতের প্রকৃত উপাদান (stuff) সেগুলো অভেদ্য নয়, যেহেতু সেগুলো দেশ-কালের মধ্যে অংশতঃ পরস্পরের উপর অবস্থান করতে পারে। এক কথায় জড় এখন আর ঘটনা সংক্রান্ত কতকগুলো কার্যকারণ নিয়ম উল্লেখ করার একটা সুবিধাজনক সংকেতলিপি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

কিন্তু জড়ের ভাগ্যে যদি মন্দ কিছু ঘটে থাকে, মনের ভাগ্যে তার চেয়ে ভাল কিছু ঘটেনি। 'মানসিক' (mental) নামক বিশেষণটার কোন সঠিক তাৎপর্য থাকতে পারে না। সত্য বটে, এক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো ঘটনা আছে—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ (percepts)—যাদের সবগুলোকে 'মানসিক' বলা যায়। কিন্তু যদিও প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন 'মানসিক' ঘটনা নেই বললে তা স্বেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক হবে, তথাপি অন্য আর কি ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তা নির্ণয় করার জন্য উপযুক্ত কোন সূত্র খুঁজে পাওয়াও কঠিন। সম্ভবতঃ মনের সবচেয়ে অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে অন্তর্দর্শন ও স্মৃতি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, স্মৃতি তার কতকগুলো আকারে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়মের একটা ফল; এবং এ নিয়মটা যে পরিমাণে মনোবৈজ্ঞানিক অন্ততঃ সেই পরিমাণে শরীরতাত্ত্বিক, এবং এটা মনের চেয়ে বরং জীবন্ত তন্তরই বৈশিষ্ট্যসূচক। সংবেদনশীলতা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির একটা ধর্ম, এবং, আমরা যেমন দেখেছি, সংবেদনশীলতা থেকে জ্ঞানকে পৃথক করা সহজ নয়। অন্তর্দর্শন জ্ঞানের একটা রূপ, কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সাধারণ 'জ্ঞান'-এর একটা সতর্কতাপূর্ণ ব্যাখ্যা ছাড়া সে অধিক আর কিছু নয়। যেখানে চিড়িয়াখানায় দার্শনিকের শিশু বলে "ওখানে একটা জলহস্তী আছে",

১. Declaration of Independence.

২. Tautological result.

সেখানে দার্শনিকের জবাব দেওয়া উচিত : "ওখানে কোন একটা আকার-বিশিষ্ট একটা রঙীন প্যাটার্ন রয়েছে, যাকে সম্ভবতঃ, বাহ্য কারণের যে তন্ত্রটাকে জলহস্তী বলা হয়, তার সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়।" (আমি নিজেও এ উপদেশ অনুসারে কাজ করি না।) ওখানে একটা রঙীন প্যাটার্ন রয়েছে বলার মধ্যে দার্শনিক সেই একমাত্র অর্থে অন্তর্দর্শন অভ্যাস করছেন, আমি যে অর্থটা সেই পদটাতে আরোপ করতে পারি, অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান-প্রতিক্রিয়াটা ঘটছে পদার্থিক দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নিজের মস্তিষ্কে অবস্থিত কোন-একটা ঘটনার উপর, এবং তিনি সজ্ঞানে যতদূর সম্ভব শরীর-বহির্ভূত ও অন্যান্য অনুমান এড়িয়ে যাচ্ছেন। যেসব ঘটনার উপর এজাতীয় জ্ঞান-প্রতিক্রিয়া ঘটে সেগুলো 'মানসিক', কতকগুলো দিক থেকে তাদের অনুরূপ অন্যান্য ঘটনাগুলোকেও তেমনি মনে হয়। কিন্তু এই বৃহত্তর পুঞ্জটাকে আমি এছাড়া আর কিছু বলে সংজ্ঞায়িত করার উপায় দেখছি না যে, মানসিক ঘটনাগুলো একটা জীবন্ত মস্তিষ্কের, অথবা আরও ভাল করে বলতে গেলে, তেমন একটা অঞ্চলের মধ্যবর্তী ঘটনা যেখানে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সংবেদনশীলতা ও শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া নিয়মের সম্মিলন ঘটেছে। এ সংজ্ঞাটার অন্ততঃ এই গুণটা আছে যে, এর মধ্যে দেখা যায় মানসিকতা কার্যকারণ নিয়মের ব্যাপার, স্বতন্ত্র ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার নয়, এবং এ-ও দেখা যায় যে, মানসিকতা একটা মাত্রাগত ব্যাপার।

সম্ভবতঃ এ পর্যায়ে একথার পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক নয় যে, মস্তিষ্কের ভেতরকার ঘটনাগুলোকে জড়খণ্ডের গতির দ্বারা তৈরী বলে মনে করা ঠিক নয়। আমরা দেখেছি যে, জড় এবং গতি যৌক্তিক সংগঠন, যার মধ্যে ঘটনাগুলো উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত, এবং সেজন্য গতিশীল জড়[১] থেকে ঘটনাগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আমি মনে করি যে, যখন আমাদের কোন-একটা প্রত্যক্ষণ (percept) ঘটে তখন ঠিক যে জিনিসটা আমরা প্রত্যক্ষ করি (ভ্রান্তির যে উৎসগুলো এড়ানো সম্ভব সেগুলো যদি আমরা এড়িয়ে যাই) তা একটা ঘটনা যা, পদার্থবিদ্যার মতে, যে অঞ্চলটা মস্তিষ্কের দখলে তার অংশবিশেষ জুড়ে আছে। বস্তুতঃ, পদার্থিক জগতের উপাদান সম্পর্কে

১. Matter in motion.

সবচেয়ে মূর্ত জ্ঞান আমরা পাই প্রত্যক্ষণ থেকে, কিন্তু আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা আমাদের মস্তিষ্কের উপাদানের অংশ—টেবিল ও চেয়ার, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজির উপাদানের অংশ নয়। ধরা যাক আমরা একটা পাতার দিকে তাকিয়ে আছি, এবং একটা সবুজ ছোপ (patch) আমরা দেখছি। পাতাটা যেখানে এই ছোপটা সেই 'বাইরের ওখানে'[১] নয়, বরং এটা একটা ঘটনা যা, আমরা যতক্ষণ পাতাটা দেখছি, ততক্ষণ আমাদের মস্তিষ্কের কোন-একটা খণ্ড (volume) দখল করে আছে। পাতাটা দেখার অর্থ এই যে, যে অঞ্চলটাতে আমাদের মস্তিষ্ক রয়েছে সেখানে একটা সবুজ ছোপ আছে, যে ছোপটা পাতাটার সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত; বরং বলা যায়, যে পদার্থিক দেশে পদার্থবিদ্যা অনুসারে পাতাটা অবস্থিত সেখান থেকে যে ঘটনা-পরম্পরা বেড়িয়ে আসছে, সবুজ ছোপটা কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা তার সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যক্ষটা এই ঘটনা-পরম্পরার মধ্যবর্তী অন্যতম ঘটনা; এবং অন্যগুলো থেকে এর পার্থক্যটা, যে অঞ্চলে সে ঘটছে, সেই অঞ্চলের বিশেষ কতকগুলো ধর্ম থেকে উৎপন্ন তার কার্যফলগুলোর মধ্যে—অথবা এটা বললে সম্ভবতঃ আরো নির্ভুল হবে যে, বিভিন্ন কার্যফলগুলো 'নিজেরাই' (are) সে অঞ্চলের বিশেষ ধর্ম।

'মন' এবং 'মানসিক' নিছক মোটামুটি ধারণা[২] মাত্র, যাদের থেকে কতকগুলো মোটামুটি-ঠিক কার্যকারণ নিয়মের[৩] জন্য সুবিধাজনক সংকেত (shorthand) পাওয়া যায়। কোন পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানে 'মন' শব্দটা এবং 'জড়' শব্দটা উভয়ই অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং তাদের স্থান দখল করবে 'ঘটনা' সম্পর্কিত কার্যকারণ নিয়ম; যে একমাত্র ঘটনাসমষ্টি তাদের গাণিতিক এবং কারণিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে ছাড়া আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তারা হচ্ছে প্রত্যক্ষ (percepts), যেগুলো একটা মস্তিষ্ক যে অঞ্চলে অবস্থিত ঠিক সেই অঞ্চলে অবস্থিত এবং যাদের 'জ্ঞান-প্রতিক্রিয়া'[৪] নামক এক বিশেষ ধরনের কার্যফল রয়েছে।

১. Out there.

২. approximate concepts.

৩. approximate causal laws.

৪. Knowledge-reactions.

দেখা যাবে যে, আমি যে মত প্রচার করছি সেটা জড়বাদও নয় মানসবাদও (mentalism) নয়, বরং সেটা হচ্ছে আমরা যাকে (ড়ঃ এইচ. এম. শেফারের[১] একটা ইঙ্গিত অনুসরণ করে) 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ'[২] বলি। এটা একত্ববাদ এই অর্থে যে, এতে জগৎকে কেবল এক রকমের উপাদান, অর্থাৎ ঘটনা, দিয়ে তৈরী বলে মনে করা হয় ; কিন্তু এটা বহুত্ববাদ এই অর্থে যে, এতে অসংখ্য ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যেখানে প্রতিটি ন্যূনতম ঘটনা একট যৌক্তিক অর্থে স্বয়ং-নির্ভর সত্তা।

সে যাই হোক, আরেকটা প্রশ্ন আছে যেটা ঠিক এর থেকে অভিন্ন নয়, অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নটা। আমরা যদি আরো জানতাম, তাহলে কি মনোবিজ্ঞান পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তো ? জড়বাদী হয়েও একজন লোক এ অভিমত পোষণ করতে পারেন যে, মনোবিজ্ঞান একটা স্বাধীন বিজ্ঞান ; ডঃ ব্রড তাঁর The Mind and its Place in Nature নামক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, মন একটা জড় সংগঠন (material structure), কিন্তু এর মধ্যে এমন গুণাবলী রয়েছে যেগুলোকে, এমন কি তাত্ত্বিকভাবেও, এর জড় উপাদানগুলো থেকে অনুমান করা যায় না। তিনি উল্লেখ করেন যে, বেশ প্রায়শই সংগঠনের মধ্যে এমন গুণাবলী থাকে যেগুলোকে, আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায়, তাদের অংশগুলোর গুণ ও সম্বন্ধাবলী থেকে অনুমান করা যায় না। পানির অনেক গুণ আছে যেগুলোকে—যদি আমরা ধরে নিই যে, পানির অণুর গঠন সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত যা জেনেছি তার চেয়েও অধিক সম্পূর্ণভাবে সে সম্বন্ধে আমরা জানি—তাহলেও হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের গুণাবলী থেকে আমরা অনুমান করতে পারি না। সমগ্রের যে-সব গুণকে, এমনকি তাত্ত্বিকভাবেও, তার অংশসমূহের গুণ এবং সম্বন্ধাবলী থেকে অনুমান করা যায় না, ডঃ ব্রড সেগুলোকে 'উন্মেষমূলক (emergent) গুণ বলেন। এইভাবে তিনি মনে করেন যে, মনের (অথবা মস্তিষ্কের) এমন কতকগুলো গুণ আছে যেগুলো 'উন্মেষমূলক', এবং

১. Sheffer.

২. neutral monism.

এটুকু পর্যন্ত মনোবিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা থেকে স্বাধীন হবে। মনের 'উন্মেষমূলক' গুণগুলো আবিষ্কৃত হবে কেবল মনকে নিরীক্ষণ করার মাধ্যমে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার নিয়মাবলী থেকে অনুমানের মাধ্যমে নয়। এ সম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর পর্যালোচনা পণ্ডশ্রম হবে না।

জড়ের একটা একককে স্বয়ং চূড়ান্ত বলে গণ্য না করে একটা ঘটনা-সমষ্টি হিসাবে গণ্য করার যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, তার ফলে 'উন্মেষমূলক' গুণ সম্পর্কিত আমাদের প্রশ্নটার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসে যায়। আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে: জড় কি ঘটনা থেকে উন্মিষিত? মন কি ঘটনা থেকে উন্মিষিত? যদি আগেরটা হয়, তাহলে মন কি জড় থেকে উন্মিষিত, অথবা জড়ের গুণাবলী থেকে অনুমানযোগ্য, অথবা এর কোনটাই নয়? যদি পরেরটা হয়, তাহলে জড় কি মন থেকে উন্মিষিত, অথবা মনের গুণাবলী থেকে অনুমানযোগ্য, অথবা এর কোনটাই নয়? অবশ্য, যদি মন অথবা জড়ের কোনটাই ঘটনা থেকে উন্মিষিত না হয়, তাহলে এই পরবর্তী প্রশ্নগুলো আর ওঠে না।

'ক্রনো-জিওগ্রাফি'[১] নামে একটা শব্দ গঠন করা যাক সেই বিজ্ঞানের জন্য, যে বিজ্ঞান দেশ-কালিক সম্বন্ধবিশিষ্ট ঘটনা-সমষ্টি নিয়ে আরম্ভ হয় এবং শুরুতেই ধরে নেয় না যে, কতকগুলো ঘটনা-শৃঙ্খলকে স্থায়ী জড় একক[২] অথবা মন বলে গণ্য করা যেতে পারে। তখন প্রথমে নিজেদেরকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে: পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যায় জড়ের বিজ্ঞান যে আকারে দেখা দেয় সেই আকারে তাকে কি সম্পূর্ণভাবে ক্রনো-জিওগ্রাফিতে পর্যবসিত করা যায়? যদি না যায়, তাহলে জড় ঘটনা থেকে উন্মিষিত; যদি যায়, তাহলে তা উন্মেষমূলক নয়।

জড় কি ঘটনা থেকে উন্মিষিত? বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এ প্রশ্নের একটা সুমীমাংসিত (decided) উত্তর দেওয়া কঠিন। আধুনিক পদার্থবিদ্যায়, জড়ের ধারণাটা শক্তির (energy) ধারণার মধ্যে মিশে গেছে। এডিংটন তাঁর *Mathematical Theory of Relativity*-তে দেখিয়েছেন যে, ঘটনা

---

১. Chrono-geography.

২. Persistent material units.

সম্পর্কে ধরে নেওয়া নিয়মগুলোর দৌলতে, একটা-কিছু অবশ্যই আছে যার মধ্যে নিত্যতা (conservation) সম্পর্কিত জড় ও শক্তির নিরীক্ষিত গুণ-গুলো রয়েছে। এটাকে তিনি বলেন 'জড়-শক্তি-টেন্সর",[১] এবং ইংগিত দেন যে, এটাই হচ্ছে সেই সত্তা (reality) যাকে আমরা কখনও 'জড়' এবং কখনও শক্তি বলি। এতটুকু পর্যন্ত জড়কে উন্মেষমূলক নয় বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের অস্তিত্ব (তাদের সত্যিকার অস্তিত্ব যেটুকু আছে) এখনও সাধারণ আপেক্ষিকবাদ থেকে অনুমান করা হয়নি, যদি ও প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং যে-কোন মুহূর্তে সাফল্য আসতে পারে যদিও যখন সে সাফল্য আসবে, তখন সেই মুহূর্ত থেকে পদার্থবিদ্যা কোন পরিমাণেই আর ক্রনো-জিওগ্রাফি থেকে স্বতন্ত্র থাকবে না, কিন্তু বর্তমানে এ অংশতঃ স্বতন্ত্র থেকে যাচ্ছে। রসায়নবিদ্যার কথা বলতে গেলে, যদিও আমরা কার্যতঃ একে সম্পূর্ণভাবে পদার্থবিদ্যায় পর্যবসিত করতে পারছি না, তথাপি আমরা দেখতে পারি কিভাবে, তাত্ত্বিক দিক থেকে, এটা করা সম্ভব হতো, এবং আমি এটা ধরে নেওয়া নিরাপদ মনে করি যে, রসায়নবিদ্যা চূড়ান্ত অর্থে কোন স্বাধীন বিজ্ঞান নয়।

আমরা যে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করছি সেটা হচ্ছেঃ ঘটনার নিয়মগুলো থেকে, তাত্ত্বিকভাবে, আমরা কি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, জড় এককগুলো যে-সব নিয়ম বাস্তবিকই মেনে চলে সে-সব নিয়ম মেনে-চলা জড় একক অবশ্যই থাকবে, অথবা এটা কি একটা নতুন, যৌক্তিকভাবে স্বাধীন, সত্য? তত্ত্বের মধ্যে আমরা হয়তো প্রমাণ করতে পারি যে, এ স্বাধীন 'নয়', কিন্তু এটা যে 'সত্যিই' তাই তা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। ব্যাপক অর্থে বর্তমান অবস্থাটা এই যে, ক্রনো-জিওগ্রাফি থেকে পদার্থিক জগতের নিরবচ্ছিন্ন ধর্মগুলো (continuous properteis) অনুমান করা যায়, কিন্তু বিচ্ছিন্ন সত্যগুলো নয়, অর্থাৎ, ইলেক্ট্রন ও প্রোটন এবং প্ল্যাংকের কোয়াণ্টাম।[২] কাজেই এখনকার মতো, জড়ত্ব, সম্ভবতঃ তাত্ত্বিকভাবে না হলেও, কার্যতঃ কতকগুলো ঘটনাপুঞ্জের একটা উন্মেষমূলক বৈশিষ্ট্য।

১. Material-energy-tensor.

২. Plank's quantum.

মন কি ঘটনা থেকে উন্মিষিত? এখন পর্যন্ত, প্রশ্নটার কোন আলোচনাকে এমন-কি বোধগম্য করে তোলাও কঠিন ব্যাপার, যেহেতু বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। তা সত্ত্বেও, কতকগুলো বিষয় লক্ষ্য করার মতো। ক্রনো-জিওগ্রাফির কাজ কেবল ঘটনার অমূর্ত গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে, এবং তার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত এরকম চিন্তা করা যায় না যে, সে প্রমাণ করতে পারবে যে, দৃষ্টিগত ঘটনা অথবা শ্রুতিগত ঘটনা আছে, অথবা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যে-সব ধরনের ঘটনা আমরা জানি সে ধরনের কোন ঘটনা আছে। এ অর্থে মনোবিজ্ঞান নিশ্চয়ই ক্রনো-জিওগ্রাফি থেকে এবং পদার্থবিদ্যা থেকেও উন্মিষিত, এবং কিভাবে সে কখনও তা না হয়ে পারে সেটা উপলব্ধি করা কঠিন। এর কারণ এই যে, উপাত্ত সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের মধ্যে কতকগুলো গুণ-ধর্মী বৈশিষ্ট্য[১] রয়েছে যেগুলোকে উপাত্ত থেকে অনুমিত দেশ-কাল ঘটনাবলীর[২] নিছক গাণিতিক বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান করা যায় না, কিন্তু তথাপি এ অমূর্ত গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলোই একমাত্র বৈশিষ্ট্য যেগুলোকে আমরা বৈধভাবে অনুমান করতে পারি।

উপরোক্ত যুক্তি থেকে এ সিদ্ধান্তও পাওয়া যায় যে, মন অবশ্যই জড় থেকে উন্মিষিত হবে যদি তা একটা জড় সংগঠন হয়। আমাদের নিজস্ব প্রত্যক্ষগুলো সম্পর্কে আমরা বস্তুতঃ যা জানি, পদার্থবিদ্যার কোন পরিমাণ থেকেই তার সবটুকু কখনও জানা যেতে পারে না।

মনকে আমরা জড় এককের সংগঠন বলে মনে করবো কিনা সে প্রশ্ন এখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আমরা যদি তাকে তেমন মনে করি, তাহলে এইমাত্র আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম তার আলোকে বলা যায় যে, মনের প্রসঙ্গে, আমরা উন্মেষমূলক জড়বাদী (emergent meterialist); ডঃ ব্রড এ মতেরই পক্ষাবলম্বন করেন। যদি আমরা তাকে এরূপ মনে না করি, তাহলে আমরা কোন অর্থেই জড়বাদী নই। এই জড়বাদী মতের অনুকূলে এ সত্যটা রয়েছে যে, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যতদূর জানা যায়,

১. **Features of a qualitative sort.**

২. **Space-time event.**

মন উন্মিষিত হয় কেবলমাত্র কতকগুলো পদার্থিক সংগঠনের,[১] অর্থাৎ সজীব দেহের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে, এবং মানসিক উন্নতির বৃদ্ধি হয় পদার্থিক সংগঠনের কোন-এক রকমের জটিলতার সঙ্গে। এর বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে আমরা এটা বলতে পারি না যে, মনের কতকগুলো অসাধারণ (peculiar) বৈশিষ্ট্য আছে, কারণ একথা উন্মেষমূলক জড়বাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। একে যদি আমরা খণ্ডন করতে চাই তাহলে তা করতে হবে মন কি ধরনের ঘটনাপুঞ্জ দিয়ে তৈরী তা আবিষ্কার করে। এখন এ প্রশ্নের প্রতি নজর দেওয়ার সময় এসেছে।

মন কি? শুরুতেই বলা যায় যে, এটা অতি স্পষ্ট যে, মন অবশ্যই একটা মানসিক ঘটনার পুঞ্জ হবে, যেহেতু আমরা এ মত বর্জন করেছি যে, ইতিপূর্বে অহমকে (ego) যে-রকম একটা একক সরল সত্তা বলে মনে করা হতো, মন সে-রকমেরই একটা সত্তা। সুতরাং প্রথম ধাপ হবে 'মানসিক' ঘটনা বলতে আমরা কি বোঝাই সে বিষয়ে একটা স্বচ্ছ ধারণায় পৌঁছা।

কয়েক পৃষ্ঠা আগে আমরা বলেছিলাম যে: 'মানসিক' ঘটনাগুলো সেই অঞ্চলের মধ্যবর্তী ঘটনা, যেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংবেদনশীলতা এবং শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার নিয়মের সম্মিলন ঘটে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে, এর অর্থ (একটা শর্ত সাপেক্ষে, শীঘ্রই যার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে) এই যে, একটা মানসিক ঘটনা জীবন্ত মস্তিষ্কের ভেতরকার কোন একটা ঘটনা। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, এর অর্থ এই নয় যে, মানসিক ঘটনা তৈরী গতিশীল জড়[২] দিয়ে, যদিও প্রাচীনপন্থী পদার্থবিদের মতে মস্তিষ্কের ভেতরে এ ধরনের ঘটনাই ঘটে। আমরা দেখেছি যে, গতিশীল জড় আমাদের অর্থে কোন ঘটনা নয়; সেটা বরং ভিন্ন ধরনের ঘটনাবলীর মধ্যবর্তী নিতান্ত জটিল একটা কার্যকারণ প্রক্রিয়ার সাংকেতিক বিবরণ। কিন্তু আমাদের সংজ্ঞার বৈধতা প্রমাণের জন্য কয়েকটা কথা আমাদের বলতে হবে।

কতকগুলো বিকল্প সংজ্ঞা বিবেচনা করা যাক। আমরা বলতে পারতাম একটা মানসিক ঘটনা হচ্ছে সেই ঘটনা যা 'অভিজ্ঞাত' (experienced)। কখন একটা ঘটনা 'অভিজ্ঞাত'? আমরা বলতে পারতাম: যখন তার

১. **Physical structure.**

২. **Matter in motion.**

'স্মৃতিক' কার্যফল, অর্থাৎ অনুষঙ্গ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কার্যফল থাকে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এ নিয়ম চক্ষুমণির সংকোচনের মত নিছক দৈহিক ঘটনাবলীর বেলায় প্রযোজ্য, যাদের সঙ্গে 'মানসিক' কোনকিছুর সংযোগ আছে বলে মনে হয় না। কাজেই আমাদের সংজ্ঞাকে যদি উপযুক্ত হতে হয় তাহলে আমাদেরকে 'অভিজ্ঞতা'-র (experience) একটা ভিন্ন সংজ্ঞা দিতে হবে; আমাদের বলতে হবে যে, স্মৃতিক কার্যফলগুলোর মধ্যে এমন একটা-কিছু অবশ্যই থাকতে হবে যাকে বলা যায় 'জ্ঞান'। এর থেকে এ সংজ্ঞাটার ইঙ্গিত পাওয়া যায়: যা কিছু স্মৃত তাই মানসিক ঘটনা। কিন্তু এটা অতিরিক্ত সংকীর্ণ; আমাদের মানসিক ঘটনাগুলোর কেবল একটা ক্ষুদ্র সংখ্যা আমরা স্মরণ করি। 'চৈতন্য'-কে আমরা মানসিক ঘটনার সারবস্তু হিসাবে মনে করতে পারতাম, কিন্তু ২০শ অধ্যায়ে এ-মতটা পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল যে এটা সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয় (inadequate)। অধিকন্তু, 'অচেতন'-কে আমরা আমাদের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিতে চাই না।

একথা পরিষ্কার যে, যে প্রাথমিক মানসিক ঘটনাগুলো সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না, সেগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ (percepts)। কিন্তু প্রত্যক্ষগুলোর কতকগুলোর মধ্যে বিশেষ ধরনের কারণিক গুণাবলী রয়েছে; যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই গুণটা যে, তারা জ্ঞান-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, এবং তাদের থেকে এমন-সব স্মৃতিক কার্যফল উৎপন্ন হতে পারে যেগুলো জ্ঞানধর্মী। তবে, এসব কারণিক গুণাবলী এমন কতকগুলো ঘটনাবলীর মধ্যে রয়েছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ (percepts) নয়। মনে হয় যে, মস্তিষ্কের ভেতরকার যে কোন ঘটনার মধ্যে এ ধর্মগুলো থাকতে পারে। এবং সম্ভবতঃ যথেষ্ট চিন্তা না করেই আমরা বলে ফেলেছিলাম যে, কোন উচ্চ শব্দ শোনার ফলে চক্ষুমণির যে সংকোচন ঘটে তার মধ্যে 'মানসিক' কিছুই নেই। যে-সব 'মানসিক' ঘটনা কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের[১] অন্তর্গত তাদের ছাড়াও মানবদেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য মানসিক ঘটনা থাকতে পারে। শীঘ্রই এ সম্ভাবনার আলোচনায় আমি ফিরে আসবো। ইতিমধ্যে, 'মানসিক' ঘটনার উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে আমি বিচ্যুত হবো না,

১. Central personality.

যে সংজ্ঞা অনুসারে মানসিকতা একটা মাত্রাগত ব্যাপার বলে আমরা দেখেছিলাম।

এখন আমরা এ প্রশ্নটাতে ফিরে আসতে পারি : মন কি? যে ধরনের ঘটনাপুঞ্জকে আমাদের 'মন' বলা উচিত সে ধরনের কোন পুঞ্জের অংশ নয় এমন মানসিক ঘটনা থাকতে পারে, কিন্তু এমন পুঞ্জ নিশ্চয়ই আছে যাদের মধ্যে সেই ধরনের ঐক্য রয়েছে যার জন্য তাদেরকে আমরা একটা মন বলি। মনের দুটো লক্ষণীয় (marked) বৈশিষ্ট্য আছে : প্রথমতঃ, কোন নির্দিষ্ট দেহের সঙ্গে সে যুক্ত ; দ্বিতীয়তঃ, তার মধ্যে একটামাত্র (one) 'অভিজ্ঞতা'-র ঐক্য রয়েছে। দ্বৈত অথবা বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বেলায় আপাতদৃষ্টিতে এ দুটো পৃথক হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি, সেটা বাস্তবের চেয়ে বরং প্রতীয়মানই বেশী। এ দুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা পদার্থিক (physical) এবং অপরটা মনস্তাত্ত্বিক (psychological)। একটা 'মন' বলতে আমরা যা বোঝাই তার একটা সম্ভাব্য সংজ্ঞা হিসাবে এদের প্রতিটিকে এক-এক করে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পদার্থিক দিক থেকে, আমরা শুরুতেই লক্ষ্য করি যে, আমাদের জানা প্রতিটি মানসিক ঘটনা একটা সজীব দেহের ইতিহাসের অংশও বটে, এবং আমরা 'মন'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলি যে, মন হচ্ছে সেই-সব মানসিক ঘটনাপুঞ্জ যেগুলো কোন নির্দিষ্ট সজীব দেহের ইতিহাসের অংশ। সজীব দেহের সংজ্ঞা রাসায়নিক (chemical), এবং তত্ত্বগতভাবে রসায়নশাস্ত্রের পদার্থবিন্যাস রূপান্তরটা স্পষ্ট, যদিও কার্যতঃ [তার] গণিতটা নিতান্ত জটিল। এ পর্যন্ত এটা কেবল একটা অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে, স্মৃতিক কার্যকারণ[১] প্রায় সম্পূর্ণভাবে কোন নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংগঠনবিশিষ্ট জড়ের সঙ্গে অনুবদ্ধ। কিন্তু চৌম্বকত্ব সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যায়। এ পর্যন্ত, লোহার পরমাণুর সংগঠন সম্পর্কে আমরা যা জানি তা থেকে লোহার চৌম্বক গুণাবলী অনুমান (deduce) করতে পারি না, কিন্তু এ সন্দেহ কেউ করে না যে, যথেষ্ট জ্ঞান ও যথেষ্ট গাণিতিক নৈপুণ্য-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির পক্ষে তাদেরকে অনুমান করা সম্ভব। অনুরূপভাবে, মনে করা যেতে পারে যে, তত্ত্বগতভাবে

১. Mnemic causation.

[ত্তি]তিক কার্যকারণ সজীব জড়ের সংগঠন থেকে অনুমানযোগ্য। যথেষ্ট জ্ঞান দি আমাদের থাকতো তাহলে আমরা হয়তো অনুমান করতে পারতাম যে, স্ব কোন সম্ভাব্য সংগঠনের মধ্যে, সম্ভবতঃ এমন-কি তার চেয়েও উল্লেখ-াাগ্য মাত্রায়, স্মৃতিক ঘটনাবলী দেখা যেতো; যদি তাই হতো তাহলে ামরা এমন-সব রবট তৈরী করতে পারতাম যেগুলো আমাদের চেয়ে বেশী দ্ধিমান।

মনস্তাত্ত্বিকভাবে 'মন'-এর সংজ্ঞা দিতে গেলে দেখা যায়, মন তৈরী কোন দিষ্ট মানসিক ঘটনার সঙ্গে 'অভিজ্ঞতা', অর্থাৎ স্মৃতিক কার্যকারণ দ্বারা যুক্ত সমুদয় মানসিক ঘটনা দিয়ে, কিন্তু একটু বিশদ বিবরণ দেওয়ার পূর্বে সংজ্ঞাকে সঠিক (precise) বলে বিবেচনা করা যায় না। চক্ষুমণির কোচনকে আমরা একটা 'মানসিক' ঘটনা বলে বিবেচনা করতে চাই না; রোং মানসিক ঘটনাকে এমন একটা ঘটনা হতে হবে যার কেবল স্মৃতিক রণ নয়, স্মৃতিক কার্যফলও রয়েছে। তবে, সে-ক্ষেত্রে, একজন মানুষের বনে কোন সর্বশেষ মানসিক ঘটনা থাকতে পারে না, যদি-না আমরা র নিই যে, মৃত্যুর পর তার দেহের উপর সে ঘটনার স্মৃতিক কার্যফল ঘটতে রে। সম্ভবতঃ এ অসুবিধা আমরা এড়াতে পারি সেই 'শ্রেণীর' (kind) না আবিষ্কার করে, সচরাচর যাদের স্মৃতিক কার্যফল থাকে, যদিও বিশেষ বস্থার দরুন তাদের সংঘটনের পথ রুদ্ধ হতে পারে। অথবা আমরা মনে তে পারতাম যে, যখন মৃত্যুকে বলা হয় তাৎক্ষণিক, এমন-কি তখনও যু আসে ধীরে ধীরে; সে-ক্ষেত্রে জীবনস্রোতে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুষের জীবনের সর্বশেষ ঘটনাগুলো ক্রমানুসারে কম থেকে আরও কম নসিক হতে থাকে। এই অল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে উপেক্ষা ক'রে, কোন দিষ্ট মানসিক ঘটনা যে 'অভিজ্ঞতা'-র অন্তর্ভুক্ত তাকে আমরা সংজ্ঞায়িত বো সেইসব মানসিক ঘটনা ব'লে, সেই নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে যাদের কাছে মরা পৌঁছতে পারি এমন একটা স্মৃতিগত কার্যকারণ-শৃঙ্খলের মাধ্যমে যা ছনের দিকে অথবা সামনের দিকে যেতে পারে, অথবা পালানুক্রমে প্রথমে দিকে এবং তারপর অন্যদিকে। কোন জংশনে অথবা যেখানে অনেক-লা পয়েন্ট আছে সেখানে যে এন্‌জিনকে শান্টিং করানো হচ্ছে, তার ং তুলনা করে এ বিষয়টা চিন্তা করা যেতে পারে: যতবার শান্টিং করিয়ে

কোন-একটা লাইনে পৌঁছা যাক না কেন, সে লাইন একই অভিজ্ঞতার অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে, এক দেহের সঙ্গে যুক্ত সমুদয় মানসিক ঘটনা স্মৃতিক কার্যকারণের শৃঙ্খল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, এবং সেজন্য আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে, এক 'মন'-এর যে দুটো সংজ্ঞা আমরা দিয়েছি সে দুটোর ফলাফল অভিন্ন। বহুমুখী ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রগুলোতে, স্মৃতিক ফলাফলের অন্ততঃ কতকগুলো, বিশেষতঃ পুনরাভিজ্ঞান (recollection , এক ব্যক্তিত্বের জীবনে অনুপস্থিত থাকছে যখন তারা অন্য ব্যক্তিত্বে জীবনে ঘটেছে। কিন্তু সম্ভবতঃ উভয় ব্যক্তিত্বই স্মৃতিক শৃঙ্খলের দ্বারা সেই সব ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত যেগুলো বিষঙ্গ (dissociation) দেখা দেওয়ার পূর্বে ঘটেছিল, যে কারণে আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে কেবল একটামাত্র মন থাকবে। কিন্তু অন্যান্য সম্ভাবনাও আছে যেগুলোকে বিবেচনা করা আবশ্যক। হতে পারে যে, দেহের ভেতরকার প্রতিটি জীবকোষের নিজস্ব মানসিক জীবন আছে, এবং এসব মানসিক জীবনের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে কেবল তাদের কতকগুলোর দ্বারা সেই জীবন গড়ে ওঠে যাকে আমরা আমাদের জীবন বলে মনে করি। 'অচেতন'-টা (the 'unconscious') দেহের সেইসব অপ্রধান অংশের মানসিক জীবন হতে পারে, যাদের কখনও কখনও এমন ধরনের স্মৃতিক কার্যফল থাকে যেগুলোকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, কিন্তু যেগুলো, প্রধানতঃ যে জীবন সম্পর্কে আমরা 'সচেতন,' সে জীবন থেকে পৃথক। যদি তাই হয়, তাহলে যে-সব মানসিক ঘটনা একটা দেহের সঙ্গে যুক্ত সেগুলো সেইসব ঘটনার চেয়ে সংখ্যায় বেশী হবে যেগুলোর দ্বারা দেহটার কেন্দ্রীয় 'মন' তৈরী। তবে এগুলো কেবল চিন্তাগত (speculative) সম্ভাবনা।

মুহূর্ত খানেক আগে, যে জীবন সম্পর্কে আমরা 'সচেতন' সে সম্পর্কে আমি কথা বলেছিলাম, এবং সম্ভবতঃ পাঠক জানতে চাইছেন কেন আমি 'চেতনা'-ধারণাটাকে আরো বেশী ব্যবহার করিনি। কারণটা এই যে, আমি একে কেবল এক ধরনের স্মৃতিক কার্যফল বলে মনে করি, এবং কোন বিশেষ স্থান পাবার যোগ্য কার্যফল বলে মনে করি না। কোন ঘটনা সম্পর্কে আমি 'সচেতন' বলার অর্থ এই যে, আমি তাকে স্মরণ করি, অন্ততঃ তার ঘটার

কিছু সময় ধরে। কোন ঘটনা আমি স্মরণ করি বলার অর্থ এই যে, কোন-একটা ঘটনা এখন আমার মধ্যে ঘটছে, স্মৃত ঘটনার সঙ্গে স্মৃতিক কারণ দ্বারা যা সংযুক্ত, এবং যা সেই রকমের ঘটনা যে রকমের ঘটনাকে সেই স্মৃত ঘটনার অবগতি (cognition) বলি। কিন্তু যে-সব ঘটনা আমি স্মরণ করি না, আমার উপর তাদের স্মৃতিক কার্যফল থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আমরা ফ্রয়েডীয় অবদমনের (suppression) সাক্ষাৎ পাই, কেবল সে-সব ক্ষেত্রে নয়, বরং লেখা ও কথা বলার মত যে-সব অভ্যাস বহু পূর্বে আয়ত্ত করা হয়েছিল এবং এখন স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে, সে-সব ক্ষেত্রেও এটা ঘটে। চৈতন্যের উপর জোর দেওয়ার ফলে 'অচেতন'-টা একটা রহস্যে পরিণত হয়েছে, যা দেখে কোনভাবেই কারও আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়।

'মন' সম্পর্কিত আমাদের দু'টো সংজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টা আমরা অবলম্বন করবো, তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। সাময়িকভাবে প্রথম সংজ্ঞাটা অবলম্বন করা যাক, যে সংজ্ঞা অনুসারে কোন মন হচ্ছে সমুদয় মানসিক ঘটনা যেগুলো কোন সজীব দেহের, অথবা সম্ভবতঃ আমাদের বরং বলা উচিত, কোন সজীব মস্তিষ্কের ইতিহাসের অংশ।

এখন আমরা সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি, যে প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা বিশ্লেষমূলক জড়বাদী কিনা, তার মীমাংসা হবে, অর্থাৎ :

মন কি জড় এককের (material units) সংগঠন?

আমি মনে করি এটা পরিষ্কার যে, এ প্রশ্নের উত্তর না-বোধক। যদি মন কোন মস্তিষ্কের ভেতরকার সমুদয় ঘটনা দিয়ে তৈরী হয় তাহলেও পদার্থবিদ্যায় এসব ঘটনাকে যে-ভাবে দলবদ্ধ করা হয় সেভাবে দলবদ্ধ এসব ঘটনার একাধিক গুচ্ছ দ্বারা সে তৈরী নয়; অর্থাৎ, মস্তিষ্কের অন্তর্গত এক খণ্ড জড় যেসব ঘটনা দিয়ে তৈরী সে-সব ঘটনাকে একত্র করা, এবং তারপর অন্য একটা খণ্ড যেসব ঘটনা দিয়ে তৈরী তাদের সবগুলোকে একত্র করা, ইত্যাদি সে করে না। মন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর বেলায় যে বিষয়টার সঙ্গে আমরা সবচেয়ে বেশী সংশ্লিষ্ট সেটা হচ্ছে স্মৃতিক কার্যকারণ; কিন্তু মনে হয় সে অনুসন্ধানের জন্য পদার্থবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক, যদি আমরা ধরে নিই—এই ধরে নেওয়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়—যে, মানসিক স্মৃতিক কার্যকারণের[১]

১. Mental mnemic causation.

হেতু হচ্ছে মস্তিষ্কের উপরকার কার্যফল। তবে এ প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত স্মৃতিক কার্যকারণ যদি চূড়ান্ত (ultimate) হয়, তাহলে মন উন্মেষমূলক যদি না হয়, তাহলে প্রশ্নটা আরো জটিল। আমরা ইতিপূর্বে যেমন দেখেছি মনোবিজ্ঞানে এমন জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে যা কখনও পদার্থবিদ্যার অংশ হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই অন্য শব্দ ব্যবহার করে আমি যুক্তিটা আবার উল্লেখ করবো।

চিঠি সম্পর্কে পোস্টম্যানের জ্ঞান এবং চিঠির প্রাপকের জ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য, তার সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যার পার্থক্যের সাদৃশ্য রয়েছে পোস্টম্যান বহু চিঠির আসা-যাওয়ার খবর রাখে, প্রাপক জানে কয়েকটি চিঠির বক্তব্য। যে-সব আলোক ও শব্দ তরঙ্গ জগতের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় সেগুলোকে আমরা চিঠি হিসাবে গণ্য করতে পারি, পদার্থবি যাদের গন্তব্যস্থল জানতে পারেন; তাদের কতকগুলো আসে মানুষের কাছে এবং পাঠ করার ফলে তাদের থেকে মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান পাওয়া যায়। উপমাটা অবশ্য সম্পূর্ণ নিভুর্ল (perfect) নয়, কারণ যে-সব চিঠি নিয়ে পদার্থবি কাজ করছেন সেগুলো তাদের ভ্রমণ-কালে প্রতি নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে যেন তারা এমন কালিতে লেখা যা ম্লান হয়ে যাচ্ছে, এবং তা-ছাড়া কালিটা যেন সব সময় সম্পূর্ণ শুষ্ক ছিল না, বরং মাঝে মাঝে বৃষ্টি লেগে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে, উপমাটার উপর অতিরিক্ত চাপ না দিলে এতে চলতে পারে

২৫শ অধ্যায়ের আলোচনা ছাড়া পূর্ববর্তী অন্যান্য আলোচনার বিশে বক্তব্য পরিবর্তিত না করে যুক্তিটাকে একটা ভিন্ন মোড় দেওয়া, এবং জড়কে মানসিক একক (mental units) দিয়ে গড়া একটা সংগঠন করে তোলা সম্ভব হবে। আমি মোটেই নিশ্চিত নই যে, এ মতটাই ভ্রান্ত। ২৫ অধ্যায়ে উপাত্ত সম্পর্কে যে যুক্তি রয়েছে তার থেকে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভব ঘটে। আমরা দেখেছিলাম যে, সবচেয়ে সংকীর্ণ ও সঠিক অর্থে সম উপাত্তই মানসিক ঘটনা, যেহেতু তারা প্রত্যক্ষ (percepts)। ফল কার্যকারণ নিয়মের সমুদয় পরখই নিহিত প্রত্যাশিত প্রত্যক্ষের সংঘটনের মধ্যে তার ফলে (বাস্তব কিম্বা সম্ভাব্য) প্রত্যক্ষগুলোর বাইরে যে-কোন অনুমানের পক্ষে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমরা পরিণাম দর্শিতার পরিচয় দেব যদি আমরা পদার্থবিদ্যার অ-মানসিক (non-mental

ঘটনাগুলোকে নিছক সহকারী ধারণা হিসাবে মনে করি, যাদের কোন সত্তা আছে বলে ধরে নেওয়া হয় নি, বরং কেবল প্রত্যক্ষের নিয়মগুলোকে একটা সরল রূপ দেওয়ার জন্য যাদের অবতারণা করা হয়েছে। এইভাবে জড় হবে প্রত্যক্ষ থেকে গড়া একটা সংগঠন[1] এবং আমাদের পরাতত্ত্ব (mataphy-sic) হবে সারতঃ বার্কলীয় পরাতত্ত্ব। যদি কোন অ-মানসিক ঘটনা না থাকে তাহলে কার্যকারণ নিয়মগুলো হবে নিতান্ত অদ্ভুত (odd); উদাহরণ-স্বরূপ, কোন লুকানো ডিকটাফোন কোন-একটা কথোপকথন রেকর্ড করতে পারবে, যদিও কেউ তাকে সেই সময় প্রত্যক্ষ করছিল না বলে তখন তার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু অদ্ভুত মনে হলেও এটা যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব নয়। এবং একথা স্বীকার করতে হবে যে, যদি আমরা অ-মানসিক ঘটনা স্বীকার করি তাহলে যে পরিমাণ সন্দেহজনক আরোহী ও সাদৃশ্যমূলক অনুমানের প্রয়োজন হয়, এর মাধ্যমে তার চেয়ে কম পরিমাণ আরোহী ও সাদৃশ্যমূলক অনুমানের সাহায্যে আমরা পদার্থবিদ্যার ব্যাখ্যা দিতে পারবো।

এ-মতটার যৌক্তিক মূল্য (merits) থাকা সত্ত্বেও আমি একে গ্রহণ করতে পারছি না, যদিও আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত নই যে, একে অপছন্দ করার পেছনে আমার কারণগুলো ডঃ জনসনের কারণগুলোর চেয়ে কোন অংশে উত্তম। আমি দেখতে পাচ্ছি আমি এমনভাবে তৈরী যে, আমার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, যেদিন সূর্যটা সর্বত্র মেঘের আড়ালে পড়বে সেদিন তার অস্তিত্ব থাকবে না, অথবা পিঠাটা যে মুহূর্তে খোলা হয় সেই মুহূর্তে তার মধ্যে হঠাৎ করে মাংস গজিয়ে ওঠে। এসব আপত্তির ন্যায়শাস্ত্রীয় (logical) উত্তরটা আমার জানা আছে, এবং যুক্তিবিদ হিসাবে আমি সেটাকে একটা ভালো উত্তর বলে মনে করি। তবে, অ-মানসিক ঘটনা 'নেই', ন্যায়শাস্ত্রীয় যুক্তিটার মধ্যে এমন-কি এটা দেখাবার প্রবণতাটা পর্যন্ত নেই; সেটা থেকে কেবল এ-ই দেখা যায় যে, তাদের [অ-মানসিক ঘটনাগুলোর] অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত বোধ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি দেখতে পাচ্ছি—আমার সন্দিহান হওয়া উচিত, বলে

[1] Construction.

আমার মধ্যে একটা প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশ্যে যাই কিছু বলা হোক না কেন, আমি প্রকৃতপক্ষে এগুলোতে[১] বিশ্বাস করি।

যে-মতটা আমরা বিবেচনা করছি তার বিরুদ্ধে এক ধরনের একটা যুক্তি আছে। আমি এতক্ষণ ধরে নিচ্ছি যে, অন্যান্য লোক ও তাদের প্রত্যক্ষণ-গুলোর অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি, কিন্তু কেবল প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে ভিন্ন ধরনের কোন ঘটনা অনুমান করাকেই সন্দেহের চোখে দেখি। এখন, আমাদের যৌক্তিক সাবধানতাকে কেন আমরা আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাব না, তার কোন উপযুক্ত কারণ নেই। অন্য মানুষের প্রত্যক্ষণগুলোর সাহায্যে কোন মতবাদ আমি যাচাই করতে পারি না, পারি কেবল আমার নিজের প্রত্যক্ষণগুলোর সাহায্যে। সুতরাং পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলোকে আমি যাচাই করতে পারি কেবল সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত তাদের উপর ভিত্তি করে 'আমার' প্রত্যক্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। তাহলে আমি যদি পরখযোগ্য নয় বলে অ-মানসিক ঘটনা স্বীকার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি তাহলে, একই কারণে, আমাকে ছাড়া অন্যান্য সকলের মধ্যে মানসিক ঘটনা স্বীকার করতে আমার অনিচ্ছুক হওয়া উচিত। এইভাবে আমি পর্যবসিত হচ্ছি সেই মতবাদে যাকে বলা হয় 'আত্মসর্বস্বতাবাদ' (solipsism) অর্থাৎ এই মতবাদ যে, কেবল আমি আছি। এটা এমন একটা মতবাদ যাকে খণ্ডন করা কঠিন, কিন্তু যাকে বিশ্বাস করা আরো কঠিন। একবার এক দার্শনিকের কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছিলাম, যিনি নিজেকে আত্মসর্বস্বতাবাদী বলে দাবী করতেন, কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এই দেখে যে, তেমন আর কেউ ছিল না। অথচ অন্য কারুর যে অস্তিত্ব আছে, এ দার্শনিকের সে-কথা বিশ্বাস করার কথা নয়। এর থেকে দেখা যায় যে, যাঁরা আত্মসর্বস্বতাবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিজেদেরকে নিঃসন্দেহ বলে মনে করেন, এমন-কি তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে এতে বিশ্বাস করেন না।

আরো এক ধাপ আমরা এগিয়ে যেতে পারি। অতীতকে পরখ করা যায় কেবল পরোক্ষভাবে, ভবিষ্যতের উপর তার কার্যফলের মাধ্যমে; সুতরাং যে ধরনের যৌক্তিক সাবধানতা আমরা বিবেচনা করছি, তার ফলস্বরূপ

১. অ-মানসিক ঘটনাগুলোতে।

আমাদেরকে একথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত যে, অতীত কখনও বাস্তবিকই ঘটেছিলো : একে আমাদের সেইসব সহকারী ধারণা (auxiliary concepts) দিয়ে তৈরী বলে মনে করা উচিত যেগুলো ভবিষ্যতের প্রতি প্রযোজ্য নিয়মগুলো উল্লেখ করার ব্যাপারে সুবিধাজনক। এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আমাদের মতামত (judgment) স্থগিত রাখা উচিত; যেহেতু, যদিও ভবিষ্যৎ যদি ও যখন ঘটে তবে ও তখনই সে পরখযোগ্য, তথাপি এখন পর্যন্ত তাকে পরখ করা হয়নি। এতদূর পর্যন্ত আমরা যদি যেতে না চাই তাহলে বার্কলী যেখানে সীমারেখা টেনেছিলেন ঠিক সেখানে সীমারেখা টানার কোন কারণ নেই বলে মনে হয়। এসব কারণে, পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী যে ধরনের অ-মানসিক ঘটনাবলী অনুমান করতে আমাদের প্রযোজিত করে, তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে আমি কোনরূপ লজ্জাবোধ করি না। তৎসত্ত্বেও, অন্য মতগুলো যে সমর্থনযোগ্য তা উপলব্ধি করার মধ্যে গুরুত্ব আছে।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান

এই সর্বশেষ অধ্যায়ে, আমি চাই যে-সব মূল সিদ্ধান্তে আমরা এসে পৌঁছেছি সংক্ষেপে তাদের পুনরুল্লেখ করতে, এবং তারপর বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে, বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া এ বিষয়ে দর্শনের যা শেখাবার আছে তারই আওতার মধ্যে থেকে।

লৌকিক অধিবিদ্যা পরিচিত (known) জগৎকে মন ও জড়ে, এবং মানুষকে আত্মা ও দেহে বিভক্ত করে। কেউ কেউ—জড়বাদীরা—বলেছেন যে, কেবল জড়ই বাস্তব এবং মন একটা অধ্যাস। অনেকে—টেকনিক্যাল অর্থে ভাববাদীরা, অথবা ডঃ ব্রডের আরো উপযুক্ত নামকরণ অনুসারে, মানসবাদীরা (mentalists)—এর বিপরীত মতটা গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ, কেবল মনই বাস্তব এবং জড় একটা অধ্যাস। আমি যে-মত প্রস্তাব করেছি সেটা এই যে, মন ও জড় এমন একটা আরো আদিম উপাদান (stuff) দিয়ে তৈরী কতকগুলো সংগঠন, যা মানসিকও নয় জড়ও নয়। 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ' (neutral monism) নামক এ মতের ইঙ্গিত রয়েছে মাক-এর Analysis of Sensations-এ; উইলিয়াম জেম্‌স্‌-এর Essays in Radical Empiricism-এ এ-মত গড়ে উঠেছে, এবং এর পক্ষ সমর্থন করে অভিমত দিয়েছেন জন ডিউই ও প্রফেসর আর. বি. পেরী এবং অন্যান্য আমেরিকান বাস্তববাদী। 'নিরপেক্ষ' শব্দটার এ প্রয়োগের জন্য দায়ী হার্ভার্ডের ডঃ এইচ. এম. শেফার,[১] যিনি আমাদের কালের সবচেয়ে শক্তিমান যুক্তিবিদদের অন্যতম।

যেহেতু মানুষই তার নিজ জ্ঞানের হাতিয়ার, কাজেই জগৎ সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আমাদেরকে যা বলছে বলে মনে হয় তার মূল্যায়ন করার আগে তাকে [মানুষকে] নিয়েই অনুসন্ধান চালানো আবশ্যক। ১ম খণ্ডে কাণ্ডজ্ঞান-সম্মত বিশ্বাসের কাঠামোর মধ্যে মানুষ সম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান

১. হোল্ট-এর Concept of Consciousness-এর মুখবন্ধ দেখুন।

চালিয়েছি, ঠিক যেমন ঘড়ি বা তাপমানযন্ত্র সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান চালাতে পারতাম পরিপার্শ্বের কতকগুলো দিকের প্রতি সংবেদনশীল একটা যন্ত্র (instrument) হিসাবে, যেহেতু পরিপার্শ্বের প্রতি সংবেদনশীলতা তার[১] সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের একটা অপরিহার্য শর্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা এগিয়ে গেলাম পদার্থিক জগৎ সম্পর্কিত অনুসন্ধানে। আমরা দেখতে পেলাম যে, আধুনিক বিজ্ঞানে, জড় তার কঠিনতা ও দ্রব্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে; সে নিছক একটা ভূতে পরিণত হয়েছে, যে তার আগেকার গৌরবময় দৃশ্যপটগুলোতে আনাগোনা করে ফিরছে। দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা যায় এমন কিছু-একটার সন্ধান করতে গিয়ে, পদার্থবিদেরা জড়কে বিশ্লেষণ করলেন অণুতে, অণুকে পরমাণুতে, পরমাণুকে ইলেক্ট্রন ও প্রোটনে। কয়েক বছরের জন্য বিশ্লেষণ সেখানেই বিশ্রাম গ্রহণের মত একটা জায়গা পেয়ে গেল। কিন্তু এখন হাইজেনবার্গের হাতে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন স্বয়ং ভেঙ্গে কতকগুলো বিকিরণতন্ত্রে,[২] এবং শ্রডিংগারের হাতে কতকগুলো তরঙ্গ-তন্ত্রে[৩] পর্যবসিত হয়েছে—গাণিতিকভাবে এ মতবাদ দু'টো প্রায় একই জিনিস। এবং এগুলো লাগাম-ছাড়া পরাতাত্ত্বিক কল্পচিন্তা[৪] নয়; এগুলো সুচিন্তিত গাণিতিক হিসাব-নিকাশের ফল, এবং বেশীর ভাগ বিশেষজ্ঞ এগুলো গ্রহণ করেছেন।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্য একটা শাখার, অর্থাৎ আপেক্ষিকবাদেরও[৫] এমন দার্শনিক ফলাফল রয়েছে যে, এসব ফলাফল যদি সম্ভাব্য (possible) হয় তাহলে তাদের গুরুত্ব এমনকি আগেরগুলোর চেয়েও বেশী। দেশ ও কালের বদলে দেশ-কাল প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে দ্রব্যের ক্যাটেগরিটার প্রযোজ্যতা আগের চেয়ে কমে গেছে, যেহেতু দ্রব্যের সারাংশ হচ্ছে কালগত স্থায়িত্ব, এবং এখন কোন একটামাত্র জাগতিক কাল নেই। এর ফলে

১. অর্থাৎ, যন্ত্রটার। (অনুবাদক)
২. Systems of radiations.
৩. Systems of waves.
৪. Wild metaphysical speculations.
৫. Theory of Relativity.

পদার্থিক জগৎটা জড়ের স্থায়ী খণ্ড দ্বারা গঠিত জগতের ত্রি-মাত্রিক অবস্থা-সমূহের অনুক্রমের বদলে একটা অবিচ্ছিন্ন চতুর্মাত্রিক ঘটনাধারায় পরিণত হয়। আপেক্ষিকবাদের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে বলকে (force) বর্জন করা, বিশেষতঃ মাধ্যাকর্ষণের বলকে, এবং তার জায়গায় বিভেদাত্মক কার্য-কারণ নিয়মগুলোকে[১] এনে বসানো, যে নিয়মগুলোর সম্বন্ধ কেবল ঘটনার পরিপার্শ্বের সঙ্গে, মাধ্যাকর্ষণকে ইতিপূর্বে যে রকম একটা প্রভাব বলে মনে হতো—দূর থেকে প্রযুক্ত তেমন কোন প্রভাবের সঙ্গে নয়।

পরমাণু সম্পর্কে আধুনিক অনুসন্ধানের দু'টো ফল দেখা দিয়েছে, যার দরুন পদার্থবিদ্যার দার্শনিক তাৎপর্য (bearing) বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে। একদিকে মনে হয় যে, প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছিন্ন পরিবর্তন ঘটে, যে-সব ক্ষেত্রে এক অবস্থা থেকে মধ্যবর্তী অবস্থাগুলোর সাহায্য ছাড়াই হঠাৎ করে লাফ দিয়ে অন্য অবস্থা এসে পড়ে। (সত্য বটে যে, শ্রডিংগার বিচ্ছিন্নতার প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তায় সন্দেহ পোষণ করেন; কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর অভিমত প্রাধান্য লাভ করেনি)। অপর দিকে, বর্তমানে যে-সব পদার্থিক নিয়ম জানা আছে সেগুলোর দ্বারা প্রকৃতির গতিধারা ইতিপূর্বে যে-রকম মনে করা হতো সে-রকম সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। কোন নির্দিষ্ট পরমাণুতে একটা বিচ্ছিন্ন পরিবর্তন (discontinuous change) কখন ঘটবে সে বিষয়ে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না, যদিও পরিসংখ্যানগত গড় সম্পর্কে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। এখন আর একথা বলা যায় না যে, পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো এবং পরিপার্শ্ব সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সত্যগুলো জানা থাকলে, কোন পরমাণুর বর্তমান অবস্থা থেকে তাত্ত্বিকভাবে তার ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্ণয় (calculated) করা যায়। হতে পারে যে, এর কারণ কেবল আমাদের জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা, কিন্তু এটাই যে আসল ব্যাপার সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। এখনকার অবস্থা থেকে বলা যায়, বিগত ২৫০ বছর ধরে পদার্থিক জগৎকে যে-রকম কড়াকড়ি অর্থে নিয়ন্ত্রণধর্মী (deterministic) বলে বিশ্বাস করা হয়েছে সে জগৎ তেমন নয়। এবং বিভিন্ন দিকে অতীতে প্রতিটি পৃথক পরমাণুর নিয়ন্ত্রক হিসাবে যে-সব বিষয়কে নিয়ম

১. Differential causal laws.

(laws) বলে মনে হয়েছে সেগুলো এখন নিছক গড় (averages) বলে ধরা পড়ছে, যে গড়গুলোকে আংশিকভাবে দৈবের নিয়মাবলীতে[১] আরোপ করা চলে।

পদার্থিক জগতের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কিত এ প্রশ্নগুলো থেকে আমরা চলে এসেছিলাম আমাদের প্রত্যক্ষণের কার্যকারণ সম্পর্কিত অন্য প্রশ্নগুলোতে, এবং এ প্রত্যক্ষণগুলোই হচ্ছে সেই উপাত্ত যার উপর আমাদের পদার্থবিষ্তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দেখেছিলাম যে, একটা বাহ্য ঘটনা এবং আমাদের ভেতরকার যে ঘটনাটাকে আমরা বাহ্য ঘটনার প্রত্যক্ষণ বলে মনে করি, তাদের মাঝে সব ক্ষেত্রেই একটা দীর্ঘ কার্যকারণ শৃঙ্খল উপস্থিত থাকে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি না যে, বাহ্য ঘটনাটা এবং আমরা যা দেখি বা শুনি, এ দু'টো সঠিক অর্থে এক; বড়জোর এটা কেবলমাত্র কতকগুলো কাঠামোগত দিক থেকে প্রত্যক্ষটার অনুরূপ হতে পারে। এ সত্যটার দরুন দর্শনে বেশ কিছু পরিমাণ বিশৃঙ্খলার (confusion) সৃষ্টি হয়েছে অংশতঃ এই কারণে যে, প্রত্যক্ষণকে দার্শনিকেরা তার যোগ্যতার চেয়েও বেশী মূল্যবান বলে চিন্তা করেছেন, এবং অংশতঃ এই কারণে যে, দেশের প্রসঙ্গে তাঁরা পরিষ্কার ধারণায় উপনীত হতে পারেননি। দেশকে মনের বিপরীতে জড়ের একটা বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা প্রচলিত ব্যাপার, কিন্তু এটা কেবল 'পদার্থিক' (physical) দেশ সম্পর্কে সত্য। 'প্রাত্যক্ষণিক' (perceptual) দেশও রয়েছে, এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সরাসরিভাবে আমরা যা জানি তার অবস্থান সে দেশের মধ্যেই। পদার্থবিষ্তার দেশের সঙ্গে এ দেশকে একীভূত করা যায় না। পদার্থিক দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সমুদয় প্রত্যক্ষ আমাদের মাথার মধ্যে; কিন্তু প্রাত্যক্ষণিক দেশে আমাদের হাতের প্রত্যক্ষটা আমাদের মাথার প্রত্যক্ষের বাইরে। পদার্থিক এবং প্রাত্যক্ষণিক দেশকে পৃথক না রাখতে পারার ব্যর্থতা থেকে দর্শনে প্রচুর বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটেছে।

তৃতীয় খণ্ডে আমরা মানুষ সম্পর্কে আবার অনুসন্ধান চালানো আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু এবারকার লক্ষ্য ছিল মানুষ তার নিজের কাছে যেভাবে

[১] Laws of chance.

প্রতীয়মান তাকে সেইভাবে দেখা, কোন বহিঃস্থ নিরীক্ষক তাকে যেভাবে জানে সেইভাবে নয়। আচরণবাদীদের মতের বিরোধিতা করে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সত্য আছে যেগুলোকে কেবল সেই-সব ক্ষেত্র জানা যায় যেসব ক্ষেত্রে নিরীক্ষক এবং নিরীক্ষিত একই ব্যক্তি। আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, প্রত্যক্ষণে উপাত্তটা একটা ব্যক্তিগত সত্য (private fact) যাকে কেবল প্রত্যক্ষক সরাসরিভাবে জানতে পারে ; এটা একইভাবে পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত, এবং একে অবশ্যই পদার্থিক ও মানসিক উভয় হিসাবেই মনে করতে হবে। এর পর আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, প্রত্যক্ষণগুলো কারণিকভাবে এমন-সব ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত যেগুলো সম্পর্কে প্রত্যক্ষকের কোন অভিজ্ঞতা হয় না এবং যেগুলো কেবল পদার্থিক জগতের অন্তর্গত হতে পারে—এ মতের সপক্ষে আরোহগত ভিত্তি (grounds) আছে যা থেকে সম্ভাব্যতা পাওয়া যায় কিন্তু নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না।

নির্জীব জড়ের আচরণ থেকে মানুষের আচরণকে পৃথক করা হয় যেসব ব্যাপারকে 'স্মৃতিক' (mnemic) বলা হয় তাদের দ্বারা, অর্থাৎ অতীত ঘটনা-বলীর কোন-একজাতীয় কার্যফল দ্বারা। এ জাতীয় কার্যফলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্মৃতির মধ্যে, শিক্ষণের মধ্যে, শব্দের বুদ্ধিপ্রসূত প্রয়োগের মধ্যে, এবং প্রত্যেক রকমের জ্ঞানের মধ্যে। কিন্তু এ কারণে আমরা মন ও জড়ের মধ্যে একটা নিশ্ছিদ্র (absolute) দেয়াল তুলতে পারি না। প্রথমতঃ, সামান্য পরিমাণে নির্জীব জড়ের মধ্যে অনুরূপ ব্যবহারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যেমন, আপনি যদি গুটানো একটা কাগজকে খুলে ফেলেন তাহলে সেটা আবার নিজেই নিজেকে গুটিয়ে ফেলবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখতে পাই যে, মনের মধ্যে যেমন স্মৃতিগত ঘটনাবলীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঠিক সেই পরিমাণে সজীব দেহের (living bodies) মধ্যেও তাদের দেখা পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, আমি যাকে 'স্মৃতিক' কার্যকারণ বলেছি, যার মধ্যে কালগত দূরত্ব থেকে ক্রিয়া করা হয়, তাকে যদি আমরা এড়াতে চাই তাহলে আমাদের বলতে হবে যে, মানসিক ঘটনাবলীর মধ্যবর্তী স্মৃতিগত ব্যাপার-গুলোর কারণ হচ্ছে অতীত ঘটনাবলীর দ্বারা দেহের পরিবর্তন। অর্থাৎ, যে ঘটনা-সমষ্টি দ্বারা কোন একজন (one) মানুষের অভিজ্ঞতা গঠিত সেটা

কার্যকারণের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং সেটা এমন কতকগুলো কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল যেগুলোর মধ্যে এমন ঘটনাবলী রয়েছে যাদের সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা হতে পারে না।

পক্ষান্তরে, পদার্থিক জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ অমূর্ত : এর কাঠামোটার কতকগুলো যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য আমরা জানি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই জানি না। পদার্থবিদ্যায় এমন কিছুই নেই যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, এই বা ঐ-দিক থেকে, পদার্থিক জগতের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য মানসিক জগতের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন। এইভাবে, উভয় প্রেক্ষিত থেকেই, পদার্থবিদ্যার বিশ্লেষণ এবং মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ উভয়ের দ্বারাই, আমরা দেখতে পাই যে, মানসিক ও পদার্থিক ঘটনাবলীতে একটা কারণিক সমগ্রের[১] সৃষ্টি হয় যা দু'টো ভিন্ন রকম (sorts) দ্বারা তৈরী বলে জানা নেই। বর্তমানে, মানসিক জগতের চেয়ে পদার্থিক জগতের নিয়মগুলোই আমরা বেশী ভাল করে জানি, কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। মানসিক জগতের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা কতক পরিমাণে জানি, কিন্তু পদার্থিক জগতের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা একেবারে কিছুই জানি না। এবং যে-সব অনুমানের উপর পদার্থ-বিদ্যার অন্তর্গত আমাদের জ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে, তাদের প্রকৃতির আলোকে এটা প্রায় অসম্ভব মনে হয় যে, জড় সম্পর্কে অমূর্ত নিয়মগুলো ছাড়া আর কিছু আমরা কখনো জানবো।

চতুর্থ খণ্ডে, বিশ্ব সম্পর্কে দর্শনের যা বলবার আছে তা আমরা বিবেচনা করেছিলাম। এ গ্রন্থে যে মত সমর্থন করা হয়েছে সে মত অনুসারে, একটা বৃহৎ ও প্রভাবশালী সম্প্রদায় দর্শনের জন্য যে কাজ নির্দিষ্ট করেছে, তার কাজ সেটা থেকে কিছুটা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, কান্টের 'এনটিনমি'-গুলোর[২] কথা ধরা যাক। তিনি যুক্তি দেন যে, (১) দেশ অবশ্যই অসীম হবে, এবং (২) দেশ অসীম হতে পারে না; এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে দেশ বিষয়ীগত (subjective)। দেশ যে অবশ্যই অসীম হবে, অ-ইউক্লিডীয়রা সে যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন, এবং এ যে তা হতে পারে না, সে-যুক্তি খণ্ডন

১. One (একটা মাত্র) causal whole.

২. Antinomy – ভাবগত বিরোধ।

করেছিলেন জর্জ ক্যান্টর (Cantor)। ইতিপূর্বে অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori) যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে প্রমাণ করা হয়েছিল যে, যে-সব বিভিন্ন প্রকল্প সম্ভাব্য বলে মনে হয় সেগুলো অসম্ভাব্য যার ফলে একটা মাত্র সম্ভাব্যতা থেকে যায়, এবং সেজন্য দর্শন সেটাকে সত্য বলে ঘোষণা করে। এখন অভিজ্ঞতাপূর্ব যুক্তিবিদ্যা ব্যাবহার করে ঠিক তার উল্টোটা (contrary) প্রমাণ করা হয়, অর্থাৎ যেসব প্রকল্প অসম্ভাব্য বলে মনে হয় সেগুলো সম্ভাব্য। অতীতে যে ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যা ছিল ফরিয়াদীর কৌঁসুলি, সে-ক্ষেত্রে এখন সে আসামীর কৌঁসুলি। তার ফলটা এই যে, আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী সংখ্যক প্রকল্প স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছে। দেশ সম্পর্কিত দৃষ্টান্তটায় ফিরে গিয়ে বলা যায় যে, অতীতে মনে হয়েছিল যে, অভিজ্ঞতার কাছ থেকে যুক্তিবিদ্যা কেবল এক রকমের দেশ পেয়েছে, এবং যুক্তিবিদ্যা এই এক রকমের দেশকে অসম্ভব বলে দেখিয়েছে। এখন, অভিজ্ঞতা থেকে আলাদাভাবে যুক্তিবিদ্যা বহু রকমের দেশ উপস্থিত করছে, এবং অভিজ্ঞতা কেবল আংশিকভাবে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে, যা আছে তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যখন আগে যা মনে করা হতো তার চেয়ে কমে এসেছে, তখন যা হতে পারে তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। যে সংকীর্ণ আবেষ্টনের প্রতি আনাচ-কানাচ পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব ছিল, তার মধ্যে আবদ্ধ থাকার বদলে আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাচ্ছি স্বাধীন সম্ভাবনার এক মুক্ত জগতে যেখানে অনেক কিছু অজ্ঞাত থেকে যায় এজন্য যে, জানার বিষয় এত আছে। অভিজ্ঞতাপূর্ব নীতিমালার মাধ্যমে নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা বিশ্বকে বাঁধার প্রচেষ্টা ভেঙ্গে পড়েছে, অতীতে যুক্তিবিদ্যা ছিল সম্ভাব্যতার পথে বাধা-স্বরূপ—তার বদলে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে কল্পনার এক বড় মুক্তিদাতা; চিন্তাবিমুখ কাণ্ডজ্ঞানের কাছে ধরা পড়ে না এমন অসংখ্য বিকল্প (alternatives) সে উপস্থিত করেছে, এবং, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব সেখানে, আমাদের পছন্দের কাছে যুক্তিবিদ্যা যে বহু সংখ্যক জগৎ উপহার দিচ্ছে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সে অভিজ্ঞতার কাছে ছেড়ে দিচ্ছে।

আমরা যা বলছি তা যদি নির্ভুল হয় তাহলে মূলগতভাবে (essentially) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে দার্শনিক জ্ঞান পৃথক নয়; প্রজ্ঞার এমন কোন বিশেষ

উৎস নেই যা দর্শনের কাছে উন্মুক্ত কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে নয়, এবং বিজ্ঞানে যে-সব ফলাফল পাওয়া যায় দর্শন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সেগুলো থেকে মূলগতভাবে পৃথক নয়। বিজ্ঞান থেকে দর্শনের পার্থক্য কেবল এই যে, দর্শন আরো বিচারধর্মী (critical) এবং আরো সাধারণ (general)। কিন্তু আমি যখন বলি যে দর্শন বিচারধর্মী, তখন আমি একথা বোঝাই না যে, এ বাইরের দিক থেকে জ্ঞানের সমালোচনা করে, কারণ সেটা অসম্ভব; আমি কেবল এই বোঝাই যে, এ আমাদের ধরে-নেওয়া জ্ঞানের বিভিন্ন অংশগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে চায় সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, এবং যেসব অনুমান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সেগুলো সতর্ক ও সম্যক পরীক্ষার কাছে বৈধ বলে প্রতীয়মান হয় কিনা। উদ্দিষ্ট সমালোচনা এমন নয় যে, কারণ ছাড়াই সে বর্জন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বরং সে প্রতীয়মান জ্ঞানের প্রতিটি খণ্ডকে বিবেচনা করে তার নিজস্ব গুণের ভিত্তিতে, এবং এ বিবেচনা সমাপ্ত হবার পরও যা জ্ঞান বলে প্রতীয়মান হয় তাকে রেখে দেয়। ভুলের কিছু আশংকা যে থেকে যায় তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, কারণ মানুষ ভ্রমশীল। ন্যায়সঙ্গতভাবেই দর্শন দাবী করতে পারে যে, ভুলের আশঙ্কা সে কমিয়ে দেয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আশঙ্কাটাকে সে এত ছোট করে ফেলে যে কার্যতঃ তা নগণ্য হয়ে পড়ে। যে জগতে বিভ্রান্তি না ঘটে পারে না সেখানে এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব নয়; দর্শনের কোন সুবিবেচনা-সম্পন্ন প্রবক্তা এর চেয়ে বেশী করতে পেরেছেন বলে দাবী কববেন না।

বিশ্বে মানুষের স্থান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে আমি শেষ করতে চাই। সচরাচর দাবী করা হয়েছে যে, দার্শনিক দেখাবেন কয়েকটা দিক থেকে জগৎটা ভালো। এ রকম কোন কর্তব্য আছে বলে স্বীকার করতে আমি অপারগ। অনুরূপভাবে লোকে এটাও দাবী করতে পারতো যে, হিসাব-রক্ষকের উচিত সন্তোষজনক স্থিতিপত্র (balance sheet) দাঁড় করানো। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যেমন ছল-চাতুরীপূর্ণ আশাবাদ ভালো নয়, দর্শনেও ঠিক তেমনি। জগৎ যদি ভালো হয়, সর্বতোভাবে তা জানা যাক; কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে সেটাও জানা যাক। আর যাই হোক, জগতের ভালোত্ব বা মন্দত্বের প্রশ্নটা বরং বিজ্ঞানের জন্য, দর্শনের জন্য নয়। আমরা যেমন চাই তেমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য যদি জগতের থাকে তাহলে জগৎকে

আমরা ভালো বলবো। অতীতে দাবী করা হয়েছিল যে, জগতের যে এ-রকম বৈশিষ্ট্য আছে, দর্শন তা প্রমাণ করতে পারে, কিন্তু প্রমাণগুলো যে অবৈধ (invalid) তা এখন বেশ সুস্পষ্ট। অবশ্য, এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো জগতের নেই; কেবল এটা অনুমান করা যায় যে, দর্শন প্রশ্নটার মীমাংসা করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত অমরত্বের কথা ধরা যাক। প্রত্যাদিষ্ট (revealed) ধর্মের ভিত্তিতে আপনি তা বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু সে ভিত্তি দর্শনের আওতার বাইরে। আত্মা-সম্পর্কিত গবেষণায় (psychical research) যেসব বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয় তাদের ভিত্তিতে আপনি তাতে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু সেটা বিজ্ঞান, দর্শন নয়। আগেকার দিনে, একটা দার্শনিক কারণে আপনি তাতে বিশ্বাস করতে পারতেন, অর্থাৎ, এই কারণে যে আত্মা একটা দ্রব্য এবং সব দ্রব্যই অবিনশ্বর (indestructible)। অনেক দার্শনিকের মধ্যে, কখনও কখনও অল্প-বিস্তর ছদ্ম আবরণে, এ যুক্তি আপনি দেখতে পাবেন। কিন্তু পরিবর্তনশীল অবস্থা-সম্পন্ন একটা স্থায়ী সত্তার অর্থে দ্রব্যের ধারণাটা এখন আর জগতে প্রযোজ্য নয়। ইলেকট্রনের বেলায় যেমন হয়, তেমনি এটা হতে পারে যে, ক্রমবদ্ধ কতকগুলো ঘটনা কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যে, তাদেরকে একটা সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা কার্যতঃ সুবিধাজনক, কিন্তু যেখানে তা ঘটে সেখানে কথাটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য (fact), কোন পরাতাত্ত্বিক অপরিহার্যতা[১] নয়। সুতরাং, ব্যক্তিগত অমরত্বের গোটা প্রশ্নটা দর্শনের বাইরে পড়ে, এবং যদি তার মীমাংসা হতে হয় তো সেটা হবে বিজ্ঞান অথবা প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের মাধ্যমে।

আর একটা বিষয় আমি আলোচনা করবো, যে সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা কিছু-সংখ্যক পাঠকের মনে হয়তো নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে। কখনও কখনও মনে করা হয় যে, দর্শনের লক্ষ্য হওয়া উচিত কোন উত্তম জীবনে উৎসাহ দেওয়া। এখন, আমি অবশ্য স্বীকার করি যে, এ ফল তার থাকা উচিত, কিন্তু একটা সচেতন উদ্দেশ্য হিসাবে একে নেওয়া দর্শনের পক্ষে উচিত বলে আমি স্বীকার করি না। শুরুতেই বলা যায়, আমরা যখন দর্শন-চর্চায় প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, উত্তম জীবন কি

১. Metaphysical necessity.

তা আমরা ইতিমধ্যেই নিশ্চিতরূপে জানি; এটা অচিন্তনীয় নয় যে, মঙ্গল (good) কি সে সম্পর্কে দর্শন আমাদের মতামত বদলে দিতে পারে, এবং তখন অ-দার্শনিকের কাছে মনে হবে যে, দর্শন থেকে খারাপ নৈতিক ফলাফলের উদ্ভব ঘটেছে। তবে সেটা একটা গৌণ (secondary) ব্যাপার। সার কথাটা এই যে, দর্শন জ্ঞানান্বেষণের একটা অংশ, এবং এই বলে পীড়াপীড়ি করে এ অন্বেষণকে আমরা সীমাবদ্ধ করে দিতে পারি না যে, জ্ঞান লাভের পূর্বে যে জ্ঞানকে আমরা নৈতিক দিক থেকে শিক্ষাপ্রদ (edifying) বলে মনে করেছিলাম, দর্শন থেকে পাওয়া জ্ঞান অবশ্যই সেরকম হবে। আমি মনে করি যে, একথা বললে সত্য বলা হবে যে, 'সব' জ্ঞান থেকেই নৈতিক শিক্ষা পাওয়া যায়, যদি নৈতিক শিক্ষা (edification) সম্পর্কে একটা নির্ভুল ধারণা আমাদের থাকে। যখন এ রকম ঘটেনি বলে মনে হয় তখন তার কারণটা এই যে, আমাদের নৈতিক মানদণ্ডগুলো অজ্ঞতার উপর স্থাপিত। সৌভাগ্যক্রমে এরকম ঘটতে পারে যে, অজ্ঞতার উপর স্থাপিত একটা নৈতিক মানদণ্ড সঠিক, কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে জ্ঞান তাকে ধ্বংস করবে না; যদি জ্ঞান তাকে ধ্বংস করতে পারে তাহলে তা অবশ্যই ভ্রান্ত। সুতরাং, দর্শনের সচেতন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কেবলমাত্র যতদূর সম্ভব সম্যকভাবে জগৎকে 'বোঝা' (understand), নৈতিক দিক থেকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয় এমন কোন যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠিত করা নয়। যাঁরা দর্শন চর্চায় প্রবৃত্ত তাঁদেরকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে তাঁদের, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক, সমুদয় পূর্বধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে: কতকগুলো দার্শনিক বিশ্বাস কখনও বিসর্জন না দেওয়ার জন্য কোন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যদি তাঁদের থাকে, তাহলে তাঁদের মানসিক কাঠামো সেরকম নয় যে রকম কাঠামোতে দার্শনিক অনুসন্ধান লাভজনক হতে পারে।

কিন্তু যদিও কোন নৈতিক উদ্দেশ্য দর্শনের থাকা উচিত নয়, তথাপি কতকগুলো ভাল নৈতিক ফলাফল তার থাকা উচিত। জ্ঞানের যে-কোন নিঃস্বার্থ অনুসন্ধান আমাদের শক্তির সীমারেখা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয়, এবং সেটা হিতকর; একই সঙ্গে, জ্ঞান আহরণে যে পরিমাণে আমরা কৃতকার্য সেই পরিমাণে আমাদের দুর্বলতার সীমারেখা সম্পর্কে সে আমাদের শিক্ষা দেয়, এবং এটাও একই পরিমাণে বাঞ্ছনীয়। এবং দার্শনিক জ্ঞানের,

অথবা বরং বলা যায় দার্শনিক চিন্তার, কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যেগুলো অন্যান্য বৌদ্ধিক কর্মপ্রচেষ্টার (pursuits) মধ্যে সমান মাত্রায় উপস্থিত নেই। তার সাধারণত্বের (generality) মাধ্যমে সে আমাদেরকে সক্ষম করে মানবিক আবেগগুলোকে তাদের সঠিক অনুপাতের মধ্যে দেখতে, এবং ব্যক্তি, শ্রেণী ও জাতিবর্গের মধ্যে অনেক বিবাদের অন্তঃসারশূন্যতা (absurdity) উপলব্ধি করতে। সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে সেই বৃহৎ, অপক্ষপাতী অনুধ্যান যা মুহূর্তের জন্যে আমাদেরকে আমাদের নিছক ব্যক্তিগত লক্ষ্যস্থলের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে—মানুষের পক্ষে তার যত কাছাকাছি আসা সম্ভব দর্শন তার ততটুকুই কাছে আসে। বুদ্ধির এক ধরনের বৈরাগ্য আছে জীবনের অংশ হিসাবে যা মঙ্গলজনক, যদিও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে জীবন সংগ্রামরত প্রাণীরূপে থেকে যেতে হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা জীবনের সবখানি হতে পারে না। বুদ্ধির বৈরাগ্যের জন্যে প্রয়োজন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জ্ঞানান্বেষণে রত ততক্ষণ জানার ইচ্ছার খাতিরে আর-সব ইচ্ছাকে আমরা অবদমিত করে রাখবো। যতক্ষণ আমরা দর্শনচর্চা করছি ততক্ষণ, জগৎটা যে ভালো, অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের (sect) ধর্মমতগুলো যে সত্য, তা প্রমাণ করার অভিলাষকে জড় প্রকৃতিগত দুর্বলতা[১] বলে মনে করতে হবে—এসব প্ররোচণাকে দৃঢ় হস্তে সরিয়ে রাখতে হবে একদিকে। কিন্তু তার বদলে আমরা পাই, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মধ্যে মরমীবাদী (mystic) যে আনন্দ (joy) অনুভব করেন, তারই কিছুটা। এ আনন্দ দর্শন দিতে পারে, কিন্তু কেবল তাদেরকে যারা, তার সমস্ত কষ্টকর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে, তাকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করতে ইচ্ছুক।

আধুনিক বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত কোন দর্শন যে জগৎকে আমাদের বিশ্বাসের কাছে উপস্থিত করে তা অনেক দিক থেকে, পূর্ববর্তী শতাব্দিগুলোতে যে জড়-জগতের ধারণা করা হয়েছিল, তার চেয়ে কম বিরুদ্ধভাবাপন্ন। যেসব ঘটনা আমাদের মনের মধ্যে ঘটে সেগুলো প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রবাহের অংশ, এবং আমরা জানি না যে, অন্যত্র যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। বর্তমানে বিজ্ঞান যেভাবে দেখাচ্ছে তাতে, পদার্থিক জগৎকে আগে যেভাবে চিন্তা করা হতো তার চেয়ে সে জগৎ সম্ভবতঃ কার্যকারণ

১. Weakness of the flesh.

নিয়ম দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত ; অল্প-বিস্তর খামখেয়ালী ভাবে, এমনকি পরমাণুতেও লোকে এক ধরনের সীমাবদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছা আরোপ করতে পারে। আমাদেরকে সুবিপুল জাগতিক শক্তিসমূহের মুঠোর মধ্যে শক্তিহীন ও ক্ষুদ্র বলে চিন্তা করার কোন আবশ্যক নেই। সব পরিমাপই প্রথাগত (conventional), এবং এমন একটা সম্পূর্ণ কার্যোপযোগী পরিমাপ-ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব যে ব্যবস্থা অনুসারে একজন মানুষ সূর্যের চেয়েও বৃহৎ হতে পারে। সন্দেহ নেই যে, আমাদের শক্তির সীমা আছে, এবং এ সত্যটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। কিন্তু সে সীমারেখাগুলো কি কি—আমরা শক্তি (energy) সৃষ্টি করতে পারি না, একথা বলার মতো সম্পূর্ণ অমূর্ত উপায়ে ছাড়া অন্য কোন ভাবে আমরা তা নির্দেশ করতে পারি না। মানব-জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তি সৃষ্টি করতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ; যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট পথে শক্তিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হওয়া, এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যত বেড়ে যেতে থাকে তত বেশী করে এ কাজটা আমরা করতে পারি। মানুষের প্রথম চিন্তা করতে আরম্ভ করার মুহূর্ত থেকে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলো তাদের উপর উৎপীড়ন চালিয়েছে ; ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী, এবং দুর্ভিক্ষ তাদেরকে ভরে দিয়েছে আতঙ্কে। শেষ পর্যন্ত এখন, বিজ্ঞানের দৌলতে, এজাতীয় ঘটনা থেকে এ পর্যন্ত যে দুঃখ-কষ্ট উৎপন্ন হয়েছে তার অনেকখানি কি করে এড়ানো যায়, মানবজাতি তা আবিষ্কার করছে। আমার কাছে যেমন মনে হয়, যে মানসিক ভাব নিয়ে আজকের মানুষের উচিত বিশ্বের মুখোমুখি হওয়া তা একটা প্রশান্ত (quiet) আত্ম-মর্যাদার ভাব। বিজ্ঞান যে বিশ্বকে জানে সে বিশ্ব স্বয়ং (in itself) মানুষের প্রতি বন্ধু অথবা শত্রুভাবাপন্ন নয়, কিন্তু ধৈর্যশীল জ্ঞান-সহকারে তার দিকে অগ্রসর হলে তাকে দিয়ে একজন বন্ধুর মত কাজ করানো যায়। বিশ্ব যেখানে সংশ্লিষ্ট, সেখানে যে একটা জিনিস প্রয়োজন সে হচ্ছে জ্ঞান। সজীব বস্তু-সমুদয়ের মধ্যে কেবল মানুষই সেই জ্ঞানার্জনে নিজেকে সক্ষম বলে প্রমাণ করেছে, তার পরিপার্শ্বের উপর কিয়ৎ পরিমাণ প্রভুত্ব অর্জনের জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক। ভবিষ্যতে, অথবা অন্ততঃ যে-কোন পরিমাপযোগ্য ভবিষ্যতে, মানুষের কাছে বিপদ উপস্থিত হবে, প্রকৃতির কাছ থেকে নয়, বরং মানুষের নিজেরই কাছ থেকে। সে কি তার নিজের শক্তিকে

প্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহার করবে? অথবা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ভেতর থেকে যে শক্তি উৎসারিত হয়েছে, সে কি সেই শক্তিকে তার স্বজাতীয়দের সঙ্গে সংগ্রামে রূপান্তরিত করবে? ইতিহাস, বিজ্ঞান, ও দর্শন, সবকিছুই মানবজাতির মহৎ সমষ্টিগত কীর্তিরাজি (achievements) সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে। খুবই মঙ্গলের কথা হতো যদি প্রতিটি সভ্য মানুষের মধ্যে এ কীর্তিরাজির একটা বোধ এবং ভবিষ্যতে এগুলোর চেয়েও বৃহত্তর ব্যাপারের সম্ভাবনার একটা উপলব্ধি জাগতো, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, যেসব তুচ্ছ ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে ব্যক্তির ও জাতির আবেগ-ইচ্ছার অপচয় ঘটছে সে-সব বিষয়ে তার মধ্যে একটা ঔদাসীন্য জাগতো।

জীবনের উদ্দেশ্যসমূহ এবং জীবনের যেসব উপাদানের অন্তর্নিহিত মূল্য আছে, দর্শনের উচিত সে সব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান দেওয়া। কার্যকারণের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা যে ভাবেই সীমিত হোক না কেন, মূল্যের (values) ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতার কোন সীমারেখা স্বীকার করার কোন কারণ আমাদের নেই: যাকে আমরা তার নিজ গুণে ভালো বলে বিবেচনা করি, আমাদের নিজস্ব অনুভূতি ছাড়া আর কিছুর প্রতি লক্ষ্য না করে আমরা তাকে ভালো বলে বিবেচনা করে যেতে পারি। দর্শন স্বয়ং জীবনের উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু পূর্ব-সংস্কারের (prejudice) উৎপীড়ন ও সংকীর্ণ দৃষ্টিজাত বিকৃতির হাত থেকে সে আমাদের মুক্ত করতে পারে। প্রেম, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও জীবনের আনন্দ: আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যতই বিস্তীর্ণ হোক না কেন, এ জিনিসগুলোর ঔজ্জ্বল্যের তাতে হানি হয় না। এবং দর্শন যদি আমাদেরকে এ জিনিসগুলোর মূল্যানুভবে সাহায্য করতে পারে, তাহলে অন্ধকার জগতে আলোক সঞ্চারের লক্ষ্যে মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সে তার ভূমিকা পালন করেছে বলা যাবে।

———

নির্ঘণ্ট

অ

অর্থ—৬৬, ৯৩, ১০৮
অন্তর্দর্শন—১২-১৬, ২২৯ (ক্রমশ), ২৫৬ (ক্রমশ)
অনিবার্যতা, নরত্বারোপী ধারণা—১৪৫, ১৪৮
অনুবন্ধের নিয়মাবলী—১৪৯
অনুভূতি, মানসিক ঘটনা হিসাবে—২৫৭
অনুমান, 'শরীরবর্তীয়'—১৭, ১৭১, [১৯৩]
আরোহী ও গাণিতিক—১০৫ (ক্রমশ)
সহানুমানিক—১০০
অনুষঙ্গ নিয়ম—৪৪ (ক্রমশ), ৬২, ৮২, ২২৯
'অপ্রকৃত বর্তমান'—২৪৮, ২৫১
অভিজ্ঞতা, উদ্দীপকের উত্তরে প্রতিক্রিয়ায় তার কার্যফল—২৩০ (ক্রমশ)
অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori), কার্যকারণ সম্বন্ধ অভিজ্ঞতাপূর্ব নয়—১৮৯
জ্ঞান—৩২০ (ক্রমশ), ৩৪২
সম্ভাব্যতা, কীন্সের মতবাদ অনুসারে ৩৫৩-৫৪
যুক্তিবিদ্যা—৩৮৪
অভিলাস—২৫৮
অভ্যাস-গঠন—৪৭
অভ্যাস-স্মৃতি—২৩৯, ২৪৯
[অসুখ—২৫৭]
অহম—২৭৩

আ

আকার (size), এর অর্থ [জ্ঞান]—১৯৩
'আত্মসর্বস্বতাবাদ'—৩৭৬
আকারের উত্তরে প্রতিক্রিয়া—১০৭ (ক্রমশ)
আরোহ, বৈধতার সমস্যা—১৭

আরোহের সূত্র—৩৪৬ (ক্রমশ)
কীনস্ সাহেবের পর্যালোচনা—৩৪৯ (ক্রমশ)
ক্রিয়া [অভ্যাস] হিসাবে—১০১ (ক্রমশ)
যৌক্তিক সমস্যা—৩৪৭ (ক্রমশ)
আইনস্টাইন, ১২৪, ১৪৭, ৩০৭, ৩১০, ৩১৯
আবেগ, অপরিহার্য শর্তাবলী—২৭৮
অযৌক্তিক মতামতের জন্ম দেয়—২৮১
সাপেক্ষীকরণ যোগ্যতা—২৭৯
অ্যাস্টন. ডঃ এফ. ডব্লিউ—১২৫
অ্যারিস্টটল—২৮৯
আত্ম-নিরীক্ষণ—১৫৯, ২০৯ (ক্রমশ)
এমন জ্ঞান দেয় যা পদার্থবিদ্যার অঙ্গ নয়—২২৩
ডঃ ওয়াটসনের মতামত—২১৩ (ক্রমশ)
ডেকার্টের মতবাদের ভিত্তি—২০৬ (ক্রমশ)
আপেক্ষিকতা, মতবাদ, একটি জাগতিক কাল ও দেশের বদলে
'দেশ-কাল'—১৩৭
এর কিছু ফলাফল—১৩৭ (ক্রমশ)
এর দার্শনিক ফলাফল—৩৭৯
এর মধ্যে 'শক্তি'র স্থান নেই—১৪১
গতিশীল জড়বস্তুর বদলে 'ঘটনা'—১৩৯-৪০
'ঘটনা'র মধ্যবর্তী সম্বন্ধ—১৪০ (ক্রমশ)

ই

'ইচ্ছা'—৭৭, ২৮৪ (ক্রমশ)
ইচ্ছা করা, মানসিক ঘটনা হিসাবে—২৫৭-৫৮
ইচ্ছাপূরণ ও ভীতিপূরণ—২৪৭
ইথার বা শূন্য দেশ—১৩৬
ইলেক্ট্রন—১২৬ (ক্রমশ), ১৪৭, ১৮২

উ

'উক্তি', এর সংজ্ঞা – ৩৩৫
উইলিয়াম জেম্‌সের মত সমর্থিত—২৭৭
উন্মেষমূলক গুণাবলী—৩৬৪
উপযোগবাদী দর্শন—২৯২ (ক্রমশ)
'উপাত্ত'—৩৪৩ (ক্রমশ), ৩৫৬

এ

একত্ববাদী ও বহুত্ববাদী, বিতর্ক – ৩২২ (ক্রমশ)
বহুত্ববাদ বিজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের মত – ৩২৫-২৬
এডিংটন, প্রফেসর—৩৫৩, ৩৬০

ও

ওগডেন ও রিচার্ড্‌স, মেসার্স—৬৭
ওয়াটসন, ডঃ জে. বি.—১৩ ২৯, ৩১, ৪১, ৪৪-৫০, ৮৯ (ক্রমশ), ১৬০ (ক্রমশ), ২০৬-৭, ২১৩ (ক্রমশ), ২২৬-২৭,২৩৯, ২৭৯, ২৮২, ৩৩৪

ক

কনফিউসিয়াস—২৮৯
কল্পনার বিশ্লেষণ—২৪২ (ক্রমশ)
কল্পনার সারবস্তু—২৪৩
অসাধারণ কল্পনা-শক্তি—২৪৫
কল্পনা ও বিশ্বাস—২৪৬ (ক্রমশ)
স্মৃতি থেকে পার্থক্য—২৪৭
কবিতা – ২৮০
কাণ্ট—১০১, ২৫৬, ৩০৭, ৩১৮, [৩৪২], ৩৮৩
কাণ্ডজ্ঞানে চৈতন্যের ধারণা—২৬৯ (ক্রমশ)
কার্যকারণ, অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্বাস হিসাবে—৬, ১৮৯
'অবশ্যম্ভাবী' অনুক্রমের ধারণা – ১৪৫
তার বৈজ্ঞানিক ধারণা—১৮১ (ক্রমশ)

'কারণ', কান্টের মতবাদ—৩১৮ (ক্রমশ)
কাল, জাগতিক নয়—১৩৭ (ক্রমশ), ১৯৯
কীন্‌স, মি, আরোহের সমস্যাবলী সম্পর্কে—৩৪৭ (ক্রমশ)
ক্যানন—২৭৮
ক্যান্টর, জর্জ (Georg Cantor)—৩৮৪
কোয়ান্টাম পরিবর্তন—১৩৪
কোহ্‌লার—৪৯ (ক্রমশ)
কৌতূহল—২৮১
'ক্রনো—জিওগ্রাফি'—৩৬৫

গ

গতি—১৫০, ২০৭
গেস্টাল মনোবিজ্ঞান—৪৯, ৫৪, ৫৭, ৮৭, ৩১৮
গ্যালিলিও—১০১
গ্রিফিথ, মি, পার্সি—১৫০

ঘ

ঘটনা, পদার্থবিদ্যায়—১৩৯ (ক্রমশ)
কাঠামো ও গাণিতিক নিয়মাবলী—১৯৮
ঘটনা থেকে বস্তুর সংঘঠন—৩৫৮
ঘটনা-পরম্পরা—১৪৯ (ক্রমশ)
ন্যূনতম—৩৫৯
'মানসিক'—১৭৭, ৩৬১ (ক্রমশ)

চ

চিন্তনহীন কথন—২৪২
চিন্তা—২০৭ (ক্রমশ), ২২১ (ক্রমশ), ৩০৮-৯, ৩৩৯-৪০
'চৈতন্য'—৭৬
উইলিয়াম জেমসের মত—২৬৮
শব্দটার দুটো ভিন্ন অর্থ—২৬৮
এক জাতীয় স্মৃতিগত কার্যফল—৩৭২

ছ

ছবি, প্রতিচিত্র হিসেবে—২৩৩

জ

জগৎ, পদার্থিক, এর বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ—১৯০
এর বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, সম্পূর্ণ অমূর্ত—৩৮৩
ঘটনাবলীর চার-মাত্রাবিশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন সমগ্র—৩৮০
'জন কল্যাণ'—২৯৩
জড়, পরমাণুর গঠন—১২৪ (ক্রমশ)
আধুনিক পদার্থবিদ্যার ধারণায়—১৯৮, ৩৭৯
ঘটনার দ্বারা সংঘটিত—৩৫৮
পুরাতন মত, এখন গ্রহণীয় নয়—১৯৯ (ক্রমশ)
সম্ভবতঃ মানসিক এককের সংগঠন—৩৭৪
সারবস্তু—১৮৪
স্থায়িত্ব, কেবল মোটামুটি—৩৬০
জড়বাদ, দর্শন হিসাবে—২০১
জানা (cognition)—৭৭, ২৫৭ (ক্রমশ), ২৭৭
জানা, মানসিক ঘটনা হিসাবে—২৫৭
জেম্‌স, উইলিয়াম—২৬৮, ২৮৪
জ্ঞান—৩২০ (ক্রমশ), ৩৪২
জ্ঞান, পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যেভাবে প্রকাশিত—২৫ (ক্রমশ)
অন্তর্দার্শনিক ও অন্যান্যের মধ্যে পার্থক্য—২৭৫
অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori)—৩২০ (ক্রমশ)
আচরণবাদী মত—১১০ (ক্রমশ)
প্রত্যক্ষগত—৭৪ (ক্রমশ)
ভাষার কাঠামোজনিত সীমা—৩৪০ (ক্রমশ)
জ্ঞান-প্রতিক্রিয়া—২৭৬, ৩৬২
জ্যামিতি, ভূগোলের মতোই অভিজ্ঞতানির্ভর—৩১৯ (ক্রমশ)

ড

ডিউই, জন—৩৭৮
ডেকার্ট—১২, ২০৬ (ক্রমশ), ৩০৪ (ক্রমশ)
ডেকালগ্—২৯০
ড্যাল্টন—১২৫

ত

তারকা ও অণু (এডিংটন)—৩৬০
তেজস্ক্রিয়তা—১২৫, ১৩০

থ

থর্নডাইকের 'বিবেচনা-সাপেক্ষ নিয়মাবলী'—৪২ (ক্রমশ)

দ

দ্য-রগলি—৩৫৯
দর্শন, তার কাজ—২, ১৩৭, ৩০৩
উপযোগবাদ—২৯২ (ক্রমশ)
ডেকার্ট, স্পিনোজা ও লাইবনিজের মতবাদ—৩০৪ (ক্রমশ)
দর্শন হিসাবে আচরণবাদ—১৬২ (ক্রমশ)
লক, বার্কলী ও হিউম—৩১৩ (ক্রমশ)
সচেতন উদ্দেশ্য—৩৮৭
দেশ, আপেক্ষিকতাবাদে একটিমাত্র ও স্থায়ী হিসাবে দেশের বিলুপ্তি—১৩৭
পদার্থিক ও প্রাত্যক্ষণিক—১৭২ (ক্রমশ), ৩১০ (ক্রমশ), ৩৮১
দেশ-কাল, আপেক্ষিকতাবাদে—১৩৭ (ক্রমশ)
এর গঠন—১৮৩
এর মধ্যে বিন্দু মুহূর্ত—৩৫৮
'দেহ-মন সহচার'—৩০৬
দৃষ্টি, স্পর্শের সঙ্গে তুলনায়—১৯৬ (ক্রমশ)
দ্রব্য [পদার্থ, অধিবস্তু]—৬, ৩১১ (ক্রমশ), ৩৭৯

ধ

ধারণা—২৫৯

ন

নাম—৬৮
নাড়ীবিহীন গ্রন্থি—২৭৮
নিউটন—৩১০
নিয়ম (Laws), কারণিক—১৮০ (ক্রমশ)
প্রমাণ [সাক্ষ্য]—১৮৫
সার্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী—১৮৭
নিরপেক্ষ একত্ববাদ তত্ত্ব—২৬৭, ২৬৮, ৩৬৪, ৩৭৮
নিসবেট, আর. এইচ., সম্ভাব্যতা সম্পর্কে—৩৫৫
নীতিবিদ্যা, প্রাচীন চিন্তাবিদদের মতামত—২৮৯
উপযোগবাদ—২৯২ (ক্রমশ)
চরম নৈতিক বিধি—২৯৯ (ক্রমশ)
প্রধানতঃ সামাজিক—২৯৭
প্রাধিকারের আনুগত্য সদগুণ এই মতামত—২৮৯ (ক্রমশ)
'শুভ'র ধারণা—২৯৩
নীতিশিক্ষা—২৮৭
'নৈতিক সমস্যাবলী'—২৯০

প

পদার্থবিদ্যা, আধুনিক—১২৩
আগের চেয়ে কম নিয়ন্ত্রণবাদী—৩০৭
আমাদের পদার্থবিদ্যার জ্ঞান—১৯০ (ক্রমশ)
এবং প্রত্যক্ষণ—১৫৫ (ক্রমশ)
এবং মনোবিজ্ঞান—৩৬৪, ৩৭৪
কেবল গাণিতিক বৈশিষ্ট্যাবলী আবিষ্কারযোগ্য—১৯৮
পদার্থবিদ্যায় কারণিক নিয়মাবলী—১৪৪ (ক্রমশ) ১৮২ (ক্রমশ)
পদার্থবিদ্যায় দৈশিক সম্বন্ধ—১৭২ (ক্রমশ)
পরিপ্রেক্ষিত—১৯১
পারমিনাইডিস, একত্ববাদী মতের পূর্ণতাপ্রাপ্তি—৩২২

পুনরাভিজ্ঞান, দুই রূপ—২৫০
পেরি, প্রফেসর, আর. বি.—৩৭৮
প্রকৃতির মধ্যে ছেদহীনতা (continuity)—১৩৭
প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা—১২৭, ১৩৪, ১৩৭
পরমাণু, তত্ত্ব—১২৪ (ক্রমশ)
আধুনিক গবেষণার দার্শনিক ফলাফল—৩৭৯
যে কেন্দ্র থেকে বিকিরণ বেরিয়ে আসে—১৯৭
পরমাণুর গঠন সম্পর্কে হাইজেনবার্গ-শ্রডিংগার মতবাদসমূহ—৩১২
পরিচয়, স্মৃতির অন্যতম ধাপ—২৪৯ (ক্রমশ)
প্রকাশ্যতা, পদার্থিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে—২১৬
প্রতিক্রিয়া, শিক্ষালব্ধ—২৯, ৪৪, ৪৭ ৪৮, ৬৩, ১০২
প্রত্যক্ষ (percepts)—১৬৮, ১৭০, ১৭২ (ক্রমশ)
প্রত্যক্ষণ, অন্তর্দর্শন থেকে পার্থক্য—১৩ (ক্রমশ)
এবং অনুমান—৮৩ (ক্রমশ)
এবং পদার্থবিদ্যার কারণিক নিয়মাবলী—১৮২ (ক্রমশ)
বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক, কারণিক ও গাণিতিক—১৮৭
বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে—৮৪ (ক্রমশ)
বিষয়ীগত উপাদান—১৬৪ (ক্রমশ)
বাহ্য ঘটনার প্রত্যক্ষণের বিশ্লেষণ—১৫৫ (ক্রমশ)
সংবেদনশীলতার এক প্রজাতি—৭৬, ১৫৫
প্রবণতা, এর পরিমাণগত নিয়মাবলী—১৮১
প্রমাণ [সাক্ষ্য]—১৫ (ক্রমশ), ২১৭
পর্যায়ক্রমের [অনুক্রম] নিয়মাবলী—১৪৭
প্রাত্যক্ষণিক জ্ঞান, এ জাতীয় জ্ঞান ক্রিয়ার পর্যায়সমূহ—২৫ (ক্রমশ)
প্রাণবাদী—৩৪
প্রাণীর শিক্ষণ, পর্যালোচনা—(ক্রমশ)
থর্নডাইকের সূত্রাবলী—৪২-৪৩
শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া—৪৭

প্ল্যাংকের ধ্রুবক—১২৮ (ক্রমশ)
প্লেটো—২৮৯

ফ

ফ্রয়েডীয় 'অবচেতন'—২৮২

ব

বস্তু (object), আমাদের দেখার সময় কি ঘটে—১৮৭ (ক্রমশ)
বাক্য—৬৫, ৬৯, ৯৫, ৩২৮, ৩৪০
বাক্য-বিন্যাস, দর্শনের উপর এর প্রভাব—৩১৩
এর নিয়মাবলী ও পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলীর মধ্যে সংযোগ —৩৩৯-৪০
বার্কলী—৩১৫ (ক্রমশ)
বার্গসঁ—৯০, ৯৩, ২৫২
বাটলার, স্যামুয়েল—৯০
বাসনা, আচরণবাদী মত—১১২ (ক্রমশ)
অন্তর্দার্শনিক মত—২৮৩ (ক্রমশ)
বাস্তববাদ, সরল—১৬৫, [২২৩, ২৭১]
বিবেক—২৯১
বিরতি, দেশ-সদৃশ ও কাল-সদৃশ—১৪০
বিশ্ব, দর্শন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—৩০৩
এর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ—৩৮৫ (ক্রমশ)
"বিশ্বাস"—৩২৭, ৩৩৩ (ক্রমশ)
ঐ, সংজ্ঞা—৩৩৭
বিশ্বাস, প্রচলিত (common)
বিশ্বাসগুলোর ত্রুটিবিচ্যুতি—৩ (ক্রমশ)
বিষয়গত ও বিষয়ীগত অনুসন্ধান—৪০
বিষয়মূলকতা [বিষয়গততা]—১৯৪ (ক্রমশ), ২১৬
বিষয়ীমুখিতা [বিষয়ীমূলকতা]—১৬৩, ১৬৯, ১৭০, ১৯৪ (ক্রমশ)
বুদ্ধ—২৮৯

বেকন—১০১
ব্রড, ডঃ—২৩৯, ২৪৮, ৩৬৪, ৩৭৮
ব্রেথওয়েট, আর. বি.—৩৪৭
ব্রেনটানো—২৫৮
ব্র্যাডলী, একত্ববাদী মত—৩২২
সম্বন্ধের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলোর সমালোচনা—৩২৪
'বৈধ আচরণ'—২৯৩
বোর, নীল্‌স্‌, পরমাণু তত্ত্বে তাঁর সংযোজন—১২৮ (ক্রমশ)

ভ

ভাষা, দৈহিক অধ্যাস হিসেবে—৫৬ (ক্রমশ)
আদর্শ যৌক্তিক ভাষার শব্দ—৩৩০ (ক্রমশ)
ভাষা ও বস্তুসমুদয়, তাদের সম্বন্ধ—৩৪০
মনোবৈজ্ঞানিক দিক—৬১
ভিটগেনস্টাইন—৩৪১
ভীতি ও ক্রোধ—২৭৯
ভূমিতিক—১৪২, ১৪৮

ম

মন, পদার্থিক কারণ-প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদ—১৮৯
আধুনিক ধারণাবলী—৩৬১ (ক্রমশ)
ঘটনা থেকে উন্মেষিত—৩৬৭
সংজ্ঞাসমূহ—৩৬৮ (ক্রমশ)
মন ও জড়, প্রচলিত ধারণাবলী—১৭৭
অবাস্তব [বিভ্রান্তিকর পৃথকীকরণ]—১৭৮, ২৫৬
কার্টেজীয় দ্বৈতবাদ—৩০৭
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—১৮৯
নিরপেক্ষ একত্ববাদের তত্ত্ব—২৬৭
প্রভেদ, কিভাবে দূর হয়—১৮৬
লাইবনিজের মতবাদ—৩০৯ (ক্রমশ)

মন ও জড়ের দ্বৈত—১৭৭, ৩০৭
মনাদ—৩১০
মনোযোগ—২৬২
মনোবিজ্ঞান—২৪, ২১৯-২০, ২৩৫
এবং পদার্থবিদ্যা—৩৬৪-৬৫, ৩৭৪
মরমীবাদী—২৯২, ৩৪০, ৩৮৮
মাইনঙ—২৫৮
মাক—২৬৩, ৩৭৮
মাধ্যাকর্ষণ, ১৪৭ (ক্রমশ), ১৮৩, ৩৫৯
মানবদেহ—৩৪, ১৭৫
মানসচিত্র, দৃষ্টিগত, শ্রুতিগত ও স্পর্শগত—২২৪
আচরণবাদী ব্যাখ্যা—২২৫ (ক্রমশ)
সংজ্ঞা—২৩৪ (ক্রমশ)
সংবেদন থেকে পার্থক্য—২২৭ (ক্রমশ)
স্মৃতির প্রথম ধাপ হিসাবে—২৪৯
'মানসিক' ঘটনা (events)—১৭৭, ২৭৩ (ক্রমশ), ৩৬১ (ক্রমশ)
'মানসিক' সংঘটন (occurrences)—২৫৭, ২৭০
মানুষ, বিশ্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ—৩৭৮, ৩৮১, ৩৮৩ (ক্রমশ)
ম্যাক্সুয়েলের সমীকরণ—১৮২
মিনকাউস্‌কি—৩০৭
মিল, জে. এস. তাঁর আরোহের নিয়মাবলী—৩৪৮
ম্যুর, ডঃ জি. ই. 'শুভ'র ধারণা সম্পর্কে—২৯৩
মেণ্ডেলিভ—১২৫

য

যুক্তিবিদ্যা—৩৩৯, ৩৮৪
'যৌক্তিক পরমাণুবাদ'—৩১৮

র

রাদারফোর্ড, স্যার ই.—১২৬-২৭

ল

লক—৩১৩ (ক্রমশ)
লাইবনিজ—৩০৭, ৩১০ (ক্রমশ)

শ

শক্তি [বল]—১৪১, ১৪৪, ১৪৮, ১৫২ (ক্রমশ)
শক্তি, জড় থেকে শূন্যদেশে বিকিরণ—১৮২
    শূন্যদেশে জড়ের উপর প্রভাব—১৮৪
    শূন্যদেশে শক্তির বিস্তার—১৮৪
শব্দ, এর উদ্দেশ্য—১৫
    আদর্শ যৌক্তিক ভাষায় শব্দ—৩৩০ (ক্রমশ)
    এর অর্থ-৬৬ (ক্রমশ), ৩২৯-৩০
    এর সম্বন্ধ—৭১-৭২
    কথিত ও লিখিত—৬০
    ভৌত [পদার্থিক] ঘটনা হিসাবে—৫৭ (ক্রমশ)
    শিশুরা কিভাবে আয়ত্ত করে - ৬২ (ক্রমশ)
শিক্ষণ, নিয়মাবলী—৩২, ৩৭ (ক্রমশ)
    দুই উপায়—৫১
    শিশুদের মধ্যে—৫৪, ৬২
    সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে—১১৮ (ক্রমশ)
শিক্ষা—২৯৮
শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া—৪৭
শিলার, ডঃ এফ. এস. এস.—১০০
শূন্যদেশে তরঙ্গ—১৩৬ (ক্রমশ)
শেফার, ডঃ এইচ. এম.—৩৬৪, ৩৭৮
শ্রডিংগার—১২৪, ১৩৩ (ক্রমশ), ৩৫৯, ৩৭৯, ৩৮০
শেক্সপীয়র—২৪৫

স

সক্রেটিস—২৮৯
সংবেদন, মানসচিত্র থেকে পার্থক্য—২২৮

প্রত্যক্ষণের বিপরীত হিসাবে—২৬০
বিলীয়মান—২৫১
সংবেদনশীলতা—৭৬ (ক্রমশ), ১১০, ১৫৫, ২২৫
সত্য [সত্যতা]—১১৭, ৩৩৭ (ক্রমশ)
সত্যতা ও মিথ্যাত্ব, এ বিষয়ে রহস্যের কারণাবলী—৩২৭
দুটো প্রশ্ন—৩২৭ (ক্রমশ)
বাক্যের অর্থ পরীক্ষিত—৩২৮ (ক্রমশ)
'বিশ্বাস'—৩৩৩ (ক্রমশ)
এর সমস্যাবলী—৩৩৩ (ক্রমশ)
মিথ্যাত্বের চরম পরখ—৩৩২
যেসব ভিত্তিতে উক্তিকে সত্য বা মিথ্যা মনে করা হয়—৩৩১-৩২
স্বপ্ন—৭৯, ১৬১, ২২২, ২২৩, ২৩৬, ২৪১, ২৪৬
সমারফেল্ড—১৩১
সম্বন্ধ, ব্র্যাডলীর বিরুদ্ধ যুক্তি—৩২৩-২৫
বিশৃঙ্খলার কারণ—৩৪১
সম্ভাব্যতা, কীন্সের মতবাদ অনুসারে—৩৫৩-৫৪
সম্ভাব্যতা, বিজ্ঞানে মৌলিক—৩৫৩
মি. কীন্সের মতবাদে অভিজ্ঞতাপূর্ব—৩৫৪
'পৌনঃপুনিকতা'র তত্ত্ব—৩৫৪ (ক্রমশ)
সহজাত উপকরণ—৩১
[শিক্ষাবিযুক্ত সরঞ্জাম]
'সহজাত ধারণা'র মতবাদ—৩১৪
সহানুমান—১০০
সাদৃশ্য, সদর্থক ও নঞর্থক—৩৪৯
'সাপেক্ষ অনুবর্ত'—৪৭
সার্বিক—৬৮, ২৫৯
সার্বিগায়ন—৩৪৯ (ক্রমশ)
স্যাণ্টায়ানা, মি.—২৯৩
সেমন—৬৩, ২২৯

স্পিনোজা—৩০৬, ৩২২
স্মরণ, সত্যকার—২৫৩ (ক্রমশ)
স্মৃতি, আচরণবাদী মত—৮৯ (ক্রমশ)
অতীতানুভূতির জটিলতা—২৪২
অতীতের প্রতি ইঙ্গিত—২৩৯ (ক্রমশ)
অতীতের প্রতি সংকেত সম্পর্কে ডঃ ব্রডের অভিমত—২৪৮
কল্পনার চেয়ে বেশী মৌলিক—২৪২
কল্পনা থেকে মৌলিক পার্থক্য—২৪৬-৪৭
তাৎক্ষণিক—২৫০ (ক্রমশ)
পর্যায়—২৪৯ (ক্রমশ)
বিশ্বস্ততা—২৫৪
সত্যিকার স্মরণ [স্মৃতি]—২৫২
'স্মৃতিক' কার্যফল—৬৩, ২৬৬, ৩৮২
'স্মৃতিক ঘটনাবলী—৬৩, ২২৯ (ক্রমশ)

হ

হাইজেনবার্গ—১২৪, ১৩৩, ৩৫৯, ৩৭৯
হিউম—২২৯, ২৪৩, ৩১৭ (ক্রমশ)
হুক, ম্যাশিয়ঁার—২৯৫
হেগেল—২৮৯, ২৯২, ৩২২
হেরাক্লিটাস—৩২২
হোয়াইটহেড, ডঃ—২০০

A

Analysis of Matter, The—(বার্ট্রাণ্ড রাসেল)—৩৫৮
Analysis of Sensation (মাক)—৩৭৮
Animal Intelligence (থর্নডাইক)—৪০

B

Behaviourism (ওয়াটসন) – ৩১, ৪১, ৪৪-৪৫
Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage (ক্যানন)—২৭৮

C

'Critique of Practical Reason' (কাণ্ট)—৩২০

E

Essays in Radical Empiricism – (উইলিয়াম জেম্‌স্‌)—২৬৮, ৩৭৮

L

Le probleme logique de l'induction (জ়াঁ নাইকড্‌) – ৩৪৭, ৩৫২

M

Mathematical Theory of Reality (এডিংটন)—৩৬৫
Meaning of Meaning, The (ওগ্‌ডেন ও রিচার্ড্‌স)—৬৭
Mentality of Apes (কোহ্‌লার)—৪৯ (ক্রমশ), ৭৯
Mind and Its Place in Nature, The (ডঃ ব্রড)—১৭, ২৩৯, ৩৬৪
Mneme (সেমন) – ৬৩

T

Treatise on Probability—(কীন্‌স্‌)—৩৪৭ (ক্রমশ)

W

Winds of Doctrine (স্যাণ্টায়ানা)—২৯৩

পরিভাষা

Absolute : পূর্ণাঙ্গ, চূড়ান্ত
Abstract : অমূর্ত
—argument : —যুক্তি
—idea : —ধারণা
—knowledge : —জ্ঞান
Abstraction : অমূর্তায়ন
Accidental : দৈবিক
Acolenthic sensation : বিলীয়মান সংবেদন
Acquired habits : অর্জিত অভ্যাস
Active meaning : সক্রিয় অর্থ
Active motor : সক্রিয় সঞ্চালনমূলক
Actual particular : বাস্তব বিশেষ
Administratoı's ethics : প্রশাসকের নীতি
Afferent nerve : অন্তর্বাহী স্নায়ু
After image : অনুবেদন
Analogical argument : সাদৃশ্যমূলক অনুমান
Animal faith : জৈবিক বিশ্বাস
Animal learning : প্রাণীর শিক্ষণ
Animal spirit : জীবাত্মা
Antecedent : পূর্বগ
Anthropology : নৃতত্ত্ব
Anthropomorphic : নরত্বারোপী
Anticipation : প্রাকচিন্তন
Antinomy : এনটিনমী
Apparent : আপাত প্রতীয়মান
A priori : অভিজ্ঞতাপূর্ব
A priorist : অভিজ্ঞতাপূর্ববাদী
Approximate concepts : মোটামুটি ধারণা
Asexual unicellular organism : এককোষী অযৌন জীব
Assemblage of events : ঘটনাসমষ্টি
Associated : অনুষঙ্গবদ্ধ, অনুষক্ত
Association : অনুষঙ্গ
— of ideas : ধারণার অনুষঙ্গ
Associative cause : আনুষঙ্গিক কারণ
Associative effects : আনুষঙ্গিক কার্য
— habit : অনুষঙ্গমূলক অভ্যাস
— unit : অনুষঙ্গের একক
Assumption : পূর্বস্বীকৃতি
Atomic number : পারমাণবিক সংখ্যা
— weight : পারমাণবিক ওজন
Atomistic : পরমাণুবাদী

Auditory events : শ্রুতিগত ঘটনা

—images : —মানসচিত্র

Aural images : শ্রুতিগত মানসচিত্র

Automatic machine : স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র

Auxiliary concept : সহকারী ধারণা

B

Babinski reflex : ব্যবিন্সকি অনুবর্ত

Behaviourist : আচরণবাদী

—definition : — সংজ্ঞা

—philosophy : —দর্শন

—psychology : —মনোবিগ্তা

Belief : বিশ্বাস

Bio-chemist : জৈব-রসায়নবিদ

Biological reason : জৈবিক কারণ

—survival : —উদ্বর্তন

Bodily association : দৈহিক অনুষঙ্গ প্রক্রিয়া

—habit : —অভ্যাস

—movement : —সঞ্চালন, — সঞ্চলন

— processes : —প্রক্রিয়া

—responses : —প্রতিবেদন

British empiricist : বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী

Bundle of sensations : সংবেদনপুঞ্জ

C

Canons of induction : আরোহের মূলনীতি

Cartesian doubt : কার্টেজীয় সন্দেহ/সংশয়

— dualism : —দ্বৈতবাদ

Category : ক্যাটেগরি, ক্যাটিগরি

Categories of grammar : ব্যাকরণের ক্যাটিগরি

— of reality : বাস্তবতার ক্যাটিগরি

Causal : কারণিক

—antecedent : —পূর্বগ

—chains : কার্যকারণপরম্পরা

—connection : কার্যকারণ সম্বন্ধ

—continuity : কারণিক অবিচ্ছিন্নতা

—definition : — সংজ্ঞা

—origin : — উৎস

—properties : —ধর্ম

—theory : —তত্ত্ব

—unit : —একক

—word : —শব্দ

Causality : কার্যকারণতা

Causally : কারণিকভাবে, কারণগতভাবে

Causally continuous chain of events : কার্যকারণিক অবিচ্ছিন্ন ঘটনাশৃঙ্খল

Causally self-sufficient : কার্য-কারণের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ

Causation : কার্যকারণ
Cause-and-effect relation : কার্যকারণ সম্বন্ধ
Centre of gravity : ভরকেন্দ্র
Cerebral : মস্তিষ্কগত, মস্তিষ্কীয়
Centrally excited : কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্রিক্ত
Cerebral control : মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ
—reaction : মস্তিষ্কগত প্রতিক্রিয়া
Chain of association : অনুষঙ্গ শৃঙ্খল
Chance parts : দৈবলব্ধ অংশ
Chance variation : দৈবিক পরিবর্তন
Characteristic reaction : বৈশিষ্ট্যমূলক প্রতিক্রিয়া
Chemical composition : রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি
—energy : —শক্তি
—imperialism : —সাম্রাজ্যবাদ
—peculiarity : —বৈশিষ্ট্য
—self-preservation : — আত্ম-সংরক্ষণ
—structure : —সংগঠন
Code : নীতিমালা
C -equal substnces : সহ-সমান দ্রব্য
Cognition : জ্ঞান, অবগতি
Cognitive powers : ধীশক্তি
—state : অবগতিমূলক অবস্থা
Coincidence : সমাপতন
Collective illusion : সমষ্টিক অধ্যা
Collocation : বস্তু-বিন্যাস
Commonsense : সাধারণ জ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞা
—belief : কাণ্ডজ্ঞানসম্মত বিশ্বাস কাণ্ডজ্ঞানের বিশ্বাস
—realism : কাণ্ডজ্ঞানগত বাস্তববাদ
Compulsion : বাধ্যবাধকতা
Concept : প্রত্যয়
Conclusive : চূড়ান্ত
—evidence : —প্রমাণ
Concurrent testimony : যুগপৎ প্রমা
Conditioning : সাপেক্ষীকরণ
Conditioned reflex : সাপেক্ষ অনুবর্ত, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত
— — hypothesis : — —প্রকল্প
Congenital apparatus : সহজাত সাধন উপায়
—constitution : —সংগঠন
Conscious : সচেতন
—inference : —অনুমান
Conciousness : চৈতন্য
Conservation of energy : শক্তির নিত্যতা

Conservation of momentum : ভরবেগের নিত্যতা
Construction : সংগঠন
Contingency : সম্ভাব্য ঘটনা
Continuous properties : নিরবচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য
Convention : প্রচল
Conventional : প্রচলগত
Convinient shorthand : সুবিধাজনক সংক্ষেপন
Co-ordinates of an event : ঘটনার স্থানাঙ্ক
Copy : অনুলিপি
Correlate : অনুবন্ধ স্থাপন করা ; অনুবন্ধ
Correlation : অনুবন্ধ
Correspondence : অনুরূপতা
Correspondence with fact : সত্য ঘটনার অনুরূপতা
Corresponding event : অনুরূপ ঘটনা
Cosmic forces : জাগতিক শক্তি
—time : —কাল, মহাজাগতিক কাল
Created substance : সৃষ্ট দ্রব্য
Creative : সৃষ্টিধর্মী
Creed : ধর্মমত
Crinkles in space-time : দেশ-কালের অন্তর্গত কুঞ্চন
Cromagnon man : ক্রোম্যাগনন মানব

D

Datum : উপাত্ত
Dead matter : নিষ্প্রাণ জড়
Deaf-and-dumb language : কালা ও বোবাদের ভাষা
Definable : সংজ্ঞেয়
Defined : সংজ্ঞায়িত
Definite objective time-order : সুনির্দিষ্ট বিষয়গত কাল-ক্রম
Delusion : বিভ্রান্তি
Demonstrative : প্রতিপাদনধর্মী
—argument : প্রতিপাদক যুক্তি
—inference : প্রতিপাদনমূলক অনুমান
Derivatively : গৌণভাবে
Determinism : নিয়ন্ত্রণবাদ
Deterministic : নিয়ন্ত্রণবাদী
Differences of perspective : পরিপ্রেক্ষিতের পার্থক্য
Differential equations : অন্তরাত্মক সমীকরণ
Direct belief : প্রত্যক্ষ বিশ্বাস
—confirmation : সরাসরি প্রমাণ
—experience : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা
Directly verifiable : প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণযোগ্য
Discomfort : যন্ত্রণা
Discontinuous fact : বিচ্ছিন্ন ফ্যাক্ট

Discordant desires : সামঞ্জস্যহীন বাসনা
Disinterested pursuit of knowledge : জ্ঞানের নিঃস্বার্থ অনুসন্ধান
Disorder of blind impulses : অন্ধ তাড়নার বিশৃঙ্খলা
Dissociation : বিষঙ্গ
Distinctive quality : পার্থক্যসূচক গুণ
Diturbance : আলোড়ন
Doctrine of chances : দৈবসংক্রান্ত মতবাদ
Dogma : মতবাদ
Double vision : যুগ্মদৃষ্টি
Dread fulfilment : ভীতি পূরণ
Dualism : দ্বিবিধত্ব
Dualism of mind and matter : মন ও জড়ের দ্বিত্ব
Ductless glands : নালীবিহীন গ্রন্থি

E

Efferent nerve : বহির্গামী স্নায়ু
Ego : অহম
Electromagnetism : তড়িৎ চুম্বকত্ব
Electromagnetic disturbance : বিদ্যুৎ চুম্বকধর্মী আলোড়ন
Emanation : নির্গমন
Emergent materialism : উন্মেষমূলক জড়বাদ
—properties : —ধর্ম
Emotion : আবেগ
Emotional association : আবেগিক অনুষঙ্গ
—content : —আধেয়
—significance : —তাৎপর্য
Empirical : অভিজ্ঞতিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক, অভিজ্ঞতামূলক
—generalisation : অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক সাধারণীকরণ
Empirically indistinguishable : অভিজ্ঞতার দিক থেকে অপ্রভেদযোগ্য
—verifiable : অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরখযোগ্য
Empiricist : অভিজ্ঞতাবাদী
Empty space : শূন্য দেশ
Energy : শক্তি
Entities : সত্তা
Enumeration of instances : দৃষ্টান্ত গণনা
Essential : মূলগত
Euclidean Geometry : ইউক্লিডীয় জ্যামিতি
Evidence : প্রমাণ, সাক্ষ্য
Evolution : বিবর্তন
Experience : অভিজ্ঞতা
Explanatory hypothesis : ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প

External causation : বাহ্য কারণ
—object : —বস্তু
—observation : —নিরীক্ষণ
—perception : —প্রত্যক্ষণ
—stimulus : — উদ্দীপক
Extra-cerebral event : মস্তিষ্ক-বহির্ভূত ঘটনা

F

Fact : 'ফ্যাক্ট্', বাস্তবাবস্থা
Falsehood : মিথ্যা
Familiarity : পরিচয়
Feeling : অনুভূতি
Feeling of pastness : অতীতত্বের অনুভূতি
Field of vision : দৃষ্টিক্ষেত্র
Finite : শান্ত, সসীম
Force : শক্তি, বল
Form : আকার
Formal definition : রীতিসিদ্ধ সংজ্ঞা
Formal theory : আকারিক তত্ত্ব
Formula of the conditioned reflex : সাপেক্ষ অনুবর্তের সূত্র
Four dimensional continuum of events : অবিচ্ছিন্ন চতুর্মাত্রিক ঘটনাধারা
Frequency theory : পৌনঃপুনিকতা তত্ত্ব
Frequent characteristic : পৌনঃপুনিক বৈশিষ্ট্য
Freudian suppression : ফ্রয়েডীয় অবদমন

G

General conception : সাধারণ ধারণা
Generalisation : সাধারণীকরণ
Generalised : সাধারণীকৃত
— reaction : — প্রতিক্রিয়া
— word : — শব্দ
Generality : সাধারণত্ব
Generic : জাতিবাচক
Genus : জাতি
Geodesic : ভূমিতিক
Gestalt psychologic : গেস্তাল-মনোবিজ্ঞান
Good : শুভ, ভালো
Gravitational force : মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

H

Habit-formation : অভ্যাস-গঠন
Habit memory : অভ্যাস-স্মৃতি
Habit terminology : অভ্যাস সম্পর্কিত পরিভাষা
Hallucination : মতিভ্রম
Hampton Court maze : হ্যাম্পটন কোর্ট গোলকধাঁধা
Harmonious desires : সামঞ্জস্য-পূর্ণ বাসনা

Hate ঃ ঘৃণা

Highest grade of certainty ঃ নিশ্চয়তার সর্বোচ্চ মাত্রা

Homicidal maniac ঃ নরহত্যাকারী পাগল

'How' of natural processes ঃ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর 'কিরূপে'

I

'I' ঃ 'আমি'

Idea ঃ ধারণা

Ideal logical language ঃ আদর্শ যৌক্তিক ভাষা

Illusion ঃ অধ্যাস

Illusions of touch ঃ স্পর্শগত অধ্যাস

Illusory ঃ ভ্রান্ত

Image ঃ মানসচিত্র, প্রতিরূপ

Imaginative use of words ঃ শব্দের কল্পনাত্মক প্রয়োগ

Immediate certainty ঃ তাৎক্ষণিক নিশ্চয়তা

— environment ঃ অব্যবহিত পরিবেশ

— memory ঃ তাৎক্ষণিক স্মৃতি

Impersonal contemplation ঃ নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধ্যান

Implicit behaviour ঃ অপ্রত্যক্ষ আচরণ

Impression ঃ সংবেদন, ছাপ

Improbable ঃ অসম্ভাব্য

— hyopthesis ঃ — প্রকল্প

Inanimate matter ঃ নির্জীব জড়

Indirect confirmation ঃ পরোক্ষ প্রমাণ

Induction ঃ আরোহ

Inductive inference ঃ আরোহী অনুমান

— law ঃ — নিয়ম

Inference ঃ অনুমান

Inferential ঃ আনুমানিক, অনুমানগত

Inferred ঃ অনুমিত

Infinitesimal calculus ঃ অণুকলন

Infinitesimal gravitational actio ঃ অতিক্ষুদ্র মাধ্যাকর্ষণিক ক্রিয়া

Inflected language ঃ ধাতুরূপ-সম্পন্ন ভাষা

Innate idea ঃ সহজাত ধারণা

Innate cerebral mechanism ঃ সহজাত মস্তিষ্কগত কলকব্জা

Inner duplicity ঃ আভ্যন্তরীণ দ্বি

Insight ঃ অন্তর্দৃষ্টি

Inspection ঃ অবেক্ষণ

Instinctive ঃ সহজাত, উৎপ্রেরণামূলক

— animals ঃ উৎপ্রেরণা-নিয়ন্ত্রিত প্রা

Intellectual : তাত্ত্বিক, তত্ত্বগত
— process : বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া
Intellectualist psychology : বুদ্ধিবাদী মনোবিজ্ঞান
transcription : বুদ্ধিজীবীসুলভ প্রতিরূপ
Intellectualistic : বুদ্ধিবাদী
Intelligenc : বুদ্ধি
— quotient : বুদ্ধ্যঙ্ক
Interaction : পাস্পরিক ক্রিয়া
— between mind and body : মন ও দেহের পারস্পরিক ক্রিয়া
Intermediate causes : অন্তর্বর্তী কারণাবলী
Interpretative hypothesis : ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প
Intervening medium : অন্তর্বর্তী মাধ্যম
Intrinsic characteristic : অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য
— law : — নিয়ম
— character : — চরিত্র
— causal law : — কার্যকারণ নিয়ম
Introspection : অন্তর্দর্শন
Introspective attitude : আন্তর্দার্শনিক মনোভঙ্গি
Involuntary movement : অনৈচ্ছিক সঞ্চলন/সঞ্চালন

J

Judgment : অবধারণ
Joy of life : জীবনের আনন্দ

K

Knowledge : জ্ঞান
Knowledge reaction : জ্ঞান-প্রতিক্রিয়া
— response : জ্ঞান-প্রতিবেদন
Knowing : জানা

L

Latin tag : ল্যাটিন অধিবচন
Laudatory association : প্রশংসামূলক অনুষঙ্গ
Law : নিয়ম
—of acceleration : ত্বরণের নিয়ম
Law of association : অনুষঙ্গ নিয়ম
— —correlation : অনুবন্ধের নিয়ম
— — effect : কার্যফল নিয়ম
— — exercise : অনুশীলন নিয়ম
— — Parallelogram : সামন্তরিক নিয়ম
— — sequence : পর্যায়ক্রমের নিয়ম
— — syntax : পদবিন্যাসের নিয়ম
— — thought : চিন্তার নিয়ম
— — transfer of response : প্রতিবেদনের স্থানান্তর নিয়ম
Lazy scepticism : অলস সংশয়বাদ

Learned reaction : শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া
Learning by experience : অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষণ
— — insight : অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষণ
Legal code : আইনের নীতি-মালা
Light-quanta : আলোক-কণা
Light-wave : আলোক-তরঙ্গ
Limited free will : সীমাবদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছা
Living matter : সপ্রাণ জড়
Living tissue : জীবন্ত তন্তু
Logical atomism : যৌক্তিক পরমাণুবাদ
— category : যৌক্তিক ক্যাটেগরি
— chain : যুক্তি-পরম্পরা, যুক্তি-শৃঙ্খল
— characteristic : — বৈশিষ্ট্য
— construction : যৌক্তিক সংগঠন
— content : — আধেয়
— contradiction : — বিরোধ
— structure : — কাঠামো
— impossibility : —অসম্ভাব্যতা
— principle : — সূত্র
—process : — পদ্ধতি/প্রক্রিয়া
Logically impossible : যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব
Logically self-subsistent entity : যৌক্তিকভাবে স্বয়ংনির্ভর সত্তা
Love : প্রেম
Logical puzzle : যৌক্তিক ধাঁধা
Logically dependent : যৌক্তিকভাবে নির্ভরশীল

M

Maladjustment : অনোপযোজন
Manifold of points : বিন্দুর সমাহার
Manual habit : দৈহিক অভ্যাস
Matter : জড়
Materialism : জড়বাদ
Materialist : জড়বাদী
Material constituents : জড় উপাদান
— energy tensor : জড়শক্তি টেন্সর
— structures : জড় সংগঠন, জড় কাঠামো
— unit : — একক
Mathematical characteristics : গাণিতিক বৈশিষ্ট্য
— equivalent : — সমমানিক
— fiction : — রূপকথা
— physics : — পদার্থবিদ্যা
— properties : — বৈশিষ্ট্য
— symbol : — প্রতীক

Maxwell equations : ম্যাকস্বেলের সমীকরণ
Meaning : অর্থ
Meaninglessness : অর্থহীনতা
Measurable future : পরিমাপযোগ্য ভবিষ্যৎ
Mechanical : যান্ত্রিক
Mechanism : যন্ত্র, যন্ত্রবাদ
Mechanism of association : অনুষঙ্গের প্রক্রিয়া
Memory : স্মৃতি
Mental constituents : মানসিক উপাদান
— occurrences : — ঘটনা
Mentality : মানসিকতা, মনোধর্মিতা
Metaphysics : পরাতত্ত্ব, অধিবিদ্যা
Metaphysical : পরাতাত্ত্বিক
— belief : — বিশ্বাস
— connotation : — জ্যাতার্থ
— necessity : — অপরিহার্যতা
— sense : রূপক অর্থ
— speculation : পরাতাত্ত্বিক চিন্তাধ্যান
Methodic doubt : পদ্ধতিগত সংশয়
Methodological precept : পদ্ধতিগত উপদেশ
Metrical geometry : পরিমাপী জ্যামিতি
Middle term : মধ্যপদ
Mind : মন
Minimal event : ন্যূনতম ঘটনা
Mirage of illusion : অধ্যাস মরিচিকা
Mnemic : স্মৃতিক, স্মৃতিগত
Mnemic cause : স্মৃতিগত কারণ
— causation : — কার্যকারণ
— causal chain : — কার্যকারণ শৃঙ্খল
— effect : — কার্য, স্মৃতিক কার্য
— phenomena : স্মৃতিক ঘটনাবলী
Modifications of the brain : মস্তিষ্কের রূপান্তর
Molar motion : দেহ সঞ্চালন
Momentary experience : ক্ষণিক অভিজ্ঞতা
Monad : মনাদ
Monism : একত্ববাদ
Monist : একত্ববাদী
Monistic : একত্ববাদী
Morals : নীতিশিক্ষা
Moral code : নৈতিক নীতিমালা
— rule : — নিয়ম
Motion : গতি
Motor : সঞ্চালনমূলক
— centre : মোটর কেন্দ্র

Motor part : সঞ্চালনমূলক অংশ/অঙ্গ
Movement – গতি
Multiple personality : বহুমুখী ব্যক্তিত্ব
Muscular event : পেশিক ঘটনা
Mysticism : মরমীবাদ
Mystical faculty : রহস্যময় বৃত্তি
— epiphany : — এপিফ্যানি
— speculation : মরমীবাদী ধ্যান

N

Naive belief : অতি-সরল বিশ্বাস
— realism : সরল বাস্তববাদ
Narrative uses of words : শব্দের বর্ণনামূলক প্রয়োগ
Natural History : প্রাকৃত ইতিহাস
Natural response : স্বাভাবিক প্রতিবেদন
Necessary condition : আবশ্যিক শর্ত
Necessarily : অবশ্যম্ভাবীরূপে
Negative analogy : নঞর্থক সাদৃশ্য
Neighbourhood of an event : ঘটনার প্রতিবেশ
Neutral authority : নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ
— monism : নিরপেক্ষ একত্ববাদ
Noise : ধ্বনি, আওয়াজ
Non-inferential : অনুমানবিযুক্ত
— knowledge : অনুমান-বহির্ভূত জ্ঞান
Nonverbal fact : অশাব্দিক ফ্যাক্ট
Numerically measurable probability : সংখ্যার দ্বারা পরিমাপ-যোগ্য সম্ভাব্যতা

O

Objective : বিষয়গত
— method : — পদ্ধতি
— phenomenon : — ব্যাপার
— psychology : — মনোবিজ্ঞান
— reality : বাস্তব সত্তা
— significance : — তাৎপর্য
— standpoint : — দৃষ্টিকোণ
— study : বিষয়নিষ্ঠ পর্যালোচনা
— verification : বিষয়গত প্রমাণ
Objectivity : বিষয়মূলকতা
Object represented : প্রতিবেদিত বস্তু
Object-side : বিষয়-দিক
Obscurantism : প্রচ্ছন্নতাবাদ
Observer and the observed : নিরীক্ষক ও নিরীক্ষিত, পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত
Observable : নিরীক্ষণযোগ্য
Observation : নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ
Occurrence : ঘটনা
— of a word : শব্দের প্রয়োগ

Olfactory : ঘ্রাণগত
Open question : অমীমাংসিত প্রশ্ন
Optic nerve : অক্ষি স্নায়ু
Order of the words : শব্দ-বিন্যাস
Ordinary act of perception : সাধারণ প্রত্যক্ষণ ক্রিয়া
— language : — সাধারণ ভাষা
— nouns : — নামবাচক পদ
— philosophy : — দর্শন
Outer world : বহির্জগৎ
Over-simplification : অতি-সরলীকরণ

P

Paradoxical conclusion : কূটাভাসধর্মী সিদ্ধান্ত
Parallelism : সহচার
Particularity : বিশেষত্ব
Passion : ভাবাবেগ
Passive meaning : নিষ্ক্রিয় অর্থ
Pastness : অতীতত্ব
Patch of colour : রঙের ছাপ/ছোপ
Pattern of colours : রঙের প্যাটার্ন
Perception : প্রত্যক্ষণ
Perceptive : প্রত্যক্ষণগত, প্রত্যক্ষণশীল
Percipient : প্রত্যক্ষক
Perceptual space : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশ
Perceiver : প্রত্যক্ষক
Persistence of a body : বস্তুর স্থায়িত্ব
Persistent space : পরিবর্তনহীন দেশ
Person : ব্যক্তি
Personal immortality : ব্যক্তিগত অমরত্ব
Phenomenon of fluorescence : প্রতিপ্রভা-প্রপঞ্চ
Philosophy of Physics : পদার্থ-বিদ্যার দর্শন
Philosophical validity : দার্শনিক বৈধতা
Photographic plate : আলোকচিত্রের পর্দা
Physical antecedent : পদার্থিক পূর্বগ
— causal connection : ভৌত কার্যকারণ সম্বন্ধ
— causation : ভৌত কার্যকারণ
— chain : জড় শৃঙ্খল
— environment : জড় পরিবেশ
— fact : পদার্থিক সত্য
— inference : পদার্থবৈজ্ঞানিক অনুমান
— knowledge : পদার্থিক জ্ঞান

— object : জড় বস্তু
— occurrence : ভৌত ঘটনা, পদার্থিক ঘটনা, জড় ঘটনা
— phenomena : পদার্থিক ঘটনা
— process : — প্রক্রিয়া
— realm : — জগৎ
— space : — দেশ
— stimulus : জড় উদ্দীপক
— structure : পদার্থিক কাঠামো
— world : বস্তুজগৎ, পদার্থিক জগৎ

Physically impossible : পদার্থিক দিক থেকে অসম্ভব
Physiological concomitant : শারীরবৃত্তীয় সহগ
— conditions : দৈহিক শর্তাবলী
— explanation : শরীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
— induction : শারীরবৃত্তীয় আরোহ
— inference : শারীরবৃত্তিক অনুমান, শরীরতত্ত্বীয় অনুমান
— optics : শরীরবৃত্তীয় আলোকতত্ত্ব
— process : — প্রক্রিয়া
Physiologist : শরীরতত্ত্ববিদ
Place : স্থান
Plank's constant : প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক
Planetary electrons : আবর্তমান ইলেকট্রন
Plausible line of argument : আপাতসিদ্ধ যুক্তির ধারা
Pleasure : সুখ
Pleasant : প্রীতিকর
— consequence : সুখদায়ক ফল
Pluralism : বহুত্ববাদ
Pluralistic : বহুত্ববাদী
Pluralist : বহুত্ববাদী
Point-instant : বিন্দু-মুহূর্ত
Popular language : লৌকিক ভাষা
— metapysics : — অধিবিদ্যা
Positive analogy : সদর্থক সাদৃশ্য
Possessive activities : অধিকারধর্মী কাজকর্ম
Possible datum : সম্ভাব্য উপাত্ত
Postulate : পূর্ব স্বীকৃতি, প্রাক্-স্বীকার্য
Practical certainty : ব্যবহারিক নিশ্চয়তা
— difficulty : প্রয়োগিক অসুবিধা
— induction : ব্যবহারিক আরোহ
Practically indistinguishable : কার্যতঃ অপ্রভেদযোগ্য
Pragmatism : প্রয়োগবাদ
Pragmatist : প্রয়োগবাদী
Preconception : পূর্বধারণা
Predicate : বিধেয়

Pre-established harmony : পূর্বস্থাপিত/প্রাকপ্রতিষ্ঠিত সমন্বয়
Prejudice : পূর্বসংস্কার
Presupposition : পূর্ব ধারণা
Primary datum : মূল উপাত্ত
Primitive desire : আদিম বাসনা
Principle of conditioning : সাপেক্ষীকরণ নিয়ম
Principle of limitations of variety : বৈচিত্র্যের সীমাবদ্ধতার সূত্র
Private : ব্যক্তিগত
— data : — তথ্যাবলী/উপাত্ত
— fact : — সত্য
Process of conditioning : সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়া
Professional confidences : পেশাগত আস্থা
Progressive periodic processes : ক্রমবর্ধিষ্ণু পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া
Projective geometry : অভিক্ষেপী জ্যামিতি
Property : ধর্ম
Proper names : বিশেষ নাম, স্বকীয় নাম
Proposition : যুক্তিবাক্য, প্রতিজ্ঞা
Protoplasm : প্রটোপ্লাজম
Prototype : মূলাদর্শ
Provisional definition : অস্থায়ী সংজ্ঞা
— law : বিবেচনা সাপেক্ষ নিয়ম
Proximate causes : গৌণ কারণ
Psychologist : মনোবিজ্ঞানী
Psychoanalysis : মনোবিশ্লেষণ
Psychophysical parallelism : দেহ-মন সহচার
Public senses : প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়সমূহ
Publicly observable : প্রত্যক্ষভাবে নিরক্ষণযোগ্য
Publicity of physical facts : পদার্থিক সত্যগুলোর প্রকাশ্যতা
Pure intellect : নিছক বুদ্ধি
— observation : বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ
Purely contemplative knowledge : বিশুদ্ধ ধ্যানগত জ্ঞান
Pushiness of matter : জড়ের ধাক্কাপ্রবণতা

Q

Quantitative laws of tendency : প্রবণতার পরিমাণগত নিয়ম
— relation : পরিমাণগত সম্বন্ধ
Quantum phenomena : কোয়ান্টাম-গত ঘটনাবলী, কোয়ান্টাম ঘটনাবলী
— principle : কোয়ান্টাম নিয়ম, কোয়ান্টাম সূত্র
Quasi-permanent material structures : অর্ধস্থায়ী জড় সংগঠন

R

Radiator : রেডিয়েটর

Radio-activity : তেজস্ক্রিয়তা

Rage reaction : ক্রোধাত্মক প্রতিক্রিয়া

Random acts : এলোমেলো ক্রিয়া

— movement : বিশৃঙ্খল ছুটাছুটি

Rational : যুক্তিসিদ্ধ, যুক্তিবাদী

— man : যুক্তিবাদী মানুষ

Rationalising of natural processes : প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যৌক্তিগায়ন

Rationalisation : যুক্ত্যাভাস

Reaction to the environment : পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া

Real : বাস্তব

Reality : বাস্তবতা/সত্তা

Realm of guess work : আন্দাজের জগৎ

Reason : যুক্তি, বুদ্ধি, কারণ

Recency : সাম্প্রতিকতা

Receptive : গ্রাহী

Reciprocity : ব্যতিহার

Recognition : পুনরাভিজ্ঞান

Recollection : স্মৃতি, পুনরাভিজ্ঞান, স্মরণ

Reflex : প্রতিবর্ত, অনুবর্ত

Refraction : প্রতিসরণ

Regress : পশ্চাদগামী যুক্তিধারা

Relation : সম্বন্ধ

Relational words : সম্বন্ধসূচক শব্দ

Relativity dynamics : আপেক্ষিকতাবাদী গতিবিদ্যা

Relations of order : ক্রমের সম্বন্ধ

Remembering : স্মরণ

Representation : প্রতিস্থাপনা, প্রতিবেদন

Response : প্রতিবেদন

Resultant : অন্তফল

Retentiveness : ধারণক্ষমতা

Revealed religion : প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম

Reversibility of causal laws : কার্যকারণ নিয়মগুলোর প্রতিবর্তনযোগ্যতা

Rhythmical events : তাল-লয়-বিশিষ্ট ঘটনা

Rightness of conduct : আচরণের ন্যায্যতা

Rods and cones : দণ্ড ও শঙ্কু

S

Salivary glands : লালাগ্রন্থি

Satisfaction : পরিতোষ

Scheme : পরিকল্প

Scepticism : সংশয়বাদ

Sceptic : সংশয়বাদী

Secrets of the confessional : কনফেশনালের গোপন কথা

Seeming : প্রতীয়মান হওয়া
Seeming table : প্রতীয়মান টেবিল
Self : অহম
Self-consistent : আত্মসঙ্গতিপূর্ণ, আত্মসমন্বিত
Self consciousness : আত্মচৈতন্য
Self-contradiction : স্ব-বিরোধিতা, আত্ম-বিরোধিতা
Self-contradictory : আত্মবিরোধী
Self-luminous : স্ব-ভাস্বর
Self-observation : আত্ম-নিরীক্ষণ
Self-subsistent : স্বয়ংনির্ভর
Sensation : সংবেদন
Sensation of touch : স্পর্শ-সংবেদন
Sensation through association : অনুষঙ্গের মাধ্যমে সংবেদন
Sense organ : ইন্দ্রিয়
Sensible stimulus : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপক
Sensory : ইন্দ্রিয়জ, ইন্দ্রিয়গত
Sensitivity : সংবেদনশীলতা
Series : অনুক্রম
— of actions : ক্রিয়া পরম্পরা, কার্যক্রম
— causes : পরম্পরাবদ্ধ কারণ, কারণানুক্রম
Shape : আকৃতি
Sign : চিহ্ন
Simple entity : সরল সত্তা
Simplification : সরলীকরণ
Simultaneous stimuli : সমসাময়িক উদ্দীপক
Singularities : অসাধারণ বৈশিষ্ট্য
Solipsism : আত্মসর্বস্বতাবাদ
Sophistication : সূক্ষ্মীকরণ
Sound-waves : শব্দ তরঙ্গ
Space : দেশ
Space-like : দেশ-সদৃশ
Space-order : দেশ-বিন্যাস
Space-time order : দেশ-কালিক অনুক্রম
— points : দেশ-কালিক বিন্দু
Space of sight : দৃষ্টির দেশ
Specious present : অপ্রকৃত বর্তমান
Spatial configuration : দৈশিক সংগঠন
Spatial relation : দৈশিক সম্বন্ধ
Species : প্রজাতি
Speculative possibility : চিন্তাগত সম্ভাবনা
Sphere of values : মূল্যের ক্ষেত্র
Spiritualist seance : প্রেততত্ত্ববিদের সেয়াসেঁ
Square numbers : বর্গমৌলিক সংখ্যা

Statement : উক্তি
Statistical averages : পরিসংখ্যানিক গড়, পরিসংখ্যানগত গড়
— knowledge : পরিসংখ্যানিক জ্ঞান
Stellar universe : নাক্ষত্রিক বিশ্ব
Stimulus : উদ্দীপক
— internal and external : উদ্দীপক, আভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ
Stimulated : উদ্দীপিত
String of actions : ক্রিয়া পরম্পরা
— events : ঘটনা পরম্পরা
Structure : কাঠামো
— of language : ভাষার কাঠামো
Stuff : উপাদান
Subject : উদ্দেশ্য, কর্তা
Subject-predicate structure : উদ্দেশ্য-বিধেয় কাঠামো
Subject-side : বিষয়ী দিক
Subjective : আত্মগত, বিষয়ীগত
— psychology : বিষয়ীগত মনোবিজ্ঞান
— standpoint : — দৃষ্টিকোণ
Substance : পদার্থ, দ্রব্য, অধিবস্তু
Substantial : সত্তাধর্মী, পদার্থিক
Substantiality : দ্রব্যত্ব
— of words : শব্দের পদার্থিকতা
Substitute stimulus : প্রতিকল্পী উদ্দীপক
Successive links : আনুক্রমিক সংযোগ
Suggestion : নির্দেশনা, ইঙ্গিত
Supreme substance : পরম দ্রব্য
Syllogistic inference : সহানুমান
— logic : সহানুমানিক যুক্তিবিদ্যা
Sympathetic muscular contractions : সহানুভূতিসূচক পৈশিক সঙ্কোচন
Syntax : পদবিন্যাস
Synthesis of things : বস্তু-সমষ্টির সমন্বয়
Synthetic : সংশ্লেষণাত্মক
— a priori : অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক
System of knowledge : জ্ঞানতন্ত্র

T

Tactual images : স্পর্শগত মানসচিত্র
Tatuological : পুনরুক্তিমূলক
Technical sense : টেক্নিক্যাল অর্থ
— terms : পারিভাষিক শব্দ
Technicalities : কলাকৌশল
Temporal process : কালিক প্রক্রিয়া
— sequence : — অনুক্রম

— succession : অনুক্রম
Tentative : পরীক্ষামূলক
Testimony : সাক্ষ্য
Theology : ধর্মতত্ত্ব
Theory of knowledge : জ্ঞানতত্ত্ব, ধীবিদ্যা
— meaning : অর্থ-তত্ত্ব
— relativity : আপেক্ষিকবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ
Theoretically deducible : তত্ত্বগতভাবে অনুমানযোগ্য
— inexplicable : তত্ত্বগতভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব
Thing : বস্তু, জিনিস
Thing in itself : শুদ্ধ সত্তা
Things and their qualities : বস্তু ও তাদের গুণ
Thinking : চিন্তন
Thre-edimensional world : ত্রিমাত্রিক জগৎ
Time : কাল
Time-like : কাল-সদৃশ
Time-like interval : সময়-সদৃশ বিরতি
Time-order : কাল-বিন্যাস, কাল-ক্রম
Touch reaction : স্পর্শ প্রতিক্রিয়া
Traditional Philosophy : গতানুগতিক দর্শন
Truism : স্বতঃসিদ্ধ সত্য
Truth : সত্য, সত্যতা
Two-dimensional pattern : দ্বিমাত্রিক প্যাটার্ন
Tyranny of prejudice : পূর্ব সংস্কারের উৎপীড়ন

U

Ultimate certainty : চরম নিশ্চয়তা
— philosophy : — দর্শন
Unconscious desire : অবচেতন বাসনা
— inference : — অনুমান
Unit : একক
Unity of a body : বস্তুর ঐক্য
Universal : সার্বিক [বিশেষ্য ও বিশেষণ]
Universe : জগৎ, বিশ্ব
Unlearned response : সহজাত প্রতিবেদন
Unreflecting judgment : চিন্তাশূন্য/চিন্তাবিযুক্ত অবধারণ
Unstable equilibrium : অস্থায়ী সমতা
Unsubstantial : অবাস্তব

V

Vagueness : অস্পষ্টতা
Validity : বৈধতা, অভ্রান্ততা

Verbal behaviour : শাব্দিক আচরণ
— expression : — প্রকাশ
— habit : — অভ্যাস
— induction : — আরোহ
— intermediaries : — মাধ্যম
— preliminaries : —পূর্বায়োজন
— symbolisation : শাব্দিক প্রতীকায়ণ
— thinking : শব্দগত চিন্তা
Verification : প্রতিপাদন
Verified : প্রতিপাদিত
Verify : পরীক্ষা/প্রতিপাদন করা
Virtue : সদগুণ
Visceral memory : আন্ত্রিক স্মৃতি
— response : — প্রতিবেদন
Vision : দৃষ্টি
Visual : দৃষ্টিগত
Visual dimension : দৃষ্টিগত মাত্রা
Visual object : দৃষ্টিগত বস্তু
Vital : জৈবিক
Vitalist : প্রাণবাদী
Volition : ইচ্ছা
Voluntary : ঐচ্ছিক

W

Waking perceptions : জাগ্রতাবস্থায় প্রত্যক্ষণ
Watsonian : ওয়াটসনীয়
Wave motion : তরঙ্গ-গতি
'Why' of natural processes : প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর 'কেন'
Wild metaphysical speculation : লাগাম-ছাড়া পরাতাত্ত্বিক কল্পচিন্তা
Willing : ইচ্ছা করণ
Windowless (monad) : গবাক্ষহীন (মনাদ)
Wish fulfilment : ইচ্ছা-পূরণ
Word : শব্দ
Word-picture : শব্দচিত্র
Working hypothesis : সাময়িক প্রকল্প
Wrongness of conduct : আচরণের অন্যায্যতা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২২-২৩	কাণ্ডজ্ঞানলব্ধ বিশ্বাসগুলো কেবল যে	কাণ্ডজ্ঞানলব্ধ বিশ্বাসগুলোর দার্শনিক বিভ্রান্তিসমূহ কেবল যে
১৩	১৬	সে অথে প্রত্যক্ষণের	সে অর্থে বাহ্য প্রত্যক্ষণের
৬৫	১২	অন্যের কথা বোঝার ক্ষেত্রে	[এখান থেকে নতুন অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছে]
৭৯	১৪	প্রারম্ভিক স্পর্শ-প্রক্রিয়া	প্রারম্ভিক স্পর্শ-প্রতিক্রিয়া
৮৬	২৬	জৈবিক প্রক্রিয়া	পদার্থিক প্রক্রিয়া
৯২	১৭	আম্রিক অভ্যাসও	আম্রিক প্রতিবেদনও
১০২	১২	বুক্তাভ্যাস	বুক্ত্যাভাস
১৩৯	১৪-১৫	বিশেষ, ধর্মগুলো	বিশেষ ধর্মগুলো
১৮৩	২৫	প্রতিপ্রভা-প্রপক্ষের	প্রতিপ্রভা-প্রপঞ্চের
২১৫	২৯	উপর তাঁর প্রতিক্রিয়ার	উপর তাঁর অখণ্ড প্রতিক্রিয়ার
৩৩৪	২৪	animal spirit	"animal spirits"
৩৬৩	২১	সাম্পতিক	সাম্প্রতিক
৩৬৬	৮	যদি ও	যদিও
৩৬৬	৯	যদিও যখন	যদি ও যখন